অর্থবিদ্যা

ECONOMIC PRINCIPLES

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী

অর্থবিদ্যা

দ্বিতীয় সংস্করণ

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

অনিলকুমার বসাক এম. এ.

অমৃতরঞ্জন চক্রবর্তী এম. এ.

ECONOMIC PRINCIPLES

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৭০০ ০০৯

দ্বিতীয় সংস্করণ
অগস্ট ১৯৬৫

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম খণ্ড শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
জ্ঞানোদয় প্রেস, ৫৫বি কবি সুকান্ত সরণি, কলিকাতা ৭০০০৮৫ হইতে মুদ্রিত
দ্বিতীয় খণ্ড শ্রীপ্রদীপকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
টাইপোগ্রাফার্স অব ইণ্ডিয়া, ৩৮-এ তালপুকুর রোড, কলিকাতা ৭০০০৮৫ হইতে মুদ্রিত

বিষয়সূচী

১

ভূমিকা
INTRODUCTION

অর্থনৈতিক শব্দ ও মূল ধারণাবলী
ECONOMIC TERMS AND BASIC CONCEPTS

১. ১. অর্থবিদ্যা চর্চার প্রয়োজন কি ? / Why Study Economics ?

১. নানান প্রাকৃতিক সম্পদে ভারত সমৃদ্ধ হলেও, ভারতবাসী এত গরিব কেন ? স্বাধীনতা লাভের পর থেকে দেশে কলকারখানা, জিনিসপত্রের উৎপাদন এত বেড়েছে, তা সত্ত্বেও বেকারের সংখ্যা ও জিনিসপত্রের দরদাম বেড়েই চলেছে কেন ? কৃষির উৎপাদন বাড়ছে কিন্তু সেই সাথে দেশে গরিব চাষী ও খেতমজুরের সংখ্যাও বাড়ছে কেন ? স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ধনী আরও ধনী এবং গরিব আরও গরিব হচ্ছে কেন ? কলকারখানার ও খেতখামারের উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্যস্তর হ্রাস, বেকারদের কাজের সংস্থান, সাধারণ মানুষের আয় এবং জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করার উপায় কি ? দেশের হাতে যে সম্পদ বা সম্বল রয়েছে তার অধিকাংশ শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের জন্য খরচ করা উচিত, না, কৃষির উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা উচিত ? মানুষের বর্তমান অভাব দূর করার উপযোগী ভোগ্যপণ্য সামগ্রী বেশি করে উৎপাদন করা উচিত, না, ভবিষ্যতে ভোগ্যপণ্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়ানোর জন্য এখন বেশি করে পুঁজিদ্রব্য (যেমন যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) উৎপাদন করা প্রয়োজন ? আমাদের সম্পদের বেশির ভাগ কি প্রতিরক্ষার শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা উচিত, না কি তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা উচিত ? দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কি কমানো উচিত ? তাহলে তার প্রকৃষ্ট উপায় কি ? অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমাদের দেশের পক্ষে কোন্ ধরনের কারিগরী কলাকৌশল ও পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী ? আমাদের কি এমন পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত যাতে যন্ত্রপাতির তুলনায় শ্রমিক বেশি লাগে, না. এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত যাতে শ্রমিকের তুলনায় যন্ত্রপাতি বেশি লাগে ? মুদ্রাস্ফীতিকে সকলে খারাপ বলে কেন ? তা দূর করার উপায়ই বা কি ? এমনি হাজার হাজার প্রশ্ন আজ আমাদের সকলেরই মনে।

২. কৃষকরা জানতে চান, ফসলের উৎপাদন খরচ কমানোর ও ন্যায্য দাম সুনিশ্চিত করার উপায়টা কি ? কারখানার মালিকরা জানতে চান, উৎপাদন খরচ কমানোর, উৎপাদন ও বিক্রির পরিমাণ বাড়ানোর এবং উৎপন্ন সামগ্রী লাভজনক দামে বিক্রি করার উপায়টা কি ? কারবারীরা জানতে চান, কারবার পরিচালনার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থাটা কি ? শ্রমিক-কর্মচারী সাধারণ মানুষ জানতে চান, তাঁদের আয় বাড়ানোর উপায়টা কি ? তরুণ ও যুবক কর্মপ্রার্থীদের জিজ্ঞাস্য, কোন্

ধরনের কাজে বেকার হওয়ার আশঙ্কা কম? রোজগারী মানুষের সমস্যা, আয়ের কতটা সঞ্চয় এবং কতটা খরচ করা উচিত?

৩. এমনি হাজার হাজার প্রশ্ন হল মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন, আর এই সব প্রশ্নের সঠিক সমাধানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের সরকারের সাফল্য বা অসাফল্য, স্থায়িত্ব বা পতন, দেশের সমৃদ্ধি বা দারিদ্র্য এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও সমৃদ্ধি। আর একমাত্র অর্থবিদ্যাই পারে এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে।

৪. তাই আজ দুনিয়ার এমন কোন দেশ নেই যার সরকারের একটি দিনও অর্থনীতিবিদ্‌দের পরামর্শ ছাড়া চলতে পারে। এমন উন্নতিশীল আধুনিক কারবারী সংস্থা নেই যা অর্থনীতিবিদ্‌দের মতামত ও গবেষণা ছাড়া চলে। ভারতের কথাই ধরা যাক। অর্থনীতিক সমস্যাগুলির সমাধান ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে সম্পূর্ণ হতে পারে না সে সত্য উপলব্ধি করেই ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়ে সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সেই পথে অগ্রসর হয়েই স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার গঠন করেন যোজনা কমিশন। সেই যোজনা কমিশন এখন দেশের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারগুলির প্রধান উপদেষ্টায় পরিণত হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক যোজনাগুলি হয়ে উঠেছে দেশের নানা গুরুতর অর্থনীতিক সমস্যা সমাধানের উপায়।

৫. অর্থবিদ্যার জ্ঞান কারবারীকে আরও ভালভাবে কারবার চালাতে সাহায্য করতে পারে। সংসারী মানুষকে আরও ভালভাবে তার সংসার চালাতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু **অর্থবিদ্যায় তাবৎ সমস্যার আলোচনা করা হয় গোটা সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের দিক থেকে, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে, কারো ব্যক্তিগত ভালমন্দ লাভ-লোকসানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নয়।**

১.২. অর্থনীতিক শব্দাবলী ও অর্থনীতিক সমস্যাবলীর উৎস

Economic Terms and Sources of Economic Problems

১. অর্থবিদ্যার মূল ভিত্তি হল দু'টি বাস্তব তথ্য: মানুষের অসীম অভাব; এবং অভাব তৃপ্তির উপকরণের স্বল্পতা।

২. **অসীম অভাব** (unlimited wants): মানুষের বস্তুগত অভাব (material wants) হল সীমাহীন, অনন্ত। অর্থবিদ্যায় বস্তুগত অভাব বলতে প্রথমত বোঝায় এমন সব দ্রব্য (goods) ও সেবাকর্মের (services) জন্য ভোগীদের আকাঙ্ক্ষা যা থেকে তারা তৃপ্তি পায়, যা পেলে তাদের অভাব দূর হয়। খাদ্য, পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, বই, খাতা, কলম, পেনসিল. সাইকেল, রেডিও, বাড়িঘর, গহনা, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটার, চা, কফি, ডাক্তারের চিকিৎসা, উকীলের পরামর্শ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মেরামতি, নার্সের সেবা, রেল, ট্রাম, গাড়ির চালকের কাজ, বিমানের পাইলটের কাজ ইত্যাদি হল এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু এই জিনিসগুলি সব এক ধরনের নয়। এদের মধ্যে ন্যূনতম খাদ্য, পানীয়, পোশাক-

পরিচ্ছদ ইত্যাদি হল **প্রয়োজনীয় দ্রব্য** (necessaries); রেডিও, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটার, গহনা প্রভৃতি **হল বিলাস দ্রব্য** (luxuries)। চা, কফি ইত্যাদি **হল আরামদায়ক দ্রব্য** (comforts)। আবার এইসব দ্রব্যের মত ডাক্তারের চিকিৎসা, উকীলের পরামর্শ, নার্সের সেবা, কারিগরদের যন্ত্রপাতি মেরামতির কাজ, গাড়ি ও বিমান চালকের কাজ, অফিস-কাছারির কর্মীদের কাজ, শিক্ষকের কাজ ইত্যাদি, যা সেবাকর্ম বলে গণ্য হয়, মানুষের অভাব তৃপ্ত করে। সুতরাং অর্থবিদ্যায় দ্রব্য ও সেবা এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য নেই।

বস্তুগত অভাব বলতে ব্যক্তির মতই যাবতীয় কারবারী সংস্থা, সরকারি সংস্থা ও সরকারের নানাবিধ দ্রব্য ও সেবাকর্মের জন্য আকাঙ্ক্ষাও বোঝায়। কারবারী সংস্থাগুলি চায় কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, গুদামঘর, ব্যাঙ্ক, বীমা প্রভৃতি। জন-সাধারণের সমষ্টিগত আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসাবে কিংবা তার নিজস্ব নির্ধারিত লক্ষ্য হিসাবে সরকার চায় পথ, ঘাট, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, নদীবাঁধ, বিদ্যুৎ-কেন্দ্র, সামরিক সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি।

দ্রব্য ও সেবাকর্মের এই যে অভাব তৃপ্ত করার ক্ষমতা, অর্থবিদ্যায় একে বলে **উপযোগ** (utility)। যার উপযোগ আছে তাই হল দ্রব্য (ও সেবাকর্ম)। দ্রব্য ও সেবাকর্ম হল মানুষের অভাব তৃপ্ত করার উপায় মাত্র (means), তার বেশি কিছু নয়। অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে দ্রব্য ও সেবাকর্ম ব্যবহার করার কাজটাকে বলে **ভোগ** (consumption)। যে ভোগ করে সে হল **ভোগী** (consumer)। দ্রব্য ও সেবাকর্মের মধ্যে যে উপযোগ থাকে ভোগের দ্বারা তা ক্ষয় পায়। ভোগ হল একটা **প্রক্রিয়া** (process)। নানা ধরনের **অভাব দূর করার জন্য মানুষের যাবতীয় কাজকর্মই হল অর্থনৈতিক কাজকর্ম** (economic activity)। অভাব তৃপ্ত করাই হল যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য।

অভাবের বৈশিষ্ট্য একাধিক : (ক) সীমাহীনতা হল অভাবের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এটি হল সাধারণ অর্থে। মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই বলে **সাধারণভাবে** তার **অভাবেরও শেষ নেই।** একটি অভাব মিটলে সে জায়গায় অন্য একটি অভাব দেখা দিতে পারে এবং দেয়ও। এই অর্থে অভাব হল অসীম। (খ) যে কোন নির্দিষ্ট বস্তুর জন্য যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে, মানুষের অভাব অবশ্যই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ মানুষের **যে কোন নির্দিষ্ট অভাবের সীমা আছে।** আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি পেলে নির্দিষ্ট সময়ে তার নির্দিষ্ট বস্তুটির অভাব সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়। (গ) মানুষের অনেক অভাব **পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী** হতে পারে। এটা সাধারণত হয় তার সীমাবদ্ধ আয়ের জন্য ও সমাজের সম্পদের স্বল্পতার দরুন। যেমন আয় সামান্য হলে জামা ও জুতো দুটোই কেনা সম্ভব নাও হতে পারে। তখন কোন্‌টার অভাব বা প্রয়োজন বেশি অর্থাৎ অভাব পূরণে কোন্‌টাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তা স্থির করতে হয় এবং একটি অভাব পূরণ করতে গিয়ে অপরটি ত্যাগ করতে হয়। (ঘ) **অভাবগুলি** আবার একে অপরের **পরিপূরক ও সম্পূরকও হতে পারে।** যেমন, চা খেতে ইচ্ছে হলে চায়ের অভাব থেকে চিনির এবং দুধের অভাব দেখা

দেয় এবং তখন চায়ের অভাব মেটাতে হলে চিনি এবং দুধের অভাবও মেটাতে হয়। (ঙ) বিজ্ঞাপন, প্রচার এবং অন্যের দৃষ্টান্ত ইত্যাদির দ্বারা মানুষের অভাববোধ প্রভাবিত হয় এবং তার ফলে নতুন নতুন অভাবের জন্ম হয়।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সে বাস করে তার পরিবারে। সে পরিবার একজনকে নিয়ে যেমন, তেমনি দশজনকে নিয়েও গঠিত হতে পারে। এক একটি পরিবারকে ভোগের এক একটি একক বা **ভোগী-একক** (unit of consumption) বলে অর্থবিদ্যায় গণ্য করা হয়। অর্থবিদ্যায়, ভোগী-এককগুলি অর্থাৎ পরিবারগুলি (household units) হল সমাজের প্রধান দুটি অর্থনীতিক এককের মধ্যে একটি **মূল একক** (basic unit)।

৩. **স্বল্প উপকরণ** (scarce resources)**:** দ্রব্যসামগ্রী তৈরী ও সেবাকর্ম নির্বাহের কাজটাকে অর্থবিদ্যায় বলে **উৎপাদন** (production)। দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদনের কাজে যা কিছু লাগে তাই হল উপকরণ (resource)।

কোন দেশের বা মানব সমাজের যাবতীয় উপকরণ তিন রকমের**:** (ক) জমি, বন, জঙ্গল, খনিজ, মাটির নিচের তৈল ভাণ্ডার, জল ইত্যাদি হল বিনা মূল্যে প্রকৃতির দান। এরা হল **প্রাকৃতিক উপকরণ** (natural resources)। অর্থবিদ্যায় যাবতীয় প্রাকৃতিক উপকরণের নাম দেওয়া হয়েছে **ভূমি** (land)। (খ) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং চেষ্টায় আয়ত্ত মানসিক ও শারীরিক সমস্ত মানবিক উপকরণকে অর্থবিদ্যায় বলা হয় **শ্রম** (labour)। তাই কলকারখানার কারিগর, বাগানের মালী, খেতখামারের চাষী, বিক্রয়কর্মী, মেকানিক, শিক্ষক, উকিল, বিচারপতি, পারমাণবিক বিজ্ঞানী সকলেই অর্থবিদ্যার মতে শ্রমিক। (গ) উৎপাদনের কাজে সহায়ক (যেমন কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি) মানুষের তৈরী যে সব জিনিস সরাসরি ভোগ-ব্যবহারের দ্বারা অভাব তৃপ্তির কাজে না লাগিয়ে অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়, অর্থবিদ্যায় তাকে বলে **পুঁজি** (capital)।

এই তিন রকমের উপকরণ ছাড়াও, অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে আরও এক রকমের উপকরণ আছে। এই চতুর্থ উপকরণটিকে বলে **উদ্যোগ** (enterprise) বা **সংগঠন** (organisation)। উদ্যোগ যে নেয় সে হল **উদ্যোক্তা** (entrepreneur)। তার কাজ হল মূলত চারটি**:** (ক) মুনাফার আশায় দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদনের কাজে নিয়োগের উদ্দেশ্যে সে ভূমি, শ্রম ও পুঁজি **সংগ্রহ ও সম্মিলিত করার জন্য উদ্যোগ** নেয়; (খ) **কারবারী** কর্মপন্থা ও নীতিসংক্রান্ত দৈনন্দিন **সিদ্ধান্তগুলি** তাকেই নিতে হয়; (গ) সে হল নতুন নতুন বিষয়ের **উদ্ভাবক** (innovator)। প্রয়োজনমত যে কোন নতুন দ্রব্য, নতুন উৎপাদন কৌশল, এমনকি নতুন ধরনের কারবারী সংগঠনও সে উদ্ভাবন করে ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তা কাজে লাগায়; (ঘ) পূর্বোক্ত তিনটি কাজের পেছনে যে ঝুঁকি রয়েছে তাও তাকেই নিতে হয়। তাই সে হল **ঝুঁকি বহনকারী** (risk-taker)।

উৎপাদনের উপকরণগুলিকে ভূমি, শ্রম, পুঁজি ও উদ্যোগ (বা সংগঠন) এই চারভাগে ভাগ করে, অর্থবিদ্যায় এগুলিকে উৎপাদনের এক একটি **উপাদান** (factor of production) বলে নাম দেওয়া হয়েছে। উৎপাদনের এই চারটি উপাদানের সম্মিলিত ব্যবহারে এবং বাজারে বিক্রি করার জন্য যা তৈরী বা উৎপন্ন হয় তাকে বলে **পণ্য** (commodity)। পণ্যগুলি দু'রকমের—দ্রব্য ও সেবাকর্ম।

ভূমির দ্বারা উপার্জিত আয়কে বলে **খাজনা** (rent)। শ্রমের উপার্জিত আয়ের নাম **মজুরি** (wages); পুঁজির উপার্জিত আয়ের নাম **সুদ** (interest); উদ্যোগ বা সংগঠনের আয়ের নাম **মুনাফা** (profit)।

উপকরণের বৈশিষ্ট্য : (ক) সমস্ত উপকরণ বা উপাদানেরই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, প্রয়োজনের তুলনায় তা **স্বল্প,** অর্থাৎ যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে, চাহিদার তুলনায় তার যোগান, পরিমাণের দিক (quantitative) এবং গুণাগুণের দিক (qualitative)—দু'দিক থেকেই সীমাবদ্ধ। (খ) এদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, প্রতিটি উপকরণ একাধিকভাবে ব্যবহার করে একাধিক অভাব দূর করা যায়। অর্থাৎ প্রত্যেকটি উপকরণ বা উপাদান একাধিক বিকল্প ব্যবহারের উপযোগী। কিন্তু যে কোন সময়ে কোন উপকরণকে শুধু একটি মাত্র ভাবেই এবং একটি মাত্র অভাব দূর করার কাজেই ব্যবহার করা যায়। সুতরাং যে কোন একটি উপকরণকে একটি মাত্র ভাবে যে কোন একটি মাত্র অভাব পূরণের জন্য ব্যবহার করতে গেলে তা আর অন্য কোনভাবে ব্যবহার করে অন্য কোন অভাব দূর করা যায় না।

ভারতের মোট জমির মাত্র অর্ধেকের মত হল আবাদযোগ্য। আবাদযোগ্য জমির সবটাই আবার একই রকমের উর্বর নয়। আমাদের দেশে যে পুঁজিদ্রব্য (অর্থাৎ কলকব্জা, যন্ত্রপাতি) রয়েছে তা দরকারের তুলনায় কম এবং তার বেশির ভাগই বৃহদায়তনে উৎপাদনের জন্য ব্যবহারোপযোগী নয়। কর্মক্ষম বয়সের লোকসংখ্যা, অর্থাৎ শ্রমের যোগান ২৯ কোটি হলেও সেটা অসীমও নয় কিংবা গুণাগুণের দিক থেকে তা উৎকৃষ্টও নয়। উদ্যোক্তার যোগানও এদেশে চাহিদার তুলনায় বিশেষভাবেই কম। কিন্তু শুধু ভারতের মত গরিব দেশ কেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ধনী দেশেও চাহিদা বা প্রয়োজনের তুলনায় উপকরণ বা উপাদানের স্বল্পতা রয়েছে, অতীতেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে।

দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম যেমন মানুষের অভাব তৃপ্ত করার উপায় মাত্র, তেমনি উপকরণ বা উপাদানগুলিও দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদনের উপায় মাত্র। প্রথমটার প্রয়োজন অভাবতৃপ্ত করার জন্য, আর দ্বিতীয়টার প্রয়োজন উৎপাদনের জন্য।

ভূমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন (বা উদ্যোগ), এই চার রকমের উপাদানের সম্মিলিত প্রয়োগে উৎপাদনের কাজটা যে বা যারা চালাচ্ছে সে বা তারা হল **উৎপাদনের এক একটি একক বা কারবার** (business)। এই উৎপাদন-একক

৪. **পছন্দ বা বাছাই (choice)ঃ** অভাব বা আকাঙ্ক্ষার তুলনায় সব জিনিসের যোগান স্বল্প, এবং তাদের প্রত্যেকটির বহু বিকল্প ব্যবহারও সম্ভব, আবার মানুষের সমস্ত অভাব তৃপ্ত করা সম্ভব নয়। তাই কোন্ অভাব বা অভাবগুলি তৃপ্ত করা হবে এবং কোন্‌টি বা কোন্‌গুলি তৃপ্ত করা হবে না এবং সে অনুসারে কোন্ দ্রব্য বা সেবা কর্মটি উৎপাদনের জন্য কোন্ উপকরণটি কতটা ব্যবহার করা হবে সে সিদ্ধান্ত প্রতিটি মানুষকে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজকে নিতেই হয়। উপকরণের স্বল্পতার দরুন পছন্দের বা বেছে নেবার প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে, একটি বা কয়েকটি জিনিস ভোগ করতে গিয়ে আরেকটি বা অন্য কতকগুলি জিনিসের ভোগ পরিত্যাগ করতে হয়। একটি জিনিস বেশি পরিমাণে পাবার অর্থাৎ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার মানেই হল আরেকটি জিনিস কম পরিমাণে পাবার অর্থাৎ কম পরিমাণে উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেওয়া, কি ব্যক্তির সংসারের, কি গোটা দেশের পক্ষে, একথা সমান সত্য। সব সমাজ ব্যবস্থাকেই এই সমস্যার মুখোমুখী হতে হচ্ছে এবং কোন না কোন রকমে সিদ্ধান্তগুলি নিতেই হচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে ভোগীরা, কারবারী সংস্থাগুলি, শ্রমিক ইউনিয়নগুলি, সরকারী পদস্থ কর্মচারীরা সকলেই এই সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে কিছু না কিছু প্রভাব খাটায়।

ব্যক্তি-মানুষের ক্ষেত্রে অর্থবিদ্যায় তত্ত্বগতভাবে ধরে নেওয়া হয়, প্রতিটি মানুষ যুক্তিবাদী (rational being)। সে তার বিবেচনায় সব চেয়ে জরুরী অভাব আগে মেটানোর সিদ্ধান্ত নেয়, আর সব চেয়ে কম দরকারী অভাবটা সে পূরণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। বাস্তবে এ কথাটা অবশ্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য নাও হতে পারে। কারণ এমন মানুষের অভাব নেই যারা সব সময় হিসাব ক'রে, ভেবেচিন্তে চলে না। ঝোঁকের মাথায় আমরা অনেকেই অনেক সময় এমন জিনিস কিনে বসি যা নিয়ে পরে আফশোস করি। কিন্তু ভুল হলেও সেটা বেছে নেবার সিদ্ধান্ত তো বটে। সিদ্ধান্তটা ভুল কি সঠিক তা এখানে বিবেচ্য নয়। বিবেচ্য হচ্ছে প্রতি বিষয়ে দৈনন্দিন জীবনে মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে, কোন্ অভাবটা তৃপ্ত করা হবে আর কোন্‌টা হবে না সেটা বেছে নিতে হচ্ছে। এটাই লক্ষণীয়। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি ভোগী পরিবারের অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সংসারে সবচেয়ে বেশি সিদ্ধান্ত নিতে হয় আয়ের টাকাটা খরচ করার ব্যাপারে। প্রথমে তাকে স্থির করতে হয় সে কতটা খরচ করবে আর কতটা সঞ্চয় করবে। তারপর তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় বাড়িভাড়া, খাবার-দাবার, কাপড়-চোপড়, সিনেমা-থিয়েটার, বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদির জন্য কতটা খরচ করবে। কেউ যখন বলে, অমুক জিনিসটা কেনা তার সাধ্যের বাইরে, তখন বুঝতে হবে আসলে সে অন্য কোন জিনিসের জন্য খরচ করাটা বেশি পছন্দ করছে।

কারবারীদের তো সর্বদাই পছন্দ বা বেছে নেবার সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। প্রথমেই তাদের সিদ্ধান্ত করতে হচ্ছে তারা কি উৎপাদন করবে। তারপর তাদের সিদ্ধান্ত করতে হচ্ছে সেটা উৎপাদনের জন্য কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে, সে জন্য

কতটা পরিমাণে পুঁজি ও শ্রম ব্যবহার করা হবে, বৃহদায়তনে না ক্ষুদ্রায়তনে তা উৎপাদন করা হবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

৫. **পছন্দের মাত্রা** (scale of preference): অর্থবিদ্যা ধরে নেয়, মানুষ যেহেতু যুক্তিবাদী সেহেতু একাধিক অভাব পূরণ করতে গিয়ে সে ভেবেচিন্তে সেই অভাবটাই আগে পূরণ করার সিদ্ধান্ত নেবে যেটা সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি দেবে বলে সে মনে করে। এমনি করেই সে তার অভাবগুলি একের পর এক পূরণ করার সিদ্ধান্ত নিতে থাকে। একথার মানে হল, অর্থবিদ্যা ধরে নেয়, প্রতিটি ভোগীর মনের মধ্যে যেন একটি করে ফর্দ বা তালিকা রয়েছে, আর তাতে পরপর তার অভাবগুলি যেন ১নং ২নং, ৩নং, হিসাবে এমনভাবে সাজানো রয়েছে যে, যে অভাব পূরণে যত বেশি সে তৃপ্তি পাবে বলে ভেবেছে সেটা তত উপরে এবং যে অভাব পূরণে যত কম তৃপ্তি পাবে বলে ভেবেছে সেটা তত নিচে রয়েছে। ফলে এটাও ধরে নেওয়া যায় যে, সে নিচের দিকের অভাবগুলি পূরণ করার আগে উপরের দিকের অভাবগুলিই পূরণ করবে এবং যেটা যত উপরে রয়েছে সেটা তত আগে পূরণ করবে। তার আয়ের বা সম্বলের স্বল্পতার দরুন সবগুলো পূরণ করা সম্ভব না হলে নিচের দিকের অভাবগুলি সে ছেঁটে বাদ দেবে। ১নং অভাব পূরণ হলে সে ৩নং অভাবটা পূরণ না করে ২নং অভাবটাই পূরণ করবে। বাস্তবে হয়তো অধিকাংশ মানুষের মনেই তার অভাবগুলির গুরুত্ব অনুযায়ী এভাবে সাজানো স্পষ্ট কোন ফর্দ নেই। তারা হয়তো কোন্ অভাব পূরণ করাটা তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি দরকারী অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন্ অভাবটা সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ সেটা বলতে পারে, তার বেশি নয়। কিন্তু ওইটুকু থেকেই বোঝা যায় মানুষের মনে তার অভাবগুলি সম্পর্কে কোন্‌টা আগে এবং কোন্‌টা পরে মেটানো দরকার এমন একটা সিদ্ধান্ত থাকেই। তার সবটা তার নিজের কাছে সবসময় যে স্পষ্ট থাকে তা হয়তো নয়। কিন্তু মানুষ যুক্তিবাদী এটা ধরে নিয়ে অর্থবিদ্যার তত্ত্বে অনুমান করে নেওয়া হয় যে, তার অভাবগুলির তুলনামূলক গুরুত্ব অনুসারে তার মনে ওইগুলি যেন পরপর সাজানো থাকে এবং সেই ক্রম অনুসারে সে তা পরপর পূরণ করে। অর্থবিদ্যার ভাষায় একে বলে অভাবপূরণ সম্পর্কে **পছন্দের মাত্রা** (scale of preference)।

৬. **সুযোগ খরচ বা বিকল্প খরচ** (opportunity cost): অভাব তৃপ্তির উপায় বা উপকরণগুলি স্বল্প বলেই আমরা কোন্ অভাবটা পূরণ করব আর কোন্‌টা করব না, কোন্ উপকরণটা ব্যবহার করব আর কোন্‌টা করব না, সে বিষয়ে বাছাই করে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হই। ফলে আমাদের অভাবগুলি যেন পরস্পরের বিকল্প (alternatives) হয়ে দাঁড়ায়। একটা পেতে গেলে আরেকটা ছাড়তেই হয়। একটা একটু বেশি করে পেতে গেলে আরেকটা একটু কম করে পেতে হয়। মাছ একটু বেশি কিনলে তরকারী কেনার পয়সায় টান পড়ে। যে জমিতে মাছের ভেড়ি হল সেখানে আর ধান চাষ চলে না। খরচ (cost) কথাটার মানে যদি এই হয় যে, একটা জিনিস পেতে গেলে যা ছাড়তে হয় সেটাই হল যেটা পাওয়া গেল সেটা

পাবার খরচ (যেমন ১ কেজি রুইমাছ কিনতে ১৫ টাকা দিতে হলে, ১৫ টাকা হল ১ কেজি রুইমাছ পাবার খরচ), তাহলে একটা অভাব তৃপ্ত করার খরচ হল সে অভাবটা পূরণ করতে গিয়ে অন্য যে অভাবটা (অর্থাৎ বিকল্প অভাবটা) আর পূরণ করা হল না সেইটে ('the cost of the born is the unborn')। ১ লিটার দুধের দাম যদি ১ কেজি মাছের দামের পাঁচ ভাগের একভাগ হয় তাহলে ১ কেজি মাছের খরচ হল ৫ লিটার দুধ কিংবা ১ লিটার দুধের খরচ হল ২০০ গ্রাম মাছ (অর্থাৎ হাতে যদি মাত্র ১৫ টাকা থাকে এবং তা দিয়ে যদি ১ কেজি মাছ কেনা হয় তাহলে আর দুধ কেনা সম্ভব হবে না। কিংবা ১৫ টাকা থেকে ১ লিটার দুধ কেনা হলে ৮০০ গ্রামের বেশি মাছ কেনা যাবে না)।

গোটা সমাজের দিক থেকেও ব্যাপারটা একই। সরকার যদি বেশি করে প্রতিরক্ষার জন্য খরচ বাড়াতে যায়, অর্থাৎ আগের চেয়ে সেজন্য বেশি উপকরণ ব্যবহার করতে চায় তাহলে শিক্ষা খাতে, ভোগপণ্য উৎপাদন খাতে সে অনুপাতে টাকার টান পড়বে। অর্থাৎ তখন শিক্ষা ও অন্যান্য বেসামরিক খাতে খরচের পরিমাণ যেটুকু কমবে (অর্থাৎ শিক্ষা ও অন্যান্য বেসামরিক বিষয়ে উৎপাদনের অগ্রগতি যেটুকু কম হবে) সেটাই হল প্রতিরক্ষা খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির সত্যিকারের খরচ। এইভাবে **পরিত্যক্ত বিকল্পটির দ্বারা যে কোন নির্দিষ্ট অভাবপূরণের খরচটাকে প্রকাশ ও পরিমাপ করাটাকে অর্থবিদ্যায় বলে সুযোগ খরচ।**

১. ৩. মূল অর্থনৈতিক সমস্যাবলী / The Basic Economic Problems

আজকের দিনে যে কোন দেশের মূল অর্থনীতিক সমস্যা হল ছয়টি :

১. **কি পরিমাণে এবং কি কি উৎপাদন করতে হবে** (What to be produced and in what quantity): অভাব অসীম অথচ উপকরণগুলি স্বল্প বলেই যে প্রশ্নটা বারে বারে দেখা দেয় তা হল, কোন্ কোন্ দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন করতে হবে এবং সেগুলি কতটা করে অর্থাৎ কি পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে? চাল, পাট, গম, আখ, মোটর গাড়ি, ট্রাকটর, রেডিও, ফ্যান, জামা, জুতো, কাপড়? তাহলে কোন্টা কতটা করে, এই প্রশ্নটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আরেকটা যে প্রশ্ন তা হল, ওই সব বিকল্প জিনিস ওই সব পরিমাণে উৎপাদন করার জন্য স্বল্প উপকরণগুলির বিলি বণ্টন (allocation of scarce resources among alternative uses)। কি করে সমাজে ওই সব প্রশ্নের সমাধান করা হয়, কিভাবে বিভিন্ন বিকল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রের মধ্যে স্বল্প উপকরণগুলির বিলি-বণ্টন ঘটে, ওই বিলিবণ্টনের পরিবর্তন ঘটাতে গেলে তার ফলাফল কি দাঁড়ায়, এ নিয়ে অর্থবিদ্যার প্রথম দিন থেকেই অর্থনীতিবিদ্‌রা মাথা ঘামিয়ে আসছেন। ধনতন্ত্রী বা সমাজতন্ত্রী, যে সমাজব্যবস্থাই হোক না কেন, স্বল্প উপকরণের বিলিবণ্টন সম্পর্কে তাকে সিদ্ধান্ত কোন না কোনভাবে নিতেই হয়। ধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে স্বল্প উপকরণগুলির বিলিবণ্টন সম্পর্কে বেশির ভাগ সিদ্ধান্তই বাজারে মূল্যব্যবস্থার মারফত ঘটে। সে কারণে মূল্যব্যবস্থাটি কিভাবে কাজ করে তা রীতিমতো ভাল

করে বোঝার চেষ্টা করা অত্যন্ত দরকার। অর্থবিদ্যায় তা আলোচনা করা হয় **মূল্যতত্ত্বে** (Price Theory)।

২. **কিভাবে ওই সব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হবে** (How these goods are to be produced): একই জিনিস উৎপাদনের পদ্ধতি একাধিক হতে পারে। ছোট ছোট আয়তনের জমিতে খুব বেশি করে রাসায়নিক সার, সেচ, খেতমজুর ও চাষের যন্ত্র ব্যবহার করে নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করে যে পরিমাণে ফসল ফলানো যায়, বড় বড় আয়তনের জমিতে অপেক্ষাকৃত কম রাসায়নিক সার, সেচ, ক্ষেতমজুর ও চাষের যন্ত্র ব্যবহার করে ব্যাপক চাষের পদ্ধতিতেও হয়তো সেই একই পরিমাণ ফসল ফলানো যায়। একটি পদ্ধতিতে জমি কম ও অন্যান্য উপকরণ বেশি করে ব্যবহার করা হয়। অন্যটিতে জমি বেশি ও অন্যান্য উপকরণ কম করে ব্যবহার করা হয়। যন্ত্রশিল্পেও তেমনি বেশি পরিমাণে শ্রমিক ও সামান্য যন্ত্রপাতি (অর্থাৎ পুঁজিদ্রব্য) নিয়ে যে পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা যায়, হয়তো বেশি পরিমাণে জটিল যন্ত্রপাতি ও সামান্য সংখ্যক শ্রমিক নিয়েও সেই পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন করা যায়। কোথায়, কি কারণে, কোন্ পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং কোন্ পদ্ধতির ফলাফল কি তাও কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়। অর্থবিদ্যায় তা আলোচনা করা হয় **উৎপাদন তত্ত্বে** (Theory of Production)।

৩. **উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী কিভাবে সমাজের অধিবাসীদের মধ্যে বিলিবণ্টন করা হয়** (How the total output of goods and services is allocated among the members of the society): একটা নির্দিষ্ট কালে দেশে বা সমাজে যে মোট দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপন্ন হয়, তার আরেক নাম হল জাতীয় উৎপন্ন (national product)। দেশে চারটি উপাদানের সম্মিলিত কাজের দ্বারা মোট যে দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হয় (যার আরেক নাম হচ্ছে জাতীয় আয়), তার ভাগ-বাটোয়ারা হয় ওই চারটি উপাদানের মালিকদের (অর্থাৎ, সমাজের অধিবাসী বিভিন্ন গোষ্ঠীর) মধ্যেই। এই ভাগ বাটোয়ারায় শ্রমিকের প্রাপ্য অংশের নাম মজুরি, ভূমির প্রাপ্য অংশের নাম খাজনা, পুঁজির প্রাপ্য অংশের নাম সুদ, উদ্যোগ বা সংগঠনের প্রাপ্য অংশের নাম হল মুনাফা। খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফার হার কি ভাবে নির্ধারিত হয়, অর্থাৎ জাতীয় আয়ের বণ্টনটা কিভাবে ঘটে তা জানার আগ্রহ সকলেরই। অর্থনীতিবিদ্‌রা দীর্ঘকাল ধরে তা জানার চেষ্টা করছেন। সরকারের হস্তক্ষেপের দ্বারা জাতীয় উৎপন্নের বিলিবণ্টনটা কিভাবে এবং কতটা পরিমাণে পরিবর্তিত হতে পারে এবং সরকারের সে হস্তক্ষেপের ফলাফলই বা কি হতে পারে, আজকের দিনে যে কোন সাধারণ মানুষও তা জানতে চায়। অর্থবিদ্যায় এর আলোচনা করা হয় **বণ্টন তত্ত্বে** (Theory of Distribution)।

৪. **দেশের উপকরণগুলি কি পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে** (Are the resources of the country being fully utilised)?: অভাব তৃপ্তির উপায় যে উপকরণগুলি তাদের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় এত অল্প যে তা দিয়ে সমাজের সমস্ত মানুষের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবও মেটানো সম্ভব কি না

সন্দেহ। সুতরাং কোন উপকরণ সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার না করে আংশিকভাবে তা ব্যবহার করাটা অপচয়েরই নামান্তর এবং তা কারো অভিপ্রেত হতে পারে না। অন্তত তা হওয়া উচিত নয়, কারণ তা অপরাধেরই সামিল। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল, ধনতন্ত্রে মাঝে মাঝেই দেখা যায় উপকরণগুলির পরিপূর্ণ ব্যবহার ঘটছে না। এরকমের ঘটনা যখন ঘটে তখনই বলা হয় উপকরণগুলির অনিচ্ছাকৃত কর্মহীনতা (involuntary unemployment), বা সংক্ষেপে, বেকারী (unemployment) ঘটছে। বেকার শ্রমিক-কর্মচারীরা কাজ চায়। যে কলকারখানায় তারা কাজ করতে পারে সেগুলিও রয়েছে, কাঁচামালও প্রচুর পরিমাণে রয়েছে, মালিকরা কারখানাগুলি চালাতে যে অনিচ্ছুক তাও নয়, আর ওই অলস, অব্যবহৃত উপকরণগুলি দিয়ে যেসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হতে পারত তা সমাজের মানুষেরও কম দরকারী নয়। অথচ তা সত্ত্বেও কোন কারণবশত শ্রমিক, কলকারখানা সবই বেকার পড়ে থাকে। এরকম বেকারীর দরুন, অব্যবহৃত উপকরণ দিয়ে যে দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হতে পারত ও তা মানুষের অভাব দূর করতে পারত তা চিরতরে হারানোর লোকসানটা যেমন কম নয়, তেমনি কম নয় দীর্ঘকাল ধরে নিরুপায় বেকার মানুষের জীবনযন্ত্রণা ভোগ। ধনতন্ত্রী সমাজে কেউ না চাওয়া সত্ত্বেও বারে বারে এ সংকট দেখা দেবার কারণটা দীর্ঘকাল ধরে অর্থনীতিবিদ্‌রা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে এসেছেন। কার্ল মার্কস ধনতন্ত্রের এই রোগের মূল কারণ নির্দেশ করে যে বিকল্প সমাজব্যবস্থার রূপরেখা নির্দেশ করেছেন তা সমাজতন্ত্র নামে পরিচিত। সমাজতন্ত্রী সমাজব্যবস্থায় এই সংকট নিবারিত। অর্থবিদ্যায় ধনতন্ত্রের এই সমস্যার আলোচনা করা হয় **বাণিজ্য চক্র তত্ত্বে** (Trade Cycle Theory)।

৫. **উপকরণগুলি কতটা দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা হচ্ছে** (How efficiently are the resources being used) ? ঃ কোন্ কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে উৎপাদন করা হবে, কিভাবে তা উৎপাদন করা হবে, কাদের জন্য তা উৎপাদন করা হবে (অর্থাৎ, উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন কিভাবে ঘটে)—এই প্রশ্নগুলির সঙ্গে যে প্রশ্নটি জড়িত তা হল, উৎপাদনের উপকরণ এবং উৎপন্ন সামগ্রীর বিলিবণ্টন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি উপযুক্ত বিবেচনা ও দক্ষতার সাথে করা হয়েছে কি না। কিন্তু তা বোঝা যাবে কি করে ? উপকরণগুলির বিলিবণ্টনে খানিকটা পরিবর্তন ঘটিয়ে, আগে তা দিয়ে যে যে দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হত তা অক্ষুণ্ণ রেখে সেইসাথে অন্তত আরো একটি বেশি দ্রব্য যদি উৎপাদন করা সম্ভব হয় তাহলে বুঝতে হবে আগের উৎপাদনটা ছিল অদক্ষ। তেমনি, উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর পুনর্বণ্টন ঘটিয়ে সেই সঙ্গে কারো অবস্থা কোন রকমে ক্ষুণ্ণ না করে অন্তত আরো একটি মানুষের অবস্থার যদি উন্নতি ঘটানো সম্ভব হয় তাহলে বুঝতে হবে আগের বণ্টনটা ছিল অদক্ষ।

সবদেশেই উপকরণ ও উৎপন্ন সামগ্রীর বিলিবণ্টনে যে কম বেশি কিছু না কিছু অদক্ষতা আছে তা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। আর সে অদক্ষতা যদি দূর করা সম্ভব হয় তা হলে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন যেমন একই সাথে বাড়ানো সম্ভব হবে, তেমনি সম্ভব হবে সমাজের প্রত্যেকের অবস্থার আরো কিছুটা উন্নতি।

অর্থবিভায় এর আলোচনা **কল্যাণমূলক অর্থবিদ্যা** (Welfare Economics) নামে পরিচিত।

৬. **প্রতি বৎসর দেশের উৎপাদনক্ষমতা কি বাড়ছে, না তা স্থাণু রয়েছে** (Is the economy's capacity to increase production growing from year to year or is it remaining static)? : দেশের উৎপাদনক্ষমতা ক্রমাগত বাড়লেই জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের ক্রমাগত বৃদ্ধি সম্ভব। কিভাবে দেশের উৎপাদনক্ষমতার ক্রমাগত বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করা যায়, কতকগুলি দেশে উৎপাদনক্ষমতা ক্রমাগত বাড়ছে কেন, কতকগুলি দেশে উৎপাদনক্ষমতা অতি ধীরে ধীরে বাড়ছে কেন, আবার কতকগুলি দেশে উৎপাদনক্ষমতা বিন্দুমাত্রও বাড়ছে না কেন, এ সব প্রশ্ন বহুদিন ধরেই অর্থনীতিবিদ্‌দের অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে রয়েছে। এ সব প্রশ্নের কিছুটা উত্তর মিললেও পুরো উত্তর এখনও মেলেনি। অর্থবিভায় এ সমস্যার আলোচনা হয় **অর্থনীতিক উন্নয়নের তত্ত্বে** (Theory of Economic Growth)।

৭. **ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা** (Micro and Macro Economics) : অর্থবিভায় উপরোক্ত বিষয়গুলি মূলত দু'রকমের। এক, মূল্যতত্ত্ব অর্থাৎ কোন পণ্যের দাম কি করে নির্ধারিত হয়, উৎপাদন তত্ত্ব অর্থাৎ কোন একটি পণ্য কিভাবে উৎপাদন করা হলে সবচেয়ে ভাল হয় এবং বণ্টন তত্ত্ব অর্থাৎ কিভাবে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফার হার নির্ধারিত হয়—এ সব সমস্যা হল অর্থনীতির খণ্ড খণ্ড বা টুকরো টুকরো সমস্যা। অর্থবিভায় এই ধরনের খণ্ডিত সমস্যার আলোচনাকে বলে ব্যষ্টিগত অর্থবিভা (Micro Economics)। দুই, যাবতীয় উপকরণের পরিপূর্ণ ব্যবহারের সমস্যা (যেমন বাণিজ্যচক্র, বেকার সমস্যা, জাতীয় আয় বৃদ্ধির সমস্যা, উপকরণগুলির সুদক্ষ ব্যবহারের সমস্যা ও জনকল্যাণ বৃদ্ধির সমস্যা, ব্যাঙ্কিং ও বাণিজ্যের সমস্যা এবং অর্থনীতিক উন্নয়নের সমস্যা ইত্যাদি) হল একটা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিক সমস্যা। তাই এদের আলোচনাকে নাম দেওয়া হয়েছে সমষ্টিগত অর্থবিভা (Macro Economics)।

অর্থনীতির মূল সমস্যাগুলির চিত্ররূপ—
উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখা

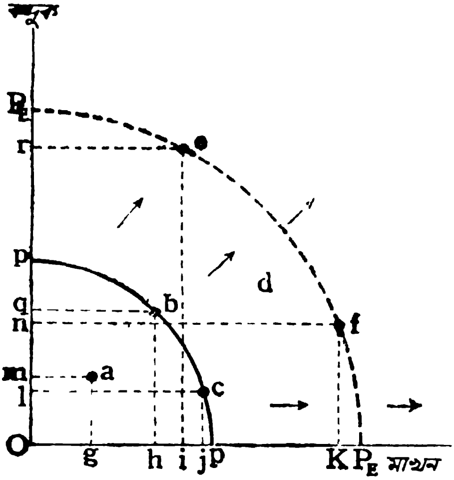
DIAGRAMMATIC REPRESENTATION OF THE BASIC PROBLEMS—THE PRODUCTION-POSSIBILITY CURVE

উপরে আলোচিত সমগ্র বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে পরপৃষ্ঠার চিত্রটির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এটি হল উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার চিত্র।

সমাজের উপকরণগুলির স্বল্পতার দরুন পছন্দ বা বাছাই করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এটা তখন হয়ে দাঁড়ায় উপকরণের বিলিবণ্টনের প্রশ্ন (যেমন, উপকরণের কতটা মাখন এবং কতটাই বা বন্দুক উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হবে)। সমাজের উপকরণ পরিপূর্ণরূপে ব্যবহার করে বন্দুক ও মাখন উৎপাদনের সম্ভাব্য সংমিশ্রণ (যেমন b, c ইত্যাদি) বিন্দুগুলিকে সাজিয়ে নিয়ে একটি রেখা দিয়ে সংযুক্ত করলে

যে pp রেখাটি পাওয়া যায় সেটি হল উপকরণের পূর্ণ নিয়োগের (full employment) সীমারেখা। অন্যভাবে বলা যায়, এটি হল উপকরণ ব্যবহারের দ্বারা মাখন ও বন্দুকের বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদন-সম্ভাবনার সীমারেখা (production possibility boundary)।

১. সমাজের হাতে এখন যে উপকরণ রয়েছে তার পূর্ণ ব্যবহার বা পূর্ণ নিয়োগ ঘটলে সর্বাধিক সম্ভব উৎপাদনের সীমারেখা হবে pp। সমাজ যদি সে অবস্থায় পৌঁছে গিয়ে b বিন্দুতে থাকে, তাহলে তার মাখন উৎপাদনের পরিমাণ হবে oh এবং বন্দুক উৎপাদনের সংখ্যা হবে oq। এই অবস্থায় যদি আরও বেশি মাখন উৎপাদনের সিদ্ধান্ত (অর্থাৎ উপকরণগুলির পুনর্বণ্টনের সিদ্ধান্ত) নেওয়া হয়, তাহলে সমাজকে b বিন্দু থেকে c বিন্দুতে সরে আসতে হবে এবং তখন মাখন উৎপাদনের পরিমাণ oh থেকে hj পরিমাণ বেড়ে oj পরিমাণ হবে কিন্তু তার ফলে বন্দুক উৎপাদনের পরিমাণ oq পরিমাণ থেকে ql পরিমাণ কমে ol পরিমাণ হবে। অর্থাৎ, মাখন উৎপাদন hj পরিমাণ বৃদ্ধির সুযোগ খরচ হল ql পরিমাণ বন্দুক।



চিত্র ১·১

২. কিন্তু বাস্তবে সমাজ যদি উৎপাদন-সম্ভাবনা সীমারেখার ভিতরে (অর্থাৎ বাম দিকে) a বিন্দুতে অবস্থিত থাকে, তাহলে বুঝতে হবে উপকরণগুলির হয় পূর্ণনিয়োগ হচ্ছে না, কিংবা সেগুলি দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা হচ্ছে না। কারণ a বিন্দুতে og পরিমাণ মাখন ও om পরিমাণ বন্দুক উৎপাদিত হচ্ছে। এই অবস্থায় কিন্তু মাখন ও বন্দুক উভয়েরই উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব এবং তা করতে হলে হয় উপকরণগুলির পূর্ণনিয়োগ ঘটাতে হবে, নয়তো সেগুলি অধিকতর দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

৩. সুতরাং উপকরণগুলির যদি পূর্ণনিয়োগ ও দক্ষতাপূর্ণ ব্যবহার হয়, তখন যে সব দ্রব্য উৎপন্ন হচ্ছে, তাদের মধ্যে যে কোন একটির উৎপাদন বাড়াতে গেলে অন্য একটি কিংবা একাধিক দ্রব্যের উৎপাদন কমবেই। কিন্তু যদি উপকরণগুলির পূর্ণনিয়োগ না ঘটে থাকে কিংবা অদক্ষ ব্যবহার হতে থাকে তাহলে ওই পরিস্থিতিতে পূর্ণনিয়োগ এবং/অথবা দক্ষ ব্যবহারের দ্বারা সব সামগ্রীর উৎপাদনই বাড়ানো সম্ভব হয়। চিত্রে a বিন্দু থেকে সমাজ যতই ডানদিকে উৎপাদন-সম্ভাবনা

সীমারেখার দিকে এগোতে থাকবে ততই তার উপকরণগুলির কর্মহীনতা কমতে থাকবে, কর্মসংস্থান বাড়তে থাকবে এবং সব দ্রব্যের উৎপাদনও সেই সাথে বাড়তে থাকবে। উৎপাদন-সম্ভাবনা সীমারেখায় পৌঁছালে (যেমন b বা c ইত্যাদি বিন্দুতে) তার উপকরণগুলির পূর্ণনিয়োগ ঘটবে এবং তখনকার মত তার যাবতীয় দ্রব্যের উৎপাদন সর্বাধিক হবে।

৪. d বিন্দুটি কিন্তু উৎপাদন-সম্ভাবনা সীমারেখার বাইরে রয়েছে। এর মানে হল দেশের অর্থনীতি d বিন্দুতে থাকলে যে পরিমাণে মাখন ও বন্দুক উৎপাদন সম্ভব হত, সে অবস্থায় পৌঁছানো অর্থনীতির পক্ষে সম্ভব নয়। এখন ওটা তার সাধ্যের বাইরে।

৫. কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দেশের উৎপাদনক্ষমতা বাড়লে উৎপাদন-সম্ভাবনা সীমারেখাটি আরও ডানদিকে e বা f বিন্দুতে সরে যেতে পারে। তবে এর জন্য চাই নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন, কারিগরী জ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি ও শ্রমের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি।

৬. এ থেকে বলা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কথাটার আসল অর্থ হল, উৎপাদন-সম্ভাবনা সীমারেখার দক্ষিণমুখী স্থান পরিবর্তন এবং এই স্থান পরিবর্তন **উৎপাদন-ক্ষমতার বৃদ্ধি** সূচিত করে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, উৎপাদন-সম্ভাবনা সীমারেখার মধ্যেই কখনো কখনো উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে (c বিন্দু থেকে a বিন্দুতে) বা কমে (a বিন্দু থেকে c বিন্দুতে)। সেটা কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষণ নয়। সেটা হল বেশি বা কম পরিমাণে উপকরণ নিয়োগের ফলে অথবা দক্ষতার বৃদ্ধি বা হ্রাসের ফলে দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের স্তরের পরিবর্তন মাত্র।

১.৪. অর্থবিদ্যা কাকে বলে: সংজ্ঞা
What Economics Is : Definition

১. এবার অর্থবিদ্যার মূল ধারণাগুলি ও মূল অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির আলোচনার পটভূমিতে অর্থবিদ্যার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বা সংজ্ঞা দেবার একটা চেষ্টা করা যেতে পারে।

২. অ্যাডাম স্মিথ থেকে মার্শাল হয়ে আজকের দিনে খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থবিজ্ঞানীর কাছ থেকে অর্থবিদ্যার নানা সংজ্ঞা পাওয়া গেছে। তা থেকে দেখা যায় অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে, এবং ব্যাপকতর হয়েছে।

৩. অ্যাডাম স্মিথ বলেছিলেন, অর্থবিদ্যার কাজ হল 'সম্পদের স্বরূপ ও কারণগুলি অনুসন্ধান করা'। জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছিলেন, অর্থবিদ্যা হল 'সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে ব্যবহারিক বিজ্ঞান'। পিগু বলেন, অর্থবিদ্যা হল লোককল্যাণ বিদ্যা। এর কাজ হল মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কিভাবে উৎপাদন বাড়ানো যায় তা অনুধাবন করা। একদিকে 'সম্পদের আলোচনা' ও অন্যদিকে 'লোককল্যাণের আলোচনা', এই দুইদিকের মধ্যে সমন্বয় করে মার্শাল

বলেছিলেন, অর্থবিদ্যা হল দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজকর্মে মানবজাতির অনুধাবন'। আরও ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, 'মানুষের যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কাজকর্ম আরও ভালভাবে জীবনযাপনের সহায়ক বস্তুগত উপকরণ করায়ত্ত করার চেষ্টার সাথে জড়িত, অর্থবিদ্যা তার আলোচনা করে'। সুতরাং তাঁর মতে অর্থবিদ্যা হল, 'একদিকে সম্পদের আলোচনার বিদ্যা, অন্যদিকে, আরও গুরুত্বপূর্ণ দিকে এটি হল মানুষ সম্পর্কে অনুধাবনের একটি অংশ'।

৪. আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীর কাছে অর্থবিদ্যার আলোচনায় কিন্তু মুখ্য হয়ে উঠেছে স্বল্পতার ও পছন্দের সমস্যা। রবিন্‌স্ বলেছেন, 'অর্থবিদ্যা হল সেই বিজ্ঞান যা বহুবিধ উদ্দেশ্য ও বিবিধ বিকল্প ব্যবহারের উপযোগী উপায়গুলির মধ্যে স্থাপিত সম্পর্ক রূপে মানুষের আচরণের আলোচনা করে।'

৫. আরও আধুনিক কালে স্যামুয়েলসন বলেছেন, 'বিবিধ পণ্যসামগ্রী উৎপাদন ও বর্তমানে বা ভবিষ্যতে সমাজের বিভিন্ন মানুষ ও গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ভোগের জন্য তা বণ্টন করার উদ্দেশ্যে, অর্থের সাহায্য নিয়ে বা না নিয়ে, ব্যক্তি মানুষ এবং সমগ্র সমাজ কিভাবে বহু বিকল্প ব্যবহারের উপযুক্ত স্বল্প উপকরণগুলি নিয়োগের সিদ্ধান্ত করছে অর্থবিদ্যা তারই আলোচনা করে।'

৬. অতি সাম্প্রতিক অর্থবিজ্ঞানীরা আরও এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, স্বল্প উপকরণগুলির বহু বিকল্পে ব্যবহারযোগ্যতা এবং তাদের নিয়োগের ক্ষেত্র স্থির করার সিদ্ধান্তের উপর জোর দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়। কারণ, তাতে ধরে নেওয়া হয় যে, সমাজের উৎপাদন-সম্ভাবনার সীমারেখাটা যেন চিরস্থির হয়ে রয়েছে। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ অবাস্তব। বস্তুতপক্ষে, বিবিধ বিকল্প ব্যবহারের উপযোগী উপকরণের স্বল্পতা এবং তা নিয়োগের ক্ষেত্র স্থির করার সমস্যা ছাড়াও, আরও সমস্যা হল উৎপাদন-সম্ভাবনার সীমারেখায় পৌছতে ব্যর্থতা (অদক্ষতা এবং উপকরণগুলির স্বল্পনিযুক্তির সমস্যা) এবং সময়ান্তরে বর্তমান উৎপাদন-সম্ভাবনার সীমারেখা ছাড়িয়ে গিয়ে উচ্চতর উৎপাদন-সম্ভাবনার সীমারেখার দিকে যাত্রা সুনিশ্চিত করা (অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা)। তাই লিপসে বলেছেন, '(ক) সমাজ কিভাবে তার উপকরণগুলি ব্যবহার করে এবং উৎপন্ন সামগ্রী কিভাবে সমাজের মানুষ ও গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বণ্টন করে, (খ) সময়ান্তরে কিভাবে উৎপাদন ও বণ্টন পরিবর্তিত হয়, এবং (গ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দক্ষতা ও অদক্ষতা—অর্থবিদ্যা এসবের অনুসন্ধান ও আলোচনা করে।'

অর্থবিদ্যার স্বরূপ ও পরিধি
NATURE & SCOPE OF ECONOMICS

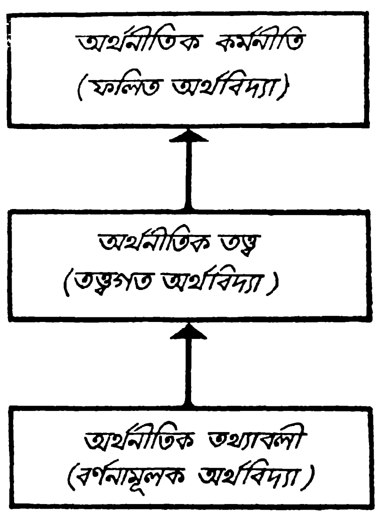
১.৫. অর্থবিদ্যা হল একটি সমাজবিজ্ঞান
Economics Is a Social Science

১. মানুষের কার্যকলাপ ও আচরণ অনুসন্ধান, অনুধাবন, বিশ্লেষণ ও আলোচনা যে বিদ্যার বিষয়বস্তু তাকে বলে সমাজবিদ্যা বা সমাজবিজ্ঞান। অর্থবিদ্যা সমাজবদ্ধ

ানব জীবনের এক বিশেষ ক্ষেত্রে, (নানা বিকল্পে ব্যবহারযোগ্য স্বল্প উপকরণগুলির থাযোগ্য বিলিবণ্টন ও ব্যবহারের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী সমাজের মানুষ ও গাষ্ঠীগুলির মধ্যে বিলিবণ্টন করে কিভাবে অভাব দূর করার চেষ্টা চলেছে, দময়ান্তরে কিভাবে সে উৎপাদন ও বণ্টন পরিবর্তিত হচ্ছে এবং সে কাজে মানুষের :তরী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কি কি দক্ষতা ও অদক্ষতা ধরা পড়ছে এ সব বিষয়ে) ানুষের আচরণ অনুসন্ধান, অনুধাবন, বিশ্লেষণ এবং আলোচনা করে। তাই মর্থবিদ্যা হল একটি সমাজবিজ্ঞান (social science) বা সামগ্রিক সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা এবং সেটি একটি নবীন শাখা।

২. অর্থবিদ্যা হল মানুষের আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান (science of human behaviour)। অর্থাৎ যার অস্তিত্ব রয়েছে, যা লক্ষ্য করা যায়, যাচাই করা যায়, যার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব এমন বাস্তব তথ্য (facts) ও ঘটনাই হল বিজ্ঞান বলে পরিগণিত সমস্ত বিদ্যার ভিত্তি। এ হল অস্তিবাচক বিজ্ঞান (positive science)। এর মধ্যে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা ইত্যাদির মত ভৌতবিজ্ঞানগুলিতে (physical sciences) বাস্তব তথ্যগুলি অজৈব (inorganic)। আর সমাজবিজ্ঞান হিসাবে অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু হল দ্রব্য ও সেবাকর্মের উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগে নিযুক্ত মানুষ ও সংস্থাগুলির আচরণ।

৩. সুতরাং কোন সুনির্দিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে বা দেশের অর্থনীতির কোন একটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হলে অর্থবিজ্ঞানীকে প্রথমেই সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলি সংগ্রহ করতে হয়। বাস্তব জগৎটা পরস্পর সংশ্লিষ্ট হাজার রকমের তথ্যজালে ভরা। সুতরাং অর্থবিজ্ঞানীকে বিবেচনাধীন সমস্যাটির সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন তথ্যগুলি বাদ দিয়ে সযত্নে কেবল প্রাসঙ্গিক ও সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলিই বেছে নিয়ে জড় করতে হয়, ঝাড়াই বাছাই করতে হয়। এ কাজটাকে কখনো কখনো নাম দেওয়া হয় **বর্ণনা-মূলক অর্থবিদ্যা** (Descriptive Economics)।



চিত্র ১·২

৪ কিন্তু শুধু প্রাসঙ্গিক, প্রয়োজনীয় ও সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলি জড করলেই নিজে থেকে সে তথ্যগুলি অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে না, বিবেচ্য সমস্যার উপর প্রয়োজনীয় আলোকপাত করতে পারে না। সেজন্য যা দরকার তা হ'ল ওই তথ্যগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো, ঐ তথ্যের ব্যাখ্যা দেওয়া (interpretation) এবং তা থেকে; সাধারণ সত্যটি, মূলনীতিটি (principle), সিদ্ধান্তটি (generalisation) বের করে

আনা, উপস্থিত করা। তথ্যাবলী থেকে এইভাবে মূল সিদ্ধান্ত বা মূলনীতিটি উপস্থিত করা হলে তাকে বলে **অর্থনৈতিক নীতি** (Economic Principle) বা **অর্থনৈতিক তত্ত্ব** (Economic Theory) যা **অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের** (Economic Analysis) চূড়ান্ত ফল।। অর্থবিদ্যায় যে 'বিধি' (law) শব্দটা ব্যবহার করা হয় অনেক সময় সেট কিন্তু 'তত্ত্ব' শব্দটারই নামান্তর। অর্থনৈতিক তত্ত্ব বা নীতিগুলি তখন সঠিক কার্য-কারণের সুতোয় গাঁথা তথ্যগুলিকে সুশৃঙ্খল ও অর্থবহ করে তোলে ও তার উপর ভিত্তি করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।

৫. তত্ত্বের সাথে তথ্যের সম্পর্কটা একপেশে নয়, পারস্পরিক। একদিকে তত্ত্ব দাঁড়ায় তথ্যের উপর ভিত্তি করে। অন্যদিকে তথ্য আবার প্রচলিত তত্ত্ব বা নীতির সত্যাসত্যও যাচাইয়ের কাজ করে। দ্রব্য ও সেবাকর্মের উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগে নিযুক্ত মানুষ ও সংস্থাগুলির আচরণ সময়ের সাথে সাথে বদলায়। তখন নতুন নতুন তথ্যের ভিত্তিতে প্রচলিত পুরনো তত্ত্ব ও নীতি সংশোধন, পরিমার্জন এমনকি বর্জন এবং সে স্থলে নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দেয়। তা না হলেই বাস্তব তথ্যের সাথে প্রচলিত তত্ত্বের বিরোধ দেখা দেয়। দেখা দেয় প্রচলিত তত্ত্বের অসঙ্গতি বা অবাস্তবতা। কাজেই অর্থবিজ্ঞানীকে সর্বদাই পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিবেশের পটভূমিতে অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও নীতিগুলিকে তথ্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করে যেতে হয়। অর্থবিদ্যার ইতিহাসে পরিবর্তনশীল ঘটনাপ্রবাহের অনিবার্য আঘাতে জঞ্জালস্তূপে নিক্ষিপ্ত অথচ মানুষের আচরণ সম্পর্কে একদা সত্য বলে গৃহীত তত্ত্বের সংখ্যা তো কম নয়!

৬. অর্থনৈতিক নীতি বা তত্ত্বগুলি হল কতকগুলি বিশেষ তথ্যের সাধারণীকরণ (generalisation), বা অর্থবহ বিবৃতি (meaningful statement)। কিন্তু এর ত্রুটি হল এই যে, সংগৃহীত তথ্যগুলির সাথে অক্ষরে অক্ষরে তার মিল থাকে না। কারণ যাদের আচরণের সাধারণীকৃত বিবৃতি রচনা করা অর্থবিদ্যার কাজ, সেই মানুষ ও মানুষের তৈরী সংস্থাগুলির সকলের আচরণ তো এক হয় না। একই পরিস্থিতিতে একজন যা করে আরেকজন ঠিক তার উল্টোটা করে বসে। তবু তাদের আচরণের একটা গড়পড়তা ঝোঁক অবশ্যই নজরে পড়ে। ঐ গড়পড়তা ব্যাপারটাকেই তখন অর্থবিদ্যা মানুষের আচরণের সারাংশ বলে ধরে নেয়। সেইটেই হয়ে ওঠে অর্থবিদ্যার তত্ত্ব বা নীতি বা বিধি। স্বভাবতই, মানুষের বাস্তব আচরণে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নিশ্চয়ই সেটা তখন অর্থবিদ্যার তত্ত্বের বা নীতির বা বিধিরও ব্যতিক্রম বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু ওই ব্যতিক্রমটা একটা ব্যতিক্রমেরই ঘটনা, তাতে তত্ত্বের মূল্যটা নষ্ট হয়ে যায় না। যেমন, চলতি মূল্যস্তরের ভিত্তিতে হিসাব করে ১৯৭৪-৭৫ সালে ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় ৯৮৮ টাকা ৭০ পয়সা বলে ধরা হয়েছে। এটা হল ওই বৎসর একজন ভারতবাসীর গড়পড়তা আয়। অনেকের আয় ওই বৎসরে কিন্তু ৯৮৮ টাকা ৭০ পয়সা থেকে বেশিই হয়েছে, আবার অনেকের তা থেকে কম হয়েছে। কিন্তু তাতে দেশবাসীর মাথাপিছু আয়ের ঐ হিসাবটা

মিথ্যে হয়ে যায় নি। তার মূল্য যথেষ্টই আছে। অর্থবিদ্যার তত্ত্ব সম্পর্কেও একই কথা খাটে।

৭. অর্থবিদ্যার তত্ত্ব, নীতি বা বিধিগুলির এই ব্যতিক্রমের একটি বড় কারণ হল, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি গবেষণাগারের চার দেয়ালের সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তত্ত্ব রচনা করতে পারে। কিন্তু অর্থবিদ্যা বিজ্ঞানধর্মী হলেও তা পারে না। সারা সমাজ তার খোলা গবেষণাগার। সে গবেষণাগারের পরিবেশ তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তাই সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করে সে মানুষের আচরণের বিশেষ একটি দিক সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে পারে না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য অর্থবিজ্ঞানী ধরে নেয় (assumes) যে 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে' ('other things are equal')। এই কৌশলে সে তার অনুসন্ধানের বিষয়টিকে অন্যান্য প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। তারপর পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সে সত্যের সিদ্ধান্তে এসে পৌছায়। যেমন, পণ্যের দাম, চাহিদা বা যোগানের মধ্যে সম্পর্কটি অনুসন্ধানের সময় সে ধরে নেয়, খরিদ্দারদের আয়, রুচি, অন্যান্য পণ্যের দাম ইত্যাদি যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকছে। কিন্তু বাস্তব জীবনে তো অন্যান্য অবস্থা কখনই অপরিবর্তিত থাকে না। তাই, অর্থবিদ্যার তত্ত্ব কখনও অক্ষরে অক্ষরে খাঁটি (exact) অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমবিহীন হয়ে উঠতে পারে না, সেটা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে হয়ে থাকে।

৮. কিন্তু তাই বলে অর্থবিদ্যার তত্ত্বগুলি মোটেই অবাস্তবও নয়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের অনুপযুক্তও নয়। বরং অর্থবিদ্যার তত্ত্ব বা নীতি কিংবা তথাকথিত বিধিগুলি হল সযত্নে সংগৃহীত বাছাই করা তথ্যের সাধারণীকৃত বিবৃতি। অন্যভাবে বলা যায়, এ তত্ত্ব বা নীতি অর্থনীতির কোন না কোন অংশের জটিলতাবর্জিত ছবি বা মডেল (model)। বাস্তবের অনাবশ্যক, বিশদ খুঁটিনাটি ও জটিলতা থেকে মুক্ত বলে তা বাস্তব ব্যাপারটাকে আরও ভালভাবে বুঝতে আমাদের সাহায্য করে।

৯. বিজ্ঞান দুই জাতীয়: অস্তিবাচক (positive) এবং আদর্শবাচক (normative)। যা আছে, রয়েছে, বিদ্যমান ('what is'), সে তথ্য অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা যে বিজ্ঞানে করা হয় তা হল অস্তিবাচক বিজ্ঞান (positive science)। এ বিজ্ঞান অবশ্য বস্তুনিষ্ঠ বা বিষয়মুখী (objective)। পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত অর্থবিদ্যার তত্ত্বগুলিও হল অস্তিবাচক। আর যে বিজ্ঞানে 'কি হওয়া উচিত' ('what should be') আলোচনা করা হয়, ভালমন্দ বিচার করা হয় তা হল আদর্শবাচক বিজ্ঞান (normative science)। ভালমন্দর আলোচনায় অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের নিজের নিজের মূল্যবোধ (values) এবং যে যার নিজস্ব মূল্যবোধের মাপকাঠি দিয়ে মূল্যবিচার করে। সুতরাং আদর্শবাচক বিজ্ঞানের আলোচনার অনেকটাই হল বিষয়ীমুখী (subjective)। অস্তিবাচক বিজ্ঞানে বিতর্কের মীমাংসা সহজেই করা যায় সংশ্লিষ্ট তথ্য যাচাইয়ের দ্বারা। কিন্তু আদর্শবাচক বিজ্ঞানের বিতর্ক শেষ হবার নয়,

তার মীমাংসা হওয়া কঠিন। কারণ, তাতে বিতর্ককারী দুই পক্ষই নিজ নিজ মূল্যবোধের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। দুই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর মিলনক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া সেখানে দুষ্কর।

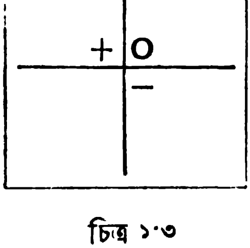
১. ৬. অর্থনীতিক তত্ত্ব ও কর্মনীতি

Economic Theory and Economic Policy

১. অর্থবিদ্যার তত্ত্বগুলির কাজ শুধু ঘটনাবলীর ব্যাখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। জিনিসপত্রের দরদাম বাড়ে বা কমে কেন, কেন মুদ্রাস্ফীতি হয় শুধু তা ব্যাখ্যা করেই তার কাজ শেষ হয় না। মানুষ ও সরকার, স্বাভাবিকভাবেই ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে আগে থেকেই তা যতটা সম্ভব অনুমান করতে চায়, কারণ ঘটনা যদি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নাও হয় তবু আগে থেকে তার আভাস পেলে সাবধান হওয়া যায় এবং সম্ভবপর ক্ষেত্রে প্রতিষেধক কিংবা সমাধানের পন্থাও গ্রহণ করা যায়। তাই অর্থবিদ্যার তত্ত্বের আরেকটি কাজ হল, অর্থনীতিক ঘটনাবলীর যথাসম্ভব পূর্বাভাস অনুমান করা এবং সমস্যার প্রতিষেধক বা প্রতিকারের পন্থা নির্দেশ করা। অর্থবিদ্যার এই অংশটি হল আদর্শবাচক বিজ্ঞানের অন্তর্গত। কারণ, কি ঘটতে পারে বা না পারে তার অনুমান করতে গিয়ে এবং প্রতিষেধক বা প্রতিকারের পন্থা সম্পর্কে পরামর্শ দিতে গিয়ে অর্থবিজ্ঞানী কেবল তথ্যের গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারে না। তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, সংস্কার, বিরাগ, পছন্দ-অপছন্দ অনেক কিছুই তাঁর মতামতের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে যায়। অর্থবিদ্যাবিদ সেখানে আর বিজ্ঞানী থাকেন না, তিনি হয়ে পড়েন কর্মনীতি নির্ধারণকারী (policy maker)। অর্থবিদ্যার এই অংশটিকে বলে অর্থনীতিক কর্মনীতি (economic policy) অথবা ফলিত অর্থবিদ্যা (applied economics)।

২. অর্থবিদ্যার তত্ত্ব, নীতি বা বিধি কিংবা মডেলগুলিকে বোঝার ও বোঝানোর সুবিধার জন্য নানাভাবে উপস্থিত করা যায়: (ক) কথা দিয়ে ব্যাখ্যা; (খ) সংখ্যার সাহায্যে সাজানো সারণি (numerical table); (গ) বীজগণিতের সমীকরণ (equation); (ঘ) চিত্র (graphs)। এদের মধ্যে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা হল নতুন পাঠকদের পক্ষে সবচেয়ে সহজে ও সংক্ষেপে বোঝার উপায়।

চিত্র আঁকার গোড়ার কথা হল: চৌকো সাদা কাগজে একটি লম্ব অক্ষরেখা একটি সমান্তরাল অক্ষরেখাকে সমকোণে খণ্ডন করলে খণ্ডন-বিন্দুটিকে বলে উৎপত্তি-বিন্দু (point of origin)। দুটি অক্ষরেখারই সংখ্যাগত মূল্যবিশিষ্ট ক্রমিক মূল্যবাচক সংখ্যা রয়েছে। উৎপত্তি-বিন্দুর উপরের ভাগে অবস্থিত লম্ব অক্ষরেখার উপরে অবস্থিত সমস্ত মূল্যবাচক সংখ্যাই হল ধনাত্মক (+)। উৎপত্তি-বিন্দুর নিচের দিকে লম্ব অক্ষরেখার উপর অবস্থিত সমস্ত মূল্যবাচক সংখ্যাগুলি হল ঋণাত্মক (−)।



চিত্র ১·৩

তেমনি উৎপত্তি-বিন্দুর ডানদিকে সমান্তরাল অক্ষরেখার উপরে অবস্থিত সমস্ত মূল্য-বাচক সংখ্যাগুলিও হল ধনাত্মক এবং উৎপত্তি-বিন্দুর বামদিকে সমান্তরাল অক্ষরেখার উপর অবস্থিত সমস্ত মূল্যবাচক সংখ্যাগুলি হল ঋণাত্মক। আর উৎপত্তি-বিন্দুটির সংখ্যাগত মূল্য হল শূন্য (0)।

প্রাথমিক অর্থবিদ্যায় দুই প্রস্থ অর্থনৈতিক তথ্যের মধ্যে সম্পর্কটিই প্রায় সর্বদাই আলোচ্য বিষয় হয়ে থাকে বলে (যেমন, দাম ও চাহিদা, কিংবা দাম ও যোগান ইত্যাদি) এবং তাদের সংখ্যাগত মূল্যও ধনাত্মক বলে, দুটি অক্ষরেখার সমকোণে খণ্ডনের দরুন যে চারটি সমকোণীক্ষেত্র পাওয়া যায় তাদের মধ্যে, ডানদিকে উপরের সমকোণী চতুর্থাংশ নিয়েই কাজ চলে যায়। কারণ তাতে দুই অক্ষ-রেখার মূল্যবাচক সংখ্যাগুলির সবই ধনাত্মক।

১.৭. অর্থনৈতিক লক্ষ্য

Economic Goals

১. অর্থনৈতিক কর্মনীতির প্রসঙ্গে এসে যায় সমাজের অর্থনৈতিক লক্ষ্যের কথা (economic goals)। এখানে সর্বজনসম্মত না হলেও বহুজন সমর্থিত কয়েকটি অর্থনৈতিক লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে: (১) অর্থনৈতিক উন্নয়ন (economic growth): আরও বেশি পরিমাণে এবং আরও উৎকৃষ্ট ধরনের দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন তথা জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন।

(২) পূর্ণ কর্মসংস্থান (full employment) বা অন্তত আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি (creation of greater employment opportunities): কাজ করতে ইচ্ছুক ও সক্ষম সকলের জন্য কাজের সংস্থান।

(৩) শিল্পায়ন (industrialisation): দেশের ভোগ ও রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য এবং শিল্পে যথাসম্ভব স্বনির্ভরতা লাভের জন্য ভোগ্যপণ্য, পুঁজিদ্রব্য ও সেবার উৎপাদন বৃদ্ধি।

(৪) উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি (increase in productivity): শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরী ক্ষেত্রের অগ্রগতি।

(৫) মূল্যস্তরের স্থিতি (price stability): দরদামের ঘনঘন ও অত্যধিক ওঠানামা উৎপাদন ও ভোগের ক্ষতি করে বলে মূল্যস্তরের স্থিতি প্রতিষ্ঠা।

(৬) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ (population control): জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির জন্য জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি।

(৭) আয়ের ন্যায্য বণ্টন (equitable distribution of income): মুষ্টিমেয় লোকের উপচে-পড়া সমৃদ্ধি ও অগণিত মানুষের ভয়াবহ দারিদ্র্য দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানের উন্নতির বাধা হয়ে দাঁড়ায় বলে দেশের মধ্যে আয়ের ন্যায্য বণ্টন প্রতিষ্ঠা।

(৮) অর্থনৈতিক নিরাপত্তা (economic security): সমাজের পিছিয়ে-পড়া এবং অর্থনৈতিক শক্তিতে দুর্বলতর অংশের মানুষ ও পীড়িত, অশক্ত, কর্মক্ষমতাহীনদের জন্য ব্যবস্থা।

(৭) বৈদেশিক বাণিজ্য ও লেনদেনের ব্যালান্সের উন্নতি (improvement of external balance) : অন্তত পক্ষে দেশের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের মধ্যে সমতা বা ভারসাম্য স্থাপন।

২. অর্থনীতিক লক্ষ্যগুলির এই তালিকাটি সম্পূর্ণও নয়, পূর্ণাঙ্গও নয়। [যেমন এই তালিকায় যোগ করা যায় আরেকটি লক্ষ্য, 'অর্থনীতিক স্বাধীনতা' (economic freedom)। এর অর্থ হল সমাজে কারবারী ও শ্রমিক, জমির মালিক ও খেতমজুর, উৎপাদক ও ভোগী, সকলের জন্য বেশি মাত্রায় অর্থনীতিক স্বাধীনতা ভোগের ব্যবস্থা করা। ধনতান্ত্রিক সমাজে এই লক্ষ্য রাখা হয় বলে গর্ব করা হয়। কিন্তু আসলে শ্রমিক ও মালিক, ভূ-স্বামী ও খেতমজুর উভয়ের স্বাধীনতার মানে শেষ পর্যন্ত মালিক ও ভূ-স্বামীদের স্বাধীনতাই হয়ে দাঁড়ায় নাকি ?] দেশের পরিস্থিতি, প্রয়োজন ও সাধ্য অনুযায়ী এই লক্ষ্যগুলি এক এক দেশে ও এক এক সময়ে এক এক রকম হয়ে থাকে। এখানে লক্ষণীয় এই যে : এই লক্ষ্যগুলির অনেকগুলি যেমন পরস্পরের অনুপূরক তেমনি আবার কতকগুলির মধ্যে পরস্পরের খানিকটা বিরোধও থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে অর্থনীতিক কর্মনীতি নির্ধারকদের ঠিক করতে হয় কোন্‌টিকে কার উপরে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং সে সিদ্ধান্তটা অবশ্যই করতে হয়, অর্থবিজ্ঞানীকে নয়, করতে হয় রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে, সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে। এখানে অগ্রাধিকার নিয়ে যেমন, তেমনি আবার ওই লক্ষ্যগুলির অর্থ ও তাৎপর্য নিয়েও মতভেদ দেখা দিতে পারে। কারণ বিষয়টার সাথে মূল্যবোধের প্রশ্নটা থাকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে।

১.৮. অর্থবিদ্যা ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান
Economics and Other Social Sciences

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কাজ হল মানুষের পরিবেশের বিভিন্ন দিক অনুসন্ধান। আর সমাজবিজ্ঞানের কাজ হল মানুষের আচরণের বিভিন্ন দিক অনুসন্ধান। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পুরোপুরি অস্তিবাচক বিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান আংশিক অস্তিবাচক, আংশিক আদর্শবাচক। কিন্তু সমস্ত বিদ্যার জন্ম হয়েছে মূলবিদ্যা দর্শন শাস্ত্র থেকে। এরিস্টটল, প্লেটো প্রমুখ পণ্ডিতেরা নীতিশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি, এমনকি অর্থবিদ্যারও সামান্য আলোচনা করেছেন সামগ্রিক বিদ্যা অর্থাৎ দর্শন শাস্ত্রের শাখারূপেই, ন্যায়নীতি বা রাষ্ট্রনীতির প্রসঙ্গে। ইয়োরোপে মধ্যযুগে অর্থবিদ্যাকে গণ্য করা হত ধর্মতত্ত্বের অন্তর্গত রূপে। মধ্যযুগের অবসানে ইয়োরোপে রেনেসাঁসের কালে এল বাণিজ্যবাদ বা মার্কেন্টাইলিজমের যুগ। জাতীয়তাবাদের আবির্ভাবের সাথে সাথে তখন শক্তিশালী জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ার অন্যতম উপায় রূপে জোর পড়ল দেশের বাণিজ্যের প্রসার দ্বারা সমৃদ্ধি লাভের উপর। রাষ্ট্র তখন হয়ে উঠল বাণিজ্য ও শিল্প নিয়ন্ত্রক। অর্থনীতিক বিষয়গুলি হয়ে দাঁড়াল রাজনৈতিক প্রশ্ন। শিল্প-বিপ্লবের আগমনে মধ্যযুগের অবসান ঘটল। অবসান ঘটল সামন্ততন্ত্রের। আবির্ভূত হল ধনতন্ত্র এবং পুঁজিপতি শ্রেণী। অর্থবিদ্যাও মুক্তি পেয়ে পরিণত হল

স্বতন্ত্র এক সম্পূর্ণ বিদ্যায়। তখন থেকে জোর দেওয়া হতে লাগল অর্থবিদ্যার সাথে অন্যান্য সমাজবিদ্যার পার্থক্যের উপর। এখন আবার পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। ন্যায়নীতি, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, সমাজতত্ত্ব আর মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি সমাজবিদ্যার অন্যান্য শাখার সাথে অর্থবিদ্যার এতদিনের যে আড়ালের দেওয়াল তৈরি করা হয়েছিল তা এখন ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে। অর্থবিদ্যাসহ সমাজবিজ্ঞানের সব শাখারই লক্ষ্য হল মানুষের আচরণ অনুসন্ধান। অর্থনীতিক প্রশ্নগুলির সাথে অন্যান্য, যথা সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি প্রশ্নও জড়িত। সুতরাং অর্থনীতিক প্রশ্ন ও সমস্যাগুলির সমাধান করতে গেলে মানুষের আচরণকে অন্যান্য সমাজবিদ্যার চোখ দিয়েও দেখে নেওয়া দরকার। তা না হলে নিছক অর্থনীতিক সমাধান দিয়ে ফল পাওয়া যাবে না। তাই অর্থবিদ্যার আলোচনা থেকে আজকের দিনে সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ন্যায়নীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার আলোচনাকে আর বাদ দেওয়া যাচ্ছে না। অর্থবিদ্যা এখন পূর্ণাঙ্গ একটি সমাজবিদ্যায় পরিণত হলেও সব সমাজ-বিজ্ঞানেরই লক্ষ্য যখন মানুষ ও তার পরিবেশ এবং আচরণ, তখন অন্যান্য সমাজ-বিজ্ঞান থেকে অর্থবিদ্যাকে দূরে সরিয়ে রাখা আর সম্ভবও নয়, যুক্তিযুক্তও নয়।

২

ভোগ
CONSUMPTION

ভোগ ও উপযোগ
Consumption & Utility

২. ১. ভোগ / Consumption

১. অর্থবিদ্যায় 'ভোগ' বলতে অভাবপূরণে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের ব্যবহার বোঝায়। তার মধ্য দিয়ে আসে তৃপ্তি, দূর হয় অভাব। খাদ্য-পানীয়ের মত জিনিসগুলি একবার মাত্র ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তৃপ্তি এনে দিয়ে অভাব দূর করে ফুরিয়ে যায়। জামা, কাপড়, চেয়ার, টেবিলের মত জিনিসগুলি অনেক দিন ধরে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তৃপ্তি এনে দিতে ও অভাব দূর করতে থাকে। সুতরাং ভোগ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে দ্রব্য ও সেবাকর্ম মানুষকে তৃপ্তি এনে দিয়ে অভাব দূর করে।

২. অভাব দূর বা তৃপ্ত করাই হল মানুষের যাবতীয় অর্থনীতিক কাজকর্মের উদ্দেশ্য। সেটা সম্ভব হয় ভোগের দ্বারা। সুতরাং ভোগই হল মানুষের যাবতীয় অর্থনীতিক কাজকর্মের উদ্দেশ্য ও চালিকা শক্তি। ভোগের উদ্দেশ্যেই মানুষ যাবতীয় অর্থনীতিক কর্মে প্রণোদিত ও প্রবৃত্ত হয়। ভোগের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কাজকর্মই হল অর্থনীতিক কর্ম।

৩. সমাজবদ্ধ মানুষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতজীবনে কিভাবে ভোগের ক্ষেত্রে আচরণ করে, তাদের সেই সব আচরণের মধ্যে কোন সাধারণ নিয়ম ধরা পড়ে কিনা তার আলোচনাই বর্তমান অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

২. ২. উপযোগ / Utility

১. মানুষের কোন না কোন অভাব দূর বা তৃপ্ত করার ক্ষমতা বা গুণ যার আছে তাকেই বলে দ্রব্য (ও সেবাকর্ম)। যতক্ষণ দ্রব্য ও সেবাকর্মের এই অভাব তৃপ্ত করার ক্ষমতা (অর্থাৎ উপযোগ) থাকে, ততক্ষণই তা মানুষের অভাব দূর করতে পারে। অর্থবিদ্যায় এটি একটি মৌলিক ধারণা এবং এর উদ্ভাবক ও প্রচারকদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন জেভোনস, ওয়ালরাস, উইকস্টীড ও কার্ল মেঙ্গার।

২. 'উপযোগ' বলতে অভাব তৃপ্তির যে ক্ষমতাটাকে বোঝায় এবং যা দ্রব্য ও সেবাকর্মের মধ্যে রয়েছে বলে ধরা হয় তা কিন্তু একটা কল্পনা বা মনোগত ধারণা মাত্র। 'উপযোগ' কোন প্রাকৃতিক গুণ বা ধর্ম নয় এবং এর কোন প্রকৃত বা বস্তুগত অস্তিত্ব নেই। এই কারণেই নিরামিষাশীর কাছে মাছের উপযোগ নেই, আবার খাদ্য গ্রহণের আগে খাদ্যের যে উপযোগ থাকে, খাদ্য গ্রহণের পরে তা থাকে না।

৩. যে দ্রব্য বা সেবাকর্ম ভোগী চাইছে, তার কোন ব্যবহারিক কার্য-কারিতা থাকুক বা নাই থাকুক, কিংবা তা ভালই হোক বা মন্দই হোক, ওই দ্রব্য বা সেবাকর্মটির দ্বারা তার কোন অভাব দূর হবে মনে করেই সে তা চাইছে ধরে নিতে হবে। সুতরাং তার কাছে সে দ্রব্য বা সেবাকর্মটির উপযোগ আছে বলে গণ্য করতে হবে। তাই উপযোগ-এর সাথে ভাল-মন্দ, নৈতিকতা ও বৈধতার কোন সম্পর্ক নেই।

৪. উপযোগ একটা মনোগত ধারণা বলে, দ্রব্য, সেবাকর্ম বা টাকা পয়সা, কোনটার উপযোগই আসলে পরিমাপ করা যায় না, জানা যায় না। তবু ভোগীদের আচার আচরণ বিশ্লেষণ ও আলোচনার সুবিধার জন্য, মার্শাল প্রভৃতি পণ্ডিতেরা ধরে নিয়েছেন যে, উপযোগ মাপা যায়। তাঁদের কাছে একটি দ্রব্য বা সেবা কেনার জন্য ভোগী যে দাম দিতে রাজী থাকে সে দাম ভোগীর কাছে ওই জিনিসটির উপযোগের সমান। এর মানে হল, অর্থ বা টাকার সাহায্যে উপযোগ পরিমাপ করা। এটা হল পরোক্ষভাবে উপযোগ মাপার চেষ্টা এবং তা করতে হলে টাকার উপযোগটা সব সময় একই রকম আছে বলে কল্পনা করতে হয়, যদিও বাস্তবে তা থাকে না। এটা খানিকটা গোঁজামিল বটে, কিন্তু উপযোগ যদি আদৌ পরিমাপ করতেই হয়, তবে এছাড়া উপায়ও নেই। এটা অবশ্য অনেক অর্থবিজ্ঞানীর মনঃপূত নয়। এঁদের মতে, উপযোগ কোনভাবেই পরিমাপ করা যায় না। এঁরা তাই ভোগীদের আচরণ বিশ্লেষণে পছন্দ তত্ত্ব নামে একটি বিকল্প পন্থা প্রচার করেছেন।

৫. কোন দ্রব্য বা সেবাকর্মের চাহিদার ভিত্তিটি কী, সে প্রশ্নের জবাবটি খুঁজতে গিয়ে জেভোনস প্রমুখ অর্থবিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে, **উপযোগ** বা অভাব তৃপ্তির ক্ষমতাই **হল** দ্রব্য বা সেবাকর্মের **চাহিদার ভিত্তি এবং নির্ধারক**।

২.৩. মোট ও প্রান্তিক উপযোগ / Total and Marginal Utility

১. **মোট উপযোগ :** কেউ যদি একটি কলম কেনে, তবে তা থেকে সে যে উপযোগ পেল, তাই হল একটি কলম থেকে পাওয়া তার কাছে কলমের মোট উপযোগ। যদি সে দু'টি কলম কেনে, তবে প্রথম কলমটির উপযোগের সাথে দ্বিতীয় কলমটির উপযোগ যোগ দিলে, যে যোগফল পাওয়া যাবে তাই হল তার কাছে কলমের মোট উপযোগ। অর্থাৎ, ক্রেতা বা ভোগী কোন দ্রব্য বা সেবাকর্মের যতগুলি একক কেনে বা কিনবে বলে ভাবছে, তার সবগুলির উপযোগের সমষ্টিই হল মোট উপযোগ।

২. **প্রান্তিক উপযোগ :** প্রান্তিক উপযোগ হল কোন দ্রব্য বা সেবাকর্মের প্রান্তিক এককের উপযোগ। কোন দ্রব্য বা সেবাকর্মের যতগুলি একক কেনা হয়েছে যদি তার আরও একটি বা অতিরিক্ত একক কেনা হয় বা কেনার কথা ভাবা

হয়, তবে ওই অতিরিক্ত এককটিই হল প্রান্তিক একক এবং তার উপযোগই হল প্রান্তিক উপযোগ। ভোগী যদি কোন দ্রব্য বা সেবাকর্মের একটি মাত্র একক কেনে, তখন ওই একটি এককই হল তার কেনা মোট একক এবং প্রান্তিক একক। যদি সে দুটি একক কেনে, তবে দুটি একক হল তার কেনা মোট একক এবং দ্বিতীয় এককটি হল তার কাছে প্রান্তিক একক। তিনটি একক কিনলে, বা কেনার কথা ভাবলে, তৃতীয় এককটি হবে তখন প্রান্তিক একক। কেনা এককের সংখ্যা যত বাড়তে থাকবে, 'প্রান্ত'ও ততই সরে যেতে থাকবে।

২.৪. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি
Law of Diminishing Marginal Utility

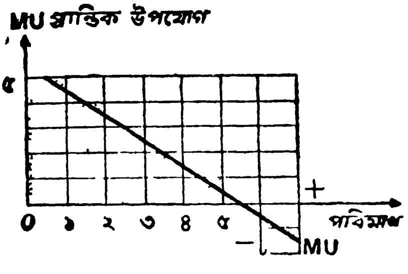
১. দ্রব্য ও সেবাকর্মের ভোগের মারফত অভাবের তৃপ্তি সাধনটা অর্থবিদ্যায় ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি নামে পরিচিত একটি মৌলিক নিয়মের অধীন। একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট অভাবের তৃপ্তি সাধন সম্ভব, অভাবের এই অন্যতম বৈশিষ্ট্যটি হল এই বিধির ভিত্তি। অর্থাৎ, যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটি অভাব যে দূর হয়ে থাকে, আমাদের প্রতিদিনের এই বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই এই বিধিটি প্রতিষ্ঠিত।

২. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ **বিধিটি হল এই ঃ** একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে কোন একটি দ্রব্য বা সেবাকর্ম যতই আমরা ভোগ বা ব্যবহার করতে থাকি ততই আমাদের কাছে তার মোট উপযোগ বাড়তে থাকলেও, তার পরের পর এককের বা প্রান্তিক এককের উপযোগ অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পেতে থাকে। কিংবা বলা যায়, তার মোট উপযোগ বাড়তে থাকে বটে, কিন্তু তার বৃদ্ধির হারটা কমে যেতে থাকে। এই কথাটাই মার্শাল বলেছিলেন এইভাবে,—'কোন ব্যক্তির কাছে কোন জিনিসের মজুদ পরিমাণ যতই বাড়তে থাকে ততই মজুদের ওই বৃদ্ধি থেকে সে আগের তুলনায় ক্রমাগত কম সুবিধা পেতে থাকে'।

৩. **ব্যাখ্যা ঃ** আমরা যখন কোন দ্রব্য বা সেবাকর্মের অভাব অনুভব করি তখন আমাদের কাছে তার উপযোগ জন্মে। যখন আমরা তার প্রথম এককটি পাই ও ভোগ করি তখন তা থেকে আমরা সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি পাই। কারণ তার আগে ওই জিনিসের অভাবটি আমাদের কাছে অতৃপ্ত ছিল। তাই সে জিনিসের জন্য আকাঙ্ক্ষাও তীব্র ছিল। যেমন, খিদের সময় একথালা ভাত আমাদের খুবই তৃপ্তি দেয়। কিন্তু ভাত খেতে খেতে যতই পেট ভরে উঠতে থাকে ততই, প্রথমবার ভাত নিয়ে তা থেকে যতটা তৃপ্তি পেয়েছিলাম, পরের বারে ভাত নিয়ে তার থেকে কম এবং তারও পরের বারের ভাত থেকে আরো কম তৃপ্তি পেতে থাকি। অর্থাৎ, যে কোন দ্রব্য বা সেবাকর্ম যতই ভোগ করা হতে থাকে ততই তার প্রান্তিক উপযোগ কমে যেতে থাকে। এইভাবে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমাগত হ্রাস পেতে পেতে একসময়ে শূন্যে (০) পরিণত হয়ে তারপর ঋণাত্মক (—)

হয়ে পড়বে। এবার নিচের দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি আরও বিশদ করা যেতে পারে।

৪. **দৃষ্টান্ত:**



চিত্র ২'১

সারণি ২'১

পণ্যের একক	প্রান্তিক উপযোগ	মোট উপযোগ
১	৫	৫
২	৪	৯
৩	৩	১২
৪	২	১৪
৫	১	১৫
৬	০	১৫
৭	−২	১৩

২'১ সারণিতে দেখা যাচ্ছে পণ্য বা সেবাকর্মের ভোগ যতই বাড়ছে ততই পরের পর এককগুলির উপযোগ বা প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ কমে ৬ষ্ঠ এককে হয়েছে শূন্য (০) এবং ৭ম এককে তা হয়েছে −২। এটা ২'১ চিত্রে রেখার সাহায্যে দেখান হয়েছে। ভূমিতলের সমান্তরাল অক্ষরেখাটির সাহায্যে ভোগের এককগুলির পরিমাণ ও লম্ব অক্ষরেখাটির সাহায্যে প্রান্তিক উপযোগ পরিমাপ করা হয়েছে। ১ম এককের উপযোগ ৫ থেকে ৭ম এককের উপযোগ −২ পর্যন্ত প্রান্তিক উপযোগ রেখাটি (MU) সরলরেখা রূপে বাম দিকে উপর থেকে ডান দিকে ক্রমশ নিচে নেমেছে। এই হল প্রান্তিক উপযোগ রেখার রূপ। তা সর্বদা বাম দিকে উপর থেকে ডান দিকে নিচে নামে। তবে রেখাটি সরল না হয়ে অবতল-ও (convex) হতে পারে। প্রান্তিক উপযোগ সর্বদাই কমে বলে, রেখাটি বাম দিক থেকে ডান দিকে সর্বদাই নিম্নমুখী হবে। কখনও ডান দিকে ঊর্ধ্বমুখী হবে না। কারণ পরবর্তী এককের উপযোগ কখনও আগের এককের চেয়ে বেশি হয় না। সারণির তৃতীয় কলমে মোট উপযোগ দেখান হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রান্তিক উপযোগ যেখানে শূন্য হয়, মোট উপযোগ বাড়তে বাড়তে সেখানে সর্বাধিক হয়। তারপর প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হলে মোট উপযোগ কমে।

৫. **বিধিটির সীমাবদ্ধতা ও অনুমিত শর্তাবলী:** অর্থবিদ্যার অন্যান্য বিধির মতই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটিও সর্বাবস্থায় সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নিম্নোক্ত অবস্থা বা বিষয়গুলি যদি অপরিবর্তিত থাকে তবেই এই বিধিটি প্রযোজ্য হবে বা খাটবে।

(ক) একটি নির্দিষ্ট কাল ধরে একটানাভাবে কোন দ্রব্য বা সেবাকর্ম ভোগ করা হলে তবেই সেক্ষেত্রে বিধিটি খাটবে। মাঝখানে বিরতি ঘটলে বিধিটি নাও

খাটতে পারে। দিনের বেলা ভাত খেয়েছি বলে রাতের বেলা ভাতের প্রান্তিক উপযোগ কম হবে না। কিন্তু দিনে হোক বা রাতেই হোক খাওয়ার সময় আগের বারের তুলনায় পরের বারের ভাতের প্রান্তিক উপযোগ অবশ্যই কম হবে।

(খ) ভোগীদের রুচি, অভ্যাস, পছন্দ এবং আয় ঐ নির্দিষ্ট কালের মধ্যে অপরিবর্তিত থাকলে, তবেই বিধিটির সত্যতা প্রমাণিত হবে। মাঝখানে যদি রুচি, পছন্দ, অভ্যাস, আয় বদলে যায়, তবে একটানা ভোগের ক্ষেত্রেও প্রান্তিক উপযোগ না কমে বেড়ে যেতে পারে।

(গ) ভোগের ঐ নির্দিষ্ট কালের মধ্যে দ্রব্য বা সেবাকর্মটির গুণমান অপরিবর্তিত থাকলে, তবেই বিধিটি খাটবে। প্রথম বারের চা অপেক্ষা দ্বিতীয় বারের চা যদি উৎকৃষ্ট হয়, তাহলে প্রথম কাপ চায়ের চেয়ে দ্বিতীয় কাপ চায়ের উপযোগ বেশি হতে পারে।

(ঘ) দ্রব্য বা সেবাকর্মের এককগুলির আয়তন বা পরিমাণ স্বাভাবিক এবং আগাগোড়া একরকম থাকলে তবেই বিধিটি খাটবে। তৃষ্ণার সময় গ্লাসের বদলে চামচে করে জল খেলে, প্রথম চামচ জলের চেয়ে দ্বিতীয় চামচ জলের উপযোগ বেশি হওয়াই স্বাভাবিক।

(ঙ) অন্যের অনুকরণে ভোগ না করলে বিধিটি সত্য প্রমাণিত হবে। ক্লাসের সবার যদি ২টি করে কলম থাকে, আর আমার কাছে যদি একটি মাত্র কলম থাকে এবং তাতে আমি যদি প্রভাবিত হই, তাহলে আমার কাছে তখন প্রথম কলমটির উপযোগের চেয়ে দ্বিতীয় কলমটির উপযোগ বেশি হবে।

২. ৫. প্রান্তিক উপযোগ ও দাম / Marginal Utility & Price

১. কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে একজন ভোগী কোন দ্রব্য বা সেবাকর্ম কিনতে যখন বাজারে আসে তখন তার নির্দিষ্ট আয় অনুযায়ী টাকার প্রান্তিক উপযোগ ও দ্রব্য বা সেবাকর্মের বিভিন্ন সম্ভাব্য পরিমাণের প্রান্তিক উপযোগ সম্পর্কে একটা ধারণা তার মনে থাকে। বাজারে এসে সে দেখে জিনিসটি একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রি হচ্ছে। তখন ঐ দামেই তাকেও সেটি কিনতে হয়। কারণ তার একার পক্ষে দামের উপর প্রভাব খাটানো সম্ভব নয়।

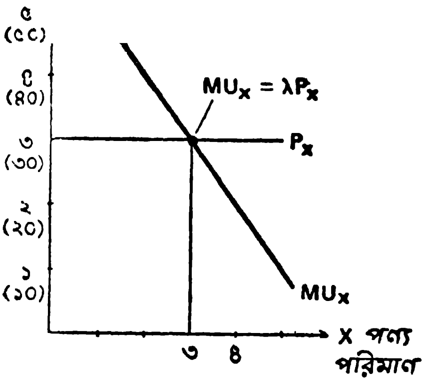
২. ভোগী ঠিক কি পরিমাণ দ্রব্য কিনবে তা নির্ভর করে দ্রব্যের দাম, তার নিজের আয়, তার নিজের কাছে টাকার প্রান্তিক উপযোগ এবং দ্রব্যটির বিভিন্ন পরিমাণের প্রান্তিক উপযোগের উপর। ভোগী তার ক্রয়ের পরিমাণ ঠিক সেই এককেই সীমাবদ্ধ রাখবে যে এককের প্রান্তিক উপযোগ দামের মাধ্যমে প্রকাশিত টাকার প্রান্তিক উপযোগের সমান হবে।

৩. **ব্যাখ্যা :**

বাজার দাম ও প্রান্তিক উপযোগ

সারণি ২·২

পণ্যটির একক	প্রান্তিক উপযোগ	দাম	টাকার প্রান্তিক উপযোগ (১ টাকা= ১০)
১ম	৫০	৩ টাকা	৩০
২য়	৪০	"	৩০
৩য়	৩০	"	৩০
৪র্থ	২০	"	৩০
৫ম	১০	"	৩০



চিত্র ২·২

ধরা যাক, ভোগীর কাছে তার আয় অনুযায়ী টাকার প্রান্তিক উপযোগ হল ১০ একক এবং পণ্যটির বাজার দাম হল ৩ টাকা। এই দামে কিনতে হলে তাকে ৩০ একক উপযোগ ছাড়তে হয়। ওদিকে পণ্যটির প্রথম এককের উপযোগ ৫০ হলে এটি ৩ টাকা দিয়ে কিনলে ভোগী বাড়তি ২০ একক উপযোগ পাচ্ছে। এতে তার লাভ হল বলে সে দ্বিতীয় এককটিও কিনতে চাইবে। পণ্যটির দ্বিতীয় এককের উপযোগ ৪০ হওয়ায় এবারও সে ৩ টাকা দিয়ে অর্থাৎ টাকার ৩০ একক উপযোগের বদলে পণ্যটির দ্বিতীয় একক কিনবে। তাতে তার লাভ হবে ১০ একক উপযোগ। তাতে প্রলুব্ধ হয়ে সে এবার তৃতীয় এককটি কিনবে। এবার ৩ টাকা বা টাকার ৩০ একক উপযোগের বিনিময়ে পণ্যটির ৩য় এককটি কিনলে তা থেকেও সে ৩০ একক উপযোগ পাবে। তাতে তার ক্ষতি নেই, যদিও বাড়তি লাভও নেই। কিন্তু সে ৪র্থ এককটি ৩ টাকা দামে কিনবে না। কারণ তা থেকে সে ২০ একক উপযোগ পাবে অথচ তাকে ত্যাগ করতে হবে তিন টাকার ৩০ একক উপযোগ। সুতরাং বাজারে দাম ৩ টাকা হলে ভোগী ৩টি একক পণ্য কিনবে। তাতে পণ্যটির প্রান্তিক উপযোগ (=৩০) দামের দ্বারা প্রকাশিত টাকার প্রান্তিক উপযোগের (=৩০) সমান হবে।

২·২ চিত্রে এ বিষয়টি দেখান হয়েছে। লম্ব অক্ষরেখায় দাম ও প্রান্তিক উপযোগ এবং ভূমিতলের সমান্তরাল অক্ষরেখায় পণ্যটি কেনার পরিমাণ দেখান হয়েছে। দাম সবসময় ৩ টাকা বলে (=৩০ একক উপযোগ বলে) দাম রেখা P_x একটি সমান্তরাল রেখার আকৃতি নিয়েছে। বামদিকে উপর থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী প্রান্তিক উপযোগ রেখা MU_x-কে যেখানে দাম রেখা P_x ছেদ করেছে সেখানে

পণ্যটির প্রান্তিক উপযোগ (MU_x) এবং পণ্যটির দামের দ্বারা প্রকাশিত ক্রেতার কাছে টাকার উপযোগ (λP_x) পরস্পরের সমান হওয়ায়, ক্রেতা ৩টি একক পণ্য কিনবে।

২. ৬. পরিবর্ততার/সমপ্রান্তিক উপযোগ/সর্বাধিক তৃপ্তির বিধি

Law of Substitution/Equimarginal Utility/ Maximum Satisfaction

১. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের ধারণাটি চাহিদার বিধিটিকে ব্যাখ্যার ভিত্তিরূপে কাজ করে। শুধু তাই নয়, বিবিধ দ্রব্য ও সেবা কেনাকাটার ক্ষেত্রে ভোগীরা কিভাবে তাদের মোট খরচটি বিভিন্ন পণ্যের জন্য ভাগ করে দেয়, তাদের সেই আচরণ ব্যাখ্যা করতে এ ধারণাটি প্রধান ভূমিকা নেয়।

২. ভোগের উদ্দেশ্যে পণ্যসামগ্রী কিনলে ভোগীরা তা থেকে পায় উপযোগ। সেটা তাদের লাভ বা এক ধরনের প্রাপ্তি। আর সেজন্য যে দাম দিতে হয়, সেটা তাদের খরচ। অর্থবিদ্যায় মানুষকে যুক্তিবাদী বলে গণ্য করা হয়। সুতরাং ধরে নেওয়া হয়, ভোগীরা যুক্তিবাদীরূপে সবচেয়ে কম খরচে সর্বাধিক তৃপ্তি বা উপযোগ পেতে চেষ্টা করছে। তাদের সে চেষ্টাটাও একটা নিয়মের অধীন। অর্থবিদ্যায় তার নাম হল পরিবর্ততার বিধি বা সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি বা সর্বাধিক তৃপ্তির বিধি।

অবশ্য, তারা যে সব সময় এ চেষ্টায় সফল হয় তা নয়। কারণ, পণ্য সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকে না এবং অভ্যাসবশত তারা সবসময় যুক্তি মেনে চলতে পারে না। তবে, তা সত্ত্বেও, ধরে নেওয়া যেতে পারে, তারা যে সব দ্রব্য কিনবে বলে স্থির করছে, সে সব দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ সম্পর্কে তাদের মোটামুটি ধারণা আছে।

৩. ভোগীদের আয় সীমাবদ্ধ। কারণ, তারা উৎপাদনের যে উপাদান (জমি, পুঁজি, শ্রম, উদ্যোগ) সমাজকে বা কারবারকে যোগান দিয়ে আর্থিক আয় উপার্জন করে তাও সীমাবদ্ধ। আর যে সব দ্রব্য ও সেবা তারা কেনে সেগুলির যোগানও সীমাবদ্ধ বলে ঐগুলি পেতে হলে তাদের নির্দিষ্ট দাম দিতে হয়। সুতরাং, যা যা তাদের দরকার তার সবই কিনতে না পেরে, সীমাবদ্ধ আয়ের দ্বারা তারা সীমাবদ্ধ সংখ্যক ও সীমাবদ্ধ পরিমাণ জিনিসই শুধু কিনতে পারে। ফলে, তারা তাদের সীমাবদ্ধ আয় এমনভাবে খরচ করে যাতে তারা সর্বাধিক তৃপ্তি পেতে পারে। সেজন্য দরকারী নানা জিনিস থেকে তাদের বেছে নিতে হয় কোন্‌টা তারা কিনবে, কোন্‌টা বাদ দেবে এবং যেটা কিনবে তা কতটা পরিমাণে কিনবে।

৪. **বিধিটির বক্তব্য:** সীমাবদ্ধ আয় নিয়ে সীমাবদ্ধ বাজেটের গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত সব ভোগীকেই স্থির করতে হয়, যে সব পণ্য তাদের একই সঙ্গে দরকার সেগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি কতটা পরিমাণে কিনলে তারা সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি পাবে। এর উত্তর হল, পছন্দ অনুযায়ী কেনার মত বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবার মধ্যে ক্রেতারা এমনভাবে তাদের মোট খরচটা ভাগ করে দেয় যাতে প্রতিটি

দ্রব্যের জন্য খরচ করা শেষ টাকাটা থেকে তারা সমপরিমাণ অতিরিক্ত (বা প্রান্তিক) উপযোগ পেতে পারে। একে **উপযোগ সর্বাধিকীকরণের নিয়ম** বলা যায়।

মার্শালের কথায়, বিধিটি হল, "কারো কাছে যদি এমন কিছু থাকে (যেমন, টাকা) যা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে সে ঐ জিনিসটিকে ঐ সব ব্যবহারগুলির মধ্যে এমনভাবে বণ্টন করে দেবে যাতে সমস্ত ক্ষেত্রেই তার প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়"।

৫. **ব্যাখ্যা:**

সারণি ২.৩

(দৈনিক ১০ টাকা আয়ে ক্রয়যোগ্য মাছ ও তরকারির সর্বাধিক উপযোগ সংমিশ্রণ)

[তরকারির দাম = ১ টাকা কেজি ও মাছের দাম = ২ টাকা কেজি]

(১) পণ্যের একক	(২) তরকারির প্রান্তিক উপযোগ (ক)	১ টাকার প্রান্তিক উপযোগ (প্রাঃ উঃ ÷ দাম) (খ)	(৩) মাছের প্রান্তিক উপযোগ (ক)	১ টাকায় প্রান্তিক উপযোগ (প্রাঃ উঃ ÷ দাম) (খ)
প্রথম	১০	১০ (তৃতীয় ১ টাকা ব্যয়)	২২	১১ (প্রথম ২ টাকা ব্যয়)
দ্বিতীয়	৮	৮ (চতুর্থ ১ টাকা ব্যয়)	২০	১০ (দ্বিতীয় „ „)
তৃতীয়	৭	৭	১৮	৯ (তৃতীয় „ „)
চতুর্থ	৬	৬	১৬	৮ (চতুর্থ „ „)
পঞ্চম	৫	৫	১২	৬

রমেশ তার দৈনিক আয় ১০ টাকা নিয়ে দুটি দ্রব্য, তরকারি ও মাছ কিনতে বাজারে এসেছে। এমন পরিমাণে ঐ দুটি পণ্য সে কিনবে যাতে সে সর্বাধিক উপযোগ পায় এবং তার মোট আয় (অর্থাৎ ১০টা টাকাই) খরচও হয়ে যায়। স্বভাবতই রমেশের আয় এবং ঐ দুটি পণ্যের জন্য তার পছন্দ দিয়েই উপযোগ সর্বাধিকীকরণের সংমিশ্রণটি নির্ধারিত হবে।

২.৩ সারণিতে তরকারি ও মাছের জন্য রমেশের পছন্দ ২(ক) ও ৩(ক) কলমে বিভিন্ন এককের প্রান্তিক উপযোগ দিয়ে দেখান হয়েছে, এবং তার মধ্য দিয়ে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের বিধিটি প্রতিফলিত হচ্ছে। ২(খ) এবং ৩(খ) কলমে খরচের প্রতিটি টাকার প্রান্তিক উপযোগ দেখান হয়েছে তরকারি ও মাছের প্রান্তিক উপযোগের সাথে তুলনামূলকভাবে। এটা হল পণ্য দুটির প্রান্তিক উপযোগকে (কলম ২-ক এবং কলম ৩-ক) পণ্যদুটির দাম (কলম ২ ও ৩) দিয়ে ভাগের ভাগফল। এর উদ্দেশ্য হল একটি পণ্য পেতে গেলে, সেটির উপযোগ লাভের বিনিময়ে তাকে টাকার উপযোগ এবং সেহেতু অপর পণ্যটির কতটা পরিমাণ ছাড়তে বা ত্যাগ করতে হচ্ছে তা দেখান।

এখন আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হল, (১) তার বাজেটের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে রমেশ কিভাবে তার আয়টা খরচ করলে সর্বাধিক উপযোগ পাবে? এবং (২) ১০ টাকা খরচ হয়ে গেলে দ্রব্য দুটির কি রকম সমন্বয় তার কেনা হবে?

এবার ২·৩ সারণির ২ (খ) এবং ৩ (খ) কলমের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখছি, প্রথম দুটি টাকা মাছের জন্যই রমেশের খরচ করা উচিত। কারণ তাতে সে টাকা পিছু তরকারির চেয়ে বেশি উপযোগ পাচ্ছে। এতে সে মোট উপযোগ পাবে ২২। এবার খরচ করলে রমেশ মাছ থেকে যে উপযোগ পাবে, তরকারি থেকেও তাই পাবে। সুতরাং দুটির মধ্যে তার বেছে নেবার কিছু নেই। কারণ টাকা পিছু প্রান্তিক উপযোগ দুইক্ষেত্রেই সমান। তাই ধরা যাক, সে আরো দুটি টাকা মাছের জন্য এবং একটি টাকা তরকারির জন্য খরচ করবে। ফলে এবার অতিরিক্ত এক একক মাছ ও এক একক তরকারি থেকে সে মোট উপযোগ পাবে ৩০। এখন তার মোট খরচ হল ৫ টাকা এবং হাতে আছে ৫ টাকা। সুতরাং সে আরো মাছ এবং তরকারি কিনবে। আর একবার ২ (খ) এবং ৩ (খ) কলমের দিকে তাকালে দেখতে পাই, এবার আরো এক একক মাছ কিনে আরো ২ টাকা খরচ করাই তার পক্ষে লাভজনক। কারণ মাছের তৃতীয় এককের টাকা পিছু প্রান্তিক উপযোগটা তরকারির দ্বিতীয় এককের টাকা পিছু প্রান্তিক উপযোগের চেয়ে বেশি। সুতরাং রমেশ আরো এক একক মাছ কিনে আরো ২টি টাকা খরচ করবে এবং মোট উপযোগ পাবে ১৮। এখন তার হাতে থাকবে আর ৩ টাকা। এবার দেখা যাচ্ছে মাছ এবং তরকারি উভয়েরই পরবর্তী এককের (মাছের চতুর্থ একক এবং তরকারির দ্বিতীয় একক) এবং খরচের শেষ টাকা পিছু প্রান্তিক উপযোগ = ৮ অর্থাৎ সবগুলিই সমান সমান। এবারও দুটির মধ্যে কোন একটিকে রমেশের বেছে নেবার নেই। তাই সে আরো এক একক মাছ কিনে ২ টাকা এবং আরো এক একক তরকারি কিনে ১ টাকা খরচ করবে এবং মোট উপযোগ পাবে ২৪। এখন তার মোট ১০ টাকাই খরচ হয়ে গেল। সে ৪ একক মাছ ও ২ একক তরকারি কিনল এবং সর্বমোট উপযোগ সে পেল ২২ + ৩০ + ১৮ + ২৪ = ৯৪। এই হল রমেশের উপযোগ সর্বাধিকীকরণ সংমিশ্রণ।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ১০ টাকায় মাছ ও তরকারির আরও অনেক রকম সংমিশ্রণ রমেশ কিনতে পারত. কিন্তু তার কোনটা থেকেই সে এত বেশি উপযোগ পেত না। যেমন, সে ৪ একক তরকারি ও ৩ একক মাছ কিনলেও মোট ১০ টাকাই খরচ হত, কিন্তু তাতে মোট উপযোগ পেত ৯১ একক। আবার, সে ৪ একক তরকারি ও ৫ একক মাছ কিনলে ঐ দুটো দ্রব্যের উপর খরচ-করা শেষ টাকা থেকে সমান প্রান্তিক উপযোগও পেত, কিন্তু তাতে খরচ হত ১০ টাকার বেশি। কিংবা, সে ১ একক তরকারি ও ২ একক মাছ কিনলেও ঐ দুটোর উপর খরচ করা শেষ টাকার প্রান্তিক উপযোগও সমান হত। কিন্তু তাতে তার পুরো ১০ টাকা খরচ হত না।

৬. **ভোগীর ভারসাম্য (Consumer's equilibrium) ও পরিবর্ততা:** উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি, একাধিক দ্রব্য ও সেবা কিনতে গিয়ে,— (১) প্রথমত, ভোগীরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি দ্রব্য বা সেবা কিনে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাছে সেটির প্রান্তিক উপযোগ ও দামের অনুপাতটি (অর্থাৎ দাম) পরস্পরের সমান বা উভয়ের ভাগফল ১-এর সমান না হচ্ছে ($Mu = P$, বা, $\frac{Mu}{P} = 1$)। (২) দ্বিতীয়ত, যে কটি দ্রব্য বা সেবা একসঙ্গে কেনা হচ্ছে, তাদের প্রতিটির ক্ষেত্রে যতক্ষণ প্রান্তিক উপযোগ ও দামের অনুপাত পরস্পরের সমান না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা যেটির প্রান্তিক উপযোগ কম তার বদলে যেটির প্রান্তিক উপযোগ বেশি সে দ্রব্যটি বেশি পরিমাণে কিনতে থাকে। এইভাবে কম প্রান্তিক উপযোগের দ্রব্যের পরিবর্তে বেশি প্রান্তিক উপযোগের দ্রব্যটি বেশি পরিমাণে কেনা ও ভোগ করা হতে থাকে। এভাবে পরিবর্ততা চলতে থাকে। ফলে আবার বেশি পরিমাণে কেনার দরুন বেশি প্রান্তিক উপযোগের দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ কমে এক সময়ে তা কম প্রান্তিক উপযোগের দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়। অর্থাৎ তখন দুটি বা ততোধিক দ্রব্যের প্রত্যেকটির প্রান্তিক উপযোগ ও প্রত্যেকটির দামের অনুপাত পরস্পর সমান হয়ে পড়ে $\left(\frac{\text{Mu of } x}{\text{Price of } x} = \frac{\text{Mu of } y}{\text{Price of } y} = \frac{\text{Mu of } z}{\text{Price of } z} \text{ ইত্যাদি} = 1\right)$। (৩) তৃতীয়ত, যতগুলি দ্রব্য ও সেবা কেনা হচ্ছে, সেগুলি এমন পরিমাণে কেনা হয় যে, তাদের প্রান্তিক উপযোগ ও দামের অনুপাতগুলি কেবল পরস্পরের সমানই নয়, তারা আবার টাকার প্রান্তিক উপযোগেরও সমান হয় $\left(\frac{\text{Mu of } x}{\text{Price of } x} = \frac{\text{Mu of } y}{\text{Price of } y} = \frac{\text{Mu of } z}{\text{Price of } z} = \text{Mu of money}\right)$। কারণ টাকারও প্রান্তিক উপযোগ আছে এবং তার পরিমাণ যত বাড়ে তত তার প্রান্তিক উপযোগ কমে এবং পরিমাণ যত কমে প্রান্তিক উপযোগ তত বাড়ে। খরচ করার আগে দ্রব্য ও সেবার প্রান্তিক উপযোগ ভোগীর কাছে বেশি এবং টাকার প্রান্তিক উপযোগ কম থাকে। যতই টাকা খরচ হতে থাকে ততই দ্রব্য ও সেবার প্রান্তিক উপযোগ কমতে থাকে এবং টাকার প্রান্তিক উপযোগ বাড়তে থাকে। তাই ভোগীরা ঠিক সেই পরিমাণে বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবা কেনে, যে পরিমাণ কেনার ফলে তাদের কাছে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি সামগ্রীর প্রান্তিক উপযোগ ও টাকার প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সমান হয়ে পড়ে। যতক্ষণ তা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবা কেনার পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাতে থাকে। (৪) চতুর্থত, এই কেনাকাটার ব্যাপারটা চলতে থাকে তাদের বাজেট অনুযায়ী খরচের টাকা নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত। ঠিক এ অবস্থায় যখন ভোগীরা আসে তখনই তারা সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করে এবং তাদের অভাব দূর হল বলে মনে করে। এবং ঐ অবস্থায় তারা বিভিন্ন দ্রব্য যে যে পরিমাণে কিনে ফেলেছে, তার আর হেরফের করতে চায় না। কারণ তাহলে তার মোট উপযোগ তথা তৃপ্তি সর্বাধিক

হবে না। এইটিই হল প্রতিটি ভোগীর বা প্রতিটি গৃহস্থ পরিবারের ভারসাম্য বা সর্বাধিক তৃপ্তির অবস্থা।

৭. **বিধিটির সীমাবদ্ধতা:** এই বিধিটি বাস্তবে প্রযুক্ত হওয়ার পক্ষে চারটি প্রধান অসুবিধা রয়েছে: (ক) উপযোগ সঠিকভাবে পরিমাপের কোন যন্ত্র বা উপায় নেই। (খ) ভোগীদের রুচি, পছন্দ, অভ্যাস, জিনিষের দাম প্রভৃতি অপরিবর্তিত থাকে বলে এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়। অথচ বাস্তবে তা হয় না। (গ) চেয়ার, টেবিল, আলমারি, বাড়ি, গাড়ি প্রভৃতির মত অনেক ভোগ্য দ্রব্য ও শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতির মত অনেক সেবাকর্ম আছে, যেগুলি কেনার বেলায় প্রান্তিক একক ও প্রান্তিক উপযোগ হিসাব করা বেশ কঠিন। (ঘ) বস্তুতপক্ষে বাজারে একচেটিয়া কারবারীর প্রভাব, বিজ্ঞাপন, প্রচার এবং অন্যান্য কারণে ভোগীরা সবসময় একটি দ্রব্যের পরিবর্তে আরেকটি দ্রব্য কেনার স্বাধীনতা পুরোমাত্রায় ভোগ করতে পারে না।

৮. **বিধিটির সার্থকতা:** কিন্তু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, এই বিধিটি ভোগীদের আচরণ মোটামুটি সন্তোষজনকভাবেই ব্যাখ্যা করে। সংসার-খরচের বাজেট হিসাব করতে গিয়ে মাছ বেশি কেনা হবে, কি তরকারি বেশি কেনা হবে, রেডিও না টেলিভিশন, সাইকেল না স্কুটার কোন্‌টা কেনা হবে, তা স্থির করতেই হয়। আর সর্বাধিক উপযোগ বা তৃপ্তি লাভের উদ্দেশ্যটাকে সামনে রেখেই সে কাজটি করা হয়।

২.৭. ভোগীর উদ্বৃত্ত (উপযোগ) বা ভোগোদ্বৃত্ত

Consumer's Surplus (Utility)

১. ভোগোদ্বৃত্তের ধারণাটি অর্থনীতিতে প্রথম প্রবর্তন করেন মার্শাল। ক্রেতা ও ভোগী হিসেবে আমাদের কাছে এ ধারণাটি সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়। প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের সাধারণ কেনাকাটায় আমরা অনেক সময়ই কিছু না কিছু ভোগোদ্বৃত্ত পাই। কোন একটা জিনিসের জন্য আমরা যে দাম দিই তার থেকেও বেশি দাম দিতে আমরা হয়ত প্রস্তুত ছিলাম। যা দিতে প্রস্তুত ছিলাম আর যা দিলাম এ দুয়ের পার্থক্যই হল ভোগোদ্বৃত্ত। বাস্তব জীবনে বহু জিনিসের ক্ষেত্রেই তো আমরা ভোগোদ্বৃত্ত পাচ্ছি। যে জিনিসগুলি আমাদের খুবই দরকারী অথচ দামে সস্তা (অন্তত আমরা সে রকম মনে করছি) সে সব জিনিস কিনে আমরা ভোগোদ্বৃত্ত পাই। যেমন, সংবাদপত্র, পোস্টকার্ড, লবণ, দেশলাই ইত্যাদি। এ দ্রব্যগুলি পেতে আমরা অনেক বেশি দাম দিতেও প্রস্তুত, কারণ, এগুলি থেকে যে উপযোগ (তৃপ্তি) আমরা পাব বলে আশা করি সে উপযোগ (তৃপ্তি) থেকে আমরা নিজেদের বঞ্চিত করার চাইতে বরং একটু বেশি দাম দিয়েও সেগুলিকে আমরা সংগ্রহ করতে চাইব। কিন্তু বাস্তবে যে দাম দিলাম সেটা আমাদের মনে মনে হিসাব করা দামের থেকে কম। এই যে অতিরিক্ত উপযোগ বা তৃপ্তি সেটাই হল ভোগোদ্বৃত্ত।

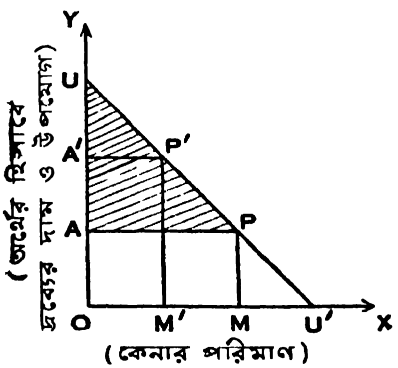
ভোগোদ্বৃত্তের ধারণাটির উৎপত্তি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি থেকে। পরপৃষ্ঠায় ভোগীর দিক থেকে উপযোগের একটি কল্পিত তালিকা দেওয়া হল:

সারণি ২.২

আপেলের একক	প্রান্তিক উপযোগ	দাম	মোট উপযোগ	ক্রেতার মোট ব্যয়	ভোগোদ্বৃত্ত
০	০	৪ প.	০	০	০
১	১০	,,	১০	৪ প.	৬
২	৮	,,	১৮	৮ প.	১০
৩	৬	,,	২৪	১২ প.	১২
৪	৪	,,	২৮	১৬ প.	১২
৫	২	,,	৩০	২০ প.	১০
৬	০	,,	৩০	২৪ প.	৬

বাজারে প্রতিটি আপেলের দাম ৪ পয়সা হলে ভোগী ৪টি আপেল কিনবে। কেননা, এ তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে ৪র্থ আপেলটির উপযোগ ৪ পয়সার সমান। ক্রেতা সেই ক'টি আপেলই কিনবে যে ক'টি আপেলের প্রান্তিক উপযোগ এবং বাজার দাম পরস্পরের সমান হয়। এ ক্ষেত্রে ৪টি আপেলের জন্য সে মোট দাম দিচ্ছে ৪ × ৪ = ১৬ পয়সা। আর ঐ ৪টি আপেল থেকে ২৮ পয়সার সমান মোট উপযোগ পাচ্ছে (অর্থাৎ, সে ৪টি আপেলের জন্য ২৮ পয়সা ব্যয় করতে রাজী ছিল)। সুতরাং ভোগী এক্ষেত্রে (২৮ – ১৬) = ১২ পয়সার সমান ভোগোদ্বৃত্ত পাচ্ছে। [ভোগী যে দাম দিতে রাজী থাকে -- সে যে দাম দিচ্ছে = ভোগোদ্বৃত্ত।] বাজারে প্রতিটি আপেলের দাম যদি ৬ পয়সা হয়, ভোগী তখন ৩টি আপেল কিনবে। ঐ ৩টি আপেলের জন্য সে মোট দাম দেবে ৩ × ৬ = ১৮ পয়সা। ৩টি আপেল থেকে সে মোট উপযোগ পাবে ২৪ পয়সার সমান। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ভোগোদ্বৃত্ত হবে ৬ (= ২৪ – ১৮) পয়সার সমান।

২. চিত্রের সাহায্যেও বিষয়টি এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়: নীচে ২.৩ চিত্রে OX অক্ষরেখায় কেনার পরিমাণ এবং OY অক্ষরেখায় অর্থের হিসাবে দ্রব্যের দাম ও উপযোগ নির্দেশ করা হয়েছে। বাজারে দাম যদি PM (অর্থাৎ AO) হয় তাহলে ক্রেতার ক্রয়ের পরিমাণ হবে OM। কারণ, OM পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়ে দাম ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়, এখানে দাম PM = প্রান্তিক উপযোগ AO। চিত্র থেকে আরো একটা জিনিস স্পষ্ট হচ্ছে: সেটা হল M-তম এককের পূর্বেকার এককগুলির প্রান্তিক উপযোগ PM অপেক্ষা বেশি। চিত্রে দেখা যাবে ভোগী যদি PM দামে



চিত্র ২.৩

OM পরিমাণ দ্রব্য কেনে, তবে তার মোট ভোগোদ্বৃত্ত হবে UAP। দাম বেড়ে যদি

P'M' হয়, তবে ক্রয়ের পরিমাণ হবে OM'। এক্ষেত্রে ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়ে হবে UA'P'।

ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাপ নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে করা যায়:

ভোগোদ্বৃত্ত = মোট উপযোগ – দাম × কেনা এককের সংখ্যা।

= মোট উপযোগ – মোট ব্যয়।

৩. ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপের অসুবিধা: (ক) ভোগীর পক্ষে তার নিজের সম্পূর্ণ চাহিদা সূচী জানা সম্ভব নয়। ফলে কোন দ্রব্যের প্রতিটি এককের জন্য ভোগী কত দাম দিতে প্রস্তুত তার পক্ষে সেটা নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব হয় না। এই-জন্য ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ সঠিকভাবে হিসাব করা যায় না।

(খ) জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য এবং অভ্যাসগত প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি থেকে পাওয়া ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপ করা অসম্ভব। যেমন, এক গ্লাস জল থেকে কতটা ভোগোদ্বৃত্ত পাওয়া যায় তার হিসাব কে করবে এবং কিভাবে করবে?

(গ) ভোগীদের আর্থিক অবস্থার পার্থক্যের ফলে ভোগোদ্বৃত্ত সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। ধনী ব্যক্তি কোন দ্রব্যের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকতে পারে, কিন্তু গরিব মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় ভোগোদ্বৃত্ত সঠিকভাবে পরিমাপ করা শক্ত।

(ঘ) প্রত্যেক ভোগীর রুচি ও পছন্দ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। কোন একটি দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা কারো বেশি, কারো বা কম। ফলে, দ্রব্যটির জন্য কেউ বা বেশি দাম দিতে প্রস্তুত, আবার কেউ বেশি দামে কিনতে প্রস্তুত নয়। ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপের ব্যাপারে এটা সমস্যা সৃষ্টি করে।

(ঙ) ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপে ভোগীর অর্থের প্রান্তিক উপযোগে কোন পরিবর্তন হয় না বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তব জীবনে এমনটি হয় না, কারণ, ভোগী যখন কোন একটি দ্রব্য কেনার পরিমাণ বাড়িয়ে চলে তখন তার অর্থের পরিমাণও কমতে থাকে। তাতে স্বাভাবিকভাবেই তার নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগ বাড়তে থাকে।

৪. ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বের গুরুত্ব: (ক) এ তত্ত্বের সাহায্যে দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য (value in use) এবং বিনিময় মূল্যের (value in exchange) মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। কোন দ্রব্যের বিনিময় মূল্য কম হলেও তার ব্যবহারিক মূল্য যত বেশি হবে তা থেকে ভোগোদ্বৃত্তও তত বেশি পাওয়া যাবে। লবণ বা দেশলাই বাক্সের বিনিময় মূল্য (অর্থাৎ, দাম) খুবই কম, কিন্তু এ সব দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য (অর্থাৎ, মোট উপযোগ) এত বেশি যে এগুলি থেকে ভোগোদ্বৃত্তও খুব বেশি পরিমাণেই পাওয়া যায়।

(খ) এ তত্ত্বের সাহায্যে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হয়। আবার একই দেশের অবস্থা বিভিন্ন সময়ে কেমন ছিল তাও এ তত্ত্বের সাহায্যে বোঝা যায়।

(গ) একচেটিয়া কারবারী তার উৎপাদিত দ্রব্যের দাম স্থির করার ব্যাপারে এ তত্ত্বের সাহায্য নিতে পারে। একচেটিয়া কারবারী যদি দেখে যে তার উৎপাদিত দ্রব্য থেকে ভোগীরা বেশি ভোগোদ্বৃত্ত পাচ্ছে, তখন সে ঐ দ্রব্যের দাম বাড়াবার কথা ভাবতে পারে। এবং কি পরিমাণে বাড়াবে তা স্থির করতে পারে।

(ঘ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে পাওয়া অতিরিক্ত তৃপ্তি বা সুবিধা পরিমাপের কাজেও এ তত্ত্ব সাহায্য করে।

(ঙ) বিভিন্ন দ্রব্যের ওপর কি পরিমাণ কর আরোপ করা যাবে সেটা নির্ধারণ করতে সরকার এ তত্ত্বের সাহায্য নিতে পারে। যে দ্রব্য থেকে ভোগী বেশি ভোগোদ্বৃত্ত পাচ্ছে তার ওপর কর বসালে বা বর্তমানে যা আছে তার থেকে কর আরো একটু বেশি করলে করদাতার ওপর তার কি প্রতিক্রিয়া হবে সেটা বিচার করতে এ তত্ত্ব কাজে লাগে।

ভোগীর চাহিদা
CONSUMER DEMAND

২.৮. চাহিদার তত্ত্ব বা বিধি
Demand Theory or Law of Demand

১. **চাহিদা** (demand): যে সব দ্রব্যসামগ্রীর উপযোগ আছে অভাব তৃপ্তির জন্য ভোগী পরিবারের কাছে তার প্রয়োজন হয়, চাহিদা জন্মায়। কিন্তু কোন দ্রব্যের প্রয়োজন বা আকাঙ্ক্ষা হলেই তা চাহিদা হয়ে ওঠে না। সে জিনিসটি কেনার জন্য দাম দেবার ক্ষমতা থাকা চাই এবং সে দামটা দিতে রাজী থাকা চাই। এ দু'টো শর্ত পূরণ হলে তবেই আকাঙ্ক্ষা চাহিদায় পরিণত হয়। একথাটা স্পষ্ট করার জন্য অর্থবিদ্যায় চাহিদাকে বলা হয় **কার্যকর চাহিদা** (effective demand) এবং তার প্রকাশ ঘটে বাজারে। দ্রব্য তখন পরিণত হয় পণ্যে।

চাহিদা ('কার্যকর চাহিদা') বলতে,—(ক) কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে (in *'a'* period of time), (খ) কোন একটি নির্দিষ্ট পণ্যের (or *'a'* commodity) (গ) কোনো একটি নির্দিষ্ট দামে (at *'a'* specific price) এবং (ঘ) কোন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে (for *'a'* specific quantity) চাহিদা বোঝায়। যেমন, চালের চাহিদা হল ৫০০ কুইন্টাল, একথাটির দ্বারা স্পষ্ট কিছু বোঝায় না। কিন্তু যদি বলা হয়, বাজারে আজ (নির্দিষ্ট সময়) ৩০০ টাকা কুইন্টাল দরে (নির্দিষ্ট দাম) চালের চাহিদা (নির্দিষ্ট দ্রব্য) ছিল ৫০০ কুইন্টাল (নির্দিষ্ট পরিমাণ), তবেই কথাটি পূর্ণ, স্পষ্ট এবং অর্থবহ হয়। চাহিদা হল কোন একটা বিশেষ সময়ে চাহিদার পরিমাণ এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা বদলায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যা বদলায় তাকে বলে 'প্রবাহ'। সুতরাং **চাহিদা** কোন অপরিবর্তনীয় পরিমাণ নয়, **চাহিদা হল একটি প্রবাহ** (a flow)। আজ চাহিদা যা রয়েছে কাল তা নাও থাকতে পারে, বেশি হতে পারে, কমও হতে পারে।

কোন নির্দিষ্ট সময়ে, কোন দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ, প্রধানত, ওই দ্রব্যটির নিজের দাম, ক্রেতাদের আয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দামের উপর নির্ভর করে। তাই চাহিদা তিন রকমের: **দাম-চাহিদা** (price-demand), **আয়-চাহিদা** (income-demand) ও **পারস্পরিক-চাহিদা** (cross-demand)। এদের মধ্যে দাম-চাহিদার প্রাধান্যই বেশি বলে, অর্থবিদ্যায় চাহিদা বলতে সাধারণত দাম-চাহিদাকেই বোঝায়।

সংজ্ঞা: সুতরাং, চাহিদা (অর্থাৎ কার্যকর চাহিদা) বলতে, কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন একজন ভোগী বা ভোগীর কোন একটি নির্দিষ্ট দ্রব্য বা সেবা, তার সম্ভাব্য বিভিন্ন দামে কি কি বিভিন্ন পরিমাণে কিনতে চায় তার তালিকা (schedule or list) বোঝায়। এটা ক্রেতা বা ক্রেতাদের দ্রব্যটি কেনার ইচ্ছা বা পরিকল্পনা (plan) প্রকাশ করে মাত্র, তার বেশি কিছু নয়।

২. **চাহিদার বিধি** (law of demand): চাহিদার একটি মূল বৈশিষ্ট্য হল, পণ্যের দাম যত কমে সংশ্লিষ্ট পণ্যের চাহিদার পরিমাণ ততই বাড়ে এবং দাম যত বাড়ে সংশ্লিষ্ট পণ্যের চাহিদার পরিমাণ ততই কমে। সংক্ষেপে, যে কোন পণ্যের দাম ও তার চাহিদার পরিমাণের মধ্যে একটি ক্রিয়াগত সম্পর্ক (functional relation) রয়েছে এবং সে সম্পর্কটি হল বিপরীত সম্পর্ক [D = f(P)]। অর্থনীতিবিদরা এই বিপরীত সম্পর্কের নাম দিয়েছেন **চাহিদার বিধি**। স্যামুয়েলসন এর নাম দিয়েছেন ক্রমহ্রাসমান ভোগের বিধি (law of diminishing consumption)। সাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে এ বিধিটির তাৎপর্য বোঝা যায়। কোন একটি জিনিস পাবার পথে দামটা হল একটা বাধা বিশেষ। বাধাটা যত বেশি হয়, আমরা ততটা কম কিনি, বাধাটা যত কম হয়, আমরা ততটা বেশি কিনি। চড়া দামে ক্রেতারা কিনতে নিরুৎসাহিত এবং কম দামে তারা কিনতে উৎসাহিত হয়।

৩. **চাহিদার বিধির ভিত্তি:** ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের নিয়মটি হল চাহিদার নিয়মের ভিত্তি। কোন দ্রব্য বা সেবাকর্ম ভোগের পরিমাণ যতই বাড়ে ভোগীর কাছে তার প্রান্তিক উপযোগ ততই কমে। যদি ধরে নেওয়া যায়, ভোগী দ্রব্যটির জন্য যে দাম দিতে চাইছে সেটা তার কাছে দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগের সমান, তাহলে বলা যায় যে, ক্রেতা হিসাবে সে দ্রব্যটি যত বেশি কিনবে ততই সে দ্রব্যটির পরবর্তী এককের দাম কম দিতে চাইবে।

ধরা যাক, অনেকক্ষণ চা খাওয়া হয়নি, তোমার চা খেতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। তখন ১ কাপ চায়ের জন্য ৪০ পয়সা পর্যন্ত দাম দিতে তুমি হয়তো রাজী। তা যদি হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে, তোমার কাছে চায়ের প্রান্তিক উপযোগ ৪০ পয়সার সমান। দোকানে ১ কাপ চায়ের দাম যদি ৪০ পয়সাই হয়, তাহলে তুমি ১ কাপ চা-ই খাবে। ১ম কাপ চা খাবার পর তোমার কাছে চায়ের প্রান্তিক উপযোগ কমে হয়তো ২০ পয়সার সমান হয়ে পড়েছে। তুমি ২য় কাপ চা তখন আর খাবার চিন্তাও

করবে না। কারণ তখন ২য় কাপ চায়ের দাম (৪০ পয়সা) তার প্রান্তিক উপযোগের (২০ পয়সার) চেয়ে বেশি হয়ে পড়েছে। কিন্তু চায়ের কাপ যদি ২০ পয়সা করে হয়, তবেই তুমি আর এক কাপ চা (২য় কাপ) খেতে রাজী হতে পার। কারণ, ২য় কাপ চায়ের দাম তখন তোমার কাছে ২য় কাপ চায়ের উপযোগের (অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগের) সমান হয়ে পড়েছে।

সারণি ২·৩

চায়ের কাপ	প্রাঃ উপযোগ	ভোগী যে দাম দিতে রাজী	দোকানে চায়ের দাম	চায়ের চাহিদা
১ম	৪০ পঃ	৪০ পঃ	৪০ পঃ	১ কাপ
২য়	২০ পঃ	২০ পঃ	২০ পঃ	২ "

এটা মনে রাখতে হবে তোমার কাছে চায়ের যা প্রান্তিক উপযোগ তার উপর দোকানের প্রতি কাপ চায়ের দাম নির্ভর করবে না। সেখানে দামটা হয় ৪০ পয়সা কাপ কিংবা ২০ পয়সা কাপ হবে। কিন্তু দাম ৪০ পয়সা হলে তোমার কাছে চায়ের চাহিদা হবে ১ কাপ, দাম ২০ পয়সা হলে তোমার কাছে চায়ের চাহিদা হবে ২ কাপ। দাম কম হলে চাহিদার পরিমাণ বেশি, দাম বেশি হলে চাহিদার পরিমাণ কম হবে। এবং সেটা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের ভিত্তিতেই ঘটে। (চাহিদার বিধিটির আরও দুটি কারণ আছে। তা পরে আলোচনা করা হবে।)

৪. **চাহিদার বিধির ব্যাখ্যা :** (ক) নিচের ২·৪ সারণির সাহায্যে চাহিদার বিধিটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

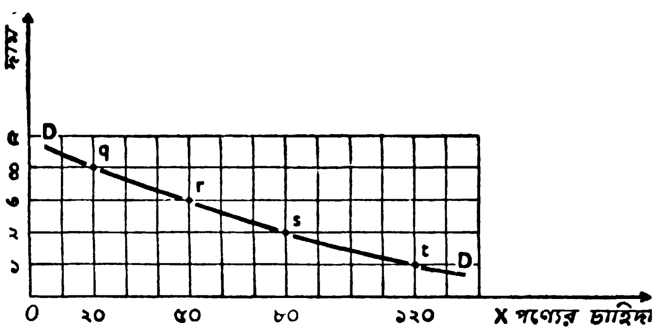
সারণি ২·৪

দাম	প্রথম ক্রেতার চাহিদা	দ্বিতীয় ক্রেতার চাহিদা	তৃতীয় ক্রেতার চাহিদা	মোট চাহিদা (বাজার চাহিদা তালিকা)
	ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকা			
৪ টা.	১৫ কেজি +	৫ কেজি +	—	= ২০ কেজি
৩ "	২০ " +	১৫ " +	১৫ কেজি	= ৫০ "
২ "	৩৫ " +	২০ " +	২৫ "	= ৮০ "
১ "	৫০ " +	৪০ " +	৩০ "	= ১২০ "

২·৪ সারণিতে কোন একটি দ্রব্যের বিভিন্ন দাম এবং ওই দামে তিনজন কাল্পনিক ক্রেতার বিভিন্ন পরিমাণে জিনিসটি কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে। এই তিনটি হল তিনজন কাল্পনিক ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকা (individual demand schedule)। যদি ধরা যায় জিনিসটির ক্রেতা কেবল এই তিনজনই, তাহলে বুঝতে

হবে বাজারে এই তিনজন খরিদ্দারই রয়েছে। তখন বিভিন্ন দামে এই তিনজনের মোট ব্যক্তিগত চাহিদার যোগফলটাই হবে বাজারের মোট চাহিদা বা বাজার চাহিদা তালিকা। তিনজন খরিদ্দারের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকা, এবং (তার যোগফল) বাজার চাহিদা তালিকা, এ দু'টো থেকেই দেখা যাচ্ছে, দাম যত বাড়ছে, চাহিদার পরিমাণ তত কমছে, এবং দাম যত কমছে, চাহিদার পরিমাণও তত বাড়ছে।

(খ) **চিত্রের সাহায্যে চাহিদার বিধির ব্যাখ্যা:** ২·৪ সারণির বাজার চাহিদা তালিকাটি নিচে ২·৪ চিত্রের সাহায্যে উপস্থিত করা হল।



চিত্র ২·৪

ভূমিতল-সমান্তরাল অক্ষরেখায় *x* পণ্যের চাহিদার পরিমাণ ও লম্ব অক্ষরেখায় *x* পণ্যটির দাম দেখান হচ্ছে। ৪ টাকা দামে মোট চাহিদা ২০ কেজি *q* বিন্দু দিয়ে, ৩ টাকা দামে মোট চাহিদা ৫০ কেজি *r* বিন্দু দিয়ে, ২ টাকা দামে মোট চাহিদা ৮০ কেজি *s* বিন্দু দিয়ে এবং ১ টাকা দামে মোট চাহিদা ১২০ কেজি *t* বিন্দু দিয়ে দেখান হয়েছে। এই বিন্দুগুলির মধ্য দিয়ে একটি রেখা টেনে দিলে DD রেখাটি পাওয়া গেল। এটি হল চাহিদা-রেখা বা চাহিদা-তালিকা। লক্ষণীয়, রেখাটি বাম দিকে উপর থেকে ডান দিকে এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ নিচে নামছে। সুতরাং ঢাল (slope) হল ঋণাত্মক (−)। এর অর্থ হল, চড়াদামে চাহিদা কম হয় (q বিন্দু), এবং দাম যত কমে ততই চাহিদার পরিমাণ বাড়ে (*r*, *s* ও *t* বিন্দু)। চাহিদার বিধির যে মূল বক্তব্য, অর্থাৎ দাম ও চাহিদার পরিমাণের বিপরীত সম্পর্কটি চাহিদা রেখা DD-র সাহায্যে প্রকাশ পেয়েছে।

৫. **চাহিদা রেখার আকৃতি** একটি সরলরেখা হতে পারে, কিংবা ২·৪ চিত্রের মত বক্ররেখা হতে পারে। কিন্তু সরল বা বক্র, যেমনই হোক চাহিদা রেখা সর্বদা বাম দিকে উপর থেকে ডান দিকে ক্রমশ নিচে নামবে এবং তা দুটি অক্ষরেখার সংযোগ স্থলের দিকে অবতল (concave) হবে। অর্থাৎ, ঢালটি সর্বদা ঋণাত্মক হবে। চাহিদা রেখা সাধারণত বাম দিকে নিচে থেকে ডান দিকে উপরে উঠবে

না অর্থাৎ তার ঢা'ল কখনও ধনাত্মক হবে না বা দুটি অক্ষরেখার সংযোগ স্থলের দিকে উত্তল (convex) হবে না। কারণ, সে রকম হলে তার অর্থ হবে দাম বাড়লে চাহিদা বাড়ে, দাম কমলে চাহিদা কমে।

৬. **চাহিদার বিধির অনুমিত শর্তাবলী :** (ক) ক্রেতাদের অভ্যাস, রুচি, পছন্দ, (খ) তাদের আয়, (গ) তাদের বিষয় সম্পত্তি, (ঘ) সংশ্লিষ্ট দ্রব্যসামগ্রীর দাম, (ঙ) দেশের মধ্যে আয় বণ্টনের প্রকৃতি প্রভৃতি যদি অপরিবর্তিত থাকে তবেই দ্রব্যটির দামের সাথে তার চাহিদার পরিমাণের বিপরীত সম্পর্কটি অর্থাৎ চাহিদার বিধিটি সত্য হয়ে উঠবে।

৭. চাহিদা রেখার ঋণাত্মক ঢালের কারণ কি? দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে ও দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে কেন?—(ক) **ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের নিয়মে** ঠিক যতটা কিনলে দাম ও প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সমান হয়, ক্রেতারা সর্বদা সেই পরিমাণে দ্রব্য কেনার চেষ্টা করে। দাম বেশি হলে অল্প পরিমাণে কিনলেই দাম ও প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সমান হয়। দাম কম হলে বেশি পরিমাণে কিনলে তবেই দাম ও প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সমান হয়। তাই বেশি দামে চাহিদার পরিমাণ কম ও কম দামে চাহিদার পরিমাণ বেশি হয়।

(খ) **আয় প্রভাব** (income effect) **:** কোন একটি পণ্যের দাম কমলে, তার ফলটা ভোগী পরিবার বা ক্রেতার আয় বৃদ্ধির মতই হয়। কারণ আগে সে যে পরিমাণে পণ্যটি কিনত দাম কমার পর সেই পরিমাণে কিনলে তার খরচটা কম হবে। এটা ক্রেতার আয় বেড়ে যাওয়ার মতই হল। খরচ কম হওয়াতে যে পয়সাটা বাঁচবে তা থেকে কিছুটা দিয়ে সে এখন পণ্যটি আরেকটু বেশি পরিমাণে কিনতে পারে। এজন্যই দাম কমলে বর্তমান ক্রেতারা বেশি পরিমাণে কেনে। দাম বাড়লে, সে দাম যতটা বাড়ে ক্রেতার আয় যেন ঠিক সেই পরিমাণেই কমে যায়। তখন পণ্যটির জন্য আগের পরিমাণে খরচ করলেও কেনার পরিমাণটা কমই হয়। এজন্য দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে। এটা হল আয় প্রভাব।

(গ) **পরিবর্ত প্রভাব** (substitution effect) **:** যে পণ্যটির দাম কমে, তার জন্য আগের মত একই পরিমাণ অর্থ খরচ করলে পণ্যটি আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে কেনা হয়। তাছাড়া অন্যান্য পণ্যের দামের তুলনায় তখন তা সস্তা হয় বলে ক্রেতারা অন্যান্য পণ্য কেনার পরিমাণ কমিয়ে দেয়। পরিবর্তে তারা ওই পণ্যটি বেশি করে কিনে ব্যবহার করে। ফলে সস্তা পণ্যটির চাহিদার পরিমাণ বাড়ে। চায়ের দাম কমলে অনেকেই কফি বা কোকোর পরিবর্তে চা বেশি করে ব্যবহারের চেষ্টা করে। আর, পণ্যটির দাম বাড়লে অন্যান্য পণ্যের দামের তুলনায় তার দাম চড়া হয় বলে ক্রেতারা ওই পণ্যটির কেনার পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে সস্তাদামের অন্যান্য পণ্য বেশি করে ব্যবহার করে। ফলে সে পণ্যটির চাহিদার পরিমাণ কমে যায়। এটা হল পরিবর্ত প্রভাব।

৮. **চাহিদার নিয়মের ব্যতিক্রম** (exceptions to the law of demand): ১. চার রকমের কারণে চাহিদার নিয়মের এই ব্যতিক্রম দেখা দিতে পারে:

(ক) **বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ ভোগের পণ্য:** মণিমুক্তা, দামী পোশাক প্রভৃতি অনেক পণ্য আছে যাদের দাম বেশি না হলে বেশি বিক্রয় হয় না। কারণ, এদের ক্রেতারা দামী জিনিস কিনেছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চায় ও অপরের কাছে তা জাহির করতে চায়। এসব জিনিস কম দামে বিক্রি হলে তারা তা কেনে না।

(খ) **পণ্যের গুণাগুণ যাচাইয়ে অক্ষমতা:** পণ্যের গুণাগুণ যাচাইয়ে অক্ষম ক্রেতারা দামকেই গুণাগুণের নির্দেশক বলে মেনে নিয়ে, দাম বেশি হলে পণ্যটি কেনে, না হলে কেনে না।

(গ) **মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা:** যে পণ্যের দাম বেড়েছে কিন্তু আরো বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে, ক্রেতারা যতটা পারে সে পণ্য কিনে রাখতে চেষ্টা করে। এতে দাম বাড়া সত্ত্বেও চাহিদা না কমে বরং বেড়ে যেতে পারে।

(ঘ) **নিকৃষ্ট দ্রব্য** (Giffen or inferior goods): ১৯ শতকের আয়ারল্যাণ্ডের জনসাধারণ এত গরিব ছিল যে তাদের সামান্য আয়ের প্রায় সবটাই তাদের প্রধান খাদ্য আলু কিনতে খরচ হয়ে যেত (গরিব বলে গম কেনা তাদের সাধ্যের বাইরে ছিল)। ফলে মাংস তারা যৎসামান্যই কিনতে পারত। আলুর দাম বেড়ে গেলে আলুর পরিমাণটা ঠিক রাখতে গিয়ে তারা বাধ্য হয়ে সামান্য পরিমাণ মাংস কেনা ছেড়ে তো দিলই, উপরন্তু মাংসের ঘাটতিটুকু পূরণ করার জন্য তারা আরেকটু বেশি করেই আলু কিনতে লাগল। কারণ আলুর দাম বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও তখনও সেটাই ছিল তাদের কাছে সবচেয়ে সস্তা খাদ্য। গিফেন এই ঘটনা সর্বপ্রথম সকলের দৃষ্টিতে আনেন। এ ঘটনা থেকে মূল সূত্র বা নিয়ম যেটা দাঁড়াল তা হল, অতি অল্প আয়ের স্তরে অবস্থিত যে ক্রেতারা নিকৃষ্ট ভোগ্যদ্রব্যের উপরই সাধারণত তাদের আয়ের অধিকাংশ খরচ করে, সে দ্রব্যটির দাম বেড়ে গেলেও, তারা অন্য যা কিছু উৎকৃষ্ট দ্রব্য যৎসামান্য পরিমাণে ব্যবহার করত, সে সবের ভোগ বন্ধ করে দিয়ে, উপায়বিহীন হয়ে, বেশি দামে ওই নিকৃষ্ট দ্রব্যটিই বেশি পরিমাণে কেনে। অর্থাৎ নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম বাড়লেও তার চাহিদা বাড়ে।

৯. **চাহিদার পরিবর্তন** (changes in demand): ক্রেতারা ১০ টাকা দামে কোন একটি পণ্য ১০০ একক কিনতে চায়; দাম ৯ টাকা হলে তারা কিনবে ২০০ একক, দাম ৮ টাকা হলে কিনবে ৩০০ একক। এটা হল **দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধির** ঘটনা (সারণি ২.৫)। এখানে ক্রমশ-কমতে-থাকা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দামে ক্রমশ বেশি পরিমাণে ক্রেতাদের কেনার ইচ্ছে, এটা হল চাহিদার একটি নির্দিষ্ট সামগ্রিক অবস্থা। এটা আবার একটা নির্দিষ্ট চাহিদা তালিকাও (সারণি ২.৫) বটে। এখানে একই চাহিদার অবস্থায় বা চাহিদা

সারণি ২·৫

দাম	চাহিদা
১০ টাকা	১০০
৯ "	২০০
৮ "	৩০০

তালিকায় (কিংবা চাহিদা রেখায়) অবস্থিত থেকে ক্রেতারা কম দামে বেশি পরিমাণ কিংবা বেশি দামে কম পরিমাণ পণ্য কিনতে চাইছে। এটাকে চাহিদার পরিবর্তন বলা যায় না। এটা হল দাম কমার ফলে **চাহিদার সম্প্রসারণ**। যে কথা বলতে চায় তা হল, দামের পরিবর্তনের সাথে চাহিদার পরিবর্তন ঘটে না, যেটা ঘটে তা হল চাহিদার সম্প্রসারণ বা সংকোচন

কিন্তু যদি দেখা যায় ক্রেতারা ১০ টাকা দামে ১০০ একক না কিনে ২০০ একক কিনতে চাইছে, কিংবা ৯ টাকা দামে ২০০ একক না কিনে ৩০০ একক কিনতে চাইছে, অথবা ৮ টাকা দামে ৩০০ একক না কিনে ৪০০ একক কিনতে চাইছে (সারণি ২·৬), তাহলে কি ক্রেতাদের চাহিদার অবস্থাটা আগের মতই আছে বলে মনে করা যায়? না। দাম না কমা সত্ত্বেও, দাম আগের মতই থাকা সত্ত্বেও, যদি দেখা যায় **ক্রেতারা একই দামে আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে** কিনতে চায়

সারণি ২·৬

দাম	চাহিদা
১০ টাকা	১০০
৯ "	৩০০
৮ "	৪০০

কিংবা দাম একই থাকা সত্ত্বেও, যদি দেখা যায় ক্রেতারা একই দামে **আগের চেয়ে কম পরিমাণে কিনতে চায়** (সারণি ২·৭), **তাহলে বুঝতে হবে** চাহিদার পুরনো অবস্থাটা আর নেই, নতুন অবস্থা দেখা দিয়েছে, অর্থাৎ, **চাহিদার** (অবস্থার) **পরিবর্তন ঘটেছে।** অর্থাৎ **চাহিদার পরিবর্তন বললে চাহিদার অবস্থার পরিবর্তন, চাহিদা তালিকার পরিবর্তন, চাহিদা রেখার পরিবর্তন বোঝায়।**

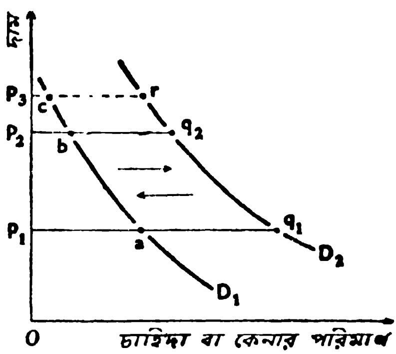
সারণি ২·৭

দাম	চাহিদা
১০ টাকা	৫০
৯ "	১০০
৮ "	২০০

দাম না কমলেও যদি ক্রেতারা আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে কিনতে চায় সেটা হল চাহিদার বৃদ্ধি ; দাম না বাড়লেও ক্রেতারা যদি আগের চেয়ে কম পরিমাণে কিনতে চায়, সেটা হল চাহিদার হ্রাস। এই দুই ক্ষেত্রেই চাহিদার (অবস্থার) পরিবর্তন ঘটেছে বলে বুঝতে হবে। ক্রেতাদের চাহিদা তালিকা বা চাহিদা রেখা বদলে গেছে বলে বুঝতে হবে।

চিত্র ২·৫-এ চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ ও চাহিদার বৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্যটা দেখান হল। OP_2 দামে ক্রেতারা P_2b পরিমাণ কিনবে, OP_1 দামে তারা P_1a পরিমাণ কিনবে। b এবং a বিন্দু দুটি একই চাহিদা রেখা D_1-এর উপর অবস্থিত। সুতরাং ক্রেতারা একই চাহিদা রেখার উপরে থেকে অর্থাৎ একই চাহিদা তালিকায় বা চাহিদার একই অবস্থায় থেকে বেশি দামে কম পরিমাণে ও কম দামে বেশি পরিমাণে কিনবে। কিন্তু তারা যদি OP_2 দামে P_2q_2 পরিমাণ কিনতে চায় কিংবা OP_1 দামে P_1q_1 পরিমাণ কিনতে চায় তাহলে বুঝতে

হবে তারা আগের চাহিদা রেখা D_1-এ আর নেই, তারা নতুন চাহিদা রেখা D_2-তে চলে গেছে : কারণ q_2 এবং q_1 বিন্দু দুটি চাহিদা রেখা D_2-র উপর অবস্থিত। চাহিদা রেখা D_2 এক ভিন্ন চাহিদা তালিকা, চাহিদার এক ভিন্ন অবস্থা বোঝাচ্ছে। P_2q_2 পরিমাণটা হল P_2b পরিমাণের চেয়ে বেশি এবং P_1q_1 পরিমাণটা হল P_1a পরিমাণের চেয়ে বেশি। তাহলে একই দামে (OP_2 কিংবা OP_1) ক্রেতারা বেশি পরিমাণে কিনতে চাইলে (চাহিদার বৃদ্ধি) তাদের চাহিদা রেখা বাম দিক থেকে ডান দিকে সরে যায় (→তীর চিহ্ন দিয়ে এটা দেখান হয়েছে)। তেমনি যদি একই দামে তারা আগের চেয়ে কম পরিমাণে কিনতে চায় (OP_2 দামে P_2q_2 পরিমাণ না কিনে P_2b পরিমাণ কিংবা OP_1 দামে P_1q_1 পরিমাণে না কিনে P_1a পরিমাণ) (চাহিদার হ্রাস) তাহলে চাহিদা রেখাটা ডান দিক থেকে বাম দিকে সরে যায় (←তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে)।



চিত্র ২·৫ : চাহিদার পরিবর্তন

চাহিদার পরিবর্তনের আরেকটা অর্থ হল, (চাহিদার অবস্থাটা বদলে যায় বলে) যে পরিমাণ পণ্য কেনার জন্য (P_1a) ক্রেতারা আগে কম দাম দিতে রাজী ছিল (OP_1) এখন তারা সেই পরিমাণ [$P_1a = P_3r$] কেনার জন্য বেশি দাম (OP_3) দিতে রাজী হয় ; কিংবা যে পরিমাণ (P_3r) কেনার জন্য আগে ক্রেতারা বেশি দাম (OP_3) দিতে রাজী ছিল, এখন তারা সেই একই পরিমাণ [$P_3r(=P_1a)$] কেনার জন্য কম দাম (OP_1) দিতে চায়।

১০. **চাহিদার পরিবর্তনের কারণ** : চাহিদার পিছনে ভোগী পরিবারগুলির রুচি, আয়, পরিবর্ত পণ্য ও সম্পূরক পণ্যগুলির দাম ইত্যাদি পরিবর্তনীয় বিষয়গুলি রয়েছে। এদের পরিবর্তনে চাহিদার বৃদ্ধি অথবা হ্রাস ঘটে এবং চাহিদার রেখাও ডান দিকে অথবা বাম দিকে কিংবা বাম দিক থেকে ডান দিকে স্থান পরিবর্তন করে।

(ক) **চাহিদার বৃদ্ধি**—পণ্যটির জন্য ক্রেতাদের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গেলে (রুচির পরিবর্তন), ক্রেতাদের আয় বেড়ে গেলে, পরিবর্ত (বা বিকল্প) পণ্যের দাম বেড়ে গেলে, সম্পূরক পণ্যের দাম কমে গেলে, লোকসংখ্যা বেড়ে গেলে—একই দামে আগের তুলনায় আরো বেশি পরিমাণে পণ্যটি ক্রেতারা কিনবে। চাহিদা রেখা ডান দিকে সরে যাবে।

(খ) **চাহিদার হ্রাস**—পণ্যটির জন্য ক্রেতাদের আকাঙ্ক্ষা কমে গেলে (রুচির পরিবর্তন), ক্রেতাদের আয় কমে গেলে, পরিবর্ত পণ্যের দাম কমে গেলে, সম্পূরক

ণ্যের দাম বেড়ে গেলে, লোকসংখ্যা কমে গেলে—একই দামে আগের তুলনায় ক্রেতারা কম পরিমাণে কিনবে। চাহিদা রেখা বাম দিকে সরে যাবে।

১১. **চাহিদার নির্ধারক ও চাহিদার পরিবর্তনের কারণঃ** কোন ণ্যের চাহিদা ছয়টি প্রধান বিষয়ের উপর নির্ভর করে:

(ক) **পণ্যটির দামঃ** দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন বিপরীত াকে ঘটে।

(খ) **ভোগী বা ক্রেতার আয়ঃ** ক্রেতার আয় চাহিদার সর্বোচ্চ মাত্রা ষ্ট্র করে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, আয় বাড়লে পণ্যের জন্য ক্রেতার াহিদা সম্প্রসারিত হয় এবং আয় কমলে তা সঙ্কুচিত হয়। [সুতরাং পণ্যের ায়-চাহিদা রেখার ঢাল ধনাত্মক হয়] শুধু বর্তমান আয় নয় অতীত আয় (সঞ্চয়) এবং ভবিষ্যৎ আয় (কিস্তিবন্দী শর্তে কেনাকাটা)-ও চাহিদাকে প্রভাবিত করে।]

(গ) **সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যের দামঃ** চিনির দাম বাড়লে গুড়ের চাহিদা াড়বে। তেলের দাম বাড়লে মোটর গাড়ির চাহিদা কমবে।

(ঘ) **ভোগীর পছন্দঃ** অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, ভোগীর ছন্দ অপছন্দ, চাহিদা প্রধান নির্ধারকে পরিণত হয়। পছন্দের পরিবর্তনের ফলে াহিদা রেখারও পরিবর্তন ঘটে।

(ঙ) **দামের ভবিষ্যৎ গতি সম্পর্কে আন্দাজঃ** ভবিষ্যতে দাম বাড়বে অনুমান রলে, বর্তমান দামে বর্তমান চাহিদা সম্প্রসারিত হবে; দাম কমবে অনুমান রলে, বর্তমান চাহিদা সংকুচিত হবে।

(চ) **ক্রেতার সংখ্যাঃ** ক্রেতা বা ভোগী সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি পণ্যের াহিদার সংকোচন বা প্রসারণ ঘটায়। সুতরাং দেশে লোকসংখ্যা বাড়লে পণ্যের াহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং লোকসংখ্যা কমলে চাহিদার পরিমাণ কমে।

৯. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

Elasticity of Demand

১. **চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণা** (the concept of elasticity f demand) **ঃ** চাহিদার বিধি থেকে আমরা দেখি, দাম কমলে বা বাড়লে ভোগীরা ণ্যটি বেশি বা কম পরিমাণে কিনে তাতে সাড়া দেয়। অর্থাৎ, দামের সাথে চাহিদার িরিমাণের পরিবর্তনের সম্পর্কটা বিপরীত এবং সে কারণে, তা হল গুণগত সম্পর্ক। কিন্তু দামের পরিবর্তনে ক্রেতারা যে সাড়া দেয় তার মাত্রাটা বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের হয়। আবার একই পণ্যের বিভিন্ন দামের স্তরেও দামের পরিবর্তনে ভাগীদের সাড়াটা অর্থাৎ পণ্যটির কেনার পরিমাণের পরিবর্তনটা বিভিন্ন রকমের য়। এটা হল দামের পরিবর্তনের সাথে চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণগত সম্পর্ক। তমনি আবার ভোগীদের আয়ের পরিবর্তনের ফলেও পণ্যের চাহিদার পরিবর্তন টে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যের দামের পরিবর্তনের ফলেও কোন একটি নির্দিষ্ট পণ্যের চাহিদায় পরিবর্তন ঘটে (তার নিজের দামটির পরিবর্তন না ঘটলেও)।

এ দু'টি হল ভোগীদের আয়ের কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যের দামের পরিবর্তনের সাথে কোন একটি নির্দিষ্ট পণ্যের চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণগত সম্পর্ক।

কোন একটি পণ্যের দামের বা ভোগীদের আয়ের কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যের দামের নির্দিষ্ট পরিবর্তনের ফলে কোন একটি পণ্যের ভোগীরা কতটা সাড়া দিচ্ছে, অর্থাৎ ওই পণ্যটির চাহিদায় কতটা পরিবর্তন ঘটছে, তা ওই দুটি বিষয়ের পরিবর্তনের অনুপাতের তুলনার দ্বারা পরিমাপ করা যায়, বোঝা যায় ও প্রকাশ করা যায়। একে বলে স্থিতিস্থাপকতা বা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা। অর্থাৎ **চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হল, পণ্যের চাহিদার পরিবর্তনের ও পণ্যটির দামের কিংবা ভোগীদের আয়ের অথবা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যের দামের পরিবর্তনের তুলনামূলক অনুপাত।**

সুতরাং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হল তিন রকমের: (ক) চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা ; (খ) চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতা ; (গ) চাহিদার পারস্পরিক-স্থিতিস্থাপকতা।

১. ক. চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা (price elasticity of demand): কোন পণ্যের দামের পরিবর্তনের দরুন তার ক্রেতারা কি রকম সাড়া দেয়, অর্থনীতিবিদ্‌রা ও কারবারীরা তার পরিমাপ করেন চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটির সাহায্যে। কতকগুলি পণ্যের চাহিদা এমন যে তাদের দামের পরিবর্তনে ক্রেতারা আপেক্ষিকভাবে বেশি সাড়া দেয়। এদের দামের পরিবর্তনের দরুন ভোগীদের চাহিদা ও কেনার পরিমাণ যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়। এরকম পণ্যের চাহিদাকে বলে স্থিতিস্থাপক চাহিদা। আবার, এমন কতকগুলি পণ্য আছে যাদের দামের পরিবর্তনে ক্রেতারা তেমন একটা সাড়া দেয় না, দামের পরিবর্তনে কেনার পরিমাণ সামান্যই বদলায়। এরকম পণ্যের চাহিদাকে বলে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা।

যে কোনো পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার বা অস্থিতিস্থাপকতার মাত্রাটি পরিমাপ করা হয় চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার সহগ-র (price-elasticity co-efficient) বা E_p-র দ্বারা ; এর সূত্রটি হল: চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার

$$\text{সহগ বা } E_p = \frac{\text{চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন}}$$

চাহিদার পরিবর্তনকে আগের চাহিদার পরিমাণ দিয়ে ভাগ করে এবং দামের পরিবর্তনকে আগের দাম দিয়ে ভাগ করে চাহিদা ও দামের শতকরা পরিবর্তনটা হিসাব করতে হয়।

তখন সূত্রটি দাঁড়ায় —

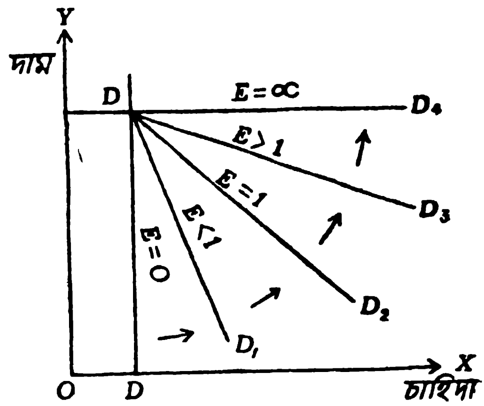
$$E_p = \frac{\text{চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন}}{\text{আগের চাহিদা}} \div \frac{\text{দামের পরিবর্তন}}{\text{আগের দাম}}।$$

[কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, পরিবর্তনের পরিমাণটা ব্যবহার না করে পরিবর্তনের শতকরা ভাগ বা শতাংশ ব্যবহারের প্রয়োজনটা কি? এর উত্তর হল, পরিবর্তনের

পরিমাণ যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে ফলাফল বা সহগটি বিভ্রান্তিকর হবে এবং সঠিক হবে না। দৃষ্টান্ত, দাম ৪ টাকা থেকে কমে ৩ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ যদি ৪০০ কেজি থেকে বেড়ে ৪৫০ কেজি হয়, তাহলে মনে হতে পারে, দাম মাত্র ১ টাকা কমে যাওয়ায় চাহিদার পরিমাণ যখন ৫০ কেজি বেড়েছে, তখন ভোগীরা দামের পরিবর্তনে যথেষ্ট সাড়া দিয়েছে এবং সেহেতু চাহিদা নিশ্চয়ই স্থিতিস্থাপক। কিন্তু যদি ১ টাকার বদলে ১০০ পয়সা ধরা যায়, তখন দেখা যায় দাম ১০০ পয়সা কমে যাওয়ায় চাহিদা ৫০ কেজি বেড়েছে। তখন মনে হয় ক্রেতারা দামের পরিবর্তনে বিশেষ সাড়া দেয়নি। অর্থাৎ চাহিদাটা তাহলে অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু পরিবর্তনের শতকরা ভাগ বা শতাংশের ভিত্তিতে হিসাবটা করলে এই সমস্যার সঠিক সমাধান করা যায়। তখন দেখা যায়, দামের পরিবর্তনটা হয়েছে ২৫ শতাংশ (১ টাকা/৪ টাকা বা ১০০ প./৪০০ প.) এবং চাহিদার পরিবর্তনটা ঘটেছে ১২·৫ শতাংশ (৫০/৪০০ কেজি) ।]

১. খ. চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার প্রকার ভেদ : এখন সূত্রটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এই ভাবে : (ক) দামের পরিবর্তনের শতাংশের তুলনায় চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনের শতাংশটি বেশি হলে চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা হল স্থিতিস্থাপক। দৃষ্টান্ত, দাম ৫ শতাংশ কমলে চাহিদার পরিমাণ যদি ৬ শতাংশ বাড়ে, তবে চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা হল স্থিতিস্থাপক। যে সব ক্ষেত্রে চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার সহগটি (অর্থাৎ চাহিদার পরিবর্তনের শতাংশকে দামের পরিবর্তনের শতাংশ দিয়ে ভাগ করে যে ভাগফলটি পাওয়া যায়) ১-এর বেশি হবে সে সব ক্ষেত্রেই চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতাকে স্থিতিস্থাপক বলে গণ্য করতে হবে ($E_p > 1$)। (খ) দামের পরিবর্তনের শতাংশের তুলনায় চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনের শতাংশটি কম হলে, চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা হবে অস্থিতিস্থাপক। দৃষ্টান্ত, দাম ৪ শতাংশ কমলে চাহিদার পরিমাণ যদি ৩ শতাংশ বাড়ে, তবে চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা হবে অস্থিতিস্থাপক। যে সব ক্ষেত্রে চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার সহগটি ১-এর কম, সে সব ক্ষেত্রেই চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা হল অস্থিতিস্থাপক ($E_p < 1$)। (গ) চাহিদার এই দু'রকমের দাম-স্থিতিস্থাপকতার মাঝখানে চাহিদার আরেক রকম দাম-স্থিতিস্থাপকতা আছে, যে ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের শতাংশ ও চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনের শতাংশ একই রকম বা পরস্পরের সমান। এক্ষেত্রে চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার সহগটি ১ বা একক হয়ে থাকে ($E_p = 1$)। চাহিদার এই বিশেষ স্থিতিস্থাপকতাকে বলে **একক স্থিতিস্থাপকতা বা সমানুপাতিক স্থিতিস্থাপকতা** ($E_p = 1$)। (ঘ) চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার একটি চরম ক্ষেত্র আছে যেখানে দামের সামান্যতম পরিবর্তনের দরুন ক্রেতারা তাদের কেনার পরিমাণ '0' (শূন্য) থেকে বাড়িয়ে যতটা পায় তার সবটাই কিনে ফেলে। চাহিদার এরকম দাম-স্থিতিস্থাপকতাকে বলে নিখুঁত দাম-স্থিতিস্থাপকতা (perfect price-elast city of demand) বা অসীম দাম-স্থিতিস্থাপকতা (infinite price-elast.city .of demand [$E_p = \infty$])। এরকম ক্ষেত্রে পণ্যের চাহিদা রেখাটি

ভূমিতল অক্ষরেখার সমান্তরাল ও সরলরেখায় পরিণত হয়। দৃষ্টান্ত, নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদক সংস্থার পণ্যের চাহিদা রেখা এরকম আকৃতি গ্রহণ করে। (ঙ) চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার আরেকটি চরম ক্ষেত্র আছে যেখানে দামের কোন পরিবর্তনই চাহিদার পরিমাণে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটাতে পারে না এর দৃষ্টান্ত হল, বহুমূত্র রোগীর কাছে ইনসুলিন ওষুধটির চাহিদা। প্রতিদিনই তাকে এর ইনজেকশন নিতে হবে এবং তার পরিমাণ নির্দিষ্ট। সুতরাং ইনসুলিনের দাম কমই হোক বা বেশিই হোক, তাকে একই পরিমাণে ইনসুলিন কিনতে হবে। এরকম ক্ষেত্রে পণ্যের দাম চাহিদা হল **সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক** বা চাহিদার **দাম-স্থিতিস্থাপকতা হল** '0' (শূন্য) $[E_p = 0]$। এসব ক্ষেত্রে চাহিদা রেখাটি লম্ব অক্ষরেখার সমান্তরাল একটি সরলরেখায় পরিণত হয়।



চিত্র ২·৬

২·৬ চিত্রে চাহিদার পাঁচ রকমের দাম-স্থিতিস্থাপকতার ধারণা দেবার জন্য পাঁচ রকমের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা রেখার আকৃতি দেখান হল।

১. গ. **একটি সমস্যা ও সমাধান:** চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা হিসাব করতে গেলে একটা বিভ্রান্তিকর সমস্যা দেখা দেয়। দৃষ্টান্ত, ৪ টাকা দরে চালের চাহিদা ছিল ২০০ কেজি; দর কমে ৩ টাকা হলে চালের চাহিদার পরিমাণ বেড়ে ৩০০ কেজি হল। এখানে চালের চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা হিসাব করতে গিয়ে আমরা হিসাবের ভিত্তিরূপে ৪ টাকা দর ও ২০০ কেজিকে নেব, নাকি ৩ টাকা দর ও ৪০০ কেজিকে নেব? এই দুটি দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে হিসাব করলে চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার সহগটি দু'রকমের হবে। ৪ টাকা দর ও ২০০ কেজি চাহিদার ভিত্তিতে হিসাব করলে দেখা যাবে দাম কমেছে ২৫ শতাংশ এবং চাহিদা বেড়েছে ৫০ শতাংশ চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার সহগ-র যে সূত্রটি আমরা জেনেছি (অর্থাৎ, $E_p =$ চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনের শতাংশ ÷ দামের পরিবর্তনের শতাংশ) তা থেকে দেখা যায় স্থিতিস্থাপকতার সহগটি হয়, $\frac{৫০\%}{২৫\%} = ২$। কিন্তু যদি ৩ টাকা দর ও ৪০০ কেজিকে হিসাবের ভিত্তি ধরা যায়, তাহলে দেখা যাবে দামের পরিবর্তনের শতাংশ হল ৩৩·৩̇ এবং চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনের শতাংশটিও হল ৩৩·৩̇%।

সুতরাং সূত্র অনুযায়ী স্থিতিস্থাপকতার সহগটি হল, $\frac{৩৩\cdot৩\%}{৩৩\cdot৩\%}=১$। দুটি ক্ষেত্রে চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা স্থিতিস্থাপক বলে দেখা গেল বটে, কিন্তু তার মাত্রা দেখা গেল দু'রকমের। সমস্যা হল, কোন্‌টি ঠিক? এর একটি সমাধান হল, দুটি দামের গড় এবং আগের ও পরের চাহিদার পরিমাণ দু'টির গড়কে হিসাবের ভিত্তিরূপে ব্যবহার করা। তাহলে হিসাবের ভিত্তিরূপে দামের গড় দাঁড়ায় ৩·৫০ টাকা এবং আগের ও পরের চাহিদার পরিমাণের গড় দাঁড়ায় ২৫০ কেজি। তাতে দামের পরিবর্তনের শতাংশ হয় ২৮·৬%। এবং চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনের শতাংশ হয় ৪০%। সুতরাং স্থিতিস্থাপকতার সহগটি হয় (৭০% − ২৮·৬%) ১·৩৯। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে দাম ও চাহিদার মাঝামাঝি বিন্দু ধরে তার ভিত্তিতে স্থিতিস্থাপকতার সহগটি হিসাব করা হয়। সুতরাং এই নিয়মে, চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার সহগ,

$$E_p=\frac{\text{চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন}}{\text{দুটি চাহিদার পরিমাণের যোগফল}\div২}\div\frac{\text{দামের পরিবর্তন}}{\text{দুটি দামের যোগফল}\div২}।$$

$$=\frac{১০০}{৫০০\div২}\div\frac{১}{৭\div২}=১\cdot৩৯।$$

১·ঘ. চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ: মোট ব্যয়ের তুলনা

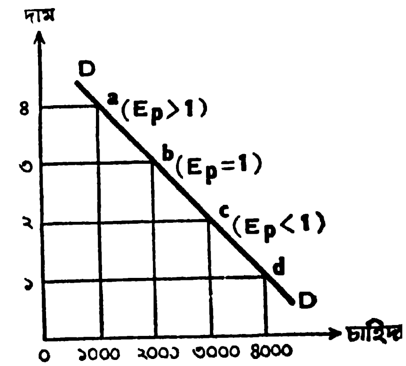
সারণি ২·৮

বাজার দাম প্রতিকিলো	প্রতিদিন চাহিদার পরিমাণ	ক্রেতাদের মোট ব্যয়	চাহিদা দাম-স্থিতিস্থাপকতা
৮ টাকা	১,০০০ কিলো	৮,০০০ টাকা	স্থিতিস্থাপকতা > ১
৬ "	২,০০০ "	১২,০০০ "	$\left[\frac{১০০০}{৩০০০\div২}\div\frac{১}{\cdot০\div২}=২\cdot৩\right]$
৬ "	২,০০০ "	১২,০০০ "	স্থিতিস্থাপকতা = ১
৪ "	৩,০০০ "	১২,০০০ "	$\left[\frac{১০০০}{৫০০০\div২}\div\frac{২}{১০\div২}=১\right]$
৪ "	৩,০০০ "	১২,০০০ "	স্থিতিস্থাপকতা < ১
২ "	৪,০০০ "	৮,০০০ "	$\left[\frac{১০০০}{৭০০০\div২}\div\frac{২}{৭\div২}=০\cdot৫\right]$

উপরে ২.৮ সারণিতে দেখা যাচ্ছে, দাম কিলো প্রতি ৮ টাকা থেকে কমে ৬ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ ১০০০ কিলো থেকে ২০০০ কিলো হয়। ফলে ক্রেতাদের মোট ব্যয় ৮ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ১২ হাজার টাকায় ওঠে। এখানে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সহগটি দাঁড়ায় ২.৩, অর্থাৎ দাম-স্থিতিস্থাপকতার সহগটি হল ১-এর বেশি ($E_p > 1$)।) সুতরাং ৮ টাকা ও ৬ টাকা দামের মধ্যে পণ্যটির চাহিদা হল স্থিতিস্থাপক। অতএব দাম কমে গেলে ক্রেতাদের মোট ব্যয় যদি বাড়ে, বুঝতে হবে তখন চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা হল স্থিতিস্থাপক। অর্থাৎ দামের পরিবর্তনের হারের তুলনায় চাহিদার পরিবর্তনের হার বেশি।

দাম ৬ টাকা থেকে কমে ৪ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ ২ হাজার কিলো থেকে বেড়ে ৩ হাজার কিলো হয়। ক্রেতাদের মোট ব্যয় কিন্তু ১২ হাজার টাকাই থেকে যায়। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতাব সহগটি ১-এর সমান $E_p = 1$)।) সুতরাং দাম কমে গিয়ে ও চাহিদা বেড়ে গিয়েও যদি পণ্যটির জন্য ক্রেতাদের মোট ব্যয় আগেব মতই থাকে, তাহলে, চাহিদাব দাম-স্থিতিস্থাপকতা হল সমানুপাতিক বা ১-এর সমান।) অর্থাৎ, দামের পরিবর্তনেব হাব এবং চাহিদার পরিবর্তনের হার একই।

আবার, দাম ৪ টাকা থেকে কমে ২ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ ৩ হাজার কিলো থেকে বেড়ে ৪ হাজার কিলো হলেও, পণ্যটির জন্য ক্রেতাদেব মোট ব্যয় কিন্তু ১২ হাজাব টাকা থেকে কমে ৮ হাজার টাকায় নেমে আসে। এক্ষেত্রে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার সহগটি হল ০.৫ বা ১-এর কম ($E_p < 1$)। অর্থাৎ দাম কমে এবং চাহিদার পরিমাণ বেড়ে গিয়েও যদি পণ্যটির জন্য ক্রেতাদের মোট ব্যয় আগের তুলনায় কমে যায় তাহলে, পণ্যটির দাম স্থিতিস্থাপকতা হল অস্থিতিস্থাপক। এর কারণ, এখানে দামের পরিবর্তনের হারের তুলনায় চাহিদার পরিবর্তনের হার হল কম।



চিত্র ২.৭

(২.৮ সারণির বিভিন্ন দামে বিভিন্ন চাহিদার পরিমাণগুলি ২.৭ চিত্রে সাজানো হয়েছে। যথাক্রমে a বিন্দুতে ৪ টাকা দামে চাহিদার পরিমাণ ১ হাজার কিলো, b বিন্দুতে ৩ টাকা দামে চাহিদার পরিমাণ ২ হাজার কিলো, c বিন্দুতে ২ টাকা দামে চাহিদার পরিমাণ ৩ হাজার কিলো এবং d বিন্দুতে ১ টাকা দামে চাহিদার পরিমাণ ৪ হাজার কিলো বোঝাচ্ছে। a, b, c, d বিন্দুগুলি যুক্ত করে DD রেখাটি পাওয়া গেল। এটি হল পণ্যটির চাহিদা রেখা। এর a ও b বিন্দুর মধ্যে

চাহিদা স্থিতিস্থাপক ($E_p > 1$), b ও c বিন্দুর মধ্যে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সমানুপাতিক ($E_p = 1$) এবং c ও d বিন্দুর মধ্যে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক ($E_p < 1$)। সুতরাং যে কোন চাহিদা রেখার উপরের দিকে (অর্থাৎ বেশি দামে) চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১-এর বেশি, মাঝখানে (অর্থাৎ মাঝামাঝি দামে) চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সমানুপাতিক বা ১-এর সমান, ও নিচের দিকে (অর্থাৎ কম দামে) চাহিদা অস্থিতিস্থাপক বা ১-এর কম হয়ে থাকে। অর্থাৎ স্থিতিস্থাপকতার পার্থক্য অনুসারে চাহিদা রেখার আকৃতি বিভিন্ন রকমের হয় না। একই চাহিদা রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

১.ঙ. চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার বৈশিষ্ট্য ঃ (১) চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার প্রথম বৈশিষ্ট্য হল, এর সহগটি সর্বদা ঋণাত্মক (−) হয়ে থাকে। তার কারণ পণ্যের দাম ও তার চাহিদার মধ্যে সম্পর্কটি হল বিপরীত ; দাম বাড়লে (+), চাহিদার পরিমাণ কমে (−), এবং দাম কমলে (−), চাহিদার পরিমাণ বাড়ে (+)। তাই চাহিদার রেখাটির ঢাল হল ঋণাত্মক (দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে)। তবে, অর্থনীতিবিদ্‌রা সাধারণত চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার সহগের আগে ঋণাত্মক চিহ্ন (−) বসান না। কিন্তু ঐ চিহ্ন রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। (২) যে কোন পণ্যের দামের বিভিন্ন স্তরে তার চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা সাধারণত বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কম দামের তুলনায় বেশি দামে সাধারণত চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা বেশি হয়। সুতরাং দাম যখন যথেষ্ট বেশি রয়েছে তখন তা আরও বাড়লে ক্রেতারা হয় দ্রব্যটি কেনা বন্ধ করে, নয়তো তার কোন বিকল্প দ্রব্য কেনে। ফলে চাহিদা তখন দামের বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশি হারে কমে। আবার দাম যখন যথেষ্ট কম রয়েছে, তখন তা আরেকটু কমলেও ক্রেতারা তা আরো বেশি পরিমাণে কিনতে উৎসাহিত হয় না। কারণ তারা এরই মধ্যে যা কেনার তা কিনতে পেরেছে। (৩) চাহিদা রেখার সামগ্রিক আকৃতি (তার খাড়াই বা গড়ানে আকৃতি) থেকে পণ্যটির চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা সঠিকভাবে বোঝা যায় না। কারণ, চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা হল দামের ও চাহিদার আপেক্ষিক পরিবর্তনের সম্পর্ক নিয়ে।

১.চ. চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার নির্ধারক ঃ সাধারণত,—(ক) যে পণ্যের বা দ্রব্যের সন্তোষজনক পরিবর্ত সামগ্রী সংখ্যায় বেশি ; (খ) যে পণ্যের বিকল্প ব্যবহারের ক্ষেত্র খুব বেশি ; (গ) যে পণ্যের জন্য ক্রেতারা তাদের মোট ব্যয়ের বেশি অংশ খরচ করে ; (ঘ) যে পণ্য ক্রেতারা বেশি করে বিলাস-দ্রব্য হিসাবে গণ্য করে ; (ঙ) যে পণ্য বেশি দিন ব্যবহার করা যায় ; এবং (চ) যে পণ্য ব্যবহারে ক্রেতারা কম অভ্যস্ত—সে পণ্যের চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা বেশি হয়ে থাকে। তা ছাড়া, (ছ) পণ্যের দাম খুব বেশি হলে, এবং (জ) ক্রেতাদের আয়ের স্তর কম হলে, পণ্যের চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা বেশি হয়ে থাকে। **দৃষ্টান্ত ঃ** লবণের কোন বিকল্প নেই, লবণের উপর ক্রেতাদের খরচ তাদের মোট খরচের সামান্য অংশ এবং লবণ তাদের কাছে অত্যাবশ্যক নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য। তাই

লবণের চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা হল অস্থিতিস্থাপক ($E_p<1$)। সেজন্য লবণের দাম ৩০ পয়সা থেকে ৬০ পয়সা কেজি হলেও তার চাহিদা একই থেকে যায়। কিন্তু ফিলিপস রেডিওর ভালো বিকল্প রূপে অন্যান্য রেডিও যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যায়, ক্রেতার রেডিও কেনার খরচ ক্রেতার মোট খরচের একটা বড়ো অংশ, একবার কিনলে তা অনেক দিন ধরে ব্যবহার করা যায় এবং অনেক খরিদ্দারের কাছে তা বিলাসদ্রব্য বলে গণ্য হয়, তাই, ফিলিপস রেডিওর চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা হল স্থিতিস্থাপক।

যারা চা পানে অভ্যস্ত তাদের কাছে চায়ের চাহিদা বর্তমানে (short period) অস্থিতিস্থাপক। তাই এখন চায়ের দাম কিছুটা বাড়লেও তাদের কাছে চায়ের চাহিদা নাও কমতে পারে। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা যদি চা পান কমাতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত চা পান খুব কমিয়ে দেয় বা ছেড়ে দেয়, তাহলে দীর্ঘকাল (long period) পরে তাদের কাছে চায়ের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়ে পড়বে। অর্থাৎ, অভ্যাসের পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ বলে সাধারণত পণ্যের চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা স্বল্পকালীন সময়ে অস্থিতিস্থাপক ও দীর্ঘকালীন সময়ে স্থিতিস্থাপক হয়।

সাইকেল, মোটরগাড়ি, রেডিও, আসবাবপত্র, টি. ভি. ইত্যাদি জিনিস একবার কিনলে অনেক দিন ধরে ব্যবহার করা চলে। এসব জিনিসের কোনটি খারাপ হলে তা ফেলে দিয়ে নতুন আরেকটি না কিনে, মানুষ বরং তা সারাই করে নিয়ে ব্যবহার করাটাই পছন্দ করে। তাই যে পণ্য যত বেশি কাল স্থায়ী তার চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা তত বেশি হয়।

১.ছ. চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার ব্যবহারিক গুরুত্ব: তত্ত্বগত আলোচনার ক্ষেত্র ছাড়াও, বাস্তব ক্ষেত্রেও নানা সমস্যার কারণ অনুসন্ধানে এবং তার সমাধানে চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে:

(১) **কারবারীর কাছে** তার উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পণ্য উৎপাদন, বিক্রয়, দাম ও অন্যান্য বিষয়ে কারবারীর নীতিগুলি পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অনুযায়ী না হলে লোকসানের সম্ভাবনাই বেশি। সুতরাং তার উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সহগ কত তা আধুনিক কারবারীকে খানিকটা আন্দাজ করতেই হয়। পণ্যের দাম একটু কমিয়ে বা বাড়িয়ে সে তার বিক্রয়লব্ধ মোট আয়ের (ক্রেতাদের মোট খরচের) হিসাব করলেই তা থেকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার হদিস পাবে। পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কতটা তা না জানলে কারবারীর পক্ষে তার পণ্যের দাম ঠিক মত ধার্য করা সম্ভব হয় না। সর্বাধিক মুনাফা উপার্জন করাও সম্ভব হয় না।

(২) কোন কারবারী হয়ত স্থির করল তার কারখানায় সে অটোমেশন (স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদনের কাজ করানো) চালু করবে। তা করতে গেলে হয়ত কারখানার ২ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হবে। কিন্তু তাতে পণ্যের উৎপাদন খরচ অনেক কম হবে এবং কম দামে তখন পণ্যটি বিক্রয় করা সম্ভব হবে। এখন, পণ্যটির

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যদি বেশি হয় তাহলে দাম কমার ফলে চাহিদা হয়ত খুব বেশি পরিমাণে বাড়বে। সে চাহিদা মিটাতে পারে এমন পণ্য উৎপাদন করতে ঐ ২০০০ ছাঁটাই শ্রমিক ছাড়াও আরো অনেক শ্রমিক লাগতে পারে। মোট বিক্রয়ের পরিমাণ বেড়ে গেলে কারবারীর মুনাফাও অনেক বেড়ে যাবে। কিন্তু যদি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশি না হয়, তাহলে এসবের কিছুই হবে না। সুতরাং অটোমেশন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার আগে পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাটি তাকে অবশ্যই জানতে হবে।

(৩) **শ্রমিকদের কাছেও,** যে পণ্য উৎপাদনের সাথে তারা জড়িত তার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ধরা যাক, কোন একটি রেডিও তৈরির কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়নের হিসাব বা ধারণা, কোম্পানীর রেডিওর দাম ৫ শতাংশ কমলে তার চাহিদা ২০ শতাংশ বাড়বে এবং ইউনিয়নেরই ধারণা অনুসারে কোম্পানীর মুনাফাও বাড়বে। এ হিসাবের ভিত্তিতে ইউনিয়ন দাবি করল কোম্পানীকে রেডিওর দাম ৫ শতাংশ কমিয়ে শ্রমিকদের মজুরি ১০ টাকা বাড়াতে হবে। শ্রমিকদের এ দাবির অর্থ হল, তাদের মতে কোম্পানীর তৈরি রেডিওটির দাম-চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সহগ হল ৪। এর উত্তরে কর্তৃপক্ষ জানাল তাদের রেডিওর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা মাত্র ০·৫ থেকে ১·৫-এর মধ্যে। অতএব দাম কমালে চাহিদা বাড়বে না, মুনাফা কমবে। সুতরাং শ্রমিকদের দাবি মেনে নেওয়া কোম্পানীর পক্ষে সম্ভব নয়। এরকম ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সহগটি প্রকৃতপক্ষে কত, তার উপরে শ্রমিকদের দাবি আদায়ের সম্ভাবনা এবং কর্তৃপক্ষের সাথে শ্রমিকদের সম্পর্কটা সন্তোষজনক থাকবে কিনা তা বিশেষভাবেই নির্ভর করছে।

(৪) চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা **কৃষকদের কাছেও** কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন অধিকাংশ দ্রব্যেরই চাহিদা হল অত্যন্ত অস্থিতিস্থাপক। সুতরাং ভাল বৃষ্টির জন্যই হোক কিংবা উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যই হোক, ফসলের উৎপাদন বাড়লে তার দর পড়ে যায় এবং কৃষকদের মোট আয় কমে। তাই কৃষি পণ্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক বলে উচ্চ ফলন চাষীদের বিপদ ঘটাতে পারে।

(৫) **সরকারকে** নানা বিষয়ে **অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে,** সংশ্লিষ্ট দ্রব্য বা সেবার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিবেচনা করতেই হয়: (ক) কৃষি পণ্যের চাহিদার অস্থিতিস্থাপকতার দরুন ফসলের উৎপাদন বাড়লে তার দাম ও মোট আয় কমে যায়। ফলে কৃষকরা আত্মরক্ষার জন্য উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। তাতে আবার দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের মোট উৎপাদন কমে যায়। তাই সরকারকে তখন উৎপাদন বৃদ্ধি বজায় রাখতে ও কৃষকদের আয় বাড়াতে কৃষিজাত ফসলের লাভজনক ন্যূনতম দাম সুনিশ্চিত করার নীতি (price support policy) গ্রহণ করতে হয়। এজন্য সরকার ফসলের ন্যূনতম দাম বেঁধে দিয়ে তার চাহিদা বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে পারে (যেমন রপ্তানির দ্বারা) কিংবা সরাসরি নিজেই উদ্বৃত্ত ফসলটা নির্ধারিত দরে কিনে নিয়ে আপৎকালীন ভাণ্ডার (buffer stock) গড়তে পারে এবং রেশন প্রথার মাধ্যমে নির্ধারিত দামে তা দেশের মধ্যে বিক্রি করতে পারে। (খ) রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সরকারের

নীতি বিদেশে রপ্তানী পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে। বিদেশে রপ্তানী পণ্যের চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয় তাহলে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিদেশে রপ্তানী পণ্য সস্তায় বিক্রির ব্যবস্থা করতে হয়। এ উদ্দেশ্যে বিদেশী টাকার সাথে দেশের টাকার বিনিময়মূল্য কমিয়ে দিতে হয় (devaluation)। এতে সুফল পাওয়া যায় এ কারণে যে, টাকার বিনিময় মূল্য যতটুকু কমবে রপ্তানি বৃদ্ধির হার হবে তার চেয়ে বেশি। চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হলে কিন্তু এই পন্থা ফল দেয় না। (গ) পণ্য কর নির্ধারণের ক্ষেত্রেও সরকারকে সংশ্লিষ্ট পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার দিকে লক্ষ্য রেখে করের হার স্থির করতে হয়। [বিক্রয় কর, উৎপাদন শুল্ক, আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক ইত্যাদি পণ্যের উপর বসানো হয় বলে এরা হল পণ্য কর (commodity tax)]। কর বসানোর প্রধান উদ্দেশ্য হল সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি। কর বসালে পণ্যের দামের সাথে করটা যুক্ত হয়ে দাম বাড়ে। পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম হলে পণ্যটির মোট বিক্রি বিশেষ কমে না; তাই সরকারের রাজস্ব আদায় যথেষ্ট বাড়ে। কিন্তু চাহিদা স্থিতিস্থাপক হলে করের দরুন দাম বেড়ে যাওয়ায় চাহিদা বিশেষভাবে কমে যায়। ফলে বিক্রি কম হয় ও কর-রাজস্বও বিশেষ আদায় হয় না। সুতরাং রাজস্ব বৃদ্ধিই যদি প্রধান লক্ষ্য হয় তাহলে অস্থিতিস্থাপক চাহিদার পণ্যের উপর কর ধার্য করাই প্রকৃষ্ট। কিন্তু অস্থিতিস্থাপক চাহিদার পণ্যগুলি অধিকাংশই হল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। যে দামেই হোক তা কিনতেই হয় বলে করের বোঝাটা শেষ পর্যন্ত গিয়ে চাপে সাধারণ মানুষের উপর। তাদের অধিকাংশেরই আয় কম। স্থিতিস্থাপক চাহিদার পণ্য হলে বিক্রির পরিমাণটা বজায় রাখতে গিয়ে উৎপাদনকারী নিজেই করের বেশি অংশ বহন করে, দামটা করের সমপরিমাণে বাড়ায় না। কর ধার্য করতে গিয়ে তাই সরকারকে স্থির করতে হয় কতটা পরিমাণ রাজস্ব তাঁরা চান এবং কার কাছ থেকে সেটা আদায় করতে চান। (ঘ) কারবারী সংস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করার নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপরও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রভাব পড়ে। যে পণ্য বা সেবা কর্মের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক এবং যার উৎপাদক কোন বেসরকারী একচেটিয়া কারবারী সংস্থা, সে তার ক্রেতাদের চড়া দামে পণ্যটি কিনতে বাধ্য ক'রে একচেটিয়া শোষণ চালায়। এই রকম সংস্থা জনসাধারণের অবশ্য প্রয়োজনীয় সংস্থা (public utility) বলে গণ্য হলে সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের বিশেষ উপযুক্ত বলে গণ্য হয়।

২.ক. চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতা (Income Elasticity of Demand): পণ্যের চাহিদা তার দামের উপরে ত বটেই এমন কি তার ক্রেতাদের আয়ের উপরেও নির্ভর করে। অর্থাৎ, বাজারে সমস্ত পণ্যের দাম যদি অপরিবর্তিত থাকেও, তাহলেও দেখা যাবে খরিদ্দারদের আয়ের পরিবর্তনের দরুন পণ্যটির কেনার পরিমাণ বদলে গেছে। ভোগকারীর আয়ের পরিবর্তনের ফলে কোন পণ্যের চাহিদার পরিমাণে যে পরিবর্তন ঘটে, চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটির দ্বারা তা পরিমাপ করা হয়। অর্থাৎ, আয়ের পরিবর্তনে কোন পণ্যের খরিদে কি পরিমাণ সাড়া জাগে চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতা তা দেখিয়ে দেয়। আয়-স্থিতিস্থাপকতার

সহগটির দ্বারা অর্থনীতিবিদ্‌রা চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতার বা অস্থিতিস্থাপকতার মাত্রা নিচের সূত্র অনুসারে পরিমাপ করে থাকেন :

$$\text{চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতা } (E_I) = \frac{\text{চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনের শতকরা ভাগ}}{\text{আয়ের পরিবর্তনের শতকরা ভাগ}}$$

২.খ. চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা সর্বদাই ঋণাত্মক (–) হয় ; কারণ, দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণ সর্বদা বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক (+) হতে পারে, আবার ঋণাত্মকও (–) হতে পারে। এ বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর দ্বারা সংশ্লিষ্ট পণ্যটির প্রকৃতি প্রকাশ পায়। অধিকাংশ পণ্যের ক্ষেত্রেই চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতা **ধনাত্মক** হয়ে থাকে; অর্থাৎ আয়ের পরিবর্তন যে দিকে ঘটে, চাহিদার পরিবর্তনও সেদিকেই ঘটে (**সমমুখী পরিবর্তন**)। আয় বাড়লে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে ; আয় কমলে চাহিদার পরিমাণ কমে। যে সব পণ্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক হয়, তাদের **স্বাভাবিক** (normal) বা **উৎকৃষ্ট** (superior) পণ্য বলে গণ্য করা হয়। তবে, স্বাভাবিক বা উৎকৃষ্ট পণ্যের চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতা ক্ষেত্রবিশেষে স্থিতিস্থাপক ($E_I > 1$) ; অস্থিতিস্থাপক ($E_I < 1$) এবং সমানুপাতিক ($E_I = 1$) হতে পারে।

২.গ. অল্প কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে অবশ্য চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতা **ঋণাত্মক** (–) হয়। এদের ক্ষেত্রে, আয় যেদিকে পরিবর্তিত হয়, চাহিদার পরিমাণ তার বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ, আয় বাড়লে ক্রেতারা পণ্যটি কেনার পরিমাণ কমিয়ে অন্য কোন জিনিস কিনতে পারে। এ সব পণ্যকে অর্থনীতিবিদ্‌রা **নিকৃষ্ট** (inferior) পণ্য বলেন। যেমন, আয় বাড়লে গ্রামের গরিবরা যোয়ার বা বাজরা কেনা কমিয়ে দিয়ে গম কেনা শুরু করতে পারেন। স্বাভাবিক বা উৎকৃষ্ট পণ্যের মতো নিকৃষ্ট পণ্যের চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতাও স্থিতিস্থাপক ($E_I > 1$), অস্থিতিস্থাপক ($E_I < 1$) এবং সমানুপাতিক ($E_I = 1$) হতে পারে।

২.ঘ. চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব : উৎপাদনকারী ও পরিকল্পনাকারীদের কাছে চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটির গুরুত্ব অনেক। কারণ এর সাহায্যে কোন্ শিল্পের সম্প্রসারণ-সম্ভাবনা রয়েছে এবং কোন্ শিল্প পতনমুখী তা নির্ধারণ করা যায়। যদি কোন পণ্যের চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক ও বেশি হয়, তাহলে, ভোগকারী পরিবারগুলির আয় বাড়লে পণ্যটির চাহিদার পরিমাণও বাড়বে। এরকম ক্ষেত্রে, ঐ পণ্য-উৎপাদনকারী শিল্পটি সম্প্রসারণশীল শিল্প বলে গণ্য হয়। যে পণ্যের চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক তার ক্রেতাদের আয় বাড়লে, পণ্যটির চাহিদার পরিমাণ কমে যাবে। সুতরাং, তেমন পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প পতনমুখী শিল্প বলে গণ্য হয়। এ থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা যায়, কোন পণ্যের ক্রেতাদের আয় বাড়লে সে পণ্যের উৎপাদন বাড়ান হবে কিনা সেটা উৎপাদনকারী ঐ পণ্যের চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতা দেখে স্থির করে। অর্থনীতিক পরিকল্পনাকারীরাও বিভিন্ন পণ্যের চাহিদার আয়-

স্থিতিস্থাপকতা বিচার করে পরিকল্পনায় কোন্ কোন্ শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে তা স্থির করতে পারেন।

৩. **চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা** (Cross Elasticity of Demand)**:** ক. ভোগকারীদের আয় ও অন্যান্য পণ্যের দাম অপরিবর্তিত থাকলে, ওই অবস্থায় একটি পণ্যের (y পণ্য) দামের পরিবর্তনে অপর একটি পণ্যের (x পণ্য) চাহিদায় যে পরিবর্তন ঘটে, চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার দ্বারা তা পরিমাপ করা হয়। অর্থাৎ, একটি পণ্যের দামের পরিবর্তনে আরেকটি পণ্যের কেনার পরিমাণটা কতটা স্পর্শকাতর হতে পারে চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা তা দেখিয়ে দেয়। *y* পণ্যের দামের পরিবর্তনের দরুন x পণ্যের চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা হয় চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার সহগের (E_{xy}) দ্বারা :

$$\text{চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা } (E_{xy}) = \frac{\text{x পণ্যের চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}{\text{y পণ্যের দামের শতকরা পরিবর্তন}}$$

খ. চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার সহগ ধনাত্মকও (+) হতে পারে, আবার ঋণাত্মকও (−) হতে পারে। **পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার সহগটি ধনাত্মক হলে,** অর্থাৎ y পণ্যের দাম বাড়লে যদি x পণ্যের চাহিদাও বাড়ে, কিংবা y পণ্যের দাম কমলে x পণ্যের চাহিদাও কমে, তাহলে বুঝতে হবে x এবং y **পণ্য দুটি হল পরস্পরের পরিবর্ত দ্রব্য** (substitutes)। ঘি-র দাম বেড়ে গেলে দালদার চাহিদা বাড়বে এবং চায়ের দাম কমে গেলে কফির চাহিদা কিছুটা কমতে পারে। **সহগটি ঋণাত্মক হলে,** অর্থাৎ y পণ্যের দাম কমলে যদি x পণ্যের চাহিদা বাড়ে অথবা y পণ্যের দাম বাড়লে যদি x পণ্যের চাহিদা কমে (অর্থাৎ x পণ্যের চাহিদা যদি y পণ্যের দামের সাথে বিপরীত সম্পর্কবিশিষ্ট হয়), তাহলে বুঝতে হবে পণ্যদুটি হল **পরস্পরের সম্পূরক**। পেট্রলের দাম খুব বেড়ে গেলে মোটর-গাড়ির চাহিদা কমে, মাছ সস্তা হলে লোকে ভাত একটু বেশি খেতে পারে।

কিন্তু y পণ্য ও x পণ্যের চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা শূন্য ($E_{xy} = 0$) হলে বুঝতে হবে পণ্যদুটির দাম একে অপরের চাহিদাকে প্রভাবিত করে না। এরা **পরস্পর সম্পর্কহীন পণ্য**।

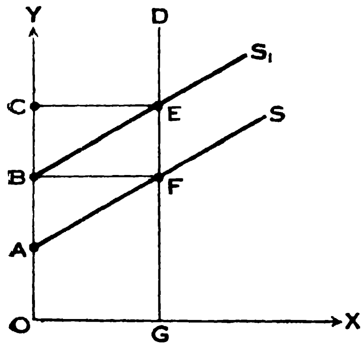
২.১০. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ও করভারের বণ্টন
Elasticity of Demand & the Distribution of the burden of a tax on a commodity

১. প্রতিযোগিতার বাজারে কোন পণ্যের উপর সরকার কর বসালে (যেমন, অন্তঃশুল্ক বা বিক্রয় কর) পণ্যটির দাম বাড়বে কিনা এবং বাড়লে, কর যতটা বসেছে দামও ততটা বাড়বে কিনা তা কিন্তু নির্ভর করবে পণ্যটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কতটা তার উপর।

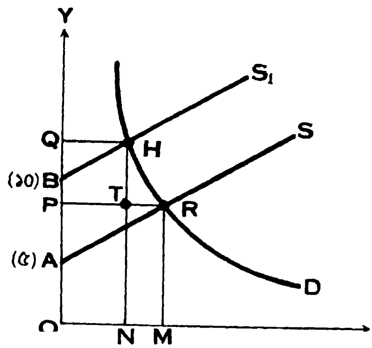
২. চাহিদা যদি একেবারে অস্থিতিস্থাপক হয় তাহলে, কর যতটা ধার্য করা

হয়েছে, পণ্যটির দাম ততটাই বাড়বে। সে ক্ষেত্রে ক্রেতাদেরই করের সব বোঝাটাই বইতে হবে। কিন্তু বাস্তবে সমস্ত পণ্যের চাহিদাই কম বেশি স্থিতিস্থাপক। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যত বেশি হবে, দামের বৃদ্ধিটা করের পরিমাণের চেয়ে ততই কম হবে এবং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যত কম হবে দামের বৃদ্ধিটা ধার্য করের পরিমাণের ততই নিকটবর্তী হবে। এরকম ক্ষেত্রে দাম যতটুকু বাড়বে করের সেটুকু অংশ ক্রেতাদের বইতে হবে, বাকিটা বইতে হবে বিক্রেতাকে। এই হল চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অনুযায়ী পণ্য করের বোঝা বণ্টনের সাধারণ নিয়ম।

৩. ব্যাখ্যা: এবার বিষয়টা দুটি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।



চিত্র ২·৮



চিত্র ২·৯

(ক) ২·৮ চিত্রে D হল সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা। যোগান রেখা S চাহিদা রেখা D-কে F বিন্দুতে ছেদ করে ভারসাম্য দাম OB কিংবা FG এবং ভারসাম্য চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ OG নির্ধারণ করে দিয়েছিল। এবার পণ্যটির উপর AB পরিমাণ কর বসানো হল। ফলে নতুন যোগান রেখা S_1 দেখা দিল এবং সেটা চাহিদা রেখা D-কে উচ্চতর বিন্দু E-তে ছেদ করল। ফলে এবার নতুন ভারসাম্য দাম হল EG কিংবা OC, কিন্তু চাহিদা রেখা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক বলে ভারসাম্য চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ একই রইল (OG)। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এবার দাম বৃদ্ধির পরিমাণটা হল EF এবং সেটা করের পরিমাণ AB-র সমান (EF = AB)। অর্থাৎ এক্ষেত্রে চাহিদা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হওয়ায়, কর যতটা বসেছে দামও ঠিক ততটাই বেড়েছে। এর অর্থ হল করের বোঝার সবটাই বিক্রেতা খরিদ্দারের কাছ থেকে আদায় করছে।

(খ) ২·৯ চিত্রে চাহিদা রেখা D স্থিতিস্থাপক চাহিদার ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রথমে যোগান রেখা S ও চাহিদা রেখা D-এর ছেদ বিন্দু R অনুযায়ী ভারসাম্য দাম RM (বা OP) এবং ভারসাম্য চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ OM নির্ধারিত

হয়েছিল। পরে AB পরিমাণ কর বসান হল। এবার নতুন যোগান রেখা S_1 চাহিদা রেখা D-এর উচ্চতর বিন্দু H-এ ছেদ করে নতুন ভারসাম্য দাম HN (বা OQ) এবং নতুন ভারসাম্য চাহিদা-যোগানের পরিমাণ ON নির্ধারণ করে দিল। দাম বেড়ে যাওয়ায় স্বভাবতঃই ভারসাম্য পরিমাণটি কমে গেল। কিন্তু দাম কতটা বাড়ল ? লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ HT কিন্তু করের পরিমাণ AB-র চেয়ে কম। অর্থাৎ কর যতটা বসেছে, দাম ততটা বাড়েনি। এর অর্থ হল করের বোঝার সবটা বিক্রেতা খরিদ্দারের উপর চাপাতে পারেনি।

২. ১১. অপক্ষপাত রেখা : চাহিদার বিকল্প ব্যাখ্যা
Indifference Curve Analysis : The Alternative Approach

১. কেনাকাটার ক্ষেত্রে ভোগীদের পছন্দ ও চাহিদার বিধির একটি বিকল্প ব্যাখ্যা আছে। তার ভিত্তি হল অপক্ষপাত রেখা। চাহিদার বিধির পুরনো ব্যাখ্যাটি উপযোগের ভিত্তিতে করা হয় এবং তাতে ধরে নেওয়া হয়—উপযোগের পরিমাণটা পরিমাপ করা যায় এবং ভোগীরা বাজারে গিয়ে কেবল একটি মাত্র জিনিস কিনছে। কিন্তু অপক্ষপাত রেখার সাহায্যে যেসব অর্থনীতিবিদ্ চাহিদার বিধিটি ব্যাখ্যা করার পক্ষপাতী, তাঁরা ধরে নেন, কেনাকাটা করতে গিয়ে ভোগীরা যে উপযোগ পেয়ে সন্তুষ্ট হন, সে-উপযোগ পরিমাণগতভাবে পরিমাপ করা যায় না। কারণ উপযোগের ধারণাটা সম্পূর্ণ মনোগত।

২. অপক্ষপাত রেখার ভিত্তিতে চাহিদার বিধিটি ব্যাখ্যা করার পক্ষপাতী যাঁরা তাঁরা মনে করেন, একটি দ্রব্য বেশি বা কম পেলে ভোগীরা বেশি কি কম পরিতৃপ্ত হয় তা তারা বলতে পারে ; কিন্তু কতটা উপযোগ তারা পেল বা কতটা পরিতৃপ্ত হল, সেটা তাঁরা বলতে পারে না। ভোগীরা সাধারণত কেনাকাটা করতে গিয়ে সেই সব জিনিসই কেনার জন্য বেছে নেন যা থেকে তাঁরা অধিকতর পরিতৃপ্তি বা উপযোগ পাচ্ছেন বলে মনে করেন। উপযোগ বিধির ভিত্তিতে চাহিদা বিধির ব্যাখ্যার তুলনায় অপক্ষপাত রেখার সাহায্যে আরও ব্যাপকভাবে চাহিদার ব্যাখ্যা করা যায়।

৩. অপক্ষপাত রেখার ব্যাখ্যায় ধরে নেওয়া হয় নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় নিয়ে ভোগীরা একসঙ্গে একাধিক জিনিস কিনছে। আয় সীমাবদ্ধ বলে, তারা একটি জিনিস একটু বেশি কিনতে গেলে আরেকটি জিনিস একটু কম করে কিনতে বাধ্য হয়। এবং ওই অবস্থায় তারা একাধিক জিনিস এমন পরিমাণে কেনে যাতে তা থেকে তারা সর্বাধিক উপযোগ বা তৃপ্তি পায়, অর্থাৎ তাদের সর্বাধিক অভাব মেটে।

৪. **অপক্ষপাত তালিকা বা রেখা হল** দুটি ভিন্ন দ্রব্যের এমন কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের সংমিশ্রণ যার প্রত্যেকটি ভোগীকে সমান স্তরের তৃপ্তি বা মোট উপযোগ এনে দেয়। বিষয়টা পরপৃষ্ঠায় ২·৭ সারণির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হল।

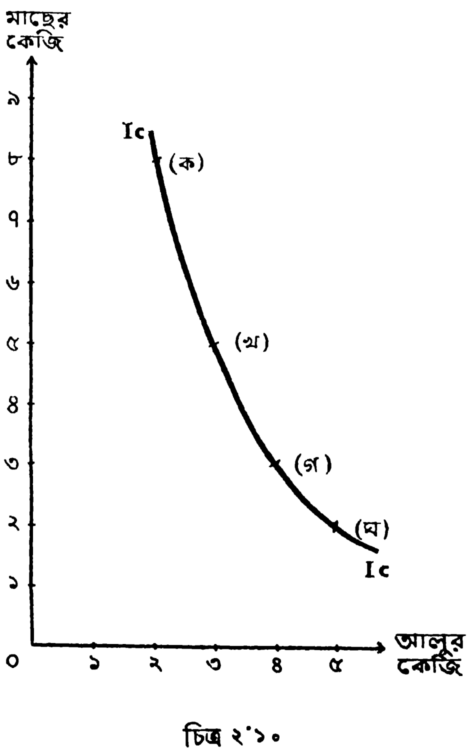
২·৭ সারণিতে মাছ ও আলুর বিভিন্ন সংমিশ্রণ (২) ও (৩) কলমে দেখান হয়েছে ; এদের প্রতিটি সংমিশ্রণ থেকে ভোগী সমান পরিতৃপ্তি পাচ্ছে। সুতরাং (ক), (খ),

সারণি ২'৯

মাছ ও আলুর কতকগুলি বিকল্প সংমিশ্রণ (যার প্রত্যেকটি থেকে ভোগীরা সম-পরিমাণ উপযোগ পাচ্ছে) এবং মাছ ও আলুর প্রান্তিক পরিবর্ততার হার—

সংমিশ্রণ (১)	মাছের কেজি (২)	আলুর কেজি (৩)	মাছের সাথে আলুর পরিবর্ততার প্রান্তিক হার (৪)
(ক)	৮	২	
			৩ কেজি মাছ / ১ কেজি আলু = ৩
(খ)	৫	৩	
			২ ,, ,, / ১ ,, ,, = ২
(গ)	৩	৪	
			১ ,, ,, / ১ ,, ,, = ১
(ঘ)	২	৫	

(গ) ও (ঘ) এই চারটি সংমিশ্রণের মধ্যে যে কোন একটি কিনলেই তার চলে। এই চারটি সম-তৃপ্তি সংমিশ্রণের কোনটির প্রতিই তার বিশেষ কোন আকর্ষণ নেই। এই চারটি সম-তৃপ্তি সংমিশ্রণ ২'১০ চিত্রে দেখান হল। সেখানে (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এই চারটি সমতৃপ্তি বিন্দু একটি রেখা দিয়ে যোগ করা হল। এই রেখাটিব নাম হল সমতৃপ্তি রেখা (Equal satisfaction curve) বা অপক্ষপাত রেখা (Indifference curve বা Ic)। মনে রাখতে হবে ২'১০ চিত্রের Ic রেখার কেবল (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) বিন্দুতে নয়, সমস্ত বিন্দু:তই মাছ ও আলুর সমস্ত সম্ভাব্য সংমিশ্রণ হল সমতৃপ্তি সংমিশ্রণ। তাই গোটা Ic রেখাটি হল সম-তৃপ্তি রেখা এবং সেহেতু ভোগীদের কাছে তা অপক্ষপাত রেখা।



চিত্র ২'১০

৫. অপক্ষপাত রেখা বাম দিকে উপর থেকে ডানদিকে নিচে নামে কেন? এর কারণ, মোট তৃপ্তি অপরিবর্তিত রেখে, একটি সংমিশ্রণ থেকে আরেকটি সংমিশ্রণে অর্থাৎ অপক্ষপাত রেখার একবিন্দু থেকে অন্য একটি বিন্দুতে ভোগীর সরে

আসা মানেই হল একটি দ্রব্য (এখানে আলু) সামান্য একটু বেশি কিনতে গিয়ে আরেকটি দ্রব্য (এখানে মাছ) একটু কম কেনা এবং তাতে একটি থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তি যেমন একটু কমছে (−), তেমনি আরেকটি থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তি একটু বাড়ছে (+)।

৬. **পরিবর্ততার প্রান্তিক হার** (Marginal Rate of Substitution)ঃ উপযোগ বা সন্তোষ বা পরিতৃপ্তির স্তরটি অক্ষুণ্ণ রেখে, দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটি একটু বেশি পরিমাণে কিনতে গেলে, অন্য দ্রব্যটির কেনার পরিমাণ কিছুটা কমাতেই হয়। সে কারণেই অপক্ষপাত রেখাটি বামদিকে উপর থেকে ডান দিকে নিচে নামে, অর্থাৎ তার ঢালটি ঋণাত্মক (negative slope) হয়। কিন্তু ২·১০ চিত্রটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, রেখাটির আকৃতির মধ্যে একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। তা হল এই, রেখাটি লম্ব ও সমান্তরাল অক্ষরেখা দুটির মিলন বিন্দু 'O'-র দিকে উত্তল হয়েছে (convex to the origin)। এর কারণ কি ? এর কারণ হল, আলু কেনার পরিমাণ ১ কেজি বাড়াতে গিয়ে মাছ কেনার পরিমাণ কত কেজি কমাতে হবে তা নির্ভর করে গোড়াতে ভোগীর কাছে কতটা পরিমাণ মাছ ও কতটা পরিমাণ আলু রয়েছে, তার উপর। গোড়ায় তার কাছে যে দ্রব্যটি বেশি পরিমাণে এবং যে দ্রব্যটি কম পরিমাণে আছে, তার মধ্যে দ্বিতীয়টি একটু বেশি করে পাবার জন্য সে প্রথমটি যথেষ্ট বেশি পরিমাণেই ছাড়তে ইচ্ছুক হবে, সাধারণ জ্ঞান থেকেই একথা বলা যায়। যেমন ২·৭ সারণির (ক) সংমিশ্রণ থেকে (খ) সংমিশ্রণে যেতে ভোগী ১ কেজি আলু বেশি পাবার জন্য মাছ কেনার পরিমাণ ৩ কেজি কমাতে রাজী। এর ফলে ভোগীর কাছে মাছের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে ও আলুর পরিমাণ বাড়তে থাকে। অবশেষে দেখা যায় (ঘ) সংমিশ্রণে এসে সে বাড়তি এক কেজি আলুর জন্য মাত্র ১ কেজি মাছ ছাড়তে রাজী। এমনি করে, প্রথমে ভোগীরা তাদের কাছে যে দ্রব্যটি বেশি পরিমাণে থাকে তা বেশি পরিমাণে ছেড়ে পরিবর্তে যেটা কম থাকে সেটি একটু বেশি পরিমাণে পেতে চায়। এর ফলে, প্রথমে যে দ্রব্যটি বেশি পরিমাণে তাদের কাছে ছিল তার পরিমাণ কমতে থাকে এবং প্রথমে যে দ্রব্যটি কম ছিল তার পরিমাণ বাড়তে থাকে। ফলে দ্বিতীয় দ্রব্যটির অতিরিক্ত একটি একক পাবার জন্য সে আগের তুলনায় ক্রমহ্রাসমান পরিমাণে প্রথম দ্রব্যটি ত্যাগ করতে থাকে। একটি দ্রব্য একটু বেশি করে পাবার জন্য আরেকটি দ্রব্য ভোগী যে পরিমাণে ছাড়তে রাজী তাকে বলে (দ্বিতীয় দ্রব্যটির) পরিবর্ততার প্রান্তিক হার। অর্থাৎ, মোট উপযোগ বা তৃপ্তির স্তরটি অক্ষুণ্ণ রেখে, একটি দ্রব্যের জন্য (আলুর জন্য) আরেকটি দ্রব্যের (মাছের) পরিবর্ততার প্রান্তিক হার হল প্রথম দ্রব্যটির (আলুর) ১টি অতিরিক্ত একক (১ কেজি) পাবার জন্য ভোগী যে পরিমাণে দ্বিতীয় দ্রব্যটি (মাছ) ত্যাগ করতে ইচ্ছুক, সেইটি। যেমন, ২·৭ সারণির (৪) কলমে ৩ কেজি মাছ, ২ কেজি মাছ ও ১ কেজি মাছ।

সুতরাং, পরিবর্ততার প্রান্তিক হার (Marginal rate of substitution)

$$= \frac{\text{প্রথম দ্রব্যটির (মাছের) হ্রাসের পরিমাণ}}{\text{দ্বিতীয় দ্রব্যটির (আলুর) বৃদ্ধির পরিমাণ}}$$

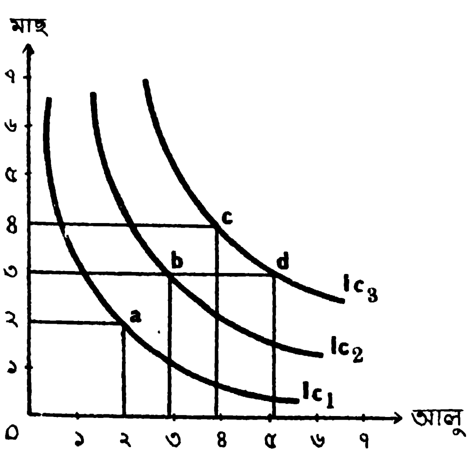
২·৯ সারণির (৪) কলম অনুসারে (খ) সংমিশ্রণে এটি হল $\frac{-৩}{+১}$ = −৩।

অর্থাৎ, পরিবর্ততার প্রান্তিক হারটি সর্বদাই ঋণাত্মক হয়। কারণ দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটি কমছে, অপরটি বাড়ছে। তাই ফলটি ঋণাত্মক (−)। কিন্তু চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার সহগটি যেমন ঋণাত্মক হলেও ঋণাত্মক চিহ্ন (−) ব্যবহার করা হয় না, তেমনি পরিবর্ততার প্রান্তিক হারটি ঋণাত্মক হলেও তা উল্লেখ করা হয় না।

একটি দ্রব্যের স্থলে আরেকটি দ্রব্যের পরিবর্ততার প্রান্তিক হারটি ক্রমশ কমতে থাকে বলেই অপক্ষপাত রেখাটি ক্রমশ বাম দিকে উপর থেকে ডান দিকে নিচে নামতে থাকে। অর্থাৎ, পরিবর্ততার প্রান্তিক হারটি ঋণাত্মক বলেই অপক্ষপাত রেখার ঢালটি ঋণাত্মক হয় ও রেখাটি লম্ব ও সমান্তরাল অক্ষরেখার মিলন বিন্দুর ('O') দিকে উত্তল হয়। অপক্ষপাত রেখার ঢালটি একটি দ্রব্যের স্থলে আরেকটি দ্রব্যের পরিবর্ততার প্রান্তিক হার পরিমাপ করে।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির সাথে এখানে পরিবর্ততার ক্রমহ্রাসমান হারের বিষয়টি মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। ওই বিধি অনুযায়ী, ভোগীর কাছে যে জিনিসটির পরিমাণ বাড়ে তার প্রান্তিক উপযোগ কমতে থাকে এবং যে জিনিসটির পরিমাণ কমে তার প্রান্তিক উপযোগ বাড়তে থাকে। ২·৯ সারণিতে (২) কলমে উপর থেকে নিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে মাছের পরিমাণ কমছে বলে মাছের প্রান্তিক উপযোগ বাড়ছে, ওদিকে (৩) কলমে আলুর পরিমাণ বাড়ছে বলে আলুর প্রান্তিক উপযোগ কমছে। তাই, (ক) সংমিশ্রণ থেকে যতই ভোগী (ঘ) সংমিশ্রণের দিকে এগোচ্ছে ততই আরেকটি অতিরিক্ত একক (কেজি) আলুর জন্য ক্রমশ কম পরিমাণে মাছ ছাড়তে চাইছে। তাই আলুর (একটি দ্রব্যের) জন্য মাছের (আরেকটি দ্রব্যের) পরিবর্ততার প্রান্তিক হার ক্রমশ কমে।

৭. **অপক্ষপাত মানচিত্র** (Indifference Map)ঃ ২·৯ সারণিতে ও ২·১০ চিত্রে সমতৃপ্তির স্তরে অবস্থিত দুটি পণ্যের (মাছ ও আলু) বিভিন্ন সংমিশ্রণ দেখান হয়েছে। ২·১০ চিত্রে অপক্ষপাত রেখা Ic-র সমস্ত বিন্দুতেই দুটি দ্রব্যের (মাছ ও আলুর) যতগুলি সংমিশ্রণ সম্ভব তাদের সবগুলিরই উপযোগ বা তৃপ্তি সমান। এক একটি সমতৃপ্তি বা অপক্ষপাত রেখা এমনিভাবে উপযোগ বা তৃপ্তির এক একটি স্তরে অবস্থিত। সুতরাং



চিত্র ২·১১

উপযোগ বা তৃপ্তির ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন সমতৃপ্তি বা অপক্ষপাত রেখা কল্পনা করা ও আঁকা যেতে পারে। যেমন ২'১১ চিত্রে করা হয়েছে। তাতে Ic_1, Ic_2 ও Ic_3 এই তিনটি সমতৃপ্তি বা অপক্ষপাত রেখা রয়েছে। Ic_1 অপক্ষপাত রেখার a বিন্দুতে যে পরিমাণ মাছ ও আলুর সংমিশ্রণ রয়েছে তার থেকে Ic_2 রেখার b বিন্দুর সংমিশ্রণে মাছ ও আলু, দুটির পরিমাণই বেশী। তেমনি Ic_3 রেখায় c বিন্দুর সংমিশ্রণে a ও b বিন্দুর তুলনায় আরও বেশী মাছ ও আলু রয়েছে। আবার Ic_3-র d বিন্দুতে Ic_2-র b বিন্দুর তুলনায় মাছ সমপরিমাণ হলেও আলুর পরিমাণ বেশী। সুতরাং বলা যায়, Ic_1-এর তুলনায় তার ডান দিকে অবস্থিত Ic_2 অপক্ষপাত রেখাটি উচ্চতর তৃপ্তির স্তরে এবং Ic_2-এর তুলনায় তার ডানদিকে অবস্থিত Ic_3 অপক্ষপাত রেখা আরও উচ্চতর তৃপ্তির স্তরে রয়েছে। অর্থাৎ বামদিকের তুলনায় দক্ষিণ দিকে অবস্থিত অপক্ষপাত রেখা উচ্চতর তৃপ্তির স্তরে এবং দক্ষিণ দিকের তুলনায় বাম দিকে অবস্থিত অপক্ষপাত রেখা নিম্নতর তৃপ্তির স্তরে অবস্থিত। তাই ভোগীর কাছে বাম দিকের তুলনায় দক্ষিণ দিকের অপক্ষপাত রেখার সংমিশ্রণগুলি বেশী পছন্দসই।

যে অপক্ষপাত রেখা যত দক্ষিণে অবস্থিত তা তৃপ্তির তত বেশি উঁচু স্তরে রয়েছে বলে ভোগীরা তাদের উপযোগ বা তৃপ্তি সর্বাধিক করার চেষ্টায় উচ্চতর অপক্ষপাত রেখায় পৌছতে, (অর্থাৎ তার উপর অবস্থিত দুটি দ্রব্যের সংমিশ্রণ) কিনতে চেষ্টা করে। (এক একটি অপক্ষপাত রেখাকে এক একটি **শৈলশিরা** বলে কল্পনা করলে এবং বাম দিকের শৈলশিরার তুলনায় ডান দিকের শৈলশিরাগুলির উচ্চতা ক্রমশ বেশি বলে কল্পনা করে নিলে বিষয়টা বুঝতে সহজ হতে পারে।)

৮. **বাজেট সীমা** (The Budget Restraint): আমরা পাঁচটি বিষয় সত্য বলে ধরে নিচ্ছি: (১) ভোগীরা যুক্তিবাদী; (২) তাদের মনের অপক্ষপাত মানচিত্রের রেখাগুলিতে আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যসামগ্রীর জন্য তাদের পছন্দগুলির ইঙ্গিত রয়েছে; (৩) তাদের আর্থিক আয় এবং ব্যয়ের পরিমাণ ও ক্ষমতা সীমিত; (৪) বাজারে সব দ্রব্যসামগ্রী দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে; এবং (৫) বাজার দাম অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রীগুলির এমন সংমিশ্রণ কিনে তারা আয়ের টাকাটা (অর্থাৎ যে টাকাটা খরচ করার জন্য বাজারে তারা নিয়ে এসেছে) নিঃশেষ করবে যে সংমিশ্রণ থেকে তারা সর্বাধিক উপযোগ বা তৃপ্তি পাবে।

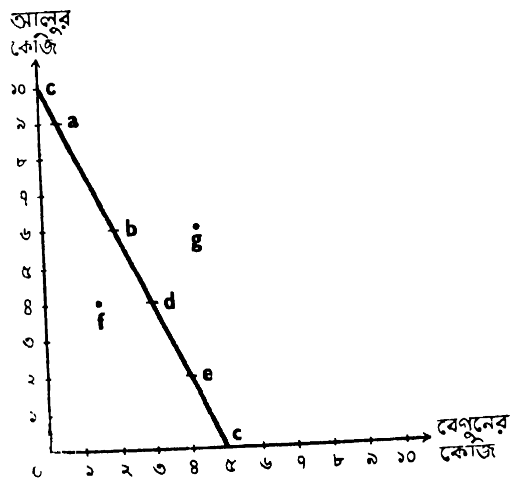
ধরা যাক, কোন ভোগীর সাপ্তাহিক আয় হল ১০ টাকা এবং বেগুন ও আলু এই দুটি দ্রব্য সে কিনবে এবং এদের দাম হল যথাক্রমে ২ টাকা কেজি ও ১ টাকা কেজি। সারণি ২'১০-এ বেগুন ও আলুর ৩টি বিভিন্ন সম্ভাব্য সংমিশ্রণ দেখান হল।

সারণি ২.১০

সপ্তাহে ১০ টাকা আয়ে বেগুন ও আলুর (২টি দ্রব্যের) বিকল্প ভোগ সম্ভাবনা

সংমিশ্রণ (১)	বেগুনের কেজি	আলুর কেজি (৩)	১ টাকা কেজি দরে বেগুনের জন্য খরচ (৪)	১ টাকা কেজি দরে আলুর জন্য খরচ (৫)	প্রতিটি সংমিশ্রণের জন্য মোট খরচ (৪)+(৫) (৬)
প্রথম	০	১০	০ টাকা	১০ টাকা	১০ টাকা
দ্বিতীয়	১	৮	২ „	৮ „	১০ „
তৃতীয়	২	৬	৪ „	৬ „	১০ „
চতুর্থ	৩	৪	৬ „	৪ „	১০ „
পঞ্চম	৪	২	৮ „	২ „	১০ „
ষষ্ঠ	৫	০	১০ „	০ „	১০ „

২.১০ সারণিতে বেগুন ও আলু কিনতে আগ্রহী একজন ক্রেতার কাছে ১০ টাকা খরচের উপযুক্ত ৬টি সম্ভাব্য সংমিশ্রণ দেখান হয়েছে। ২.১২ চিত্রেও তথ্যগুলি সাজান হয়েছে। লম্ব অক্ষরেখায় ১ টাকা কেজি দরে আলু কেনার সম্ভাব্য পরিমাণ ও সমান্তরাল অক্ষরেখায় ২ টাকা কেজি দরে বেগুন কেনার সম্ভাব্য পরিমাণ দেখান হয়েছে। প্রথম সংমিশ্রণে ১০ কেজি আলু ও ০ (শূন্য) কেজি বেগুন (মোট খরচ ১০ টাকা) এবং বিপরীত দিকে ৫ কেজি বেগুন ও ০ (শূন্য) কেজি আলু (মোট খরচ ১০ টাকা) কেনা সম্ভব হচ্ছে। এ দুটি বিন্দু যোগ করে cc রেখাটি পাওয়া গেল। এটি হল ভোগীর সম্ভাব্য বাজেট বা ব্যয় রেখা। এটি একটি সরলরেখা। এই রেখার উপর a, b, d, ও e বিন্দুগুলি যথাক্রমে ২.১০ সারণির দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম সংমিশ্রণ নির্দেশ করছে। প্রতিটি বিন্দুতে দ্রব্য দুটি কেনার পরিমাণ বিভিন্ন, কিন্তু ভোগীর মোট ব্যয় সমান এবং তা তার আয়ের সমান। সুতরাং ভোগীর বাজেট রেখা হল এমন একটি

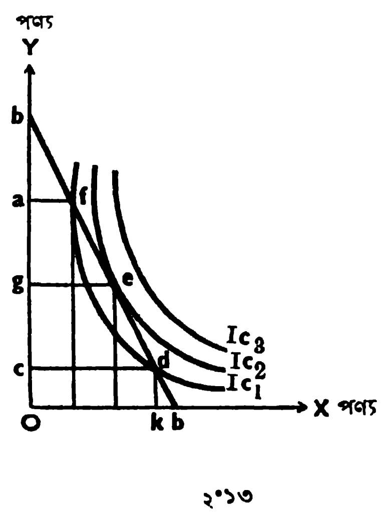


চিত্র ২.১২

সরলরেখা যা দুটি দ্রব্যের **কতকগুলি বিশেষ বিকল্প সংমিশ্রণ নির্দেশ করে এবং ঐ সংমিশ্রণের যে কোন একটি বাজার দামে কিনলে ভোগীর নির্দিষ্ট আয় ফুরিয়ে যায়।**

ভোগীর কাছে বাজেট রেখার তাৎপর্য হল,—(১) সে তার নির্দিষ্ট আয়ের দ্বারা দুটি পণ্যের কোন্ কোন্ সংমিশ্রণ কিনতে পারে তা বাজেট রেখা দেখিয়ে দেয়। (২) বাজেট রেখা আরও দেখিয়ে দেয়, বাজেট রেখার বাম দিকে কোন সংমিশ্রণ কিনতে গেলে (যেমন চিত্র ২.১২-এ f বিন্দুর সংমিশ্রণ) তার মোট আয় (যা সে ব্যয় করতে চায়) সম্পূর্ণ খরচ হবে না; তেমনি তার দক্ষিণে ও বাইরে কোন সংমিশ্রণ (যেমন চিত্র ২.১২-এর g বিন্দুর সংমিশ্রণ) কিনতে গেলেও তা ক্রেতার নির্দিষ্ট আয়ে সম্ভব হবে না।

৯. **ভোগীর ভারসাম্য: সর্বাধিক উপযোগের সংমিশ্রণ** (Consumer's Equilibrium : Utility Maximising Combination): এবার ২.১৩ চিত্রে ভোগীর অপক্ষপাত মানচিত্রের উপর তার বাজেট রেখা bb বসিয়ে দিয়ে, তার নির্দিষ্ট আয়ের দ্বারা কোন্ সংমিশ্রণটি কিনলে সে সর্বাধিক উপযোগ বা তৃপ্তি পাবে তা দেখান হল। চিত্র ২.১৩-তে Ic_3 অপক্ষপাত রেখাটি তার সাধ্যের বাইরে বলে এটির কথা আমরা বাদ দিতে পারি। Ic_1, অপক্ষপাত রেখাটিকে বাজেট রেখা bb, f বিন্দুতে ও d বিন্দুতে ছেদ করেছে। ফলে সে তার আয় সম্পূর্ণ খরচ করে এই দুটির যে কোন একটি সংমিশ্রণ থেকে সম-উপযোগ বা সমান তৃপ্তি পাবে। f বিন্দুর সংমিশ্রণটিতে সে পাবে X পণ্যের af পরিমাণ ও Y পণ্যের Oa পরিমাণ। d বিন্দুর সংমিশ্রণ থেকে সে পাবে X পণ্যের cd পরিমাণ ও Y পণ্যের dk পরিমাণ। কিন্তু তা ছাড়াও দেখা যাচ্ছে, তার বাজেট রেখা bb ডান দিকে উচ্চতর অপক্ষপাত রেখা Ic_2-কে e বিন্দুতে স্পর্শ করেছে। অর্থাৎ, সে তার নির্দিষ্ট আয় দিয়ে উচ্চতর অপক্ষপাত রেখার (Ic_2) e বিন্দুতে অবস্থিত অন্তত একটি সংমিশ্রণ কিনতে পারে। এবং Ic_1 অপক্ষপাত রেখার তুলনায় সে উচ্চতর উপযোগ বা তৃপ্তির স্তরে



২.১৩

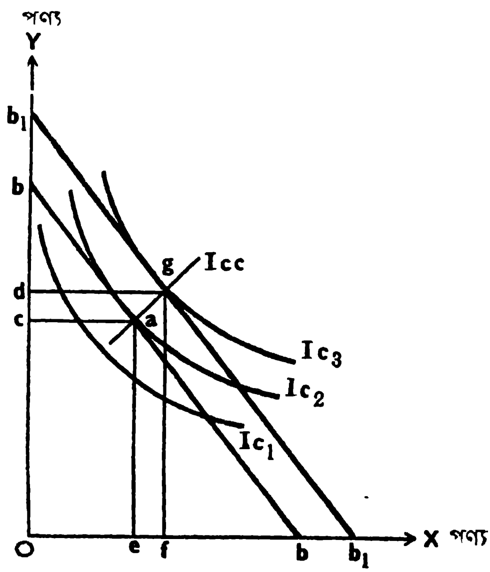
অবস্থিত Ic_2 অপক্ষপাত রেখার উপর যে কোন সংমিশ্রণ থেকে বেশি উপযোগ বা তৃপ্তি পাবে। সুতরাং, সে তার নির্দিষ্ট আয় নিম্নতর স্তরে অবস্থিত Ic_1 অপক্ষপাত রেখার উপর অবস্থিত যে কোন সংমিশ্রণের জন্য খরচ না করে, যুক্তিবাদী মানুষরূপে Ic_2 অপক্ষপাত রেখার উপর (e) সংমিশ্রণটি নিশ্চয়ই কিনবে (এ সংমিশ্রণটি কেনার

আর্থিক সাধ্য তার রয়েছে) এবং এতে সে সর্বাধিক উপযোগ বা তৃপ্তি পাবে। এবং তার নির্দিষ্ট আয়টিও সম্পূর্ণ খরচ হয়ে যাবে।

১০. আয়ের পরিবর্তনে ভারসাম্যের পরিবর্তন : আয় প্রভাব : অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে যদি ক্রেতার আয় বদলে যায় অর্থাৎ আয় বেড়ে কি কমে যায়, তাহলে তার ভারসাম্যের উপর এর ফলাফল কি হবে? ২.১৪ চিত্রের সাহায্যে তা দেখান হল।

ধরা যাক, ভোগীর সপ্তাহে আয় ১০ টাকা থেকে বেড়ে ১৫ টাকা হল। তার বাজেট রেখা আগে ছিল bb। আয় বেড়ে যাওয়ায় তার খরচ করার এবং দুটি পণ্য কেনার ক্ষমতা বেড়ে গেল, ফলে তার নতুন বাজেট রেখা ডান দিকে সরে গিয়ে হল b_1b_1। এবার সে b_1b_1 বাজেট রেখা অনুসারে সে খরচ করবে এবং সর্বাধিক উপযোগের সংমিশ্রণটি বেছে নেবে। পুরনো বাজেট রেখায় তার সর্বোৎকৃষ্ট সংমিশ্রণ ছিল Ic_2 রেখার উপর a বিন্দুতে। সেখানে সে ca পরিমাণ X পণ্য এবং ae পরিমাণ Y পণ্য কিনত। এবার নতুন বাজেট রেখা b_1b_1 উচ্চতর Ic_3 অপক্ষপাত রেখার g বিন্দুতে স্পর্শ করেছে। সুতরাং, তার কাছে এখন সর্বোৎকৃষ্ট সংমিশ্রণ হল dg পরিমাণ X পণ্য ও gf পরিমাণ Y পণ্য। এবং এই সংমিশ্রণ কিনে তার মোট আয় ১৫ টাকা সম্পূর্ণ খরচ হয়ে যাবে।

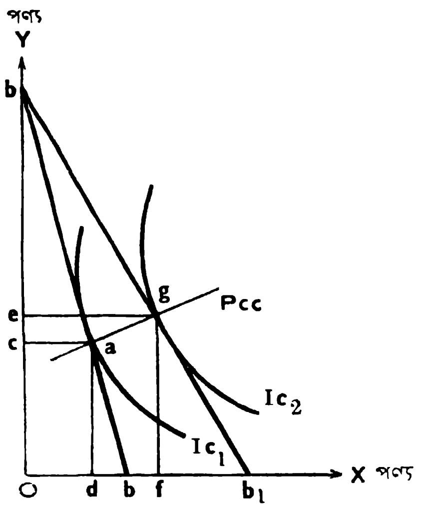
আয় বৃদ্ধির ফলে, ভোগী ভারসাম্য বিন্দু a থেকে ভারসাম্য বিন্দু g-তে চলে যাওয়ায় X এবং Y, দুটি পণ্যই আগের তুলনায় বেশি পরিমাণে ভোগ করতে পারছে। এই দুটি ভারসাম্য বিন্দু একটি রেখা দিয়ে যোগ করলে আয়ভোগ রেখা Icc (Income consumption curve) পাওয়া গেল। আয়ের পরিবর্তনে ভোগীর দুটি পণ্যেরই ভোগের পরিমাণে কিভাবে পরিবর্তন ঘটে, Icc রেখা তাই দেখিয়ে দেয়। এই হল ভোগ ও ভোগীর উপর আয়ের পরিবর্তনের ফল বা আয়-প্রভাব।



চিত্র ২.১৪

১১. দামের পরিবর্তনে ভারসাম্যের পরিবর্তন : দাম প্রভাব :

ভোগীর আয় যদি সপ্তাহে দশ টাকাই থাকে, এবং Y পণ্যের দামও যদি অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু X পণ্যের দাম যদি কমে যায়, তার ফলে ভোগীর ভারসাম্যে কি পরিবর্তন ঘটবে? ২.১৫ চিত্রে X ও Y পণ্য দুটির আগের দাম অনুযায়ী ভোগীর বাজেট রেখা ছিল bb এবং তা অপক্ষপাত রেখা Ic_1-কে a বিন্দুতে স্পর্শ করেছিল। তখন ভোগীর কাছে সর্বাধিক উপযোগের সংমিশ্রণ ছিল ca পরিমাণ X পণ্য ও ad পরিমাণ Y পণ্য। পরে Y পণ্যের দাম অপরিবর্তিত থেকে X পণ্যের দাম কমে গেলে ভোগীর নতুন বাজেট রেখা দাঁড়াল bb_1। অর্থাৎ দশ টাকা ব্যয়ে Y পণ্য আগের পরিমাণে (Ob) কিনতে পাওয়া গেলেও, এখন দশ টাকায় X পণ্যটির আগেকার Od পরিমাণের বদলে Ob_1 পরিমাণে কিনতে পারা যাচ্ছে। এই নতুন বাজেট রেখা bb_1, ডান দিকে উচ্চতর উপযোগের স্তরে অবস্থিত Ic_2 অপক্ষপাত রেখাকে g বিন্দুতে স্পর্শ করেছে। সুতরাং দশটাকা ব্যয়ে এখন ভোগীর পক্ষে eg পরিমাণে X পণ্যটি এবং gf পরিমাণে Y পণ্যটি কেনা ও ভোগ করা সম্ভব হচ্ছে।



চিত্র ২.১৫

ভোগীর আগের ভারসাম্য বিন্দু a এবং পরের ভারসাম্য বিন্দু g-কে একটি রেখা দিয়ে সংযুক্ত করলে দাম-ভোগ রেখা Pcc (Price comsumption curve) পাওয়া যায়। ভোগীর আয় ও একটি পণ্যের (Y) দাম অপরিবর্তিত থেকে অপর পণ্যটির (X) বিকল্প দামে, ভোগীর পক্ষে কি পরিমাণে দুটি পণ্য কেনা সম্ভব হতে পারে তা Pcc রেখাটি দেখিয়ে দিচ্ছে। এই হল ভোগ ও ভোগীর উপর, একটি পণ্যের দামের পরিবর্তনের ফল বা **দাম-প্রভাব**।

১২. **চাহিদা রেখা**: ২.১৫ চিত্রে দেখা যাচ্ছে, আগের দামে X পণ্যটি ca পরিমাণে ভোগীর পক্ষে কেনা সম্ভব হত। পরে X পণ্যের দাম কমে গেলে eg পরিমাণে কেনা সম্ভব হচ্ছে। অর্থাৎ দাম যখন বেশি ছিল, ভোগী X পণ্য কম পরিমাণে (ca) কিনত। দাম কমে গেলে ভোগী X পণ্যটি বেশি পরিমাণে (eg) কিনতে ইচ্ছুক হচ্ছে ও কিনতে পারছে। এটি চাহিদার বিধিরই প্রতিফলন। এই তথ্যের ভিত্তিতে তাই চাহিদার রেখাটি আঁকা গেলে আমরা চাহিদার সেই পুরাতন রেখাটিই দেখতে পাব, যা বাম দিকে উপর থেকে ডান দিকে ক্রমশ নিচে নামছে। এইভাবে অপক্ষপাত রেখা বা পছন্দ তত্ত্বটি চাহিদার বিধির বিকল্প বিশ্লেষণ উপস্থিত করে।

১৩. **পরিবর্ত প্রভাব** (Substitution effect): ২.১৫ চিত্রে আমরা

দেখছি, Y পণ্যের দামটি এবং ভোগীর আয় অপরিবর্তিত থেকে X পণ্যের দামটি কমে যাওয়ার দরুন ভোগী উপযোগের উচ্চতর স্তরে অবস্থিত Ic_2 রেখায় নতুন ভারসাম্য বিন্দু g-তে পৌঁছে কেবল যে X পণ্যটিই বেশি পরিমাণে কিনতে পারছে তা নয় (আগে কিনতে পারত Od পরিমাণে, এখন Of পরিমাণে, অর্থাৎ X পণ্য কেনার পরিমাণ বাড়ল df পরিমাণ), সে এখন Y পণ্যটিও যার দামের পরিবর্তন হয়নি) আগের তুলনায় বেশি পরিমাণে কিনতে পারছে (আগে কিনতে পারত Oc পরিমাণে, এখন কিনছে Oe পরিমাণে, অর্থাৎ ce পরিমাণ বেশি)। এর মানে হল, X পণ্যটির দাম যতটা কমল ভোগীর আয় বৃদ্ধিও যেন ঠিক ততটাই হল। ফলে, শুধু সস্তা পণ্যটিই নয়, দামী পণ্যটিও (অর্থাৎ যার দাম কমেনি) তার পক্ষে বেশি কেনা সম্ভব হয়। এটা হল দামের পরিবর্তনের দরুন ভোগের উপর আয়-প্রভাবের ফল। এখন, যে পণ্যটি সস্তা হল সেটি ভোগী বেশি পরিমাণে কিনছে। এর কারণ হল, ক) পণ্যটির দাম খানিকটা কমে যাওয়ায় ভোগীর আয় (পরোক্ষভাবে) বেড়েছে ; (খ) যে পণ্যটির দাম কমেনি (অর্থাৎ পণ্যটি দামী হয়েই রইল) সে পণ্যটির পরিবর্তে বেশি পরিমাণে সস্তা পণ্যটি ব্যবহার করার জন্য ভোগী কিনছে। একে বলে পরিবর্ত-প্রভাব। সুতরাং সস্তা পণ্যটির কেনার পরিমাণ দুটি কারণে বাড়ে: (১) একটি হল আয়-প্রভাব (আয় বেড়েছে বলে সেটি খানিক বেশি পরিমাণে কেনা হয়); (২) অন্যটি হল পরিবর্ত প্রভাব (দামী পণ্যটির স্থলে যতটা সম্ভব বেশি করে সস্তা পণ্যটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে)। অর্থাৎ, দামের পরিবর্তনের দরুন আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাব, এই দুটি প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া ঘটে। এজন্যই বলা হয়, দাম-প্রভাব (price effect) হল আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাবের সম্মিলিত ফল।

২. ১১. উৎপাদক সংস্থার দিক থেকে দ্রব্যের চাহিদা
Demand from the Individual Firm's view point

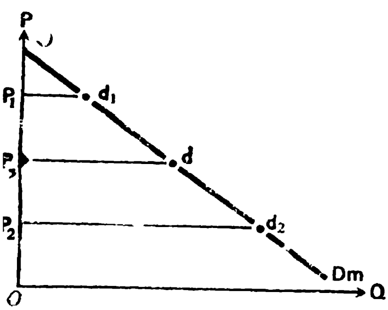
১. যে কোন ক্রেতার কাছে যে কোন পণ্যের চাহিদা রেখা হল একটি ঋণাত্মক ঢাল সম্পন্ন রেখা, বামদিকে উপর থেকে তা ডানদিকে নিচে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু একটি উৎপাদক সংস্থার কাছে তার পণ্যের চাহিদা রেখাটির (= পণ্যটির বিক্রয় রেখা) আকৃতি ওই রকম ঋণাত্মক ঢাল সম্পন্ন রেখা **হতেও পারে, নাও হতে পারে** ; তা হবে কি হবে না সেটা নির্ভর করে বাজারের কাঠাম বা গঠনের উপর।

২. বাজারের কাঠাম মূলত দু'ধরনের হতে পারে: (ক) নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার ; এবং (খ) একচেটিয়া বিক্রেতার বাজার।

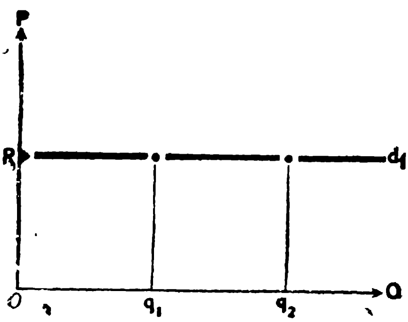
৩. **নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে**—(ক) থাকে অনেক বিক্রেতা কারবারী সংস্থা; (খ) তাদের মোট যোগানের পরিমাণটি হয় বিরাট ; (গ) বিক্রেতাদের দ্রব্যগুলির আকৃতি-প্রকৃতি একই রকমের ; (ঘ) সব বিক্রেতার যোগানের মোট পরিমাণটির তুলনায় কোন একজন বিক্রেতার যোগানের পরিমাণ এত সামান্য যে, কোন একজন বিক্রেতা তার যোগানের পরিমাণ কমালে বা বাড়ালে বাজারে পণ্যটির মোট যোগানে বিশেষ হেরফের হয় না (বাজারের মোট যোগান উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে হলে যে কোন বিক্রেতাকে তার নিজের দ্রব্যটির যোগান যে পরিমাণে বাড়াতে হবে,

ততটা বাড়ানো তার সাধ্যের বাইরে; আবার তার নিজের যোগান সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলেও বাজারের মোট যোগান তাতে এত সামান্য পরিমাণে কমবে যে, কেউ তা টের পাবে না); (৬) এই বাজারে (বাজার সব সময়েই মোট চাহিদা ও মোট যোগান দিয়ে নির্ধারিত) যে দামে পণ্যটি বিক্রি হয়, কোন ক্রেতাকে যেমন সে দামটি মেনে নিয়েই পণ্যটি কিনতে হয়, তেমনি ঐ দামটি মেনে নিয়েই কোন বিক্রেতাকেও তার দ্রব্যটি বিক্রি করতে হয়। ঐ দামে সে কম পরিমাণে বেচতে পারে, বেশি পরিমাণে বেচতে পারে, একেবারে নাও বেচতে পারে। কিন্তু ঐ দামের চেয়ে সামান্য একটু বেশি দামে সে দ্রব্যটির একটি এককও বেচতে পারে না, কারণ সে যদি বেশি দাম চায় তবে তার খরিদ্দারেরা অন্য বিক্রেতার কাছে চলে যাবে। অর্থাৎ এই বাজারে মোট যোগানকে কোন বিক্রেতা এককভাবে প্রভাবিত করতে পারে না বলে, বাজার দামকেও কোন বিক্রেতা এককভাবে বাড়াতে বা কমাতে পারে না। সুতরাং **এই বাজারে কোন কারবারী বিক্রেতা সংস্থা হল বাজার-দাম গ্রহণকারী** (price-taker)।

৪. **নিখুঁত প্রতিযোগিতায় বাজার চাহিদা রেখা ও কারবারী সংস্থার চাহিদা রেখাঃ** ক্রেতারা সকলেই চাহিদার নিয়মটির দ্বারা পরিচালিত হয়ে পণ্যটি কেনে। দাম বেশি হলে তারা কম পরিমাণে ও দাম কম হলে তারা বেশি পরিমাণে কেনে। ২·১৬ চিত্রে নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্যের মোট চাহিদা রেখা হল Dm; OP_1 দামে ক্রেতারা সকলে মিলে P_1d_1 পরিমাণ এবং OP_2



চিত্র ২·১৬ : নিখুঁত প্রতিযোগিতায় বাজারের মোট চাহিদা রেখা



চিত্র ২·১৭ : নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে যে কোন একটি কারবারী সংস্থার চাহিদা রেখা

দামে তারা P_2d_2 পরিমাণ কিনতে রাজী। কিন্তু বাজারে মোট চাহিদা ও মোট যোগানের অবস্থা অনুযায়ী OP দাম নির্ধারিত হয়েছে বলে ক্রেতারা সকলে মিলে OP দামে Pd পরিমাণে পণ্যটি কিনছে। কিন্তু এই বাজারেই, এই একই দামে (OP) যে কোন কারবারী সংস্থা যে কোন পরিমাণে তার উৎপন্ন দ্রব্যটি বেচতে পারে। ২·১৭ চিত্রে দেখা যাচ্ছে কোন একটি কারবারী সংস্থা OP দামে Oq পরিমাণও বেচতে পারে, আবার Oq_2 পরিমাণও বেচতে পারে। তাই তা

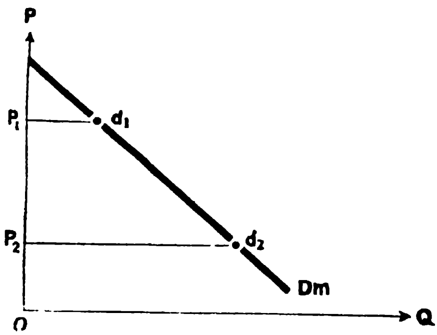
উৎপন্নের চাহিদা রেখাটি (df) রেখার যে আকৃতি নেয় সেটা অনুভূমিক সমান্তরাল।

৫. **নিখুঁত প্রতিযোগিতায় বাজার চাহিদা রেখা ও কারবারী সংস্থার চাহিদা রেখার স্থিতিস্থাপকতা :** (১) নিখুঁত প্রতিযোগিতায় বাজারের বা শিল্পের মোট চাহিদা রেখা একটি ঋণাত্মক ঢাল সম্পন্ন রেখা হয়ে থাকে। সুতরাং সাধারণ যে কোন চাহিদা রেখার মত তার বিভিন্ন বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন হয়ে থাকে (২·১৬ চিত্রে Dm রেখা)। কিন্তু নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে বা শিল্পে কোন একটি কারবারী সংস্থার উৎপন্নের চাহিদা রেখাটি অনুভূমিক সমান্তরাল রেখায় পরিণত হয় বলে সে রেখাটির প্রতি বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অসীম ($E = \infty$) হয়ে থাকে (২·১৭ চিত্রে df রেখা)।

(২) এর অর্থ হল, নিখুঁত প্রতিযোগিতায় সমগ্র বাজারের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার (Dm) চেয়ে সে বাজারে যে কোন কারবারী সংস্থার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (df) অনেক বেশি হয় ($df > Dm$)।

৬. **একচেটিয়া বাজারে**—পণ্যের উৎপাদক বা বিক্রেতা কারবারী সংস্থা থাকে মাত্র একটি। সুতরাং এখানে একটি মাত্র কারবারী সংস্থা নিয়েই সমগ্র শিল্পটি গঠিত। অতএব একচেটিয়া কারবারী সংস্থাটি যে পরিমাণে পণ্যটি উৎপাদন ও বিক্রয় করে একচেটিয়া বাজারে তাই হল পণ্যের মোট যোগানের পরিমাণ (একচেটিয়া কারবারী সংস্থার মোট উৎপাদন = বাজারের মোট যোগান)। শিল্পে বা বাজারে পণ্যটির মোট চাহিদা রেখাটিই হল এখানে একচেটিয়া বা একমাত্র কারবারী সংস্থার পণ্যের চাহিদা রেখা। এ রেখাটি হল চিরাচরিত চাহিদা রেখা এবং এটি ঋণাত্মক ঢাল সম্পন্ন। অর্থাৎ, দাম বেশি হলে ক্রেতাদের চাহিদার পরিমাণ কমে ও দাম কম হলে ক্রেতাদের চাহিদার পরিমাণ বাড়ে। ২·১৮ চিত্রে একচেটিয়া কারবারী সংস্থার (একচেটিয়া বাজারের) পণ্যের মোট চাহিদা রেখাটি দেখান হল।

একচেটিয়া বাজারে একচেটিয়া কারবারী হল একমাত্র যোগানদার। তার কোন প্রতিযোগী নেই। সুতরাং একচেটিয়া বাজারে পণ্যের চাহিদা রেখা (Dm) = একচেটিয়া কারবারী সংস্থার মোট চাহিদা রেখা (df)। দাম বেশি হলে (OP_1) চাহিদার পরিমাণ কম (P_1d_1), দাম কম হলে (OP_2) চাহিদার পরিমাণ বেশি হয় (P_2d_2)।



চিত্র ২·১৮ : একচেটিয়া কারবারীর ও একচেটিয়া বাজারের পণ্যের চাহিদা রেখা

এই চাহিদা রেখার আকৃতি অনুযায়ী তার বিভিন্ন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতাও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। সুতরাং নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে যে কোন

একটি কারবারী সংস্থার উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যেমন অসীম বলে গণ্য করা হয়, একচেটিয়া কারবারী সংস্থার পণ্যের চাহিদা রেখার স্থিতিস্থাপকতা কিন্তু তা নয়। সেটা অসীম স্থিতিস্থাপকতার চেয়ে কম $(E < \infty)$। এর অর্থ হল : (১) নিখুঁত প্রতিযোগিতায় কোন একটি কারবারী সংস্থা যেমন চলতি বাজার দাম মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং সেই দামে সে কম বা বেশি পরিমাণ পণ্য বেচতে পারে, একচেটিয়া কারবারী কিন্তু তা পারে না। বেশি পরিমাণে বেচতে চাইলে তাকে দাম কমাতে হয়, বেশি দামে বেচতে চাইলে তাকে কম পরিমাণে পণ্য বেচতে হয়।

(২) একচেটিয়া কারবারী সংস্থা বাজারে একমাত্র যোগানদার বলে, তার একার যোগানই হল বাজারে পণ্যের মোট যোগান। তাই সে যোগান কমিয়ে দিয়ে বাজারের দামটা খানিকটা বাড়িয়ে দিতে পারে, কিংবা যোগানটা বাড়িয়ে দিয়ে বাজারের দামটা খানিক কমিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ একচেটিয়া কারবারী বাজারে চলতি দাম মেনে নিয়ে সে দামে তার উৎপন্ন বেচে না। দাম কি হবে সেটা একচেটিয়া কারবারী নিজেই অনেকটা পরিমাণে স্থির করে দেয় (price maker)।

২.১২. আয় তালিকা বা আয় রেখা

Revenue Schedules

১. নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারই হোক, আর একচেটিয়া বাজারই হোক, সে বাজারে কোন কারবারী সংস্থার উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রির পরিমাণ এবং বিক্রয় লব্ধ আয় আসলে নির্ভর করে তার উৎপন্নের চাহিদা রেখার প্রকৃতি ও স্থিতিস্থাপকতার উপর। অর্থাৎ কোন কারবারী সংস্থার আয় রেখার (revenue curve) রূপটি কি হবে তা স্থির করে দেয় ঐ সংস্থার উৎপন্নের চাহিদা রেখার প্রকৃতি ও স্থিতিস্থাপকতা।

২. **কারবারী সংস্থার আয়ের বিশ্লেষণ :** কোন কারবারী সংস্থার আয় তিনটি দিক থেকে বিচার করা যায় : (ক) বিক্রয়লব্ধ **মোট আয়** (total revenue) —কোন নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট দামে (P), নির্দিষ্ট পরিমাণে (Q) পণ্য বিক্রয় করে বিক্রেতা যে মোট আর্থিক আয় উপার্জন করে তা হয় তার বিক্রয়লব্ধ মোট আয় (TR)। অর্থাৎ $P \times Q = TR$।

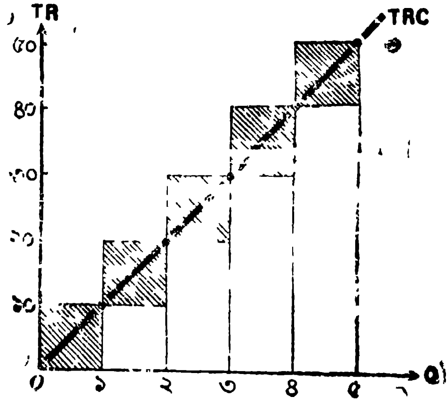
(খ) **গড় আয়** (average revenue)—বিক্রয়লব্ধ মোট আয়কে (TR) পণ্য বিক্রির মোট পরিমাণ (Q) দিয়ে ভাগ করা হলে $(TR \div Q)$ যে ভাগফল পাওয়া যায় তা হল বিক্রেতার গড় আয় (AR)। গড় আয় হল বিক্রেতার বিক্রয়-করা পণ্যের একক পিছু আয়। অর্থাৎ $TR \div Q = AR$।

(গ) **প্রান্তিক আয়** (marginal revenue)—পণ্যের মোট বিক্রির পরিমাণ একটি একক বাড়ালে $(x \times 1$ unit) মোট আয় যতটুকু বাড়ে কিংবা মোট বিক্রির পরিমাণ একটি একক কমালে $(x - 1$ unit) মোট আয় যতটুকু কমে উভয়ক্ষেত্রে ততটুকু হল বিক্রেতার প্রান্তিক আয় (MR)। অর্থাৎ $MR = TR(x+1) - TRx$ অথবা $MR = TRx - (TRx - 1)$।

অর্থাৎ, বিক্রয়ের পরিমাণে সামান্য পরিবর্তনের দরুন মোট আয় যে হারে পরিবর্তিত হয় (অর্থাৎ, মোট আয় ও মোট বিক্রয়, এই দুইটির পরিবর্তনের অনুপাত)

সারণি ২·১১

Q (১)	P (২)	TR (৩) (Q×P)	AR (৪) TR÷Q	MR (৫)
১	১০	১০	১০	১০
২	১০	২০	১০	১০
৩	১০	৩০	১০	১০
৪	১০	৪০	১০	১০
৫	১০	৫০	১০	১০



চিত্র ২·১৯ : নিখুঁত প্রতিযোগিতায় একটি কারবারী সংস্থার মোট আয় রেখা

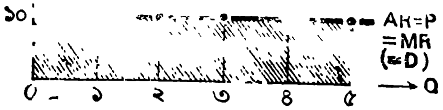
সেটাই হল প্রান্তিক আয়। অর্থাৎ $MR = \frac{\Delta R \text{ (মোট আয়ের পরিবর্তন)}}{\Delta Q \text{ (মোট বিক্রয়ের পরিবর্তন)}}$

৩. **নিখুঁত প্রতিযোগিতায় কারবারী সংস্থার মোট, গড় ও প্রান্তিক আয়ঃ** (ক) নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে কোন কারবারী সংস্থার মোট, গড় ও প্রান্তিক আয় ২·১১ সারণি দিয়ে, মোট আয় রেখা ২·১৯ চিত্রে এবং গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা ২·২০ চিত্রে দেখান হল।

নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে একটি কারবারী সংস্থার পণ্যের চাহিদা রেখার আকৃতি অনুভূমিক রেখার সমান্তরাল ও তার স্থিতিস্থাপকতা অসীম বলে (চিত্র ২·১৭) চলতি বাজার দামে সে কম বা বেশি পরিমাণে পণ্য বেচতে পারে। ২·১১ সারণিতে তাই দেখান হয়েছে। ১০ টাকা বাজার দামে [(২) কলম] বিক্রির পরিমাণ [(১) কলম] বাড়ানোর সাথে সাথে, যে অনুপাতে তার মোট বিক্রির পরিমাণ Q বাড়ছে ঠিক সেই অনুপাতে তার মোট আয় TR-ও বাড়ছে [(৩) কলম]। ফলে ২·১৯ চিত্রে দেখা যাচ্ছে তার মোট আয় রেখা TRC বাম দিক থেকে ডান দিকে ধনাত্মক ঢাল নিয়ে O বিন্দু থেকে কোণাকুণি সোজা (৪৫° কোণে) ডান দিকে উঠছে।

২·১১ সারণিতে আরও দেখা যাচ্ছে একই দামে আগাগোড়া পণ্যের বিভিন্ন এককগুলি বিক্রি হচ্ছে বলে বিক্রেতার গড় আয় (AR) আগাগোড়া একই থাকছে [(৪) কলম] এবং তা দামের সমান হচ্ছে (P = MR)। দাম আগাগোড়া অপরিবর্তিত রয়েছে বলে তার প্রান্তিক আয়ও [(৫) কলম] একই থাকছে এবং সেটাও দামের

সমান এবং গড় আয়ের সমান হচ্ছে (P=AR=MR)। এই কারণে ২·২০ চিত্রে দেখা যাচ্ছে কোন কারবারী সংস্থার গড় আয় রেখা ও প্রান্তিক আয় রেখাটি পরস্পরের সাথে মিশে গেছে। এটি আবার কারবারী সংস্থার দামের রেখা বা চাহিদার রেখাও বটে। নিখুঁত প্রতি-যোগিতায় কোন কারবারী সংস্থার চাহিদা রেখা অসীম-স্থিতিস্থাপক হয় বলে তার গড় আয় ও প্রান্তিক আয় সর্বদা তার পণ্যের বাজার-দামের সমান হয় এবং চাহিদা বা দাম রেখার সাথে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা মিশে গিয়ে একটি স্থিতিস্থাপক ও অনুভূমিক সমান্তরাল রেখায় পরিণত হয়।

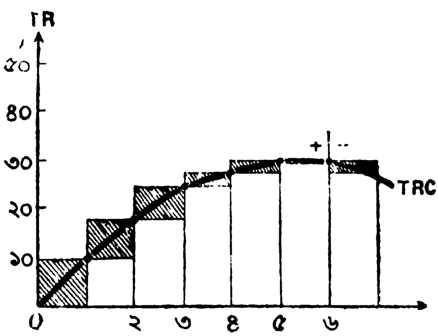


চিত্র ২·২০ নিখুঁত প্রতিযোগিতায় যে কোন কারবারী সংস্থার গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা

৪. **একচেটিয়া বিক্রেতার মোট গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা :** একচেটিয়া কারবারী সংস্থা বাজারে একমাত্র বিক্রেতা হওয়ায় তার পণ্যের চাহিদা রেখাটাই বাজারের মোট চাহিদা রেখা। তার ঢাল ঋণাত্মক (২·১৮ চিত্র)। এর অর্থ দাম বেশি হলে পণ্য বিক্রি হবে কম এবং দাম কম হলে পণ্য বিক্রি হবে বেশি।

সারণি ২·১২

Q	P	TR (Q×P)	AR (TR÷Q)	MR
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১	১০	১০	১০	১০
২	৯	১৮	৯	৮
৩	৮	২৪	৮	৬
৪	৭	২৮	৭	৪
৫	৬	৩০	৬	২
৬	৫	৩০	৫	০
৭	৪	২৮	৪	২



চিত্র ২·২১

একচেটিয়া বিক্রেতার মোট আয় রেখা

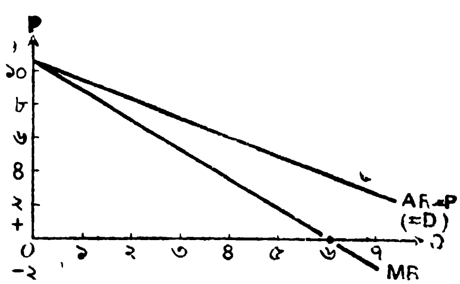
২·১২ সারণি-তে দেখা যাচ্ছে, একচেটিয়া বিক্রেতা বিক্রির পরিমাণ (Q) যত বাড়াচ্ছে ততই তাকে দাম (P) কমাতে হচ্ছে। এর ফলে, মোট বিক্রয়লব্ধ আয় (TR) বাড়ছে বটে, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—(ক) বিক্রির পরিমাণ যে হারে বাড়ছে মোট আয় বাড়ছে তার চেয়ে কম হারে ; (খ) ৫ম এককে মোট আয়

সর্বাধিক হয়েছে ; (গ) ৬ষ্ঠ এককে মোট আয় অপরিবর্তিত রয়েছে এবং (ঘ) ৭ম এককে মোট আয় কমে গেছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে ২·২১ চিত্রে একচেটিয়া বিক্রেতার মোট আয় রেখা TRC দেখান হল। ২·১৯ চিত্রের সাথে এর তুলনা করলে, নিখুঁত প্রতিযোগিতায় কারবারী সংস্থার মোট আয় রেখার আকৃতির সাথে একচেটিয়া বাজারে কারবারী সংস্থার মোট আয় রেখার আকৃতির পার্থক্যটি স্পষ্ট হবে।

২·১২ সারণিতে আরও দেখা যাচ্ছে একচেটিয়া বিক্রেতার গড় আয় (AR) সর্বদা দামের সমান (AR = P) থাকছে। নিখুঁত প্রতিযোগিতায়ও বিক্রেতার গড় আয় বাজার দামের সমান হয়ে থাকে। এর কারণ, বিক্রির পরিমাণকে (Q) দাম (P) দিয়ে গুণ করলে (Q × P) মোট আয় (TR) পাওয়া যায় ; সুতরাং সেই মোট আয়কে (TR) বিক্রির পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে (TR ÷ Q) ভাগফল দামের সমানই হবে। তবে বিক্রির পরিমাণ বাড়ার সাথে দাম কমছে বলে গড় আয়ও কমছে। এজন্যই একচেটিয়া বিক্রেতার গড় আয়-রেখার ঢাল ঋণাত্মক হয়ে থাকে।

এবার ২·১২ সারণির (৫) কলমের প্রান্তিক আয়ের সাথে যদি (৪) কলমের গড় আয়ের তুলনা করা যায় তা হলে দেখা যায় : (ক) বিক্রির পরিমাণ (Q) বৃদ্ধির (↑) সাথে সাথে দাম কমাতে হচ্ছে (P ↓) বলে, গড় আয় কমছে (AR ↓), ফলে প্রান্তিক আয়ও কমছে (MR ↓) ; (খ) প্রান্তিক আয় হল অতিরিক্ত এক একক বিক্রয় করার আগেকার মোট আয়ের সাথে অতিরিক্ত এক একক বিক্রয় করার পরেকার মোট আয়ের পার্থক্য ; গড় আয় যখন কমছে তখন প্রান্তিক আয় গড় আয়ের চেয়ে কম হচ্ছে (AR ↓ = P ↓ > MR ↓) এবং গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের পার্থক্যটা বেড়ে যাচ্ছে ; (গ) মোট আয় যখন সর্বাধিক এবং সেখানে সাময়িকভাবে অপরিবর্তিত (৫ ও ৬ একক বিক্রির সময়) থাকছে ঠিক তখন প্রান্তিক আয় শূন্যে পরিণত হয়েছে (MR ↓ = O) ; এবং (ঘ) মোট আয় যখন কমছে তখন প্রান্তিক আয় ঋণাত্মক (−) হয়ে পড়েছে (৭ একক বিক্রির সময়)।

২·১২ সারণির ভিত্তিতে ২·২২ চিত্রে একজন বিক্রেতার গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের রেখা দুটি দেখান হয়েছে। বিক্রির পরিমাণ যতই বাড়ছে—(ক) ততই গড় আয় রেখাটি বাম দিক থেকে ডান দিকে নিচের দিকে নামছে (AR ↓ = P ↓)। এটি যেমন তার দাম রেখা তেমনি পণ্যের চাহিদা রেখাও বটে (AR = P = D) ; (খ) গড় আয় রেখার ঢাল ঋণাত্মক (−) বলে (অর্থাৎ গড় আয় কমছে) প্রান্তিক আয় রেখাটি (MR) গড় আয় রেখার (AR) নিচে রয়েছে (অর্থাৎ প্রান্তিক আয় গড় আয়ের কম



চিত্র ২·২২ : একচেটিয়া বা একক বিক্রেতার গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা

হচ্ছে) ; এবং (গ) যতই বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ছে ততই গড আয়ের সাথে প্রান্তিক আয়ের পার্থক্য বাড়ছে বলে গড আয় রেখার সাথে প্রান্তিক আয় রেখাটির দূরত্ব বাড়ছে এবং প্রান্তিক আয় রেখা বাম দিকে সরে যাচ্ছে। ২·২০ চিত্রের সাথে ২·২২ চিত্রের তুলনা করলে নিখুঁত প্রতিযোগিতায় কারবারী সংস্থার গড় ও প্রান্তিক আয় রেখার সাথে একচেটিয়া বাজারে কারবারী সংস্থার গড় ও প্রান্তিক আয় রেখার পার্থক্যটি স্পষ্ট হবে।

৩ উৎপাদন ও উৎপাদন খরচ

PRODUCTION & COSTS

৩. ১. উৎপাদন
Production

১. **'উৎপাদন' শব্দটির অর্থ :** অর্থবিদ্যায় উৎপাদন বলতে বোঝায় উপযোগ সৃষ্টি। উপযোগ চার রকমের : আকার বা রূপগত (form utility), স্থানগত (place utility), সময় বা কালগত (time utility) ও সেবাগত (service utility)। প্রথমটি সৃষ্টি হয় নানা প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক ও অন্যান্য উপকরণের রূপান্তরের দ্বারা। অন্যগুলি সৃষ্টি হয় পরিবহণ, গুদামজাতকরণ, অর্থসংস্থান, বীমা, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায় প্রভৃতির দ্বারা। উপযোগ সৃষ্টির ফলে ব্যবহারিক ও বিনিময় মূল্য জন্মায়। বাজারে যা বিনিময়যোগ্য, যার বিক্রয়মূল্য আছে উৎপাদন সংস্থাগুলি তাই উৎপাদন করে। অর্থাৎ তাদের কাজের দ্বারা, উৎপাদন কর্মের দ্বারা মূল্য সৃষ্টি হয়।

২. **উপাদান** (Factors) **:** যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ, মানুষের বল, বুদ্ধি ও দক্ষতা, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার—যা কিছু উৎপাদনে লাগে তার সবই হল উৎপাদনের উপকরণ (resources)। সমস্ত উপকরণকে তাদের পারস্পরিক সাদৃশ্য অনুসারে চারটি প্রধান বর্গ বা গোষ্ঠীতে ভাগ করে এক একটিকে এক একটি উপাদান বলে গণ্য করা হয়। সুতরাং উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণ চারটি উপাদানে বিভক্ত। এরা হল : (১) ভূমি (যাবতীয় প্রাকৃতিক উপকরণ) ; (২) শ্রম (যাবতীয় মানবিক বল ও বুদ্ধির প্রয়োগ) ; (৩) পুঁজি (অংশত প্রাকৃতিক উপকরণের দ্বারা মানুষের বুদ্ধিতে ও শ্রমে পরিণত উৎপাদনের যাবতীয় যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, হাতিয়ার) ; এবং (৪) উদ্যোগ বা সংগঠন (আগের তিনটি উপাদানকে একত্রিত করার ও সংগঠিতভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মানুষের শ্রম)।

৩. **উপাদান-সেবা ও উৎপন্ন** (Inputs and outputs) **:** উপাদান হল ভৌত উপকরণ (physical resource)। তার কাজটা হল উপাদান-সেবা। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে উপাদানের কাজ বা সেবাটাই মিশে যায়, উপাদানটি মিশে যায় না। উৎপন্ন ফসলের মধ্যে জমির উর্বরতার শক্তিটাই ঢোকে, জমি যেমনটি ছিল, তেমনি পড়ে থাকে। কারখানাতে শ্রমিকদের কাজ বা সেবাটাই তৈরী জিনিসের অঙ্গীভূত হয়, শ্রমিকরা হয় না। চারটি উপাদানের সেবার দ্বারা যা সৃষ্টি হয় তারই নাম হল উৎপন্ন দ্রব্য বা 'উৎপন্ন' (product)। উৎপন্নের পরিমাণ ও গুণাগুণ নির্ভর করে উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদান সেবাগুলির পরিমাণ ও উৎপাদন প্রক্রিয়া পদ্ধতির উপর। একে বলে উপাদান-সেবা ও উৎপন্নের সম্পর্ক (input-output relationship)।

৩. ২. উৎপাদনের উপাদানসমূহ
Factors of Production

১. **ভূমি** (Land or Natural Resources) **ঃ** অর্থবিদ্যায় ভূমি শব্দটির দ্বারা কেবল জমি নয়, যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ বা উপকরণকেই বোঝায়। ভূমি হল প্রথম মৌলিক উপাদান। প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব। খাদ্য, পানীয়, পরিধেয় সবই প্রাকৃতিক উপকরণের সাহায্যে সৃষ্টি হয়। দেশের দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন তার প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। এই প্রাকৃতিক সম্পদই দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিস্তার, কর্মসংস্থান ও জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি নির্ধারণ করে। এই হল ভূমির গুরুত্ব।

ভূমির বৈশিষ্ট্য হল,—(ক) প্রকৃতির দান বলে এর কোন উৎপাদন-খরচ নেই। (খ) বিভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে ভূমিব বণ্টন অসমান। (গ) ভূমির মোট যোগান সীমাবদ্ধ। মানুষের চেষ্টায় তার পরিমাণ বাড়ানো বা কমানো যায় না। (ঘ) ভূমির গুণ, মান এবং অবস্থানে বৈষম্য রয়েছে। সব জমি সমান উর্বর নয়, সব খনির লৌহ একই রকম নয়। (ঙ) ভূমির সচলতা নেই।

২. **শ্রম** (Labour) **ঃ** অর্থবিদ্যায় 'শ্রম' বলতে মানুষের শারীরিক ও মানসিক দু'রকম পরিশ্রমকেই বোঝায়। এটি হল উৎপাদনের দ্বিতীয় মৌলিক উপাদান।

শ্রমের বৈশিষ্ট্য হল,—(ক) শ্রমিকের কাছ থেকে তার শ্রমশক্তিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কিন্তু জমি ও জমির মালিকের দুটি আলাদা অস্তিত্ব থাকে। জমির মালিক নিজে জমি চাষ করতেও পারে, না-ও পারে। কিন্তু শ্রমের মালিক অর্থাৎ শ্রমিককে নিজের শ্রম নিজেকেই উৎপাদনের কাজে প্রয়োগ করতে হয়। এই কারণে কাজের পরিবেশ ও শর্তাবলী শ্রমিক ও শ্রমিকের কাজকে তথা উৎপাদনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। (খ) শ্রমশক্তি সঞ্চয় করা যায় না। তাই মজুরির দরকষাকষিতে মালিকের তুলনায় শ্রমিক দুর্বল। সে দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য তাদের সংঘশক্তির দরকার হয়। (গ) শ্রমের যোগান ভূমির মত সীমাবদ্ধ ও অপরিবর্তনীয় নয়। জনসংখ্যা, জন্মহার, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, দক্ষতা, জনসমষ্টির আগমন ও নির্গমণ, কাজের সময় ইত্যাদির পরিবর্তনে শ্রমের যোগান পরিবর্তিত হয়। (ঘ) শ্রমশক্তি সচল, ভূমির মত স্থাণু নয়। (ঙ) শ্রমের যোগানের ক্ষেত্রে অনেক সময় যোগানের সাধারণ নিয়ম খাটে না। সাধারণত, দাম বাড়লে জিনিসের যোগান বাড়াতে উৎপাদনকারীরা উৎসাহিত হয়। তার ফলে যোগান বাড়ে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, মজুরি বাড়লে শ্রমের যোগান না বেড়ে, বরং কমে যায়। তার কারণ, শ্রমিকরা তাদের নির্দিষ্ট আয়ে একটি নির্দিষ্ট জীবনমানে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে, অল্প মজুরিতে পরিবারের বেশি লোক খাটে। মজুরি বাড়লে, পরিবারের অল্প লোক খাটে।

৩. **পুঁজি ঃ** পুঁজি হল উৎপাদনের তৃতীয় উপাদান। কিন্তু এটি মৌলিক উপাদান নয়, মিশ্র উপাদান। অংশত প্রাকৃতিক উপকরণ ও অংশত শ্রমশক্তি দিয়ে এটি গঠিত। পুঁজি হল, প্রাকৃতিক উপকরণ ও শ্রমশক্তির সমন্বয়ে গঠিত এমন একটি

সম্পদ যা অন্যান্য সম্পদ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়। এ কারণে, পুঁজিকে 'উৎপাদনের উৎপাদিত উপায়' (produced means of production) বলা হয়। এর দৃষ্টান্ত হল, বীজ ধান, উৎপাদনের হাতিয়ার, সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি। এগুলি সবই দ্রব্য। এজন্য পুঁজিকে বলা হয় উৎপাদকের দ্রব্য (producer's goods) বা পুঁজি দ্রব্য (capital goods)। এই হল পুঁজি শব্দটার প্রকৃত অর্থ। অর্থবিদ্যার ভাষায়, এটাই হল প্রকৃত পুঁজি (real capital)।

পুঁজির বৈশিষ্ট্য : (ক) পুঁজি হল একদিকে প্রাকৃতিক উপকরণ ও মানুষের অতীত শ্রমের মিশ্র ফল, অন্যদিকে মানুষের অতীত সঞ্চয়ের ফল। (খ) পুঁজির উৎপাদন খরচ আছে। (গ) পুঁজির যোগান পরিবর্তনীয়। (ঘ) পুঁজি উৎপাদনশীল এবং ভবিষ্যৎ আয়ের সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী। (ঙ) পুঁজি ক্ষয়শীল।

পুঁজির রূপ তিনটি : (ক) প্রকৃত পুঁজি বা দ্রব্য পুঁজি কিংবা পুঁজি দ্রব্য, যা প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। (খ) অর্থ পুঁজি বা নগদ টাকা, যা নিজে প্রকৃত পুঁজি নয় বটে, কিন্তু দ্রব্য পুঁজি সংগ্রহের একটি উপায়। (গ) ঋণ পুঁজি, যা অন্যের কাছ থেকে আর্থিক ঋণ হিসাবে নিয়ে তার সাহায্যে দ্রব্য পুঁজি সংগ্রহ করা যায় এবং ঋণদাতার কাছে ঐ ঋণ সুদ উপার্জনের উপায় হয়ে দাঁড়ায়। সরকারী ঋণপত্র, বন্ধকী তমসুক, হ্যাণ্ডনোট, কোম্পানীর ডিবেঞ্চার ইত্যাদি হল এর দৃষ্টান্ত।

পুঁজির প্রকারভেদ : মালিকানা অনুযায়ী পুঁজিকে তিন প্রকারে ভাগ করা যায় : (১) ব্যক্তিগত পুঁজি (personal capital) : নিজের মালিকানাধীন যে সম্পদের দ্বারা ব্যক্তি আয় উপার্জন করে সে সম্পদ তার ব্যক্তিগত পুঁজি। সে যদি বাড়ি ভাড়া দিয়ে থাকে তাহলে সে বাড়িটি, তার যদি সঞ্চিত অর্থ থাকে, তবে সে অর্থ, ব্যাঙ্কে আমানত হিসাবে যদি তার টাকা থাকে, তবে সে টাকা সে যদি নানা-রকমে ঋণপত্র কিনে থাকে তবে সে ঋণপত্র—এসবই তার ব্যক্তিগত পুঁজি। (২) কারবারী পুঁজি (business capital) : ব্যবসায়ে, বাণিজ্যে ও শিল্পে নিযুক্ত কারবারীরা আয় উপার্জনের জন্য তাদের যে টাকা, দ্রব্যসামগ্রী ও ঋণ খাটায় তা হল কারবারী পুঁজি। (৩) সামাজিক পুঁজি (social or national capital) : প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়া, দেশের ব্যক্তিবর্গের, কারবারী সংস্থাগুলির এবং রাষ্ট্রের অধীনে যে সব সম্পদ কোন না কোন দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয় তার সমষ্টিকে বলে সামাজিক বা জাতীয় পুঁজি।

কারবারী পুঁজির প্রকারভেদ : কারবারী সংস্থায় সাধারণত দুই রকমের পুঁজি লাগে : (১) স্থির পুঁজি এবং (২) কার্যকর পুঁজি।

(১) স্থির পুঁজি (fixed capital) : কারবারের আর্থিক পুঁজির একটি অংশ লাগে তার যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, সাজসরঞ্জাম, গুদাম, অফিস বাড়ি, জমি ইত্যাদির সংস্থান করতে। এই সম্পত্তিগুলি অনেকদিন ধরে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যায় বলে এইগুলিকে বলে কারবারের স্থায়ী সম্পত্তি (fixed assets)। এদের সংস্থান করতে কারবারী সংস্থার আর্থিক পুঁজির একটা বড় অংশ খরচ হয়ে যায় এবং প্রতি বৎসর মুনাফা থেকে এর একটা সামান্য অংশ উঠে আসে। সুতরাং তার

সম্পূর্ণটা ফিরে পেতে অনেকদিন লাগে। এই সমস্ত স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা পুঁজিকে বলা হয় কারবারের স্থায়ী (অথবা স্থির) কিংবা দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি (fixed or long term capital)।

(২) কার্যকর পুঁজি (working capital): কারবারী সংস্থার পুঁজির আরেকটি অংশ লাগে কাঁচামাল কিনতে, তৈরী ও আধা-তৈরী দ্রব্যসামগ্রী কিনতে, সপ্তাহে সপ্তাহে বা মাসে মাসে শ্রমিকদের মজুরি দিতে, উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ, কয়লা ও তেলের দাম দিতে, উৎপন্ন দ্রব্য মজুত রাখতে ও ধারে বিক্রি করতে। এগুলি হল কারবারের অস্থায়ী (বা চলতি) সম্পত্তি (current assets)। কারবারের চলতি সম্পত্তির সংস্থানের জন্য কারবারী সংস্থার পুঁজির যে অংশ ব্যবহার বা বিনিয়োগ করা হয় তাকে বলে কার্যকর পুঁজি। তৈরী দ্রব্যসামগ্রীগুলি বিক্রি হয়ে গেলে বিক্রয় লব্ধ অর্থ থেকে এ পুঁজি নির্দিষ্ট কাল পর পর কারবারীর হাতে ফিরে আসে এবং একটা সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ উঠে আসে। এজন্য কার্যকর পুঁজিকে আবর্তমান পুঁজিও (circulating or revolving capital) বলে। অল্পকাল পরেই বিক্রয়লব্ধ আয় থেকে এ টাকাটা সম্পূর্ণ ফিরে পাওয়া যায় বলে এটা এক নাগাড়ে বেশি দিন খাটে না। এজন্য কার্যকর পুঁজিকে স্বল্প মেয়াদী পুঁজি (short term capital) বলে গণ্য করা হয়।

পুঁজিগঠন: পুঁজিগঠন হল একটি প্রক্রিয়া বা কাজের নির্দিষ্ট ধারা। যে প্রক্রিয়ায় অর্থের সঞ্চয় ঘটে, সঞ্চিত অর্থ বা আর্থিক সঞ্চয় সংগৃহীত হয় এবং সংগৃহীত সেই সঞ্চয় পুঁজি অর্থাৎ নতুন দ্রব্য পুঁজি বা নতুন প্রকৃত পুঁজিতে বা বিনিয়োগে পরিণত হয়, তাকে বলে পুঁজিগঠন প্রক্রিয়া বা সংক্ষেপে, পুঁজিগঠন।

পুঁজিগঠনের অর্থ: ১. যার মাসিক আয় ৪০০ টাকা, সে যদি তার সবটাই প্রতি মাসে সংসার চালাতে খরচ করে, তাহলে তার আয়ের সবটাই ভোগের জন্য অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্যের বা সেবার জন্য খরচ হচ্ছে (তার ভোগ প্রবণতা হল ১-এর সমান)। তার হাতে কিছুই থাকে না। অর্থাৎ সঞ্চয় হয় না। কিন্তু সে যদি তার মাসিক সংসার খরচ ৫০ টাকা কমাতে পারে, তাহলে তার ভোগের জন্য খরচ হবে ৩৫০ টাকা আর হাতে থাকবে ৫০ টাকা। বা এ ৫০ টাকা হবে মাসিক সঞ্চয়। (তার ভোগ প্রবণতা কমে হবে ০·৮৭৫, সঞ্চয় প্রবণতা হবে ০·১২৫)।

সুতরাং মানুষের আয় থেকে ভোগব্যয় কম হলে তবেই সঞ্চয় হয় এবং এ সঞ্চয়টা হল ব্যক্তিগত সঞ্চয় বা ব্যক্তিগত আর্থিক সঞ্চয়। সঞ্চয় করতে হলে ভোগব্যয় বা ভোগ কমাতে হয়।

২. সমাজে যে যা আয় করছে সে সেই পরিমাণ দ্রব্য কিংবা সেবাকর্ম উৎপাদনের দ্বারাই তা করেছে ধরে নেওয়া যায়। সুতরাং যদি কেউ তার আয় থেকে ভোগব্যয় কমিয়ে সঞ্চয় করে, তাহলে বুঝতে হবে, উৎপন্ন সামগ্রী ৫০ টাকা পরিমাণে কম বিক্রি হবে। সুতরাং সমাজের কোথাও না কোথাও, হয় কোন কারখানার মালগুদামে কিংবা কোন দোকানে ৫০ টাকার পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি না হয়ে অবিক্রীত ও মজুদ থেকে যাবে। এটা হল সমাজের **প্রকৃত সঞ্চয়**।

সুতরাং ব্যক্তির ব্যক্তিগত **আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি** হলে সমাজের কোথাও না কোথাও **প্রকৃত সঞ্চয়** ঘটে।

৩. ব্যক্তির ব্যক্তিগত আর্থিক সঞ্চয় যদি তার কাছে শুধুই পড়ে থাকে, তাহলে সে সঞ্চয়টা নিছক টাকা মজুদ (hoarding) ছাড়া আর কিছু নয়। তাতে তারও আয় কিছু বাড়ে না ; তার আর্থিক সঞ্চয়ের ফলে সমাজে যে প্রকৃত সঞ্চয় ঘটল তা ভোগেও লাগল না, কোন উৎপাদনশীল কাজেও লাগল না। এটা এক ধরনের অপচয়।

৪. কিন্তু সঞ্চয়কারী যদি—(ক) তার ব্যক্তিগত মাসিক ৫০ টাকা আর্থিক সঞ্চয়টা জমিয়ে তা দিয়ে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য পুঁজিদ্রব্য কিনে কৃষিতে, শিল্পে, ব্যবসায়ে, বাণিজ্যে কোন দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন শুরু করে, তাহলে তার সঞ্চিত টাকাটা দ্রব্য পুঁজিতে পরিণত হয়ে সম্পদ উৎপাদন করবে। ফলে দেশে সম্পদের মোট উৎপাদন বাড়বে, আর তার নিজেরও আয় বাড়বে। এবং সে মাসিক ৫০ টাকা করে সঞ্চয়ের দ্বারা যে উৎপন্ন দ্রব্য (বা সম্পদ) কিংবা উৎপাদন করার মত উপকরণ সমাজের কোথাও না কোথাও মজুদ হয়ে পড়ে ছিল, সেটা সে কিনে পুঁজিদ্রব্য হিসাবে অন্যান্য সম্পদ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করতে পারবে।

(খ) সঞ্চিত অর্থটা দিয়ে সে যদি কোন নতুন কোম্পানীর শেয়ার বা ঋণপত্র কেনে তাহলে ঐ কোম্পানী সে টাকা দিয়ে পুঁজিদ্রব্য কিনে কৃষিতে, শিল্পে, ব্যবসায়ে, বাণিজ্যে উৎপাদনের কাজ শুরু করতে পারে। ফলে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের দরুন সমাজের যে প্রকৃত সঞ্চয় ঘটছে সেটা পুঁজিদ্রব্যরূপে উৎপাদনের কাজে লাগবে। দেশে সম্পদের উৎপাদন বাড়বে। সঞ্চয়কারীও কোম্পানীর মুনাফার লভ্যাংশ বা ঋণপত্রের সুদ আয় হিসাবে উপার্জন করতে পারবে।

(গ) সঞ্চিত অর্থটা সঞ্চয়কারী যদি কোন ব্যাঙ্কে আমানতি জমা হিসাবে রাখে তাহলে তার সুদ হিসাবে সে আয় উপার্জন করতে পারে। অন্যদিকে ব্যাঙ্কগুলি সঞ্চয়কারীদের কাছ থেকে আমানতি জমা রূপে যে টাকা পায় তা থেকে কারবারীদের ঋণ দিতে পারে। কারবারীরা সে ঋণ নিয়ে পুঁজিদ্রব্য কিনে ব্যবসায়ে, বাণিজ্যে, কৃষিতে, শিল্পে উৎপাদনের কাজে তা ব্যবহার করে দেশে সম্পদ উৎপাদন ও নিজেদের আয় উপার্জন করতে পারে।

সুতরাং সঞ্চয়কারীরা তাদের আর্থিক সঞ্চয় নিজেরা দ্রব্য পুঁজিতে পরিণত করতে পারে, কিংবা নতুন কোন কোম্পানীর শেয়ার বা ঋণপত্র কিনে কোম্পানীর আর্থিক পুঁজি যোগাতে পারে। তারপর কোম্পানী সেটা দ্রব্য পুঁজিতে পরিণত করতে পারে, অথবা সঞ্চয়কারীদের আর্থিক সঞ্চয়টা ব্যাঙ্কের মারফত কারবারীদের কাছে গিয়ে তাদের হাতে সেটা দ্রব্য পুঁজিতে পরিণত হতে পারে। আর্থিক পুঁজি যখন দ্রব্য পুঁজিতে পরিণত হয়, তাকে বলে বিনিয়োগ। অতএব, পুঁজিগঠন প্রক্রিয়াটির তিনটি ধাপ : (১) আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি→(২) আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহ→ (৩) বিনিয়োগ।

পুঁজিগঠনের তাৎপর্য বা গুরুত্ব : ১. ব্যক্তি যদি তার আয়ের সবটুকুই খরচ করে ফেলে, ভবিষ্যতের বা দুর্দিনের জন্য কিছুই সঞ্চয় না করে তবে তার বিপদে

পড়ার আশঙ্কা সব সময়েই থেকে যায়। সঞ্চয়ের ব্যাপারে ব্যক্তির ক্ষেত্রে যা সত্য, জাতির ক্ষেত্রেও তা সত্য। একটা জাতি যদি তার (বাৎসরিক) মোট উৎপাদনের (বা জাতীয় আয়ের) সবটুকুই ভোগে ব্যয় করে—অর্থাৎ কোন কিছুই সঞ্চয় না করে—তা হলে ঐ জাতির পক্ষে ভবিষ্যতের অভাব পূরণের কোন উপায়ই থাকে না। কারবারী সংস্থাগুলিও যদি তাদের সবটুকু আয় প্রতি বৎসর খরচ করে ফেলে, পুঁজিদ্রব্যের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্য আয়ের একটা অংশ প্রতি বৎসর সঞ্চয় না করে তাহলে যেদিন তার যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়বে, সেদিন নতুন যন্ত্রপাতি কেনার ও কারবার চালু রাখার কোন উপায়ই থাকবে না।

২. সুতরাং ব্যক্তি হোক, কারবারী সংস্থা হোক বা জাতি হোক—সকলের পক্ষেই ভবিষ্যতে অভাব পূরণ ও আয় উপার্জন ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য প্রত্যেকেরই বর্তমান আয় থেকেই কিছু সঞ্চয় সৃষ্টি করে সে সঞ্চয়ের বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়। পরিবারের প্রয়োজন যেমন ক্রমশ বাড়ে, কারবারী সংস্থা এবং জাতির প্রয়োজনও তেমনি বাড়ে। দেশে লোকসংখ্যা বাড়ে, দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদা বাড়ে। অতএব প্রতিবৎসর উৎপাদন ক্ষমতাও বাড়ানো দরকার। উৎপাদন ক্ষমতা বাডাতে গেলে পুঁজি দ্রব্যের উৎপাদন অর্থাৎ বিনিয়োগ বাডানো চাই। তবেই জাতির প্রয়োজন মিটতে পারে, জীবনধারণের মান বাডতে পারে। দেশে আয় ও কর্মসংস্থান বাডতে পারে। এককথায় দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে। যে হারে দেশে মোট উৎপাদন বাড়ে তাকে বলে **অর্থনীতিক উন্নয়নের হার** (rate of growth)। দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের হার নির্ভর করে দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হারের উপর। দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ যদি বেশি হারে বাড়ে তাহলে দেশের মোট উৎপাদন বা জাতীয় আয়ও বেশি হারে এবং দ্রুত গতিতে বাড়তে পারে। দেশে কর্মসংস্থান ও জীবনধারণের মানও তত দ্রুত বাড়তে পারে।

পুঁজিগঠনের উপাদান: পুঁজিগঠনের তিনটি ধাপ: (১) আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি; (২) আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহ; (৩) বিনিয়োগ। পুঁজিগঠনের উপাদানও এই তিনটি।

১. আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি (creation of savings): আধুনিক সমাজে সঞ্চয় সৃষ্টির উৎস হল তিনটি: (ক) ব্যক্তি বা পরিবার; (খ) কারবারী সংস্থা; (গ) সরকার।

(ক) ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সঞ্চয় (private savings): ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সঞ্চয় তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: (১) সঞ্চয়ের ইচ্ছা: নানা কারণে সকলেই আয়ের কিছু না কিছু সঞ্চয় করতে চায়। ছেলেমেয়ের লেখাপড়া, বিবাহ, আকস্মিক আপদ-বিপদ, বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান এবং অবস্থার উন্নতির জন্য আয় বাডানোর চেষ্টা প্রভৃতি উদ্দেশ্য মানুষের মনে সঞ্চয় প্রবণতা সৃষ্টি করে। (২) সঞ্চয়ের ক্ষমতা: সঞ্চয় কেবল ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, সঞ্চয় করার ক্ষমতা বা সামর্থ্যও থাকা চাই। সঞ্চয়ের ক্ষমতা নির্ভর করে আয়ের উপর। মানুষের ভোগ প্রবণতার নিয়ম হল, কম আয়ের স্তরে ভোগব্যয় বেশি ও বেশি আয়ের স্তরে

ভোগব্যয় আনুপাতিকভাবে কম হয়। কম আয়ের মানুষও অনেক চেষ্টা ও ত্যাগ স্বীকার করে সঞ্চয় করতে পারে বটে, তবে বেশি আয়ের স্তরে ভোগ প্রবণতা কম বলে সঞ্চয় হয় বেশি। (৩) সুদের হার: সুদের হার বেশি হলে সঞ্চিত অর্থ ধার দিয়ে সুদ বেশি পাওয়া যায়। তাতে সঞ্চয়কারীরা বেশি করে সঞ্চয় করতে উৎসাহ পায়। সুদের হার কম হলে সঞ্চিত অর্থ ঋণ দিয়ে আয় কম হয় বলে সঞ্চয়-কারীরা নিরুৎসাহিত হয়। সুতরাং সুদের হার বাড়লে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেয়। সুদের হার কমলে তার ফল বিপরীত হয়।

(খ) কারবারী সংস্থাগুলির সঞ্চয় (institutional savings): ব্যক্তি ও পরিবারের মত কারবারী সংস্থাগুলিও (যথা, কোম্পানী প্রভৃতি) কারবারের বর্তমান আয় বজায় রাখতে, ভবিষ্যতের আয় বাড়াতে এবং আকস্মিক প্রয়োজন মেটাতে সঞ্চয় করতে চায়। তাদেরও সঞ্চয়ের ক্ষমতা তাদের আয়ের উপর নির্ভর করে।

(গ) সরকারী সঞ্চয় (governmental savings): ব্যক্তি ও কারবারী সংস্থার মত আধুনিক কালে সরকারও সঞ্চয়কারীদের মধ্যে অন্যতম। সরকারী আয়ের সবটুকু ব্যয় না করে সরকারী সঞ্চয়ের সৃষ্টি হয়।

এই তিনটি উৎস থেকে সঞ্চয়ের প্রবাহ সম্মিলিত হয়ে দেশের মোট সঞ্চয় ভাণ্ডারটি গঠিত।

২. আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহ করে তাকে গতিশীল করা (accumulation and mobilisation of savings): ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, জীবন বীমা সংস্থা, বিনিয়োগকারী সংস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মারফত সমাজের বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত ও কারবারী আর্থিক সঞ্চয় সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত সঞ্চয় বিভিন্ন কাজে যাতে ব্যবহৃত হতে পারে তার জন্য তাকে গতিশীল করার ব্যবস্থা করতে হয়।

৩. বিনিয়োগ (investment): ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আর্থিক সংস্থাগুলির কাছে সমাজের আর্থিক সঞ্চয়ের অধিকাংশ সংগৃহীত হয়ে এক বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ-যোগ্য ঋণ তহবিলের সৃষ্টি হয়। এ ঋণ তহবিলটি বিনিয়োগকারীদের দ্বারা ঋণ হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু বিনিয়োগকারীরা ঋণ হিসাবে সে অর্থ নিয়ে বিনিয়োগ করবে কিনা বা করলে কতটা বিনিয়োগ করবে তা নির্ভর করে: (ক) দেশে প্রাকৃতিক উপকরণের পরিমাণের উপর; (খ) পুঁজি দ্রব্য অর্থাৎ কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি তৈরির উপযুক্ত কারিগরী জ্ঞানের স্তরের উপর; (গ) বাজারে দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদার উপর; (ঘ) ঋণের সুদের হারের উপর; এবং (ঙ) দেশে উদ্যোক্তার যোগানের উপর। এই বিষয়গুলি যদি অনুকূলে থাকে, অর্থাৎ দেশে যদি প্রাকৃতিক উপকরণের ও কারিগরী জ্ঞানের অভাব না থাকে, দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা যদি যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, ঋণের সুদের হার যদি কম থাকে এবং উদ্যোক্তার অভাব যদি না থাকে তবে সঞ্চয়ের যোগান বেশি হলে বিনিয়োগ বা পুঁজিগঠনের হারও বেশি হবে। ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে বিশেষ করে কারিগরী জ্ঞানের এবং উদ্যোক্তার অভাব হেতু রাষ্ট্রকেই বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার ভূমিকা নিতে হচ্ছে।

৪. **উদ্যোগ বা সংগঠন :** অতীতে উৎপাদনের কাজটা ছিল সরল। কুটির শিল্পে কারিগরের নিজের বাড়িতে কিংবা ছোট্ট কারখানায় সামান্য কিছু যন্ত্রপাতির দ্বারা উৎপাদনের কাজ চলত। নিজেই জিনিসগুলি তৈরি করে খরিদ্দারদের কাছে বিক্রি করত। কারিগর নিজেই একাধারে ছিল শ্রমের, পুঁজির ও জমির মালিক ও সরবরাহকারী এবং উৎপাদনের সংগঠক বা উদ্যোক্তা ও পরিচালক এবং ব্যবস্থাপক।

এখনকার দিনে উৎপাদনের কাজটা আর এত সহজ সরল নেই। ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন পদ্ধতির বদলে এখন বৃহদায়তন উৎপাদন পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে উপাদানের মালিকরা এখন আলাদা, বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। এখনকার বড় বড় কারখানাগুলিকে কোটি কোটি টাকার পুঁজি সংগ্রহ করতে হয় সারা দেশে বিক্ষিপ্ত ও পরস্পরের সম্পূর্ণ অপরিচিত সঞ্চয়কারীদের কাছ থেকে ও বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও অর্থ সংস্থানকারী সংস্থার কাছ থেকে। হাজার হাজার শ্রমিক সংগ্রহ করতে হয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্য থেকে। দরকারী কাঁচামাল আসে শত শত মাইল দূর থেকে, এমনকি বিদেশ থেকেও। তৈরী দ্রব্যগুলি বিক্রি করতে হয় দেশে বিদেশে। প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন ও চালানোর কাজ, উৎপাদনের তদারকির কাজ, তার নীতি ও কর্মপন্থা স্থির করার কাজও কম কঠিন নয়। এই কাজটির নাম হল উদ্যোগ বা সংগঠন।

৫. **উদ্যোক্তা :** উৎপাদনের কাজ চালাতে হলে, কাউকে না কাউকে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ ও একত্রিত করতে হয়, উৎপাদনের কাজের তদারকি করতে হয়, সমগ্র কাজকর্ম পরিচালনা ও সেসবের ব্যবস্থাপনা করতেই হয়। এই কাজ যার বা যাদের দ্বারা নির্বাহ হয় তাকে বা তাদের বলা হয় কারবারের সংগঠক বা উদ্যোক্তা। কারবারের উদ্যোক্তা হল কারবারী সংস্থার অর্থাৎ উৎপাদনকারী সংস্থার সংগঠক, পরিচালক ও ব্যবস্থাপক।

উদ্যোক্তার ভূমিকা : কারবার হল দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনকারী সংস্থা সুতরাং কারবারী সংস্থা স্থাপন ও পরিচালনা করতে হলে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলি সংগ্রহ ও নিয়োগ করতে হয়। কারবারের দরকারী বিভিন্ন উপকরণ বর্তমান থাকলেও তা সংগ্রহ, সমবেত এবং নিয়োগের ব্যবস্থা না করলে কোন কিছুর উৎপাদনই সম্ভব হয় না। এই কাজটির নাম হল সংগঠন। কারবারী সংস্থা স্থাপন করার অর্থ হল উৎপাদন সম্ভব করে তোলার জন্য সংগঠন সৃষ্টি করা উদ্যোক্তা এই কাজটি করে বলে সে হল সংগঠক। উদ্যোক্তা না থাকলে কোন উৎপাদনই সংগঠিত হতে পারে না, কোন কারবারী সংস্থাই স্থাপিত হতে পারে না। এই কারণে কারবারী জগতে উদ্যোক্তার গুরুত্ব হল অসীম। অধ্যাপক মার্শাল বলেছেন, 'উদ্যোক্তা হল শিল্পের নেতা'। উদ্যোক্তার ভূমিকার গুরুত্ব তার কার্যাবলী থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উদ্যোক্তার কার্যাবলী : (১) কারবারের সম্ভাবনা অনুসন্ধান : কোথায় কোন

জাতীয় কারবারের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আছে উদ্যোক্তা তার সন্ধানে থাকে। বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর জন্য ক্রেতাদের চাহিদার অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে, কোথায় কোন্ দ্রব্যটির উৎপাদন এবং যোগান তার চাহিদার অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণ এবং সেই কারণে কারবার লাভজনক হবে তা অনুসন্ধান করাই হল উদ্যোক্তার প্রথম কাজ। (২) কারবারের পরিকল্পনা এবং সংগঠন সৃষ্টি: নতুন কারবারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হয়ে উদ্যোক্তা ভাবী কারবারের গঠন সম্বন্ধে নকশা পরিকল্পনাও ঠিক করে এবং সে সম্পর্কে কারবারে উৎসাহী ব্যক্তিদের আকর্ষণ করে তাদের আগ্রহী করে তোলে। তারপর আগ্রহী ব্যক্তিদের নিয়ে কারবারের পত্তন করে। (৩) উপকরণ সংগ্রহ: উপযুক্ত স্থানে পরিকল্পনা মাফিক কারবার প্রতিষ্ঠা করে সাংগঠনিক বিন্যাস সাধনের পর উদ্যোক্তা এবার উৎপাদনের উপাদানগুলি সংগ্রহ এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজটি যত্ন এবং বিবেচনার সঙ্গে সংগঠিত করে। (৪) কারবারের নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ: কারবারী সংস্থার উৎপাদন ও পরিচালনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নীতিগুলি উদ্যোক্তাকেই ঠিক করে দিতে হয়। কখন, কোন্ জাতীয় দ্রব্য কতটা উৎপাদন করা হবে তা তাকেই ঠিক করতে হয়। এ ব্যাপারে তার মূল লক্ষ্য হল মুনাফা,—কি পরিমাণ উৎপাদন করলে সর্বাধিক মুনাফা পাওয়া যাবে এটাই তার উদ্দেশ্য। (৫) উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থা: দ্রব্যাদি উৎপন্ন হলে তাকে বাজারস্থ করা সংগঠকের একটা গুরুত্ব-পূর্ণ কাজ। এই কাজটি যথাযথভাবে না করতে পারলে উৎপাদন করার কোন অর্থই হয় না। তাই উৎপাদিত পণ্যের জন্য চাহিদা সৃষ্টি করে সাফল্যের সঙ্গে বিক্রয়ের কাজ তাকেই করতে হয় এবং এই উদ্দেশ্যে প্রচার ব্যবস্থাই তার অন্যতম হাতিয়ার। (৬) সামগ্রিক তত্ত্বাবধান বা ব্যবস্থাপনা: পূর্ব পরিকল্পনা এবং পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমস্ত স্তরের কাজ যাতে চলতে থাকে তার দায়িত্ব উদ্যোক্তার। (৭) উপার্জিত আয় বণ্টন: কারবারের উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্ম বিক্রয় করে যে আয় হয় তা উৎপাদনের উপাদানগুলির অর্থাৎ তাদের মালিকদের মধ্যে যথাযথ এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টনের কাজটিও উদ্যোক্তার। উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে জমির খাজনা, শ্রমিকের মজুরি, কর্মচারীদের বেতন, পুঁজির সুদ ইত্যাদি প্রদান করা উদ্যোক্তার কাজের অন্তর্গত। সকলকে যার যার প্রাপ্য বণ্টন করে দেওয়ার পর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে উদ্যোক্তা তা নিজের প্রাপ্য (মুনাফা) হিসাবে গ্রহণ করে। (৮) ঝুঁকিগ্রহণ: কারবারের সাফল্য ও অসাফল্যের সামগ্রিক ঝুঁকি উদ্যোক্তাকেই বহন করতে হয়। উদ্যোক্তা বাজারের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে উৎপন্ন দ্রব্যটির বিক্রয়ের সম্ভাব্য পরিমাণ সম্বন্ধে অনুমান করে সেই হিসাবে উৎপাদন করে। কিন্তু যে কোন জিনিসের বাজারই পরিবর্তনশীল ও অনিশ্চিত। বাজারের অবস্থা যথাসম্ভব অনুধাবন করে দ্রব্যটি উৎপাদনের পর বিক্রি করতে গিয়ে দেখা গেল চাহিদার অবস্থার আমূল বা আংশিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। ফলে লোকসানের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এটাই হল কারবারের ঝুঁকি। উদ্যোক্তা ছাড়া অন্যান্য উপাদানের মালিকরা কেউই এই ঝুঁকি নেয় না।

৩. ৩. উপাদানসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা
Factors in Co-operation

১. যে কোন উৎপাদক সংস্থাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (একদিন/এক সপ্তাহ/এক মাস ইত্যাদি) একটি নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করতে হয়। তা উৎপাদন করতে গিয়ে তাকে চারটি উপাদানই একসঙ্গে প্রয়োগ ও ব্যবহার করতে হয়। কারণ, উৎপাদনের প্রত্যেকটি উপাদানই উৎপাদন-ধর্মী হলেও, কোন উপাদানই একাকী কোন দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করতে পারে না। চারটি উপাদানের সক্রিয় সহযোগিতায় যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা উৎপন্ন হয়। সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণে নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদন করতে হলে, নির্দিষ্টকাল ধরে অবিরামভাবে উপাদান বা উপাদান-সেবাগুলি (inputs) ব্যবহার করতে হয় এবং তার ফলে চারটি উপাদান-সেবার সম্মিলিত ব্যবহার ও সহযোগিতার দ্বারা অবিরামভাবে পণ্য বা সেবাও উৎপন্ন হতে থাকে। এই কারণে, উপাদান-সেবা (inputs) এবং উৎপন্ন দ্রব্য (output) এই দুটিকেই একটি নির্দিষ্টকাল ব্যাপী দুটি প্রবাহ (flows) বলে গণ্য করা হয়।

২. **উৎপাদনের মাত্রা** (Scaleof production) ঃ প্রত্যেকটি উৎপাদক সংস্থা হল এক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে বিভিন্ন উপাদান সমষ্টির (যেমন, a পরিমাণ ভূমি, b পরিমাণ শ্রম, c পরিমাণ পুঁজি, d পরিমাণ উদ্যোগ ইত্যাদি) মালিক। বিভিন্ন উপাদানের ওই নির্দিষ্ট পরিমাণ সংমিশ্রণ দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সংস্থাটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে একটি দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করতে পারে (যেমন q পরিমাণ)। এটা হল তার উৎপাদনের মাত্রা বা সর্বাধিক সম্ভব উৎপাদনের পরিমাণ। সংস্থাটি যদি আরো বেশি পরিমাণে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করতে পারে (যেমন, a_1 পরিমাণ ভূমি, b_1 পরিমাণ শ্রম, c_1 পরিমাণ পুঁজি, d_1 পরিমাণ উদ্যোগ) তাহলে সে আগের চেয়ে আরো বেশি পরিমাণে দ্রব্যটি উৎপাদন করতে (যেমন, q_1, পরিমাণ) পারবে। অর্থাৎ তার উৎপাদনের মাত্রা বা সর্বাধিক সম্ভব উৎপাদনের পরিমাণ বাড়বে। সুতরাং একটা নির্দিষ্ট সময়ে, একটি উৎপাদক সংস্থা তার অধীন উপাদান সমষ্টির দ্বারা যে সর্বাধিক সম্ভব পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করতে পারে, তাকে বলে উৎপাদনের মাত্রা। উৎপাদনের মাত্রা কম হলে, সে উৎপাদন ব্যবস্থাটাকে বলে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা (small scale production) এবং সে উৎপাদক সংস্থাকে বলে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদক সংস্থা (small scale firm)। উৎপাদনের মাত্রা বেশি হলে, সে উৎপাদন ব্যবস্থাটাকে বলে বৃহদায়তন ব্যবস্থা (large scale production) এবং সে উৎপাদক সংস্থাকে বলে বৃহদায়তন উৎপাদক সংস্থা (large scale firm)।

৩. **উৎপাদনের বৃহদায়তন-জনিত ব্যয়সংকোচ** (Economics of scale or large scale) ঃ অনেক ক্ষেত্রে, একটি ন্যূনতম আকার বা আয়তনের থেকে ছোট আকার বা আয়তনের কোন একটি বা একাধিক উপাদান (যেমন, কোন যন্ত্র) পাওয়া যায় না এবং ব্যবহার করা যায় না। এরকম উপাদানকে বলে অবিভাজ্য

উপাদান (indivisible or lumpy factor)। উৎপাদনের কাজে অবিভাজ্য উপাদানের ব্যবহার উৎপাদন ব্যয়কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে, যেটা লক্ষ্য করার মত। এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়ঃ ধরা যাক, ঐ অবিভাজ্য উপাদানটিকে অন্যান্য উপাদানের সাথে একযোগে ব্যবহার করা শুরু হল। যতদিন উৎপাদনের পরিমাণ কম থাকে ততদিন অন্যান্য উপাদানগুলির পুরো ব্যবহার হয়ত সম্ভব, কিন্তু অবিভাজ্য উপাদানটির পুরো ব্যবহার সম্ভব হয় না। কিন্তু পরে, উৎপাদনের পরিমাণ যখন বাড়ে এবং অন্যান্য উপাদানগুলি যখন আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হতে থাকে, তখন ঐ অবিভাজ্য উপাদানটির উৎপাদন ক্ষমতা আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা সম্ভব হতে থাকে। ফলে, তখন উৎপাদন যে অনুপাতে বাড়ে, উৎপাদন খরচটা সে অনুপাতে বাড়ে না। এটা হল উৎপাদনের উপাদানগুলির বৃহদায়তনে ব্যবহার করার জন্য ব্যয়সংকোচ। উৎপাদনে ব্যবহৃত কোন একটি বিশেষ উপাদানের অবিভাজ্যতাই এ ধরনের ব্যয়সংকোচের প্রধান কারণ, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয়সংকোচের অন্যান্য কারণগুলি হল দু'রকমের,—অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচের কারণ (internal economies) এবং বাহ্য ব্যয়সংকোচের কারণ (external economies)। অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচ হল কোন উৎপাদক সংস্থার একেবারে নিজস্ব ব্যাপার এবং তার পরিমাণটা তার নিজের আয়তনের উপরেই কেবল নিভর করে। বড সংস্থায় অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচ বেশি এবং ছোট সংস্থায় কম হয়। এদের মধ্যে রয়েছে, কারিগরী ব্যয়সংকোচ, বাণিজ্যিক ব্যয়সংকোচ, ব্যবস্থাপনাগত ব্যয়সংকোচ, আর্থিক ব্যয়সংকোচ, এবং ঝুঁকি-সংক্রান্ত ব্যয়সংকোচ। বাহ্য ব্যয়সংকোচ কোন উৎপাদক সংস্থার নিজের আয়তনের উপর নিভর করে না। তা নির্ভর করে উৎপাদক সংস্থাটি যে শিল্পের অন্তর্গত, তার সামগ্রিক আয়তনের উপর। এদের দৃষ্টান্ত হল, শিল্পের স্থানিকতাজনিত ব্যয়সংকোচ, বিশেষীকরণজনিত ব্যয়সংকোচ এবং সংবাদাদি আদান-প্রদানের সুবিধাজনিত ব্যয়সংকোচ।

৪. **উৎপাদন অপেক্ষক** (Production function)ঃ কোন উৎপাদক বা কারবারী সংস্থার উপাদান-সেবা ও উৎপন্ন এই দুটি প্রবাহের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। উপাদান-সেবার পরিমাণের উপর, উপাদান-সেবা প্রবাহের আয়তনের উপর উৎপন্নের পরিমাণ, উৎপন্ন-প্রবাহের আয়তন নির্ভর করে। উপাদান-সেবা ও উৎপন্নের মধ্যে এই সম্পর্কটির নাম হল **উৎপাদন অপেক্ষক**। এই সম্পর্কটি হল **ক্রিয়াগত সম্পর্ক** (functional relation)।

যেমন, একটি রেডিমেড জামা তৈরির কারখানায় ৮ ঘণ্টার একটি শিফটে ২০ ডজন সার্ট তৈরী হয়। তাহলে ঐ ২০ ডজন সার্ট তৈরি করতে ন্যূনতম পরিমাণে শ্রমশক্তি, কাপড, সুঁচ, সেলাইকল, কাঁচি, চক, ফিতে, আলো, জায়গা ইত্যাদি যে উপকরণ বা উপাদান-সেবা দরকার হয় তাই হল ঐ রেডিমেড জামা তৈরির কারখানার উৎপাদন অপেক্ষক বা উপাদান-সেবা ও উৎপন্নের সম্পর্ক। কিংবা বলা যায়, নির্দিষ্ট পরিমাণে শ্রমশক্তি, কাপড়, সুতো, সুঁচ, সেলাই কল, কাঁচি, চক,

ক্ষিতে, আলো, জায়গা ইত্যাদি উপাদান-সেবার দ্বারা যে সর্বাধিক পরিমাণ সার্ট উৎপাদন করা যায় তাই হল ওই রেডিমেড জামা তৈরির কারখানার উৎপাদন অপেক্ষক বা উপাদান-সেবা ও উৎপন্নের সম্পর্ক।

সুতরাং কোন কারবারী সংস্থার উৎপাদন অপেক্ষক বা উপাদান-সেবা ও উৎপন্নের ক্রিয়াগত সম্পর্কটিকে এইভাবে সমীকরণের আকারে প্রকাশ করা যায়:

উৎপন্নের পরিমাণ = বিভিন্ন উপাদান-সেবাগুলির ক্রিয়ার ফল

অথবা, output = function of inputs

অথবা $x = f\,(a, b, c, d \cdots n)$.

[x হল উৎপন্নের সর্বাধিক পরিমাণ, f হল function বা ক্রিয়া, a, b, c, d হল বিভিন্ন উপাদান-সেবা, n হল শেষতম উপাদান-সেবা।]

প্রত্যেক কারবারী সংস্থার উৎপাদন অপেক্ষকটি তার নিজস্ব ও স্বতন্ত্র এবং এটি তার কারিগরী জ্ঞানের উপর অর্থাৎ তার উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত কারিগরী বিদ্যার স্তরের উপর নির্ভর করে। তার কারিগরী বিদ্যার স্তরের উন্নতি ঘটলে পুরনো উৎপাদন অপেক্ষকটি আর থাকবে না, সে জায়গায় দেখা দেবে তার নতুন উৎপাদন অপেক্ষক। ফলে, নতুন উৎপাদন অপেক্ষকটি হবে পুরনো উৎপাদন অপেক্ষকটির চেয়ে উৎকৃষ্ট।

এর অর্থ হল, আগের মত একই পরিমাণ বিভিন্ন উপাদান-সেবার দ্বারা আগের তুলনায় বেশি পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে কিংবা, আগের মত একই পরিমাণে উৎপাদন করতে আগের তুলনায় কম পরিমাণে বিভিন্ন উপাদান-সেবা লাগছে। [তেমনি আবার এমনও হতে পারে, জমির মত উপাদান-সেবার যদি উর্বরা শক্তি ক্ষয় পেয়ে থাকে, তাহলে কোন নতুন উৎপাদন অপেক্ষকের দ্বারা আগের চেয়ে কম পরিমাণে উৎপন্ন হতে পারে।]

৫. উৎপাদন অপেক্ষক কথাটির দ্বারা উপাদান-সেবা ও উৎপন্নের মধ্যে যে সম্পর্ক বোঝায় তা থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে, একটি নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদন করতে হলে কি কি পরিমাণে বিভিন্ন উপাদান-সেবা লাগবে তা জানা যায়। অর্থাৎ যে কারবারী সংস্থার যখন যে রকম উৎপাদন অপেক্ষকই থাকুক, তার দ্বারা সে সময়ে সংস্থাটির বিভিন্ন উপাদান-সেবার বিভিন্ন পরিমাণের একটি **বস্তুগত সংমিশ্রণ** (physical combination) বোঝায়। একসাথে বিভিন্ন উপাদান-সেবা যে যে পরিমাণে ব্যবহৃত হয় তা হল তাদের অনুপাত। সুতরাং **উৎপাদন অপেক্ষক দ্বারা কি কি অনুপাতে বিভিন্ন উপাদান-সেবা ব্যবহার করতে হবে তা প্রকাশ পায়।** এই **অনুপাতটি** কিন্তু উৎপাদন অপেক্ষকটির দ্বারা নির্ধারিত হয় না; অনুপাতটি নির্ধারিত হয় কারবারী সংস্থায় ব্যবহৃত কারিগরী বিদ্যা বা জ্ঞানের দ্বারা। সুতরাং যে কারিগরী বিদ্যা (technology) উৎপাদন অপেক্ষকটি স্থির করে সেটাই সে অপেক্ষকটির অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদান-সেবার অনুপাতটিও স্থির করে দেয়। **কারিগরী বিদ্যার পরিবর্তন ঘটলে উৎপাদন**

অপেক্ষকটির পরিবর্তনের সাথে ব্যবহার্য উপাদান-সেবাগুলির অনুপাতও বদলায়। এ থেকে বোঝা যায় উৎপাদনের জন্য যে অনুপাতে বিভিন্ন উপাদান-সেবা নিয়োগ করতে হয় তা উৎপাদক বা কারবারী সংস্থার খেয়াল খুশি বা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। তবে উৎপাদন অপেক্ষকটি এমন হতে পারে যে, তাতে অন্যান্য উপাদান-সেবার পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে কোন একটি উপাদান-সেবার কিংবা দুটি উপাদান-সেবার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেও সামান্য মাত্রায় পরিবর্তন করা যায়।

৩. ৪. উৎপন্নের বিধি

Laws of Returns

১. উৎপাদন অপেক্ষকের দ্বারা উপাদান সেবা ও উৎপন্নের পরিমাণের মধ্যে যে সম্পর্ক প্রকাশ পায় তা দু'রকমের হতে পারে : (ক) একটি হল, উপাদান-সেবা-গুলির মধ্যে একটি, দুটি বা কয়েকটির পরিমাণ পরিবর্তনীয় কিন্তু বাকি উপাদান-সেবাগুলির পরিমাণ অপরিবর্তনীয় ; (খ) অন্যটি হল, সমস্ত উপাদান-সেবার পরিমাণই পরিবর্তনীয়। আমরা এখানে একটি মাত্র উপাদান-সেবার পরিমাণ পরিবর্তনীয় এবং অন্যান্য উপাদান-সেবার পরিমাণ অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নিয়ে উৎপন্নের উপর তার প্রতিক্রিয়া বা ফলাফল বিশ্লেষণ করব। একটি উপাদান-সেবা পরিবর্তনীয় এবং অন্যগুলি অপরিবর্তনীয় ধরে নিলে উৎপন্নের উপর তার যে ফলাফল হয় সবগুলি উপাদান-সেবা পরিবর্তনীয় ধরে নিলেও ফলাফল শেষ পর্যন্ত তাই হয়।

২. উপাদান-সেবা ও উৎপন্নের পরিমাণের মধ্যে সম্পর্কটি ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি (Law of diminishing returns) বা পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি (Law of variable proportions), ইত্যাদি নামে পরিচিত।

৩. **(একটি পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবার দরুন) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি** (Law of diminishing returns to a variable input) ঃ বিধিটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় : অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, উৎপাদনে ব্যবহৃত অন্যান্য উপাদান সেবার পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে, একটি উপাদান-সেবার নিয়োগ নির্দিষ্টকাল পর পর সমপরিমাণে বাড়ানো হলে, একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছাবার পর মোট উৎপন্ন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়বে ; এবং তার ফলে প্রান্তিক উৎপন্ন ক্রমশ কমবে এবং তার পর গড় উৎপন্নও কমবে। ৩·১-সারণির সাহায্যে এটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য : (a) মোট উৎপন্ন বৃদ্ধির হার এখানে সর্বাধিক (৪৫ – ২৫ = ২০) = সর্বাধিক প্রান্তিক উৎপন্ন (e) ; (b) এখানে মোট উৎপন্ন বৃদ্ধির হার = প্রান্তিক উৎপন্ন (f) = গড় উৎপন্ন (f) ; (c) এখানে মোট উৎপন্ন সর্বাধিক, ও প্রান্তিক উৎপন্ন = ০ (g)।

ব্যাখ্যা ১ : ৩·১-সারণির সাহায্যে ধরা যাক একজন বর্ধিষ্ণু চাষী আগামী মরশুমে তার জমিতে চাষের পরিকল্পনা তৈরি করছে। তার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ

আবাদী জমি আছে, আছে চাষের ট্রাকটর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ও সেগুলি রাখার জায়গা; বেড়া দিয়ে তার জমিটি ঘেরা। নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনীয় সার এবং জলসেচের ব্যবস্থাও আছে। তাকে এখন স্থির করতে হবে, এবার চাষের জন্য সে কতজন খেতমজুর রাখবে। এটা স্থির করতে হলে সে অবশ্যই তার খামারে শ্রমের (অর্থাৎ খেতমজুরের) বস্তুগত উৎপাদনশীলতা (physical productivity) বিবেচনা করবে। সেটা ৩·১-সারণিতে দেওয়া হয়েছে। সারণিটির প্রথম তিনটি কলমে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে সেটা হল তার উৎপাদন অপেক্ষক অর্থাৎ অন্যান্য উপাদান-সেবা অপরিবর্তিত রেখে [কলম (১)] এক একক করে শ্রম (অর্থাৎ একজন করে খেতমজুর) বাড়ালে [কলম (২)] মোট উৎপন্নের উপর তার ফলাফল কি হয় [কলম (৩)]। যেমন, ১ জন খেতমজুর লাগালে মোট উৎপন্ন হয় ১০ মণ ধান, ২ জন লাগালে ২৫ মণ, ৩ জন লাগালে ৪৫ মণ, ইত্যাদি। চতুর্থ ও পঞ্চম কলমের হিসাবগুলি পাওয়া গেছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলমের তথ্য থেকেই। চতুর্থ কলমে আছে খেতমজুর পিছু উৎপন্নের পরিমাণ; মোট উৎপন্নকে (TP) খেতমজুরের সংখ্যা (l) দিয়ে ভাগ করে ($TP \div l$) পাওয়া গেছে। পঞ্চম কলমে দেওয়া হয়েছে একটি অতিরিক্ত খেতমজুর নিয়োগের ফলে অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাণ; এটি হল অতিরিক্ত উৎপন্ন বা মোট উৎপন্নের বৃদ্ধিকে (ΔTP) অতিরিক্ত খেতমজুরের সংখ্যা দিয়ে (Δl) ভাগ করে প্রাপ্ত ভাগফল ($\Delta TP \div \Delta l$)।

সারণি ৩·১

(——উৎপাদন অপেক্ষক——)				
জমি ও অন্যান্য অপরিবর্তিত উপাদান-সেবা	খেতমজুর বা শ্রম (l)	মোট উৎপন্ন (TP)	গড় উৎপন্ন (——বস্তুগত পরিমাণ——) $\frac{(TP)}{\Delta}$	প্রান্তিক উৎপন্ন $\frac{\Delta TP.}{l}$
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
অন্যান্য অপরিবর্তিত উপাদান-সেবা	১	১০ মণ	১০ মণ	১০ মণ
	২	২৫ ,,	১২·৫ ,,	১৫ ,,
	৩	৪৫ ,, (a)	১৫ ,,	২০ ,, (e)
	৪	৬০ ,, (b)	১৫ ,, (f)	১৫ ,, (f)
	৫	৭০ ,,	১৪ ,,	১০ ,,
	৬	৭০ ,, (c)	১১·৬ ,,	০ ,, (g)
	৭	৬০ ,,	৮·৫ ,,	—১০ ,,

৩·১-সারণির (২) ও (৩) কলম লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ১ একক করে খেতমজুর (বা ১ একক করে শ্রমের) নিয়োগ বাড়ানোর ফলে ৩ জন খেতমজুর পর্যন্ত

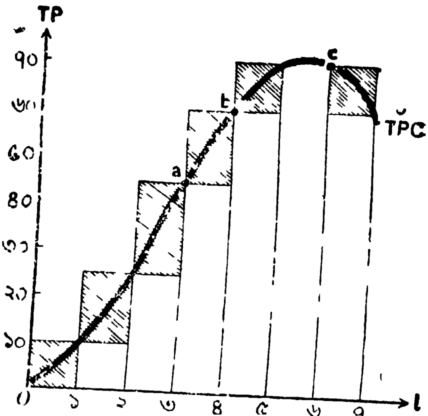
মোট উৎপন্ন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে (প্রথমে ১০ মণ, তারপর ২৫ মণ, অর্থাৎ বৃদ্ধিটা হল ১৫ মণ, তারপর ৪৫ মণ, অর্থাৎ বৃদ্ধিটা হল ২০ মণ)। মোট উৎপন্ন যখন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে, **তখন গড় উৎপন্ন** [(৪) কলম] যেমন বাড়ে তেমনি **প্রান্তিক উৎপন্নও** [(৫) কলম] **বাড়ে**। মোট উৎপন্ন যে হারে বাড়ে সেটাই হল প্রান্তিক উৎপন্ন। তাই ৩ জন খেতমজুরের মোট উৎপন্ন বৃদ্ধির হার সর্বাধিক [(৩) কলমে (a)] বলে তখন প্রান্তিক উৎপন্নও সর্বাধিক [(৫) কলমে (e)]। তারপর আরো বেশি খেতমজুর লাগালে ৪ থেকে ৬ জন খেতমজুর পর্যন্ত **মোট উৎপন্ন বাড়ে** বটে, কিন্তু **বাড়ে ক্রমহ্রাসমান হারে**। ৪ জন খেতমজুর নিয়োগের ফলে মোট উৎপন্নের ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি শুরু হল [(৩) কলমের (b)]। ফলে **তখন** থেকে **প্রান্তিক উৎপন্ন** (f) **এবং গড় উৎপন্নও (f) কমতে আরম্ভ করে**। ৫ জন খেতমজুর নিয়োগের পরে মোট উৎপন্ন সর্বাধিক স্তরে পৌঁছাল বটে কিন্তু তার বৃদ্ধিটা গেল বন্ধ হয়ে। ৫ জন খেতমজুর যা উৎপাদন করত ৬ জনও তাই উৎপাদন করে [(৩) কলমের (c)]। সুতরাং প্রান্তিক উৎপন্ন তখন হল শূন্য [(৫) কলমের (g)]। তারপর যদি আরো ১ জন খেতমজুর লাগানো হয় তাহলে মোট উৎপন্ন কমে যাবে এবং প্রান্তিক উৎপন্ন হবে ঋণাত্মক (−)।

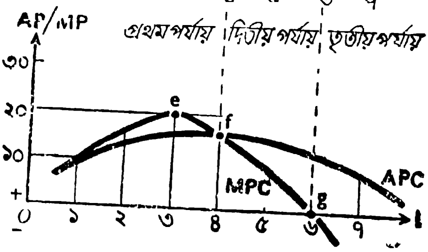
ব্যাখ্যা ২ ঃ ৩·১ ও ৩·২ চিত্রের-এর সাহায্যে ঃ ৩·১ সারণির তথ্যগুলির ভিত্তিতেই মোট উৎপন্ন রেখা এবং গড় ও প্রান্তিক উৎপন্ন রেখার প্রকৃতি দেখান হল। প্রথমটিতে TPC হল মোট উৎপন্ন রেখা এবং দ্বিতীয়টিতে APC হল গড় উৎপন্ন রেখা ও MPC হল প্রান্তিক উৎপন্ন রেখা। প্রথমটিতে (TP) উল্লম্ব রেখায় মোট উৎপন্ন [৩·১-র সারণির (৩) কলম] ও দ্বিতীয়টিতে (AP/MP) উল্লম্ব রেখায় গড় ও প্রান্তিক উৎপন্ন [৩·১ সারণির (৪) ও (৫) কলম] পরিমাপ করা হচ্ছে। দুটিতেই অনুভূমিক রেখায় শ্রমের (খেতমজুরের) পরিমাণ [৩·১ সারণির (২) কলম] পরিমাপ করা হচ্ছে।

এখন ৩·১ চিত্র ও ৩·২ চিত্রকে সমগ্রভাবে বিচার করা যেতে পারে। ৩·১ চিত্রে দেখা যাচ্ছে, মোট উৎপন্ন রেখা TPC যখন a বিন্দু পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান হারে উপরে উঠছে তখন ৩·২ চিত্রে প্রান্তিক উৎপন্ন রেখা MPC-ও সর্বাধিক উচ্চতায় উঠেছে e বিন্দুতে। তারপরে মোট উৎপন্ন রেখা TPC-র ঊর্ধ্বগতির হার কমে এসেছে। ফলে e বিন্দুর পর থেকে প্রান্তিক উৎপন্ন রেখা MPC-র নিম্নগতি আরম্ভ হয়েছে। গড় উৎপন্ন রেখা APC কিন্তু তখনও উপরে উঠেছে এবং মোট উৎপন্ন রেখা TPC যখন b বিন্দুতে পৌঁছায় তখন গড় উৎপন্ন রেখা APC সর্বাধিক উচ্চতায় f বিন্দুতে উঠেছে। এখানে প্রান্তিক উৎপন্ন রেখা MPC e বিন্দুর পর থেকে নিচের দিকে নামতে নামতে গড় উৎপন্ন রেখা APC-কে উপর থেকে f বিন্দুতে ছেদ করে নিচে নেমে যাচ্ছে [ফলে এখানে গড় উৎপন্ন = প্রান্তিক উৎপন্ন, [৩·১ সারণির (৪) ও (৫) কলমে (f)]। মোট উৎপন্ন রেখার ঊর্ধ্বগতির হার b বিন্দুর পর আগেকার তুলনায় আরও কমে গেছে বলে f বিন্দুর পর গড় উৎপন্ন রেখা APC-ও নিচের দিকে

নামতে শুরু করেছে। কিন্তু মোট উৎপন্ন রেখা TPC-র ঊর্ধ্বগতি তখনও অব্যাহত রয়েছে এবং সেটা c বিন্দুতে সর্বাধিক উচ্চতায় পৌঁছেছে। সেখানে কিন্তু মোট উৎপন্ন রেখা TPC সমান্তরাল (কোন ঢাল নেই) হয়ে পড়েছে অর্থাৎ মোট উৎপন্ন বৃদ্ধির হার শূন্য (০) [৩·১ সারণির (৩) কলমের (c)] বলে প্রান্তিক উৎপন্ন রেখা MPC নিচে নামতে নামতে অনুভূমিক অক্ষ-রেখাকে g বিন্দুতে ছেদ করে আরও নিচে নেমে গেছে। গড় উৎপন্ন রেখা APC অবশ্য তখনও প্রান্তিক উৎপন্ন রেখা MPC-র উপরে রয়েছে, তবে সে APC-ও তখন নিম্নমুখী।

চিত্র ৩·১ : মোট উৎপন্ন রেখা





চিত্র ৩·২ : প্রান্তিক ও গড় উৎপন্ন রেখা

তিনটি পর্যায় (three stages) : উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি উপাদান-সেবা পরিবর্তনীয় এবং অন্যান্য উপাদান সেবা অপরিবর্তনীয় হলে, পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাটির সাথে মোট উৎপন্নের সম্পর্কটিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। ৩·১ ও ৩·২ চিত্রে ওই পর্যায় তিনটি দেখান হয়েছে।

প্রথম পর্যায় : ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন : প্রথম পর্যায়ে মোট উৎপন্ন ক্রমবর্ধমান **হারে** বাড়ে। প্রান্তিক উৎপন্ন বাড়ে। গড় উৎপন্ন বাড়ে [৩·১ চিত্রের a বিন্দু পর্যন্ত] তারপরে মোট উৎপন্ন বৃদ্ধির **হার** কমতে শুরু করে। প্রান্তিক উৎপন্ন তখন সর্বাধিক হয়ে কমতে আরম্ভ করে। গড় উৎপন্ন তখনও বাড়তে থাকে [৩·১ চিত্রে a বিন্দু অনুযায়ী ৩·২ চিত্রে e বিন্দু]। এই পর্যায়ে যেখানে গড় উৎপন্ন সর্বাধিক ও গড় এবং প্রান্তিক উৎপন্ন পরস্পরের সমান হয় [৩·২ চিত্রের f বিন্দু] সেটি হল এই পর্যায়ের সীমারেখা। **এই পর্যায়টি হল ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন বিধির ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের** (stage of increasing returns) **পর্যায়।** এই পর্যায়ে এটি **ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি** নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় পর্যায় : ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন : দ্বিতীয় পর্যায়ে মোট উৎপন্ন ক্রমহ্রাসমান **হারে** বাড়তে থাকে। প্রান্তিক উৎপন্ন তখন কমতে থাকে। গড় উৎপন্ন কমতে থাকে [৩·১ চিত্রের b বিন্দু ও ৩·২ চিত্রের f বিন্দুর পর থেকে]। তারপরে মোট উৎপন্ন এক সময়ে সর্বাধিক হয়ে [৩·১ চিত্রের c বিন্দু] ক্রমশ কমতে আরম্ভ করে। প্রান্তিক উৎপন্ন তখন শূন্যে (০) পরিণত হয় [৩·২ চিত্রে g বিন্দু]। গড় আয়

কমতে থাকে। এই পর্যায়ের সীমারেখা হল সর্বাধিক মোট উৎপন্ন (c) এবং শূন্য প্রান্তিক উৎপন্ন (g)। এই পর্যায়টি হল **ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের পর্যায়।**

তৃতীয় পর্যায়ঃ এই পর্যায়ে মোট উৎপন্ন কমতে থাকে। প্রান্তিক উৎপন্ন ঋণাত্মক হয়। গড় উৎপন্নও কমতে থাকে [c বিন্দু ও g বিন্দুর ডান দিকে]।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায় নিয়ে সমগ্র ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন বিধিটি গঠিত। তবে তৃতীয় পর্যায়টি হল ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নবিধির **চরম পর্যায়।**

ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের কারণঃ অন্যান্য উপাদান-সেবাগুলির নিয়োগ অপরিবর্তিত রেখে কেবল একটি মাত্র উপাদান-সেবার (জমি, শ্রম বা পুঁজি যেটিই হোক) নিয়োগ বাড়ান হলে পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাটির প্রান্তিক ও গড় উৎপন্ন বৃদ্ধির মূল কারণ হল দু'টিঃ (১) তাতে উৎপাদনের মাত্রা (scale of production) বাড়ে বলে কারবারী সংস্থাটি বেশি পরিমাণে বৃহদায়তন উৎপাদন-জনিত বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচগুলি ভোগ করে। (২) পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাটি বেশি পরিমাণে ব্যবহারের দরুন অপরিবর্তিত উপাদান-সেবাগুলির অধিকতর সদ্ব্যবহার ঘটে। ব্যাখ্যা করে বলা যায়, এই পর্যায়ে প্রথমদিকে অপরিবর্তিত উপাদান-সেবাগুলির পরিমাণ পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাটির তুলনায় যদি বেশি থাকে (যেমন, অনেক জমি ও অল্প খেতমজুর) তাহলে উপযুক্ত পরিমাণ পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবার অভাবে অপরিবর্তিত উপাদান সেবাগুলি উপযুক্ত রূপে ব্যবহার করা যায় না। তাই তখন প্রান্তিক ও গড় উৎপন্ন কম থাকে। তারপর পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাটি যতই বেশি পরিমাণে নিয়োগ করা হয় ততই অপরিবর্তিত উপাদান-সেবাগুলির সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয় বলে প্রান্তিক উৎপাদন ও গড় উৎপাদন বাড়ে।

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নবিধির কারণঃ অন্যান্য উপাদান-সেবাগুলির নিয়োগ অপরিবর্তিত রেখে কেবল একটি মাত্র উপাদান-সেবার নিয়োগ বাড়ান হলে প্রথম দিকে গড় ও প্রান্তিক উৎপন্ন বাড়লেও **শেষ পর্যন্ত** গড়, প্রান্তিক এবং এমন কি মোট উৎপন্ন পর্যন্ত কমতে থাকে। তার মূল কারণ দু'টিঃ (১) অন্যান্য উপাদান-সেবা অপরিবর্তিত রেখে একটি মাত্র উপাদান-সেবা বেশি করে ব্যবহার করার অর্থ হল অপরিবর্তিত উপাদান-সেবাগুলির কাজ খানিকটা পরিমাণে পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাটির দ্বারা করিয়ে নেওয়া। একটা নির্দিষ্ট বিন্দু বা সীমা পর্যন্ত এটা সম্ভব, কিন্তু সে সীমা পার হয়ে গেলে একটি উপাদান-সেবার দ্বারা অন্য আরেকটি বা অন্যান্য উপাদান-সেবার কাজ সন্তোষজনকভাবে করিয়ে নেওয়া যায় না। যদি তা হত, তাহলে অপরিবর্তিত উপাদান-সেবা ও পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবা একই প্রকৃতির উপাদান-সেবা বলেই গণ্য হত। (২) অপরিবর্তিত উপাদান-সেবার সাথে পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাটির নিয়োগের পরিমাণ যতই বাড়ান হয় ততই উৎপাদনের আয়তন বাড়ে বটে, কিন্তু ততই উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন রক্ষা করা ও তাদের নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

৪. **সমানুপাতিক উৎপন্নবিধি** (Law of constant returns):

উৎপাদনের মাত্রা বাড়াতে গিয়ে সমস্ত উপাদান-সেবাগুলি যদি—(১) **প্রয়োজনীয় পরিমাণে** পাওয়া যায়, (২) তাদের সমস্ত এককের **দক্ষতা** যদি একই থাকে, তাহলে যে অনুপাতে সমস্ত উপাদান-সেবার নিয়োগ বাড়ান যায় ঠিক সেই অনুপাতে মোট, গড় ও প্রান্তিক উৎপন্ন বাড়ে। এটি সমানুপাতিক উৎপন্ন বিধি নামে পরিচিত। প্রকৃত পক্ষে সমানুপাতিক উৎপন্ন বিধি হল ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি ও ক্রমহ্রাসমান বিধির মধ্যবর্তী পর্যায়। এটি দেখা দিলে বুঝতে হবে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের পর্যায় শেষ হয়ে গেছে এবং ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের পর্যায় ভবিষ্যতে দেখা দেবে। সুতরাং এটি ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন বিধি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়।

৩ ৫. উৎপাদনের খরচ
Cost of Production

১. **উৎপাদন খরচ অপেক্ষক** (Cost function) ঃ ১. কারবারী সংস্থার উৎপাদন খরচ ও উৎপন্নের পরিমাণের সম্পর্কটিকে বলে উৎপাদন অপেক্ষক। বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য কি কি পরিমাণে বিভিন্ন উপাদান-সেবা লাগবে তা তার উৎপাদন অপেক্ষক অনুসারে স্থির হয়। যে সব বাজার দামে ওই সব উপাদান-সেবা কিনতে হয় তা দিয়ে কারবারী সংস্থাটির উৎপাদন খরচ অপেক্ষকটি নির্ধারিত হয়। সুতরাং কারবারী সংস্থার উৎপাদন অপেক্ষক ও উপাদান-সেবার বাজার দাম, এ দু'টি হল ঐ সংস্থার উৎপাদন খরচ অপেক্ষকের নির্ধারক। অতএব একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে পণ্য উৎপাদনের খরচ নির্ভর করে উৎপাদন অপেক্ষক ও উপাদান-সেবার বাজার দামের উপর।

২. উৎপাদন খরচ অপেক্ষক প্রধানত দু'রকমের ঃ (ক) স্বল্পকালীন উৎপাদন খরচ অপেক্ষক (short run cost function); (খ) দীর্ঘকালীন উৎপাদন খরচ অপেক্ষক (long run cost function)। অর্থাৎ কারবারী সংস্থার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য উৎপাদনের খরচ স্বল্পকালীন সময়ে একরকম ও দীর্ঘকালীন সময়ে অন্যরকম হয়ে থাকে। এর অর্থ হল, সময় অনুসারে কারবারী সংস্থার উৎপাদন খরচ ও উৎপন্নের পরিমাণের সম্পর্কটির তারতম্য ঘটে। কারবারী সংস্থার উৎপাদন খরচ অপেক্ষকটি সময় অনুযায়ী স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন খরচ রেখায় রূপান্তরিত হয়। [চাহিদা অপেক্ষক যেমন চাহিদা রেখায় এবং উৎপাদন অপেক্ষক যেমন মোট, গড় ও প্রান্তিক উৎপন্ন রেখায় রূপান্তরিত হয়, তেমনি]।

৩. **'উৎপাদন খরচ' শব্দটির অর্থ** (Meaning of cost) ঃ কোন উপকরণ বা উপাদান সংগ্রহ করতে কোন কারবারী সংস্থার যে আর্থিক খরচ লাগে তা নির্ধারিত হয় এইভাবে ঃ ঐ উপকরণটি তার কাছে নিযুক্ত না হয়ে অন্য কোন সর্বোত্তম বিকল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিযুক্ত হলে সেখানে সেটি যে দাম পেত [কিন্তু সেখানে নিযুক্ত না হওয়ায় যে আয় উপার্জনের সুযোগটি সে ত্যাগ করল] সে দামটুকুই হল ঐ উপাদান বাবদ কারবারী সংস্থার আর্থিক খরচ। এর নাম হল **বিকল্প খরচ** (alternative cost) বা **সুযোগ খরচ** (opportunity cost)।

এর অন্য একটি নাম হল **স্থানান্তর খরচ** (transfer cost) যে উদ্যোক্তা নিজে কারবার স্থাপন করল, সেই কারবারে **উদ্যোক্তার সুযোগ খরচ** (অর্থাৎ বিকল্প খরচটা) হল সে ঐ কারবারটি স্থাপন না করে অন্য কোথাও চাকরি নিলে সেই চাকরি থেকে সারা বৎসরে যা উপার্জন করত, সেটা। [চাকরি করে সারা বৎসরে যদি সে ১২ হাজার টাকা বেতন পেত, তাহলে তার কারবারে যোগদানের সুযোগ খরচটা হল ১২ হাজার টাকা। কারবার থেকে যদি তার বৎসরে ১৩ হাজার টাকা আয় হয়, তাহলে তার মুনাফাটা ১৩ হাজার টাকা নয়, (১৩০০০ টাকা – সুযোগ খরচ ১২০০০ টাকা =) মাত্র ১ হাজার টাকা বলে গণ্য করতে হবে। [যদি কারবারের আয় বৎসরে ১০ হাজার টাকা হয়, তাহলে তার সুযোগ খরচটা পুরো উঠছে না, ২ হাজার টাকা লোকসান হচ্ছে বলে গণ্য করতে হবে।] সমাজে উপকরণের পরিমাণ অফুরন্ত নয়, স্বল্প। আর রয়েছে প্রতিটি উপকরণের বহু রকমের বিকল্প ব্যবহারের সুযোগ। এর তাৎপর্য হল ঐ উপকরণ ব্যবহার করে বহু রকমের সেবা ও পণ্য উৎপাদন করা যায়। কিন্তু উপকরণ মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, সেটি একটি কাজে ব্যবহার করলে অন্য কোন কাজে আর সেটিকে ব্যবহার করা যায় না। সমাজে উপকরণের পরিমাণ স্বল্প বলে, একটি দ্রব্য বেশি পরিমাণে উৎপাদন করতে গেলে অন্য আরেকটি দ্রব্যের উৎপাদন কম হয়। বন্দুক বেশি তৈরি করা হলে মাখনের উৎপাদন কমে যায়। কারণ যে উপকরণগুলি মাখনও তৈরি করতে পারত তার বেশির ভাগ বন্দুক তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়েছে (যেমন, শ্রম, পুঁজি ইত্যাদি)। বিশ্রামের সময় বাড়ালে কাজের সময় কমে যায়। ভোগের জন্য খরচ বাড়ালে সঞ্চয় কম হয়। অতএব, অর্থবিদ্যায় 'উৎপাদনের খরচ' বা অর্থনীতিক খরচ (economic cost) বলতে বিকল্প খরচ বা সুযোগ খরচ বোঝায়। উপকরণ বা উপাদান-সেবা সংগ্রহের আর্থিক খরচটা তার সুযোগ খরচ দিয়ে নির্ধারিত হয়। অর্থবিদ্যায় এটি **সুযোগ খরচের তত্ত্ব** (doctrine of opportunity cost) নামে পরিচিত।

অর্থনীতিবিদ্‌রা একসময়ে মনে করতেন, উৎপাদনের অর্থনীতিক খরচটা নির্ধারিত হয় **'প্রকৃত খরচ'** (real cost) দিয়ে। প্রকৃত খরচ বলতে কি বোঝায়? ব্যাখ্যা করে বলা যায়, কোন কিছু উৎপাদন করতে বা সংগ্রহ করতে যা কিছু প্রচেষ্টা, পরিশ্রম, ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে—এক কথায় এ ব্যাপারে যত রকমের অসুবিধা (disutility) ভোগ করতে হয়েছে—এ সব কিছুর মোট পরিমাণ হল 'প্রকৃত খরচ'। উপাদান-সেবা সংগ্রহের খরচও তাদের প্রকৃত খরচ দ্বারা নির্ধারিত হয়। এটি **প্রকৃত খরচের তত্ত্ব** (doctrine of real cost) নামে পরিচিত। কিন্তু প্রকৃত খরচের ধারণাটি হল মনোগত (subjective) এবং অস্পষ্ট। এর একটা বড় দুর্বলতা হল, শহরের ভূগর্ভ নালা পরিষ্কারের কাজের মত অনেক বিপজ্জনক ও কষ্টদায়ক কাজের মজুরি কেন কম হয় এই তত্ত্বটি তা ব্যাখ্যা করতে পারে না। সুযোগ খরচের তত্ত্ব কিন্তু তা ব্যাখ্যা করতে পারে। এ ধরনের কাজ যারা করে, তাদের সামনে অন্য বিকল্প কাজের সুযোগ খুব কম বলেই তাদের

পারিশ্রমিক খুব কম হয়ে থাকে। তবে, প্রকৃত খরচের ধারণা যেমন উপযোগের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, তেমনি সুযোগ খরচের ধারণাটার সাথেও উপযোগের ধারণাটার খানিকটা সম্পর্ক আছে। কারণ, একটি উপাদান-সেবা বিকল্প কাজে যে মূল্য পেত সেটা সে কাজে তার উপযোগের উপরই তো প্রধানত নির্ভরশীল।

৪. কারবারী সংস্থার উৎপাদন খরচ বলতে যে বিকল্প খরচ বা সুযোগ খরচ বোঝায় তা দুটি ভাগে বিভক্ত: (ক) **সুস্পষ্ট খরচ** (explicit cos's)। মজুরি, বেতন, কাঁচামালের দাম, পৌরকর, বীমার প্রিমিয়াম, বিদ্যুতের দাম, খাজনা ও ভাড়া, অবচয়-অবচিতি (depreciation), সুদ ইত্যাদি হল সুস্পষ্ট খরচের দৃষ্টান্ত। (খ) **নিহিত খরচ** (ımplicit costs)। পুঁজির উপর যে স্বাভাবিক প্রতিদান পাওয়া যেত (অর্থাৎ, এ পুঁজি অন্যত্র বিনিয়োগ করা হলে তার দ্বারা যা উপার্জন করা যেত, অথবা, কাউকে ধার হিসাবে দেওয়া হলে এ পুঁজি থেকে যে সুদ পাওয়া যেত) এবং উৎপাদনে নিযুক্ত কারবারী সংস্থার উপকরণগুলির দ্বারা অন্যত্র যা উপার্জিত হত—এ সবের মোট পরিমাণ হল নিহিত খরচ। [হিসাবরক্ষকরা শুধু সুস্পষ্ট খরচকে উৎপাদন খরচের মধ্যে ধরেন এবং নিহিত খরচকে অগ্রাহ্য করেন। অর্থনীতিবিদরা উৎপাদনের অর্থনীতিক খরচ বলতে সুস্পষ্ট ও নিহিত দু'রকম খরচকেই ধরেন।]

৫. **সময়** (Time) **:** অর্থনীতিক বিশ্লেষণের সব ক্ষেত্রেই **সময়** হল অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। তবে সর্বত্র তা হয়তো স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয় না। কারবারী সংস্থার উৎপাদন খরচের প্রকৃতি ও ধরনধারণ বিশ্লেষণে সময়ের বিবেচনাটা হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সময় বা কাল ভেদে উৎপাদন অপেক্ষক ও উৎপাদন খরচ অপেক্ষকের মধ্যে তারতম্য ঘটে থাকে।

উৎপাদন খরচের আলোচনায় সময়কে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়: (ক) একটি হল, **স্বল্পকালীন সময়** (short period বা short run)। যে সময়ে কারবারী সংস্থা তার **কতকগুলি উপাদান-সেবার** পরিমাণ বাড়াতে বা কমাতে পারে না তা হল স্বল্পকালীন সময়। সুতরাং স্বল্পকালীন সময়ে কারবারী সংস্থার কতকগুলি উপাদান-সেবা (যন্ত্রপাতি, জমি, ব্যবস্থাপনা-কর্মী, দক্ষ শ্রমিক ইত্যাদি) **অপরিবর্তিত থাকে**। এর তাৎপর্য হল, স্বল্পকালীন সময়ে এ সব উপাদান-সেবার সবগুলি তার কাজে লাগুক বা না লাগুক এদের পারিশ্রমিক দিতেই হয়। আবার, কোন কারণে ঐ সব উপাদান-সেবা যদি বেশি পরিমাণে ব্যবহার করার দরকার হয়, তখন স্বল্পকালীন সময় বলেই ঐগুলি প্রয়োজন মত যোগাড় করা যায় না। তবে অবশ্য কোন কোন উপাদান-সেবার পরিমাণ স্বল্পকালীন সময়ে বাড়ানো কমানো যায়। তাদের বলে **পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবা**। স্বল্পকালীন সময়ে উৎপাদন বাড়াতে হলে কেবল পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলিই বেশি পরিমাণে ব্যবহার করতে হয়। এ সময়ে কারবারী সংস্থার উৎপাদন শূন্য (০) থেকে সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত বাড়ানো যায়। সেই সর্বোচ্চ সীমাটি নির্ধারিত হয় কারবারী সংস্থায় ব্যবহৃত অপরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলির সর্বোচ্চ উৎপাদন-ক্ষমতার দ্বারা। (খ) অপরটি

হল, **দীর্ঘকালীন সময়** (long period বা long run)। যে সময়ে সমস্ত উপাদান-সেবার পরিমাণই বাড়ানো কমানো যায় তা হল দীর্ঘকালীন সময়। তখন কারবারী সংস্থার উৎপন্নের পরিমাণ শূন্য থেকে অনির্দিষ্ট পরিমাণে বেশি হতে পারে।

সময়কে যে স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল হিসাবে ভাগ করা হয়, সে ভাগ কিন্তু দিন, মাস বা বৎসর ধরে করা হয় না। সময়ের এ দুটি বিভাগ দুটি আলাদা অবস্থা নির্দেশ করে। কতদিন ধরে চললে সময়টাকে স্বল্পকালীন বলা যাবে, আর কতদিন ধরে চললেই বা তাকে দীর্ঘকালীন বলা যাবে—এ বিষয়ে সঠিকভাবে কিছুই নির্ধারণ করা যায় না। জলবিদ্যুৎ শিল্পে দশ, পনেরো এমন কি কুড়ি বৎসর কালও স্বল্পকালীন সময় বলে গণ্য হতে পারে। আবার মোটর পরিবহণ শিল্পে স্বল্পকালীন সময় বলতে দুই/তিন সপ্তাহও হতে পারে। তেমনি ইস্পাত শিল্পে দীর্ঘকালীন সময়টা ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর ধরে চলতে পারে কিন্তু জনসংযোগ শিল্পে (public-relations industry) সেটা মাত্র কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী হতে পারে।

৬. **স্বল্পকালীন সময়ে** কারবারী সংস্থার উৎপাদন অপেক্ষকটিতে একটি বা একাধিক উপাদান-সেবা অপরিবর্তনীয় থাকে, আর কতকগুলি উপাদান-সেবা থাকে পরিবর্তনীয়। কিন্তু অপরিবর্তনীয় ও পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলির মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সমন্বয় সাধনের সুযোগ থাকে। অর্থাৎ, স্বল্পকালে কারখানার শেড, ভারী যন্ত্রপাতি, স্থায়ী কর্মী, ভাড়া, খাজনা, অবচয়-অবচিতি ইত্যাদি অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু অস্থায়ী শ্রমিক, কাঁচামাল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি থাকে পরিবর্তনীয় এবং একই যন্ত্রপাতির সাহায্যে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত শ্রমিক, কাঁচামাল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বেশি পরিমাণে ব্যবহার করে উৎপন্নের পরিমাণ শূন্য থেকে স্থায়ী যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত বাড়ানো যায়। উৎপন্নের পরিমাণ বাড়াতে হলে পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলি বেশি লাগে ও কম পরিমাণে উৎপাদন করতে হলে পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলি কম লাগে।

সুতরাং স্বল্পকালে কারবারী সংস্থার উৎপাদন খরচের একটা অংশ হয় অপরিবর্তিত উপাদান-সেবাগুলির জন্য, আরেকটি অংশ হয় পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলির জন্য। উৎপন্নের পরিমাণ যাই হোক, যে উপাদান-সেবাগুলি অপরিবর্তিত থাকে তাদের বাবদ খরচের পরিমাণটাও থাকে অপরিবর্তিত বা স্থির। এই কারণে, অপরিবর্তিত উপাদান-সেবাগুলির দরুন যে খরচ তাকে **স্থির খরচ** (fixed cost) বলে। আর উৎপন্নের পরিমাণ কম বা বেশি হলে পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলি কম বা বেশি পরিমাণে লাগে বলে, স্বল্পকালে পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলির দরুন খরচটাও উৎপন্নের পরিমাণের সাথে কমে বা বাড়ে। এজন্য তখন পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলির দরুন খরচটাকে বলে **পরিবর্তনীয় বা মুখ্য খরচ** (variable cost বা prime cost)। সুতরাং **স্বল্পকালে**, উৎপাদনের মোট খরচটাকে স্থির খরচ ও পরিবর্তনীয় খরচ এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। তাই স্বল্পকালীন সময়ে উৎপাদনের মোট খরচ হল স্থির খরচ ও পরিবর্তনীয় খরচের যোগফল।

স্বল্পকালীন মোট উৎপাদন খরচ = স্থির খরচ + পরিবর্তনীয় খরচ

[Short period total cost = Fixed cost + Variable cost]

এর অর্থ হল, **স্বল্পকালীন সময়ে,** কম পরিমাণে উৎপাদন করা হলে **পরিবর্তনীয় খরচগুলি কমানো যায়, কিন্তু স্থির খরচগুলি কমানো যায় না।** কারখানা যদি সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে তাহলে উৎপন্নের পরিমাণ যেমন শূন্য (o) হয়, তেমনি পরিবর্তনীয় খরচগুলিও শূন্য (o) হয়। কিন্তু তখনও স্থির খরচগুলি বইতে হয়। কারণ স্থায়ী কর্মীদের বেতন, ঋণ পুঁজির উপর সুদ, ভাড়া ও খাজনা ইত্যাদি দিয়ে যেতেই হয়। সেগুলি বাদ দেওয়া যায় না। আবার উৎপাদনের পরিমাণ যদি বাড়ানো হয় তখন পরিবর্তনীয় খরচগুলি বাড়লেও স্থির খরচগুলি বাড়ে না। স্থির খরচের মোট পরিমাণটা, উৎপাদন না হলে যা হবে, উৎপাদন বেশি হলেও তাই হবে এবং কম হলেও একই থাকবে। সুতরাং স্বল্পকালীন সময়ে উৎপন্নের পরিমাণের সাথে পরিবর্তনীয় খরচগুলির সামঞ্জস্য থাকে ও সমন্বয় করা যায়। কিন্তু স্থির খরচগুলির কোন সামঞ্জস্য থাকে না, সমন্বয় করা যায় না।

কিন্তু **দীর্ঘকালীন সময়ে** কারবারী সংস্থার উৎপাদন অপেক্ষকটিতে অপরিবর্তিত উপাদান-সেবা বলে কোন উপাদান-সেবা থাকে না। কারণ দীর্ঘকালে সমস্ত উপাদানের সচলতা (mob lity) বেশি বলে, উপাদান-সেবাগুলির উৎপাদনের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব ; তাই সমস্ত উপাদান-সেবাই তখন পরিবর্তনীয় হয়ে পড়ে। দরকার হলে তখন নতুন যন্ত্রপাতি কিনে কারখানা বাড়ানো যায়, একটার জায়গায় দুটো বা তিনটে কারখানাও বসানো যায়, কিংবা কিছু যন্ত্রপাতি বেচে দিয়ে কারখানা ছোট করে ফেলা যায়। স্থায়ী কর্মীর সংখ্যাও বাড়ানো বা কমানো যায়। তাই **দীর্ঘকালে** কারবারী সংস্থার সমস্ত উপাদান-সেবাই পরিবর্তনীয় বলে তার **সমস্ত খরচই হল পরিবর্তনীয়।** তখন তার স্থির খরচ বলে কিছু থাকে না। সুতরাং স্বল্পকালীন উৎপাদন খরচকে যেমন স্থির খরচ ও পরিবর্তনীয় খরচ, এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়, দীর্ঘকালীন উৎপাদন খরচকে তেমন দুই ভাগে ভাগ করা যায় না। দীর্ঘকালে তার সব খরচই এক রকমের, সব খরচই পরিবর্তনীয়।

৩. ৬. স্বল্পকালীন খরচ তালিকা ও খরচ রেখা

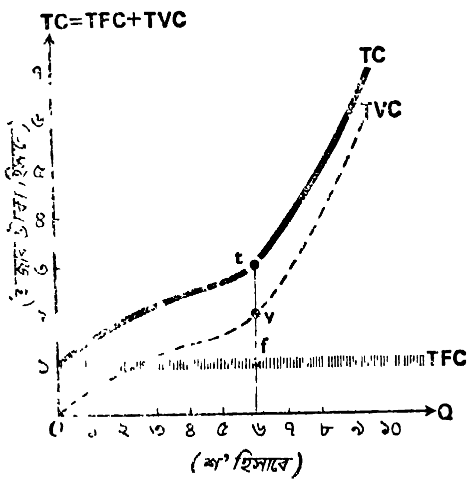
Short-run Cost Schedules

১. **উৎপাদন খরচের নির্ধারক** (Determinants of cost) ঃ কারবারী সংস্থার উৎপাদন খরচ নির্ভর করে ঃ (১) উপাদান-সেবাগুলির দাম, (২) উপাদান-সেবাগুলির এককগুলির দক্ষতা বা গুণমান ; (৩) উৎপাদন কৌশল ; (৪) উৎপাদনের সময়ে উৎপন্নের যে বিধিটি (the law of return in operation) কাজ করছে,—এসবের উপর। উপাদান-সেবাগুলির দাম যদি কম হয়, তাদের সমস্ত এককগুলির দক্ষতা বা গুণমান যদি উন্নত ও এক রকমের হয়, উৎপাদনের জন্য যে কারিগরী কৌশল ও পদ্ধতি বেছে নেওয়া হয়েছে তা যদি উন্নত ধরনের হয় এবং যদি উৎপাদনের সময় ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধিটি কাজ করে তাহলে মোট

উৎপাদনের বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদনের মোট খরচের বৃদ্ধিটা হবে কম। আর প্রথম তিনটি বিষয় অনুকূল হলেও, ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধিটি যদি ক্রিয়াশীল হয়, তাহলে মোট উৎপাদনের বৃদ্ধির তুলনায় মোট খরচের বৃদ্ধিটা হবে বেশি। সুতরাং **উৎপন্নের বিধিটিই উৎপাদন খরচের নির্ধারকগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান।** স্বল্পকালীন সময়ে স্থির উপাদান-সেবাগুলির সাথে পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলি বেশি বেশি পরিমাণে নিয়োগ করা হয় বলে উৎপাদন কার্যের প্রথম দিকে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের নিয়মটি দেখা দেয় (৩·১ ও ৩·২ চিত্রে প্রথম পর্যায়)। এর ফলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় মোট খ চেব বৃদ্ধিটা ঘটে কম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, স্থির উপাদান-সেবাগুলির সাথে পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলির সামঞ্জস্যের সীমাটা পার হয়ে যায় বলে তখন মোট খরচ যে হারে বাড়ে মোট উৎপাদন সে হারে বাড়ে না, অর্থাৎ, তখন ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের নিয়মটি কাজ করতে শুরু করে (৩·১ ও ৩·২ চিত্রে দ্বিতীয় পর্যায়)।

২. **স্বল্পকালীন খরচ তালিকার প্রকৃতি** (Nature of short-run cos s ঃ

(ক) **স্বল্পকালীন মোট খরচ রেখাসমূহ** (total cost curves) ঃ ৩·২ সারণির (১) কলমে স্বল্পকালীন সময়ে একটি কারবারী সংস্থার উৎপন্নের বিভিন্ন পরিমাণ (Q) দেওয়া হয়েছে। ঐ সারণির (২) কলমে রয়েছে বিভিন্ন পরিমাণ উৎপন্নের **মোট স্থির খরচ** (আগাগোড়া ১০০০ টাকা)। ধরা যাক, ছোট্ট একটি কারখানায় এই পরিমাণ স্থির খরচে 0 থেকে ১০০০ একক পর্যন্ত পণ্য উৎপাদন করা যায়। সুতরাং উৎপাদনের প্রকৃত পরিমাণটা 0 থেকে ১০০০ এককের মধ্যে যতটাই হোক না কেন, স্থির খরচ ঐ ১০০০ টাকাই থাকবে, তার কমও হবে না, বেশিও হবে না। তাই ৩·৩ চিত্রে **মোট স্থির খরচ রেখা** TFC একটি অনুভূমিক সমান্তরাল রেখায় পরিণত হয়েছে। TFC-র আকৃতি এ রকম হবার কারণ হল, উৎপাদন যখন শূন্য (0) স্থির খরচ তখন যেমন ১০০০ টাকা, উৎপাদন যখন ১০০০ স্থির খরচ তখনও ১০০০ টাকা। সর্বস্তরে স্থির খরচ ১০০০ টাকা হবার দরুন TFC অনুভূমিক অক্ষ-রেখা OQ-র সাথে সমান্তরাল না হয়ে অন্য কিছু হতে পারে না।



চিত্র ৩·৩ঃ মোট খরচ রেখাসমূহ

কিন্তু উৎপন্নের পরিমাণ যখন শূন্য, তখন **মোট পরিবর্তনীয় খরচ** [৩·২ সারণির (৩) কলম] কিছুই লাগে না। উৎপাদন যখন ১০০ একক থেকে [(১) কলম] শুরু হল তখন থেকে পরিবর্তনীয় খরচও শুরু হল।

তারপর উৎপন্নের পরিমাণ যেমন বাড়ছে, মোট পরিবর্তনীয় খরচও তেমন বাড়ছে। ১০০ একক উৎপন্নের সময় ৫০০ টাকা থেকে ১০০০ একক উৎপন্নের সময় মোট পরিবর্তনীয় খরচ ৮০০০ টাকায় পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন পরিমাণ উৎপন্নের পরিবর্তনীয় খরচ অনুযায়ী ৩.৩ চিত্রে **মোট পরিবর্তনীয় খরচ রেখা** TVC আঁকা হয়েছে। উৎপন্ন শূন্য (0) হলে পরিবর্তনীয় খরচ শূন্য (0) হয় বলে TVC রেখাটি দুটি অক্ষরেখার সংযোগ বিন্দু 0 থেকে শুরু হয়েছে। ৫০০ একক পর্যন্ত TVC রেখাটি অতি ধীরে ধীরে উঠছে কিন্তু তারপর থেকে তার খাড়াই খুব বেড়ে গেছে। এর অর্থ হল ৫০০ একক পর্যন্ত পরিবর্তনীয় খরচ যে হারে বেড়েছে, তারপর থেকে পরিবর্তনীয় খরচ আরও বেশি হারে বেড়েছে।

সারণি ৩.২

(১) উৎপন্নের পরিমাণ (Q)	(২) মোট স্থির খরচ (TFC + (টাকা)	(৩) মোট পরিবর্তনীয় খরচ (TVC) = (টাকা)	(৪) মোট উৎপাদন খরচ (TC) (টাকা)	(৫) গড় স্থির খরচ $(AFC = \frac{TFC}{Q})$ (টাকা)	(৬) গড় পরিবর্তনীয় খরচ $(AVC = \frac{TVC}{Q})$ (টাকা)	(৭) গড় খরচ $(AC = \frac{TC}{Q} = AFC + AVC)$ (টাকা)	(৮) প্রান্তিক খরচ $(MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{\Delta VC}{\Delta Q})$ (টাকা)
০	১০০০	০	১০০০	—	—	—	—
১০০	১০০০	৫০০	১৫০০	১০.০	৫	১৫	৫
২০০	১০০০	৯০০	১৯০০	৫.০	৪.৫	৯.৫	৪
৩০০	১০০০	১২০০	২২০০	৩.৩	৪.০	৭.৩	৩
৪০০	১০০০	১৪০০	২৪০০	২.৫	৩.৫	৬.০	২
৫০০	১০০০	১৫০০	২৫০০	২.০	৩.০	৫.০	১
৬০০	১০০০	২০০০	৩০০০	১.৬	৩.৩	৫.০	৫
৭০০	১০০০	৩২০০	৪২০০	১.৪	৪.৬	৬.০	১২
৮০০	১০০০	৪৬০০	৫৬০০	১.২	৫.৮	৭.০	১৪
৯০০	১০০০	৬২০০	৭২০০	১.১	৬.৯	৮.০	১৬
১০০০	১০০০	৮০০০	৯০০০	১.০	৮.০	৯.০	১৮

মোট স্থির খরচ + মোট পরিবর্তনীয় খরচ = মোট খরচ। ৩.৩ চিত্রে এই **মোট**

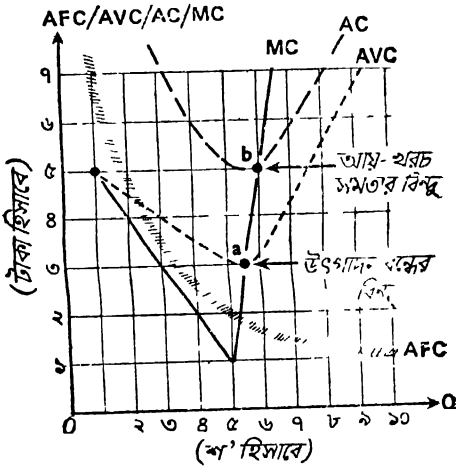
খরচ রেখাটি হল TC। ৩·২ সারণির (৪) কলম লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 0 এককের মোট খরচ হল ১০০০ টাকা (= মোট স্থির খরচ)। তাই মোট খরচ রেখাটি লম্ব অক্ষ রেখায় ১০০০ টাকার বিন্দু থেকে শুরু হয়েছে। মোট স্থির খরচ সব অবস্থাতে একই পরিমাণ বলে, এবং শুধু মোট পরিবর্তনীয় খরচের পরিবর্তন ঘটছে বলে মোট খরচ রেখার আকৃতিটা মোট পরিবর্তনীয় খরচ রেখার মতোই হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, কোন উৎপন্নের পরিমাণে মোট খরচ রেখা TC এবং মোট পরিবর্তনীয় খরচ রেখা TYC-র মধ্যে খাড়াখাড়ি ব্যবধানটা মোট স্থির খরচের সমান। যেমন, ৬০০ একক উৎপন্নের সময় মোট খরচ ৩০০০ টাকা = মোট পরিবর্তনীয় খরচ ২০০০ টাকা + মোট স্থির খরচ ১০০০ টাকা।

(খ) **স্বল্পকালীন গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ রেখাসমূহ** (average and marginal cost curves): বিভিন্ন পরিমাণ উৎপন্নের মোট স্থির খরচ, মোট পরিবর্তনীয় খরচ এবং মোট খরচ কি পড়ে তার তালিকা ও রেখা কারবারী সংস্থা ও তার ব্যবস্থাপকদের উৎপাদন খরচ সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা দিতে সাহায্য করে মাত্র। কিন্তু বাজারের অবস্থা অনুযায়ী কতটা পরিমাণে উৎপাদন করা হবে, তা স্থির করতে, কিংবা মুনাফার পরিমাণ হিসাব করতে, অথবা কতটা পরিমাণে উৎপাদন করলে সবচেয়ে কম খরচে তা উৎপাদন করা যায় তা জানতে হলে মোট খরচ তালিকা ও মোট খরচ রেখাগুলি কাজে লাগে না। তখন কাজে লাগে গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচের হিসাব ও রেখাগুলি। অবশ্য তা মোট স্থির খরচ, মোট পরিবর্তনীয় খরচ, এবং মোট খরচের হিসাব থেকেই বের করতে হয়। ৩·২ সারণির (৫) থেকে (৮) কলমে তা দেওয়া হয়েছে।

গড় স্থির খরচ (average fixed cost): মোট স্থির খরচকে উৎপন্নের পরিমাণ দিয়ে ভাগ দিলে যে ভাগফলটি পাওয়া যায় তা হল উৎপন্নের একক পিছু স্থির খরচ বা গড় স্থির খরচ [TFC ÷ Q = AFC]। ৩·২ সারণির (৫) কলমে দেখা যাচ্ছে উৎপন্নের পরিমাণ যেমন বেড়ে যাচ্ছে, গড় স্থির খরচও তেমনি ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। কারণ, উৎপাদন যতই বাড়ছে ততই উৎপন্নের বেশি সংখ্যক এককের মধ্যে মোট স্থির খরচটি ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য ৩·৪ চিত্রে গড় স্থির খরচ রেখা AFC ১০০ এককে ১০ টাকা থেকে ১০০০ এককের সময় ১ টাকায় পরিণত হয়েছে।

গড় পরিবর্তনীয় খরচ (average variable cost): মোট পরিবর্তনীয় খরচকে উৎপন্নের পরিমাণ দিয়ে ভাগ দিলে ভাগফল হল একক পিছু পরিবর্তনীয় খরচ বা গড় পরিবর্তনীয় খরচ [TVC ÷ Q = AVC]। ৩·২ সারণির (৬) কলমে দেখা যাচ্ছে গড় পরিবর্তনীয় খরচ ১০০ একক উৎপন্নের সময় ৫ টাকা থেকে ক্রমশ কমে ৫০০ এককের সময় ৩ টাকা হয়ে আবার ক্রমশ বেড়ে ১০০০ এককের সময় ৮ টাকা হয়েছে। এই কারণে ৩·৪ চিত্রে গড় পরিবর্তনীয় খরচ রেখা AVC প্রথম একক থেকে পঞ্চম একক পর্যন্ত ক্রমশ নিচে নেমে তারপর থেকে ক্রমাগত উপরের দিকে উঠেছে।

গড় খরচ (average cost) : গড় খরচ বা উৎপন্নের একক পিছু খরচ হল উৎপন্নের মোট খরচ ও মোট পরিমাণের ভাগফল [TC÷Q = AC] কিংবা গড় স্থির খরচ ও গড় পরিবর্তনীয় খরচের যোগফল [TFC + AVC = AC (= TC ÷Q)]। ৩·২ সারণির (৭) কলম লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ১০০ একক উৎপন্নের গড় খরচ হল ১৫ টাকা। তারপর উৎপন্নের ৫০০ একক পর্যন্ত গড় খরচ ক্রমশ কমে ৫ টাকা হয়েছে। ৬০০ এককেও ৫ টাকাই রয়েছে। কিন্তু তার পরে তা বাড়ছে এবং ১০০০ একক উৎপন্নের সময় তা ৯ টাকায় পরিণত হয়েছে। ৩·২ সারণি থেকে দেখা যাবে, (৭) কলম আসলে (৫) কলম ও (৬) কলমের যোগফল (AFC + AVC = AC) ছাড়া আর কিছুই নয়। উৎপন্নের ৫০০ একক পর্যন্ত (৭) কলমে গড় খরচ যে কমছে তার কারণ হল, ওই অবধি AFC এবং AVC দুটোই কমছে কিন্তু ৬০০ এককে গড় স্থির খরচ যতটা কমেছে, গড় পরিবর্তনীয় খরচ প্রায় ততটাই বেড়েছে, তাই গড় খরচ একই রয়েছে। কিন্তু তারপর থেকে গড় স্থির খরচ যতটা কমছে, গড় পরিবর্তনীয় খরচ বেড়েছে তার বেশি। তাই গড় খরচ বাড়ছে। এই কারণে ৩·৪ চিত্রে গড় খরচ রেখা AC উৎপন্নের ১০০ এককে ১৫ টাকা থেকে ক্রমশ নিচের দিকে নামছে; ৫০০ এককে সর্বনিম্ন হয়েছে, ৬০০ এককেও তা অপরিবর্তিত রয়েছে, কিন্তু ৭০০ একক থেকে AC রেখা উপরের দিকে উঠেছে। অর্থাৎ গড় খরচ প্রথমে বেশি, পরে কম ও তারপর আবার বেশি হয় বলে গড় খরচ রেখাও প্রথমে নিম্নগামী হয়ে একটা সর্বনিম্ন বিন্দুতে পৌঁছায়, সেখানে ক্ষণকাল স্থির থেকে পরে আবার ঊর্ধ্বগামী হয়।



চিত্র ৩·৪ : গড় ও প্রান্তিক খরচ রেখাসমূহ

প্রান্তিক খরচ (marginal cost) : উৎপন্নের পরিমাণ একটি একক বাড়ালে মোট খরচ যতটুকু বাড়ে কিংবা উৎপন্নের পরিমাণ একটি একক কমালে মোট খরচ যতটুকু কমে তাই হল প্রান্তিক খরচ। প্রান্তিক খরচ হল অতিরিক্ত একটি একক উৎপাদনের খরচ [total cost of x + 1 unit—total cost of x units = MC = cost of 1 extra unit]। ৩·২ সারণির (৮) কলমের সাথে (১) এবং (৪) কলম মিলিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, উৎপন্নের পরিমাণ যখন শূন্য (0) তখন মোট খরচ (= স্থির খরচ) ১০০০ টাকা, কিন্তু উৎপন্নের পরিমাণ 0 থেকে বেড়ে ১০০ একক হলে মোট খরচ বেড়ে হল ১৫০০ টাকা। সুতরাং 0 উৎপন্নের তুলনায় এখন অতিরিক্ত ১০০ এককের জন্য মোট খরচ বাড়ল ৫০০ টাকা। সুতরাং একটি

অতিরিক্ত এককের খরচ বা প্রান্তিক খরচ হল (৫০০ টাকা÷১০০ একক=) ৫ টাকা। তারপর উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক খরচ কমতে শুরু করল এবং ৫০০ এককে তা সবচেয়ে কমে ১ টাকায় দাঁড়াল। তারপর তা আবার বাড়তে শুরু করল ও ১০০০ এককে ১৮ টাকায় পৌঁছাল। অর্থাৎ, উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রথম প্রান্তিক খরচ কমে ও পরে তা আবার বাড়ে। এই কারণে ৩·৪ চিত্রে প্রান্তিক খরচ রেখা MC-ও প্রথমে উৎপন্নের ১০০ একক থেকে ৫০০ একক পর্যন্ত নিচে নেমেছে কিন্তু তারপর আবার ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে।

৩. **গড় পরিবর্তনীয় খরচ, গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচের সম্পর্ক** (Relation between average variable cost, average cost and marginal cost) ঃ (ক) **পরিবর্তনীয় খরচ ও প্রান্তিক খরচ** ঃ স্বল্পকালীন সময়ে স্থির খরচ অপরিবর্তনীয় থাকে বলে উৎপন্নের পরিমাণ বাড়লে যে খরচটা বাড়ে তার সবটাই হল শুধু পরিবর্তনীয় খরচ। সুতরাং উৎপন্নের পরিমাণ একটি একক বাড়ালে মোট খরচ যেটুকু বাড়ে এবং তখন যেটাকে **প্রান্তিক খরচ** বলে ধরা হয় তার সবটাই **হল,** আসলে **পরিবর্তনীয় খরচ**। সুতরাং প্রান্তিক খরচ= পরিবর্তনীয় খরচের বৃদ্ধির পরিমাণ [MC = variable cost of the extra unit = $\triangle VC \div \triangle Q$] ৩·২ সারণির (১) কলমে উৎপন্নের পরিমাণ 0 একক থেকে বেড়ে ১০০ একক হলে পরিবর্তনীয় খরচ 0 থেকে বেড়ে ৫০০ টাকা হয়, তাই প্রান্তিক খরচ [(৮) কলম] তখন ৫ টাকা। উৎপন্নের পরিমাণ ১০০ একক থেকে বেড়ে ২০০ একক হলে পরিবর্তনীয় খরচ বাড়ে ৪০০ টাকা (৯০০ − ৫০০ টাকা)। তাই ২০০ এককে উৎপন্নের প্রান্তিক খরচ হল ৪ টাকা [(৮) কলম]। সুতরাং **স্বল্পকালীন প্রান্তিক খরচের সাথে স্থির খরচের (মোট বা গড়) কোন সম্পর্ক নেই।**

উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে **প্রথম দিকে** গড় পরিবর্তনীয় খরচ এবং প্রান্তিক খরচ উভয়েই কমে। কিন্তু প্রান্তিক খরচ তখন গড় পরিবর্তনীয় খরচের চেয়ে বেশি হারে কমে। তাই AVC এবং MC রেখা দুটি ৩·৪ চিত্রে প্রথমে নিচে নামছে। কিন্তু MC যত ঢালু হয়ে নামছে AVC ততটা ঢালু হয়ে নামছে না। **তারপর** দুটি খরচই উৎপন্নের একটি স্তরে সর্বনিম্ন হয় বলে দুটি রেখাই নিজ নিজ সর্বনিম্ন বিন্দুতে পৌঁছায়। তখন পর্যন্ত প্রান্তিক খরচ গড় পরিবর্তনীয় খরচের কম থাকে বলে MC রেখা এই সময়ে AVC রেখার নিচে থাকে (চিত্র ৩·৪)। ওই সর্বনিম্ন বিন্দুতে (a) গড় পরিবর্তনীয় খরচ স্থির হয়ে পড়ে [সারণি ৩·২-এর (১) কলমে ৫০০ এবং ৬০০ একক উৎপন্নের পরিমাণে গড় পরিবর্তনীয় খরচ ৩ টাকা থেকে ৩·৩০ টাকার মধ্যে মোটামুটি একই স্তরে বা স্থির রয়েছে বলে গণ্য করা যায়] এবং **তারপরে** বাড়তে আরম্ভ করে। তখন প্রান্তিক খরচও, যেটা এতক্ষণ পর্যন্ত গড় পরিবর্তনীয় খরচের চেয়ে কম ছিল, বাড়তে আরম্ভ করে। কিন্তু বাড়তে গিয়ে গড় পরিবর্তনীয় খরচের বৃদ্ধির হারের তুলনায় প্রান্তিক খরচের বৃদ্ধির হারটা বেশি হয়ে পড়ে। তাই একটা সময়ে প্রান্তিক খরচ বেড়ে গড় পরিবর্তনীয় খরচের সমান হয়ে পড়ে এবং সেটা ঘটে

গড় পরিবর্তনীয় খরচ যখন সর্বনিম্ন স্তরে থাকে তখনই। কল্পনা করা যেতে পারে, উৎপন্নের পরিমাণ যখন ৫০০ থেকে ৬০০ এককের মধ্যে বাড়ছে তখন গড় পরিবর্তনীয় খরচ মোটামুটি একই স্তরে থাকলেও, প্রান্তিক খরচ দ্রুত হারে বেড়ে ৫০০ থেকে ৬০০ এককের মধ্যে কোথাও গড় পরিবর্তনীয় খরচের সমান হয়ে পড়ে এবং উৎপন্নের পরিমাণ ৬০০ এককে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে প্রান্তিক খরচ ৩ টাকার স্তর পেরিয়ে ৫ টাকায় পরিণত হয়ে গড় পরিবর্তনীয় খরচকে ছাড়িয়ে বেশি হয়ে যায় [চিত্র ৩·৪-এ MC রেখা তাই উৎপন্নের পরিমাণ ৫০০ থেকে ৬০০ এককের মধ্যে একটা বিন্দুতে ওঠার সময় AVC-র সর্বনিম্ন বিন্দু a-কে ছেদ করে উপরে উঠে গেছে]। এই বিশ্লেষণ থেকে তিনটি তথ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়: (১) প্রান্তিক খরচের চেয়ে কম হারে গড় পরিবর্তনীয় খরচ কমে বলে, গড় পরিবর্তনীয় খরচ যখন কমতে থাকে তখন প্রান্তিক খরচ গড় পরিবর্তনীয় খরচের চেয়ে কম হয়, প্রান্তিক খরচ রেখা MC তখন গড় পরিবর্তনীয় খরচ রেখা AVC-র নিচে থাকে এবং AVC রেখার ঢালের চেয়ে প্রান্তিক খরচ রেখা MC র ঢাল বেশি হয়; (২) গড় পরিবর্তনীয় খরচ যখন বাড়ে তখন তা প্রান্তিক খরচের চেয়ে কম হারে বাড়ে বলে তখনও গড় খরচ রেখা AVC-র ঢাল প্রান্তিক খরচ রেখা MC-র ঢালের চেয়ে কম হয় এবং প্রান্তিক খরচ রেখা তখন গড় খরচ রেখার উপরে চলে যায়; (৩) গড় পরিবর্তনীয় খরচ যখন সবচেয়ে কম তখন প্রান্তিক খরচ পরিবর্তনীয় গড় খরচের সমান হয়। প্রান্তিক খরচ ও গড় পরিবর্তনীয় খরচের এই সমতার বিন্দুটিকে বলে **উৎপাদন বন্ধের বিন্দু** [৩·৪ চিত্রে a বিন্দু]। বিশেষ একটি পরিস্থিতিতে কারবারী সংস্থার কাছে এর গুরুত্ব দেখা দেয়। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পরে করা হয়েছে।

গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ: কারবারী সংস্থার কাছে এই দুটি খরচ ও খরচ রেখার গুরুত্ব সব সময়েই সবচেয়ে বেশি। কারণ **প্রথমটির দ্বারা তার মোট মুনাফা ও দ্বিতীয়টির সাহায্যে সে কি পরিমাণে উৎপাদন করবে তা স্থির হয়।** সারণি ৩·২-এর (৭) ও (৮) কলম লক্ষ্য করলে দেখা যাবে: (১) ৫০০ একক পর্যন্ত গড় খরচ যখন কমছে তখন প্রান্তিক খরচও কমছে এবং তখন প্রান্তিক খরচ গড় খরচের কম রয়েছে [AC↓ > MC↓]। আসলে তখন প্রান্তিক খরচ কমছে বলেই গড় খরচও কমছে। তাই ৩·৪ চিত্রে তখন প্রান্তিক খরচ রেখা MC গড় খরচ রেখা AC-র নিচে রয়েছে। এই হল গড় ও প্রান্তিক খরচের একটি সম্পর্ক (২) ৫০০ একক উৎপন্নের সময় গড় খরচ সবচেয়ে কমছে এবং ৬০০ একক উৎপন্নের সময়ও তাই রয়েছে। সুতরাং গড় খরচ যখন সর্বনিম্ন হয় তখন তা স্থির হয়ে পড়ে। গড় খরচ যখন স্থির হয়ে পড়ে, প্রান্তিক খরচ যেটা এতক্ষণ গড় খরচের কম ছিল, তখন বেড়ে ওই নিম্নতম গড় খরচের সমান হয় [AC↓ = MC↑]। ৩·৪ চিত্রে b হল গড় খরচ রেখা AC-র নিম্নতম বিন্দু। প্রান্তিক খরচ রেখা MC নিচে থেকে উপরের দিকে উঠে আসার সময় ঐ নিম্নতম b বিন্দুকে ছেদ করে গড় খরচ রেখা AC-র উপরে চলে গেছে। গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচের এই সমতার বিন্দুটিকে বলে **আয় খরচ সমতার বিন্দু**। এর গুরুত্ব আমরা পরে আলোচনা

করব। কিন্তু একথাটি মনে রাখতে হবে, এটি হল গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচের দ্বিতীয় সম্পর্ক। (৩) উৎপন্নের পরিমাণ ৬০০ এককের বেশি বাড়ানো হলে গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ উভয়েই বাড়ে, কিন্তু প্রান্তিক খরচ গড় খরচের চেয়ে বেশি হারে বাড়ে বলে প্রান্তিক খরচ তখন গড় খরচের চেয়ে বেশি হয়। ৩·৪ চিত্রে দেখা যাচ্ছে উৎপন্নের এই স্তরে প্রান্তিক খরচ রেখা গড় খরচ রেখার উপরে রয়েছে (AC ↑ <MC ↑)। এটি হল প্রান্তিক খরচ ও গড় খরচের তৃতীয় সম্পর্ক। (৪) উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে গড় স্থির খরচের ক্রমাগত হ্রাস এবং একটা নির্দিষ্ট উৎপন্নের সীমা পর্যন্ত গড় পরিবর্তনীয় খরচের হ্রাস, এই দুটো মিলিয়ে এবং তারপর গড় স্থির খরচের ক্রমাগত হ্রাস ও গড় পরিবর্তনীয় খরচের বৃদ্ধি এই দুটো মিলিয়ে, গড় খরচের পরিবর্তনের হার স্থির হয় বলে গড় খরচ রেখার (AC) আকৃতিটা অনেকটা পরিমাণে ইংরেজী 'v' অক্ষরের মতো করে দেয়। তবে তার ঢাল প্রান্তিক খরচ রেখার (MC) চেয়ে কম হয়।

৩.৭ স্বল্পকালীন খরচ রেখাসমূহের অনুমিত শর্তাবলী

Assumptions behind Short run Cost Curves

১. **শর্তাবলী**ঃ স্বল্পকালীন গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ রেখার বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেল দুটি রেখাই উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রথমে নিচে নামে, দুটিই উৎপন্নের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে সর্বনিম্ন বিন্দুতে পৌছায় এবং তারপর দুটিই ঊর্ধ্বগামী হয়। অর্থাৎ উৎপন্নের পরিমাণ বাড়ালে প্রথম দিকে দুটি খরচই কমে, কমতে কমতে সর্বনিম্ন হয় ও পরে দুটিই বাড়ে। এর কারণ কি? উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের অবস্থা থাকলে এরকম হয়? অর্থাৎ খরচ রেখার যে 'v' আকৃতি দেখা যায় তার পিছনে কোন্ পরিস্থিতি রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, বা অনুমিত শর্তাবলী কি? অনুমিত শর্তগুলি বা অবস্থাগুলি হল:

(ক) সময়টি হল **স্বল্পকালীন সময়** (short-run): এর অর্থ হল, কারবারী সংস্থার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি পুঁজিদ্রব্য ও ব্যবস্থাপনা (management) প্রভৃতি **কতকগুলি উপাদান-সেবা** (inputs) সে সময় **অপরিবর্তনীয় থাকে**। সংস্থাটি উৎপাদনের সর্বাধিক পরিমাণের স্তরে পৌছাবে কি না সেটা ওই স্থির উপাদান-সেবাগুলির সর্বাধিক উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে (পরেরটির দ্বারা আগেরটির সীমা নির্দিষ্ট হয়)। এবং স্থির উপাদান-সেবাগুলি অবিভাজ্য (indivisible)।

(খ) উৎপন্নের পরিমাণ ওই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কমানো বাড়ানো যায় এবং বাড়াতে হলে তখন পরিবর্তনীয় উপাদান সেবাগুলির (শ্রম, বিদ্যুৎ, কাঁচামাল প্রভৃতি নিয়োগ বাড়াতে হয়। অর্থাৎ কারবারী সংস্থার **স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকটির মধ্যে কয়েকটি উপাদান-সেবা স্থির এবং কয়েকটি পরিবর্তনীয়** এবং স্থির উপাদান-সেবাগুলির সাথে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলি বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা যায়। এর ফলে নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলি বেশি পরিমাণে নিয়োগের দ্বারা অবিভাজ্য ও স্থির উপাদান-সেবাগুলি অধিকতর পরিমাণে সদ্ব্যবহার করা যায়।

(গ) তখন উৎপাদনের ক্ষেত্রে **পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধিটি সক্রিয় হয়ে** ওঠে। তার ফলে প্রথম দিকে, (অর্থাৎ স্থির উপাদান-সেবাগুলির সাথে পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলির অনুপাতটি যথোপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত) পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলি যত বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হয় ততই গড় এবং প্রান্তিক উৎপন্ন বাড়বে, গড় ও প্রান্তিক উৎপন্ন রেখা (APC ও MPC) উপরের দিকে উঠবে। উৎপাদনে দক্ষতা বাড়বে। যখন দুরকম উপাদান-সেবার অনুপাতটি যথোপযুক্ত হয়ে পড়ে তখন গড় উৎপাদন সর্বাধিক ও গড় উৎপন্ন রেখা (APC) সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছায়। এটি হল দুরকম উৎপাদন-সেবার কাম্য (optimum) অনুপাতের বিন্দু, সর্বোচ্চ দক্ষতার বিন্দু। প্রান্তিক উৎপন্ন রেখা (MPC) অবশ্য তার আগেই সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছায় (মোট উৎপন্ন বৃদ্ধির হার যেখানে সর্বাধিক সে-অনুযায়ী)। তারপরও উৎপাদন বাড়াতে পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলির নিয়োগ বাড়ালে, স্থির উপাদান-সেবাগুলির সাথে পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলির অনুপাতটি যথোপযুক্ততার সীমা ছাড়িয়ে যায়। তার অর্থ, স্থির উপাদান সেবাগুলির সাথে উপযুক্ত অনুপাতের বেশি পরিমাণে পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে (জমি অনুপাতে বেশি ক্ষেতমজুর, বা যন্ত্রের তুলনায় বেশি শ্রমিক ইত্যাদি)। ফলে, তখন থেকে প্রান্তিক ও গড় উৎপন্ন উভই কমতে শুরু করবে। এবং গড় উৎপন্ন রেখা (APC) ও প্রান্তিক উৎপন্ন রেখা (MPC) নিচের দিকে নামবে।

(ঘ) স্থির এবং পরিবর্তনীয় **উপাদান-সেবাগুলির সমস্ত এককই সমান দক্ষ**। এর অর্থ হল, স্থির উপাদান-সেবা ও পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবা, সমস্ত উপাদান-সেবার সমস্ত এককই কার্যদক্ষতায় কেউ কারো কম বা বেশি নয়। কারণ পরে নিযুক্ত এককগুলি আগের চেয়ে বেশি দক্ষ হলে প্রান্তিক ও গড় উৎপন্ন পরে বাড়বে কিংবা কম দক্ষ হলে, গড় ও প্রান্তিক উৎপন্ন তখন কমবে, এবং পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলি বেশি পরিমাণে ব্যবহারের আগেই তা হবে।

(ঙ) **পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলির এককগুলির দামের পরিবর্তন ঘটছে না**। কোন পরিবর্তনীয় উপাদানের যতগুলি অতিরিক্ত একক প্রয়োজন সেগুলি সবসময়েই একই দামে কিনতে পাওয়া যাবে। এর অর্থ হল, উপাদানের বাজারে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা রয়েছে এবং কোন কারবারী সংস্থা একাকী উপাদান-সেবার দামের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। তখন অতিরিক্ত সমস্ত পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলি একই দামে কেনা হলে (অর্থাৎ মজুরির হার একই, ইত্যাদি), উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট খরচ, গড় খরচ, প্রান্তিক খরচ প্রভৃতির যে হিসাব পাওয়া যায় (সারণি ৩·২-এ যেমন দেওয়া হয়েছে) তাতে উৎপাদনের পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধিটিই [প্রথম পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের নিয়মটি ক্রমহ্রাসমান (প্রান্তিক ও গড়) খরচের নিয়মে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের নিয়মটি ক্রমবর্ধমান (প্রান্তিক ও গড়) খরচের নিয়মে রূপান্তরিত হয়ে] দেখা দেয়। অর্থাৎ, প্রথম দিকে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের নিয়মের ফলে প্রান্তিক ও

গড় খরচ রেখা নিম্নগামী হয় এবং পরবর্তীকালে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির দরুনই প্রান্তিক ও গড় খরচ রেখাগুলি ঊর্ধ্বগামী হয়।

(চ) উৎপাদনে ব্যবহৃত **কারিগরী কৌশল** (technology) **অপরিবর্তিত রয়েছে**। কারণ, আগের তুলনায় উন্নত ধরনের কারিগরী কৌশল প্রবর্তিত হলে, গড় ও প্রান্তিক উৎপন্ন বাড়বে।

২. **অনুমিত শর্তাবলীর প্রযোজ্যতা:** এই অনুমানগুলির মধ্যে প্রথম শর্তটি অর্থাৎ স্বল্পকালীন সময় নিয়ে কোন অসুবিধা নেই। যে সময়ের মধ্যে কারবারী সংস্থার যন্ত্রপাতির ও অন্যান্য পুঁজি দ্রব্যের পরিমাণ কমিয়ে বাড়িয়ে **উৎপাদন ক্ষমতার** হ্রাস বৃদ্ধি করা সম্ভব নয় তাই হল তার স্বল্পকালীন সময়। এতে অবাস্তবতা কিছু নেই। দ্বিতীয় শর্তটি অর্থাৎ কারবারী সংস্থার কতকগুলি উপাদান-সেবা অপরিবর্তনীয় এবং কতকগুলি পরিবর্তনীয় থাকে, তাও অবাস্তব নয়। কারণ সময়টা স্বল্পকাল বলেই তখন উপাদানগুলির সচলতা কম থাকে এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে সব উপাদান-সেবা পাওয়া যায় না। যে উপাদান-সেবার অতিরিক্ত যোগান পাওয়া যায় না তা স্থির উপাদান-সেবায় পরিণত হয়। তখন যে উপাদান-সেবাগুলি বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় তার সাহায্যেই উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করতে হয়। এরই ফলে পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধিটি সক্রিয় হয়ে ওঠে। সুতরাং তৃতীয় শর্তটিও অবাস্তব নয়। শেষ শর্তটি, অর্থাৎ উৎপাদনের কারিগরী কৌশল অপরিবর্তিত থাকছে, এটিও অবাস্তব নয়। এর অর্থ এই নয় যে, বাস্তবে কারিগরী কৌশলের পরিবর্তন ঘটানোর কাজটা স্থগিত থাকে। কথাটা হল, কতকগুলি স্থির উপাদান-সেবার সাথে যদি আর কতকগুলি পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবা বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হতে থাকে এবং তখন যদি উৎপাদনের কারিগরী কৌশলের পরিবর্তন না ঘটে, তাহলে শেষ পর্যন্ত গড় ও প্রান্তিক উৎপন্ন কমবে এবং গড় ও প্রান্তিক খরচ বাড়বে। বাস্তবে এ সময়ের মধ্যে যদি কারিগরী কৌশলটা বদলে যায় তাহলে সাময়িকভাবে পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধিটির কাজ স্থগিত থাকে, গড় ও প্রান্তিক উৎপন্ন বাড়ে আর গড় ও প্রান্তিক খরচ কমে। কিন্তু তাতে এই বিধিটা মিথ্যে হয়ে যায় না।

তবে অসুবিধা হয় চতুর্থ ও পঞ্চম শর্তটি নিয়ে। বাস্তবে প্রত্যেকটি উপাদান-সেবার প্রতিটি এককের দক্ষতা সমান হয় না কিংবা নিখুঁত প্রতিযোগিতা নেই বলে উপাদান-সেবাগুলির বাজার দাম অপরিবর্তিতও থাকে না। এই দুটি শর্ত বাস্তবে খাটে না যদিও পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধিটি তত্ত্বগতভাবে সঠিক বলে প্রমাণ করার প্রয়োজনে এই শর্ত দুটি সত্য বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এ শর্ত দুটি সম্পর্কে অনুমান সত্য না হলেও তাতে পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধিটির সত্যতা বা যথার্থতা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। তা যদি হত, তা হলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধিটি মিথ্যে হত এবং তখন কেবল মাত্র এক একর জমিতে শুধু শ্রম, বীজ, সেচ এবং সারের ব্যবহার বাড়িয়েই বিশ্বের মোট খাদ্যের চাহিদা মেটানোর মতো শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হত।

৩.৮. কারবারী সংস্থার দীর্ঘকালীন উৎপাদন খরচ Long-run Costs

১. **অনুমিত শর্তাবলী** (assumptions) : দীর্ঘকালীন সময়ে, (ক) **কোন উপাদান-সেবাই অপরিবর্তনীয় থাকে না, সমস্ত উপাদান-সেবাই পরিবর্তনীয়** হয়ে পড়ে। পুঁজির পরিমাণ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি যেমন বাড়ানো (এবং কমানো) যায়, তেমনি ব্যবস্থাপনার রদবদল করা চলে। কারবারী সংস্থার সংগঠনটি এক-মালিকী কারবারের বদলে অংশীদারীতে, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীতে অথবা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত করা যায়।

(খ) **উৎপাদনের মাত্রার বা আয়তনের** (scale of production) **পরিবর্তন** করা যায়। কারবারী সংস্থা ছোট আয়তন থেকে বড় আয়তনে কিংবা বড় আয়তন থেকে ছোট আয়তনে পরিণত হতে পারে।

(গ) **কারিগরী কৌশলের** (technology) **পরিবর্তন** করা যায়। শ্রম-প্রগাঢ় উৎপাদন কৌশলের পরিবর্তে পুঁজিপ্রগাঢ় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করা যায় কিংবা তার উল্টোটা হতে পারে।

দীর্ঘকালীন সময় আসলে একাধিক স্বল্পকালীন সময়ের সমষ্টি। প্রতিটি স্বল্পকালীন সময়েই ছোট বা বড় সব কারবারী সংস্থার উৎপাদনের মাত্রা নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় থাকে। সে সময়ে সংস্থার যন্ত্রপাতি বা স্থির উপাদান সেবাগুলির সর্বাধিক উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা তার উৎপাদনের মাত্রা নির্ধারিত হয়। উৎপাদন ক্ষমতার পরিবর্তন কেবল দীর্ঘকালীন সময়েই করা যায় এবং এটা সম্ভব হয় উৎপাদনের মাত্রা, কারিগরী কৌশল ও প্রয়োজনীয় উপাদান-সেবার দরকার মত পরিবর্তন ঘটিয়ে। কিন্তু যেই ঐ পরিবর্তনটি ঘটল, অমনি কারিগরী সংস্থাটি নতুন একটি স্বল্পকালীন সময়ে প্রবেশ করল ও যতদিন এবারের উৎপাদন ক্ষমতা অপরিবর্তিত থাকবে ততদিন এই নতুন স্বল্পকালীন সময়টিও চলতে থাকবে। সুতরাং **দীর্ঘকালীন সময়টা হল প্রকৃতপক্ষে একটি স্বল্পকালীন সময় থেকে আরেকটি স্বল্পকালীন সময়ে প্রবেশের কাল।** বস্তুত পক্ষে একটি উৎপাদক সংস্থা বর্তমানে যে সময়টিতে রয়েছে সেটি সর্বদাই তার একটি নির্দিষ্ট স্বল্পকালীন সময়। কিন্তু যতগুলি স্বল্পকালীন সময় পার হয়ে সে এখানে এসে পৌঁছেছে, বর্তমান স্বল্পকালীন সময়টি সহ তার বিগত সমস্ত স্বল্পকালীন সময়ের এবং ভবিষ্যতে সে যে সমস্ত স্বল্পকালীন সময়ে প্রবেশ করতে পারে সে সবের সমষ্টিই হল তার দীর্ঘকালীন সময়। দীর্ঘকালীন সময়টাকে যদি একটি রেখা বলে কল্পনা করা যায় তাহলে স্বল্পকালীন সময়ের বিন্দুগুলি নিয়েই তা গঠিত। তার একটি হল বর্তমান স্বল্পকালীন সময় এবং সে বিন্দুটির বাঁদিকের সমস্ত বিন্দুগুলি হল বিগত স্বল্পকালীন সময় ও ডানদিকের বিন্দুগুলি অনাগত কিন্তু ভাবী স্বল্পকালীন সময়। এর খানিকটা অংশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ঘটে, বাকি অংশটা হল অনুমান। কিন্তু এর একটি থেকে আরেকটি বিন্দুতে যেতে কারবারী সংস্থাকে তার

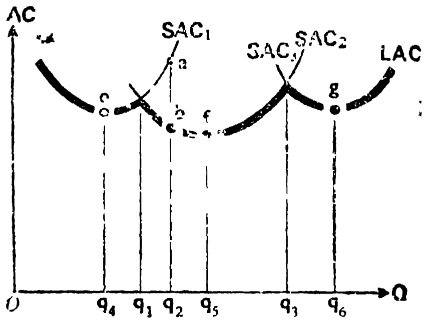
উৎপাদনের মাত্রা, কারিগরী কৌশল ও যাবতীয় উপাদান-সেবার নিয়োগের পরিমাণ পরিবর্তন করতে হয়।

২. **দীর্ঘকালীন খরচ তালিকার প্রকৃতি** (nature of long-run cost schedule) : (ক) দীর্ঘকালীন সময়ে কোন উপাদান-সেবাই স্থির বা অপরিবর্তনীয় থাকে না। সমস্ত উপাদান-সেবার ব্যবহারের বা নিয়োগের পরিমাণই পরিবর্তন করা যায় বলে, তখন কারবারী সংস্থার স্থির খরচ বলেও কিছু থাকে না ; **সমস্ত খরচই** তখন পরিবর্তনীয় খরচে পরিণত হয়। এজন্য **দীর্ঘকালীন খরচ = মোট পরিবর্তনীয় খরচ** [long-run costs = total variable costs]। পুঁজির সুদ, বাড়িভাড়া, খাজনা, স্থায়ী কর্মীদের বেতন, অবচয় অবচিতি ইত্যাদি **স্বল্পকালীন সময়ের স্থির খরচগুলির সবই দীর্ঘকালীন সময়ে** কাঁচামাল, বিদ্যুৎ, মজুরি ইত্যাদির মত **পরিবর্তনীয় খরচে পরিণত হয়ে যায়।** কারণ দীর্ঘকালে **উৎপাদনের মাত্রার** পরিবর্তনের সাথে সাথে উৎপাদনের সব রকমের খরচই বদলায়।

(খ) প্রতিটি স্বল্পকালের উৎপাদনের মাত্রায় স্থির ও পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাগুলির নিয়োগের পরিমাণ অনুযায়ী খরচের অবস্থা মাত্র একটিই থাকে। সে অনুসারে তার গড় খরচ রেখাও (এবং সেই সাথে প্রান্তিক খরচ রেখাও) একটি মাত্রই থাকে। ঐ উৎপাদনের মাত্রা বা ক্ষমতার মধ্যে কারবারী সংস্থা বাজারের পরিস্থিতি অনুসারে কম বা বেশি পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করে। কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের অর্থ দাঁড়ায় উৎপাদনের মাত্রার বা আয়তনেরও পরিবর্তন (কারণ, উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তন করতে গিয়ে যদি উৎপাদনের মাত্রার পরিবর্তন করতে না হয়, তাহলে কারবারী সংস্থাটি একই স্বল্পকালীন সময়ের মধ্যে রয়েছে বোঝায়)। সুতরাং দীর্ঘকালীন সময়ে কারবারী সংস্থার খরচের অবস্থা একরকম থাকে না, বদলায়। দীর্ঘকালীন সময়ে কারবারী সংস্থার যতবার উৎপাদনের মাত্রার পরিবর্তন ঘটেছে ও ঘটতে পারে তার প্রত্যেকটি হল তার অন্তর্গত এক-একটি আলাদা স্বল্পকালীন সময় এবং সেই আলাদা স্বল্পকালীন সময়ের প্রত্যেকটির গড় খরচও আলাদা ধরনের হবে। অতএব এক-একটি দীর্ঘকালীন সময় যেমন অনেকগুলি স্বল্পকালীন সময় নিয়ে গঠিত, তেমনি **এক-একটি দীর্ঘকালীন সময়ের গড় খরচ রেখার মধ্যে অনেকগুলি করে স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখা থাকে।**

৩. **দীর্ঘকালীন গড় খরচ** (long-run average cost) : কারবারী সংস্থা সাধারণত প্রথমে ছোট আকারেই স্থাপিত হয়। তখন তার উৎপাদনের মাত্রা থাকে ছোট। পরে সে উৎপাদনের মাত্রা ক্রমশ বাড়াতে থাকে ও সংস্থাটিও বড় হতে থাকে। এইভাবে কারবারী সংস্থার যখন সম্প্রসারণ ঘটে সেটা হয় দীর্ঘকালীন সময়। দীর্ঘকালীন সময়ে কারবারী সংস্থার যখন সম্প্রসারণ ঘটে তখন তার গড় খরচ কি রকম হয় ? এর উত্তর হল, উৎপাদনের মাত্রা বা সংস্থার আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রথমে কিছুকাল ধরে গড় খরচ কমতে থাকে এবং একসময়ে তা ন্যূনতম হয়। তারপরে আয়তন আরো বাড়তে থাকলে গড় খরচও ক্রমশ বাড়ে।

৩·৫ চিত্রে দীর্ঘকালীন সময়ে একটি কারবারী সংস্থার সম্ভাব্য আয়তনের তিন রকমের গড় খরচের অবস্থা দেখান হয়েছে। সবচেয়ে ছোট আয়তনের গড় খরচ হল SAC_1। এটি হল প্রথম স্বল্পকালীন সময়ের উৎপাদনের মাত্রা অনুযায়ী স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখা। উৎপাদনের মাত্রা আরেকটু বাড়ানো হলে যে দ্বিতীয় স্বল্পকালীন সময় দেখা দিল, SAC_2 হল তার গড খরচ রেখা। এটি প্রথম স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখা SAC_1-এর ডান দিকে রয়েছে। উৎপাদনের মাত্রা আরো বাড়ানো হলে তৃতীয় স্বল্পকালীন সময় দেখা দিল। তার গড় খরচ রেখা হল SAC_3। এটি দ্বিতীয় স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখা SAC_2-র ডানদিকে থাকছে। প্রথম আয়তন থেকে উৎপাদনের মাত্রা বাড়িয়ে দ্বিতীয় আয়তনে পৌছালে গড় খরচ কমল, কিন্তু উৎপাদনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে তৃতীয় আয়তনে পৌছালে, গড খরচ বাড়ল। ৩·৫ চিত্রে দেখা যাচ্ছে, উৎপাদনের পরিমাণ যতক্ষণ পযন্ত Oq_1-এর মধ্যে আবদ্ধ থাকছে ততক্ষণ প্রথম আয়তনে থাকাই কারবারী সংস্থাটির পক্ষে সুবিধাজনক। কারণ ঐ পরিমাণের মধ্যে উৎপাদন করতে হলে এই আয়তনে থাকলে সে কম গড় খরচে উৎপাদন করতে পারবে। কিন্তু যদি বিক্রি বেড়ে Oq_2 হয় তাহলে ওই আয়তনে থেকে উৎপাদন করলে গড খরচ পড়বে aq_2। কিন্তু উৎপাদনের মাত্রা পরিবর্তন করে সংস্থাটি যদি দ্বিতীয় আয়তনে চলে আসে তাহলে গড় খরচ রেখা হবে SAC_2 এবং তখন ঐ Oq_2 পরিমাণ উৎপাদন করতে গড খরচ পড়বে bq_2, চিত্রে দেখা যাবে bq_2 aq_2 থেকে কম। তেমনি আবার চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যদি Oq_3-এর বেশি হয় (Oq_6) তা হলে উৎপাদনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে আরও বড় আয়তনে পরিণত হলেই নিম্নতম সম্ভব কম খরচে উৎপাদন করা সম্ভবপর হবে। চিত্রে দেখা যাবে, সংস্থাটি এ কারণে আয়তন বাড়িয়ে তৃতীয় স্বল্পকালীন সময়ে এসে পৌছেছে।



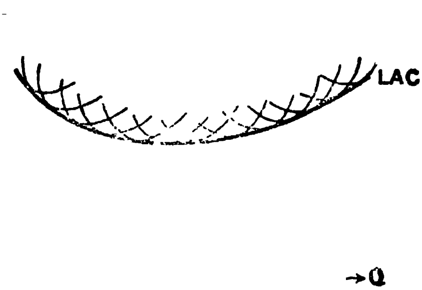
চিত্র ৩·৫ : দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখা

এখানে লক্ষণীয়, SAC_1, SAC_2 এবং SAC_3 এই তিনটি স্বল্পকালীন রেখারই একটি করে নিম্নতম বিন্দু (যথাক্রমে e, f এবং g) আছে। এগুলি হল প্রতিটি আলাদা আয়তনের সর্বনিম্ন গড খরচের বিন্দু।

এর অর্থ হল, উৎপাদনের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিটি মাত্রায় একটি করে সর্বনিম্ন গড় খরচের বিন্দু আছে যে অনুযায়ী উৎপাদনের পরিমাণের গড় খরচ সবচেয়ে কম হয় (যেমন, SAC_1-এর সময় Oq_4 পরিমাণে উৎপাদনের সর্বনিম্ন গড় খরচ হয় eq_4, SAC_2-তে Oq_5 পরিমাণে উৎপাদনের সর্বনিম্ন গড় খরচ fq_5 এবং Oq_6 পরিমাণে উৎপাদনের সর্বনিম্ন গড় খরচ gq_6)।

স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখা SAC_1, SAC_2 ও SAC_3-র নিম্নতম অংশগুলি (২টি স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখা যেখানে পরস্পরকে ছেদ করছে তার নিচের অংশগুলি) নিয়ে, ঐ তিনটি স্বল্পকালীন সময় নিয়ে যে দীর্ঘকালীন সময়টি গঠিত হল, তার গড় খরচ রেখা (অর্থাৎ, দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখা) গড়ে ওঠে। ৩·৫ চিত্রে SAC_1, SAC_2 ও SAC_3-র নিচের অংশগুলি নিয়ে দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখা (যা মোটা রেখা দিয়ে দেখানো হয়েছে) LAC তৈরী হয়েছে। সুতরাং দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখা উৎপাদনের মাত্রা বা আয়তন পরিবর্তনের পর যে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্নের সর্বনিম্ন গড় খরচ নির্দেশ করে। প্রকৃতপক্ষে, দীর্ঘকালীন সময়ে কারবারী সংস্থার সামনে উৎপাদনের মাত্রার বহুবিধ পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে এবং তা থেকে দরকার মত নির্দিষ্ট আয়তনটি বেছে নেবার সুযোগ থাকে। সেজন্য স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখাগুলি অসংখ্য বলে কল্পনা করা হয়। ঐ অসংখ্য স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখাগুলি (SAC রেখাগুলি) স্পর্শ করে যে রেখাটি টানা যায় সেটিই হল ঐসব স্বল্পকালীন গড় খরচ রেখাগুলির ভিত্তিতে গঠিত দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখা। ৩·৬ চিত্রে তেমন একটি মসৃণ গড় খরচ রেখা দেখান হল।

প্রতিটি দীর্ঘকালীন সময়ের মধ্যে অনেকগুলি করে স্বল্পকালীন সময় থাকে বলে প্রতিটি দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখার (LAC) মধ্যে অনেকগুলি স্বল্পকালীন গড় খরচ থাকে। তাই দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখাকে **লেফাফা রেখা** (envelope curve) বলে। আবার, কারবারী সংস্থার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সংস্থার আয়তন সম্প্রসারণ করতে ও উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করতে গিয়ে বিভিন্ন সম্ভাব্য মাত্রায় উৎপাদনের (অর্থাৎ বিভিন্ন আয়তনের স্বল্পকালীন) গড় খরচের বিবেচনার ভিত্তিতে উপযোগী আয়তনটি বেছে নেয় বলে দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখাকে **পরিকল্পনা রেখা** (planning curve)-ও বলে।



চিত্র ৩·৬ : দীর্ঘকালীন মসৃণ গড় খরচ রেখা

৪. **অনুমিত শর্তাবলীর গুরুত্ব বা তাৎপর্য** (significance of the assumptions) : (ক) কারবারী সংস্থার দীর্ঘকালীন খরচ উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রথমে কমে, একসময়ে সর্বনিম্ন হয় ও তারপরে আবার বাড়ে। অর্থাৎ, দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখাও ইংরেজী 'v' অক্ষরের আকৃতি নিয়ে থাকে। এর কারণ কি? এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে, প্রথমেই দীর্ঘকালীন সময়ের অনুমিত তিনটি শর্তের কথা স্মরণ করতে হবে। প্রথম শর্তটি ছিল, সমস্ত উপাদান-সেবার নিয়োগের পরিমাণ পরিবর্তন করা যায়। দ্বিতীয় শর্তটি ছিল, উৎপাদনের মাত্রা পরিবর্তন করা যায়। তৃতীয় শর্তটি ছিল, উৎপাদনের কারিগরী কৌশলের পরিবর্তন

করা যায়। সুতরাং **দীর্ঘকালীন সময়ে পরিবর্তনীয় উৎপন্নের বিধি কিংবা ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের নিয়মটি খাটে না** (কারণ, অন্তত একটি উপাদান-সেবা অপরিবর্তিত থাকলে এবং উৎপাদনের মাত্রা বা কারিগরী কৌশল অপরিবর্তিত থাকলে তবেই পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়মটি দেখা দেয়)। তাহলে গড় খরচ রেখা দীর্ঘকালীন সময়েও প্রথমে নিচে নেমে পরে উপরে ওঠে কেন? দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখার 'v' আকৃতির কারণ হল, উৎপাদনের মাত্রা বাড়ালে **বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধাগুলির (অর্থাৎ ব্যয়সংকোচগুলির) ফলে গড় খরচ কমে এবং অসুবিধাগুলির দরুন গড় খরচ বাড়ে।**

বৃহদায়তনে উৎপাদন করতে গিয়ে শ্রমের বিশেষীকরণ বাড়ে, ব্যবস্থাপনার বিশেষীকরণ ঘটে ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্ম ও যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতার আরো বেশি সন্তোষজনক ব্যবহার ঘটে এবং নানা উপদ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় বলে দীর্ঘকালীন খরচ কমে। কিন্তু অন্যদিকে আবার আয়তন ক্রমাগত বাড়াতে থাকলে ব্যবস্থাপনার অসুবিধা, বিভিন্ন বিভাগের কাজের তদারকি ও সংযোজনের অসুবিধা, অর্থ সংস্থানের অসুবিধা ইত্যাদি বেড়ে যাওয়ায় কারবারী সংস্থার দক্ষতা কমে, অপচয় বাড়ে, ফলে দীর্ঘকালীন গড় খরচও বাড়ে।

(খ) বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যয়সংকোচ (অর্থাৎ সুবিধাগুলি) এবং ব্যয়বৃদ্ধি (অর্থাৎ অসুবিধাগুলি) অর্থনীতিবিদ্‌দের কল্পনা নয়। ভাবতে অধিকাংশ যন্ত্রশিল্পেই বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যয়সংকোচগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। যে সব শিল্প বৃহদায়তন ব্যয়সংকোচের সুবিধাগুলি গ্রহণের জন্য উৎপাদনের মাত্রা বাড়াতে পেরেছে তারাই সফল হয়েছে। যারা পারেনি তারা কোনক্রমে টিকে রয়েছে। উৎপাদনের আয়তন বাড়ালে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা কমে যাওয়ার যে সম্ভাবনা দেখা দেয় তা কি করে এড়াতে হয় টাটা লৌহ-ইস্পাত কোম্পানী তার দৃষ্টান্ত রেখেছে। যে আয়তন লাভ করলে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা সর্বাধিক হয় TISCO-র বিভিন্ন বিভাগকে সে আয়তনে পরিণত করে আলাদা আলাদা স্বয়ং-শাসিত সংস্থারূপে স্থাপন করা হয়েছে।

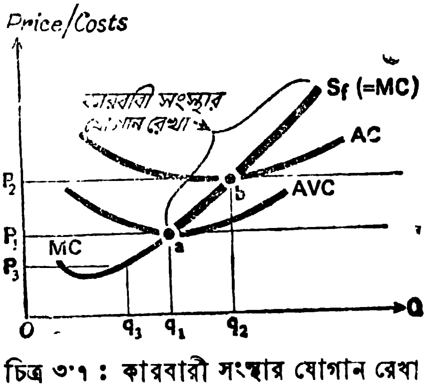
৫. **শিল্পের উৎপাদন খরচের অবস্থা** (cost conditions of the industry): যেসব শিল্পে বৃহদায়তনে উৎপাদনের ফলে ব্যয়সংকোচগুলি বেশি পরিমাণে লাভ করা যায় এবং সে শিল্পগুলিতে অসুবিধাগুলি দেখা দেয় অনেক পরে, সেখানে দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখা উৎপাদনের দীর্ঘমাত্রা পর্যন্ত ক্রমাগত কমতে থাকে এবং অনেক পরে বাড়ে। ইস্পাত, ভারী রাসায়নিক, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি ভারী শিল্পগুলি এই ধরনের। এরকম হলে, শিল্পে অল্পসংখ্যক বৃহদায়তন উৎপাদন সংস্থা থাকলে পূর্ণতম দক্ষতার সাথে উৎপাদন করা সম্ভব হয়। যেসব ক্ষেত্রে বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যয়সংকোচগুলি কম এবং অল্পকালের মধ্যেই অসুবিধাগুলি ও ব্যয় বৃদ্ধিগুলি দেখা দেয়, সেখানে উৎপাদনের মাত্রার সীমাবদ্ধ সম্প্রসারণ পর্যন্ত দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখা নিচে নামে ও তারপরে দ্রুত উপরে ওঠে। এরকম ক্ষেত্রে শিল্পে অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যক ক্ষুদ্রায়তন সংস্থা টিকে থাকতে পারে। এরা বৃহ-

দায়তন সংস্থার চেয়ে বেশি দক্ষতার সাথে কিংবা অন্তত সমান দক্ষতার সাথে উৎপাদন করতে পারে। খুচরা ব্যবসায়ে, কৃষির কিছু ক্ষেত্রে, জুতা তৈরি, রুটির কারখানা ও বস্ত্রশিল্পে এরকম অবস্থা দেখা যায়। যেসব শিল্পে উৎপাদনের মাত্রার অনেকদূর সম্প্রসারণ পর্যন্ত ব্যয়সংকোচ ও ব্যয় বৃদ্ধিগুলি প্রায় পরস্পরের সমান, সে সব ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন গড় খরচ রেখা প্রথমে নিচে নেমে অনেকদূর পর্যন্ত প্রায় সমান্তরাল থেকে পরে উপরে ওঠে। সুতরাং **উৎপাদন সংস্থার মত গোটা শিল্পের ক্ষেত্রেও দীর্ঘকালীন গড় খরচ প্রধানত নির্ভর করে বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যয়সংকোচ বা ব্যয়বৃদ্ধি কি ধরনের হবে তার উপর।**

৩. ৯. যোগান রেখাসমূহ
Supply Curves

১. যে কোন শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের মোট যোগানটা হল তার অন্তর্গত সব উৎপাদক বা কারবারী সংস্থার মোট উৎপন্ন দ্রব্যের সমষ্টি। সুতরাং শিল্পের যোগান রেখা হল তার অন্তর্গত সমস্ত কারবারী সংস্থার যোগান রেখার সমষ্টি। অর্থাৎ, শিল্পের মোট যোগান=১ম কারবারী সংস্থার উৎপাদন+২য় কারবারী সংস্থার উৎপাদন+…n-তম কারবারী সংস্থার উৎপাদন। [Industry supply= $q_1F_1+q_2F_2+q_3F_3+\cdots qnFn$] অতএব শিল্পের মোট যোগান রেখা=১ম কারবারী সংস্থার যোগান রেখা+২য় কারবারী সংস্থার যোগান রেখা+…n-তম কারবারী সংস্থার যোগান রেখা। [Industry supply curve $=S_1F_1+S_2F_2+S_3F_3+\cdots SnFn$]

২. কোন একটি কারবারী সংস্থার যোগান রেখা কোন্‌টি? কোন কারবারী সংস্থার কাছে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার বাজারে তার পণ্যের চাহিদা রেখা বা দাম রেখা হল অনুভূমিক অক্ষরেখার সমান্তরাল রেখা। অর্থাৎ তার কাছে বাজার দাম অপরিবর্তনীয়। ঐ দামে সে বেশি বা কম পরিমাণে উৎপাদন করতে পারে। সে ঠিক কতটা উৎপাদন করবে তা স্থির করতে গিয়ে সে যা দেখে তা হল, উৎপাদন বাড়ালে তার প্রান্তিক খরচ কি পড়বে এবং যে দামে তা বিক্রি হবে সেটা তার প্রান্তিক খরচের চেয়ে বেশি না কম। যদি প্রান্তিক খরচ দামের কম থাকে তাহলে অতিরিক্ত মুনাফা হচ্ছে বলে সে উৎপাদন বাড়াবে। উৎপাদন বাড়ালে এক সময়ে তার প্রান্তিক খরচ বেড়ে দামের সমান হবে। আর প্রান্তিক খরচ যদি দামের বেশি হয়ে পড়ে তাহলে লোকসান হচ্ছে বলে সে উৎপাদন কমাবে। সুতরাং সে ঠিক ততটা পরিমাণেই উৎপাদন করে, যতটা উৎপাদন করলে প্রান্তিক খরচ বেড়ে=দাম হয় (MC ↑ =P)/

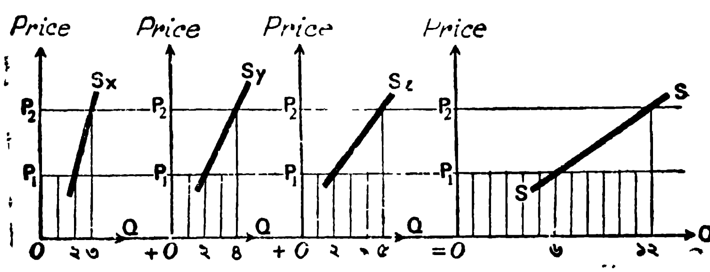


· চিত্র ৩·৭ : কারবারী সংস্থার যোগান রেখা

সুতরাং **কারবারী সংস্থার প্রান্তিক খরচরেখাটাই হল তার যোগান রেখা।** কিন্তু, **প্রান্তিক** খরচ রেখার **সবটা তার যোগান রেখা নয়।** তাহলে কারবারী সংস্থার প্রান্তিক খরচ রেখার কোন্ অংশটা তার যোগান রেখা? ৩·৪ চিত্রে দেখা যাচ্ছে প্রান্তিক খরচ রেখা MC গড় পরিবর্তনীয় খরচ রেখা AVC-কে a বিন্দুতে ছেদ করে উপরে উঠে গেছে। এই বিন্দুটিকে বলে **উৎপাদন বন্ধের বিন্দু।** এই বিন্দুতে উধ্বর্গামী প্রান্তিক খরচ = গড় পরিবর্তনীয় খরচ (MC ↑ = AVC)। দাম যদি এর কম হয় তাহলে বুঝতে হবে সে দামে একক পিছু পরিবর্তনীয় খরচ উঠবে না। এমনকি স্থির খরচেরও সবটুকু উঠবে না। তাহলে সে দামে প্রান্তিক খরচ উঠলেও যদি গড় পরিবর্তনীয় খরচের সবটা না ওঠে তাহলে পণ্য উৎপাদন করলে কারবারী সংস্থার যে লোকসান হবে সেটা উৎপাদন বন্ধ রাখার লোকসানের চেয়ে বেশি। পণ্য উৎপাদন করে ঐ দামে বিক্রি করতে হলে স্থির খরচ তো উঠবেই না, এমনকি পরিবর্তনীয় খরচেরও সবটা উঠবে না। আর উৎপাদন বন্ধ রাখলে কেবল স্থির খরচটাই বহন করতে হবে কিন্তু কোন পরিবর্তনীয় খরচ লাগবে না। তাই দাম যদি প্রান্তিক খরচের সমান হয়েও গড পরিবর্তনীয় খরচের সমান না হয় তাহলে উৎপাদন বন্ধ রাখাই ভালো। তাই দাম যদি উধ্বর্গামী প্রান্তিক খরচ ও গড় পরিবর্তনীয় খরচের সমতার বিন্দুর নিচে থাকে তাহলে কারবারী সংস্থাকে উৎপাদন বন্ধ করে দিতে হয়। এজন্য MC ↑ = AVC ↓ -র বিন্দুটিকে **উৎপাদন বন্ধের** বিন্দু বলে। এই বিন্দুর নিচে প্রান্তিক খরচ রেখার যে অংশটি থাকে তা কারবারী সংস্থার যোগান রেখা নয়। **ঐ বিন্দুর উপরে MC ↑ রেখার বাকি অংশটাই হল তার যোগান রেখা।** ৩·৭ চিত্রে MC রেখার ঐ অংশটিই মোটা রেখায় দেখানো হয়েছে।

৩. **স্বল্পকালীন সময়ে শিল্পের** বা বাজারের (পণ্যের) মোট **যোগান রেখা** = সমস্ত কারবারী সংস্থার যোগান রেখার সমষ্টি।

একটি শিল্পে x, y এবং z এই তিনটি কারবারী সংস্থা আছে ধরে নিয়ে এদের তিনটি যোগান রেখা যোগ দিয়ে কিভাবে বাজারে পণ্যটির মোট যোগান রেখা তৈরি হয় তা ৩·৮ চিত্রে দেখানো হল।



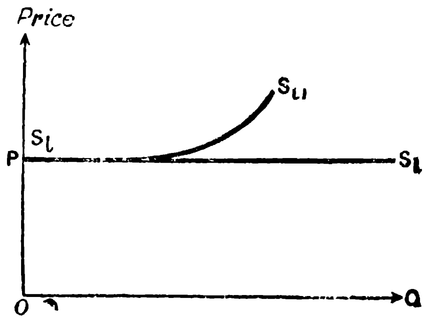
চিত্র ৩·৮ : স্বল্পকালীন সময়ে শিল্পের যোগান রেখা

স্বল্পকালীন সময়ে নির্দিষ্ট উৎপাদন মাত্রার মধ্যে উৎপাদন বাড়াতে গেলে পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি অনুযায়ী গড় ও প্রান্তিক খরচ দ্রুত বাড়ে বলে উৎপাদক

সংস্থাগুলির প্রান্তিক খরচ রেখা অনেক বেশি খাড়াভাবে উপরে ওঠে। তাই শিল্পের স্বল্পকালীন যোগান রেখাও (৩'৮ চিত্রে S রেখা) বামদিকে নিচে থেকে ডানদিকে উপরে ওঠে এবং এর ঢাল ধনাত্মক হয় (অর্থাৎ দাম বাড়ালে যোগান বাড়ে বোঝায়)।

৪. **দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পের যোগান** (**রেখা**) নির্ভর করে তার দীর্ঘকালীন খরচের (রেখার) অবস্থার উপর। বাজারে যদি বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা বিরাজ করে তবে সেখানে যে কোন নতুন কারবারী সংস্থা অবাধে প্রবেশ করতে ও সেখান থেকে কারবার গুটিয়ে চলে যেতে পারে। সে অবস্থায় শেষপর্যন্ত সব কারবারী সংস্থার উৎপাদনের মাত্রা ও পরিমাণ ও উৎপাদন খরচ একই রকম এবং উৎপাদন খরচ রেখাও একই রকমের ও পরিবর্তনহীন হয়ে পড়বে। ঐ অবস্থায় প্রত্যেকটি কারবারী সংস্থা ঠিক সেই পরিমাণে উৎপাদন করবে, যতটা উৎপাদন করলে দাম = ঊর্ধ্বগামী প্রান্তিক খরচ = নিম্নতম গড় খরচ [P = MC ↑ = AC ↓] হয়। এই দামে উৎপাদন করলে কারবারী সংস্থার একক পিছু যাবতীয় খরচ উঠবে ও তার আয় = ব্যয় হবে। এটা হল আয় = খরচ সমতার বিন্দু ৩'৪ ও ৩'৭ চিত্রে b বিন্দু)। প্রত্যেক কারবারী সংস্থা ঠিক এই পরিমাণ দ্রব্য বাজারে বিক্রি করবে অর্থাৎ যোগান দেবে। আর এককভাবে সব কারবারী যত যোগান দেবে তার সমষ্টি হবে বাজারে পণ্যটির মোট যোগান। শিল্পের মোট যোগান রেখাটি তখন অনুভূমিক অক্ষরেখার সমান্তরাল রেখায় পরিণত হবে।

৩'৯ চিত্রে SlSl রেখাটি হল এইরকম একটি শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগান রেখা। কিন্তু যদি এমন হয় যে, দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পটি একই দামে প্রয়োজনীয় পরিমাণে উপাদান-সেবাগুলি পাচ্ছে না, বেশী দাম দিয়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণে তা সংগ্রহ করতে হচ্ছে, তাহলে কারবারী সংস্থাগুলির প্রান্তিক ও গড় খরচ বাড়বে এবং তখন শিল্পের যোগান রেখাটি SlSl, রেখার মত অনুভূমিক অক্ষরেখায় সমান্তরাল না হয়ে, SlSl, রেখার মত অনেকটা পর্যন্ত সমান্তরাল থেকে পরে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হবে।



চিত্র ৩'৯ : শিল্পের যোগান রেখা

৩. ১০. যোগান, Supply

১. **পণ্যের যোগান বা সরবরাহ** : একটা নির্দিষ্ট সময়ে, একটা নির্দিষ্ট দামে বিক্রির জন্য যে পরিমাণে পণ্যটি বাজারে বিক্রেতারা উপস্থিত করে, তাই হল পণ্যটির যোগান বা যোগানের পরিমাণ। কোন পণ্যের যোগান বললে, পণ্যটির মোট মজুত পরিমাণ (stock)-কে বোঝায় না। মজুতের যে অংশ বিক্রি করার জন্য বাজারে আনা হয়েছে, তাই বোঝায়।

২. **যোগানের নির্ধারক :** কোন দ্রব্যের উৎপাদন এবং বাজারে তার যোগান ঘটবে কিনা তা অবশ্যই তার চাহিদা আছে কিনা তার উপর নির্ভর করে। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট পণ্যের চাহিদা মেটাতে তার উৎপাদন ও যোগানের পরিমাণ কতটা হবে তা যে সব বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা হল—

(ক) **পণ্যটির দাম :** দাম বেশি হলে বিক্রেতারা বেশি পরিমাণে এবং দাম কম হলে কম পরিমাণে পণ্যটি যোগান দেয়।

(খ) **উপাদান সেবার যোগান :** পণ্যটির উৎপাদনে যে সব উপাদান সেবা লাগে তাদের যোগান বেশি হলে পণ্যটির যোগান বেশি এবং কম হলে পণ্যটির যোগান কম হয়।

(গ) **উপাদান সেবার দাম :** উপাদান সেবাগুলির দাম বেশি হলে পণ্যটির উৎপাদনের খরচ বেশি পড়ে ও দাম কম হলে উৎপাদন খরচ কম হয়। পণ্যটির দামের তুলনায়, উৎপাদন খরচ বেশি হলে পণ্যটির উৎপাদন ও যোগান কম হবে, উৎপাদন খরচ কম হলে পণ্যটির উৎপাদন ও যোগান বেশি হবে।

(ঘ) **কারিগরী কৌশল :** উৎপাদনের কারিগরী কৌশল ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উন্নত হলে উৎপাদন বেশি হবে, উৎপাদন খরচ কম হবে এবং যোগান বেশি হবে; কারিগরী কৌশল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উন্নত না হলে উৎপাদনের পরিমাণ হবে কম, উৎপাদন খরচ বেশি হবে ও যোগান কম হবে।

(ঙ) **আমদানি ও রপ্তানি :** দেশে পণ্যের উৎপাদন বেশি হলেও যদি তা বেশি পরিমাণে রপ্তানি হয় তাহলে দেশের বাজারে পণ্যের যোগান কম হবে। দেশে পণ্যের উৎপাদন কম হলেও যদি তা রপ্তানি না হয় এবং ঐ জাতীয় বিদেশী পণ্য আমদানি করা হয় তাহলে দেশের বাজারে তার যোগান বাড়বে।

(চ) **পরিবহণ ব্যবস্থা :** পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি হলে উৎপাদন কেন্দ্র থেকে অল্প সময়ে বা কম খরচে বাজারে পণ্যের যোগান বাড়বে। পরিবহণ ব্যবস্থা অনুন্নত থাকলে উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বাজারে পণ্য পাঠাতে সময় এবং খরচ বেশি লাগবে।

(ছ) **রাজনৈতিক পরিস্থিতি :** দেশে শান্তিশৃঙ্খলা থাকলে পণ্যের উৎপাদন ও যোগান বাড়ে। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলায় উৎপাদন ও যোগান কমে।

৩. **যোগানের নিয়ম** (law of supply) **:** যোগানের নিয়ম বলতে যা বোঝায় সেটা পণ্যের দাম ও তার যোগানের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে, যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে, যে কোন নির্দিষ্ট পণ্যের দাম বাড়লে তার যোগানের পরিমাণ বাড়বে এবং দাম কমলে তার যোগানের পরিমাণ কমবে। এই হল যোগানের নিয়ম। অর্থাৎ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, *কোন পণ্যের যোগান নির্ভর করে তার দামের উপর।* সুতরাং **চাহিদার মত যোগানও হল দামের একটি ক্রিয়া** [supply is a function of price, or $S = f(p)$]।

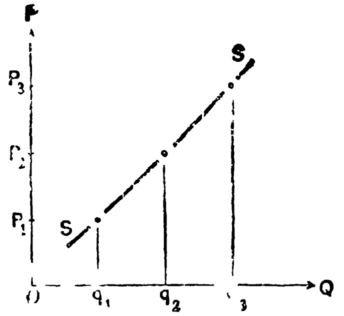
বিক্রেতারা বা কারবারী সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন দামে পণ্যটির যে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ যোগান দিতে চায় তাকে বলে বাজার যোগান তালিকা (market supply

schedule)। ৩·৩ সারণিতে তার একটি নমুনা দেওয়া হল। বাজার যোগান তালিকায় দেখা যাচ্ছে, দাম যতই বাড়ছে পণ্যটির যোগানের পরিমাণও ততই বাড়ছে। ৩·১০ চিত্রে বাজার যোগান তালিকার যোগান রেখা SS দেখানো হয়েছে। দাম OP_1 থেকে ক্রমশ বেড়ে OP_2 এবং OP_3 হয়েছে। ফলে যোগানের

সারণি ৩·৩

বাজার যোগান তালিকা

দাম	যোগান
১ টাকা	১,০০০ একক
২ „	৪,০০০ „
৩ „	৮,০০০ „
৪ „	১০,০০০ „



চিত্র ৩·১০ : বাজার যোগান রেখা

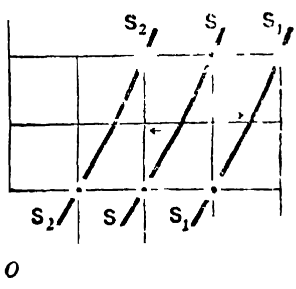
পরিমাণও বেড়ে Oq_1 থেকে ক্রমশ Oq_2 এবং Oq_3 হয়েছে। সুতরাং যোগান রেখা SS বামদিক থেকে ডানদিকে ক্রমশ উপরের দিকে উঠছে। এখানে দাম বাড়লে (+) যোগানেব পবিমাণ বাড়ে (+) বলে যোগান রেখার ঢালটি ধনাত্মক (+) হয় (এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে চাহিদা রেখার ঢাল কিন্তু ঋণাত্মক হয়ে থাকে)।

যোগানের নিয়মের ব্যতিক্রম: একমাত্র শ্রমের ক্ষেত্রে দেখা যায় কখনো কখনো মজুরির হার বাড়লে, শ্রমের যোগান কমে যায়। কারণ শ্রমিক পরিবারে প্রয়োজনীয় আর্থিক আয় তখন পরিবারের অল্প সংখ্যক কর্মক্ষম ব্যক্তির দ্বারাই উপার্জন করা সম্ভব হয়। তাই অল্প বয়স্কদের অর্থোপার্জনের কাজে নিযুক্ত না করে হয়তো স্কুলে পাঠানো হয় ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বিশ্রাম নেয়। আর মজুরির হার কম হলে যুবক, বৃদ্ধ, শিশু সকলকেই তখন পরিবারের খরচের সংস্থানের জন্য খাটতে হয়। তবে এটা যে সর্বদা ঘটে তা নয়।

৪. **যোগানের পরিবর্তন** (changes in supply): যোগানের পরিবর্তন বললে, এমন একটা পরিস্থিতি বোঝায় যেখানে দামের কোন পরিবর্তন না হওয়া

সারণি ৩·৪

আগের যোগান	দাম	পরের যোগান
১,০০০ একক	১০ টাকা	২,০০০ একক
৪,০০০ „	২ „	৬,০০০ „
২,০০০ একক	১০ „	১,০০০ একক
৬,০০০ „	২ „	৪,০০০ „



চিত্র ৩·১১ : যোগান রেখার স্থান পরিবর্তন

সত্ত্বেও যোগানের অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। পণ্যটির দাম ছাড়া অন্যান্য যে সব বিষয়ের উপর পণ্যের যোগান নির্ভর করে সেগুলির মধ্যে একটির বা একাধিক বিষয়ের পরিবর্তনে যোগানের পরিবর্তন ঘটে।

একই দামে বিক্রেতারা যদি আগের তুলনায় বেশি পরিমাণে বা কম পরিমাণে পণ্যটি যোগান দিতে চায় তাহলে যোগানের (অবস্থার) পরিবর্তন ঘটেছে বলে বুঝতে হবে। ৩·৪ সারণিতে তার নমুনা দেওয়া হয়েছে। বস্তুত পক্ষে যোগানের পরিবর্তন হল যোগান তালিকার পরিবর্তন। এর ফলে যোগান রেখার **স্থান পরিবর্তন** ঘটে। একই দামে যোগানের পরিমাণ বাড়লে যোগান রেখা স্থান পরিবর্তন করে ডানদিকে সরে যায়। এটা হল যোগানের বৃদ্ধি। আবার একই দামে যোগানের পরিমাণ কম হলে যোগান রেখা স্থান পরিবর্তন করে বাম দিকে সরে যায়। এটা হল যোগানের হ্রাস। ৩·১১ চিত্রে SS রেখাকে আগের যোগান রেখা এবং S_1S_1-কে যোগান বৃদ্ধির পরেকার নতুন যোগান রেখা বলে গণ্য করা যায় এবং S_2S_2-কে যোগান হ্রাসের পরেকার নতুন যোগান রেখা বলে গণ্য করা যায়।

৫. **যোগানের স্থিতিস্থাপকতা** (elasticity of supply) ঃ দামের নির্দিষ্ট শতকরা পরিবর্তনের ফলে যোগানের যে নির্দিষ্ট শতকরা পরিবর্তন ঘটে তাকে বলে যোগানের দাম-স্থিতিস্থাপকতা। অর্থাৎ,

$$Es = \frac{\text{যোগানের শতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন}}$$

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মতই যোগানের স্থিতিস্থাপকতা একের কম $(E<1)$, একের সমান $(E=1)$, একের বেশি $(E>1)$, অসীম $(E=\infty)$ এবং শূন্য $(E=0)$, এই পাঁচ রকমের হতে পারে।

৩. ১১. উৎপাদন ঃ সম-উৎপন্ন রেখাভিত্তিক বিশ্লেষণ
Production Analysis : The Iso-quant Approach

১. কোন একটি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে সব উপাদান-সেবা (inputs) ব্যবহার করা হয় এবং তাদের দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, এই দু'য়ের মধ্যে (অর্থাৎ ব্যবহৃত উপাদান-সেবা ও উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে) সম্পর্কটির নামই হল উৎপাদন-অপেক্ষক। ব্যাখ্যা করে বলা যায়, প্রত্যেক উৎপাদক সংস্থাই কোন একটি বিশেষ সময়ে একটি নির্দিষ্ট কারিগরী-জ্ঞানের স্তরে আর একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনাগত কুশলতার স্তরে উৎপাদনের কাজ চালিয়ে থাকে। এ দু'টির স্তর যা আছে তাই ধরে নিয়ে একটি নির্দিষ্টকালের মধ্যে উপাদান-সেবাগুলির বিভিন্ন সংমিশ্রণের দ্বারা সর্বোচ্চ কি পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যেতে পারে—সেটাই উৎপাদন-অপেক্ষক নির্দেশ করে। এক কথায় উৎপাদন-অপেক্ষকটি বিভিন্ন সম্ভাব্য পরিমাণ উৎপাদনের একটি তালিকা।

২. অর্থবিদ্যায় তিন ধরনের উৎপাদন অপেক্ষকের আলোচনা করা হয়: (ক) একটিমাত্র পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাভিত্তিক উৎপাদন-অপেক্ষক (production function with one variable input)। এটি হল স্বল্পকালীন উৎপাদন-অপেক্ষক।

(খ) দু'টি পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাভিত্তিক উৎপাদন-অপেক্ষক (production function with two variable inputs)। এটিও স্বল্পকালীন উৎপাদন-অপেক্ষক। এবং (গ) সমস্ত পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাভিত্তিক উৎপাদন-অপেক্ষক (production function with all variable inputs)।

৩. উৎপাদক সংস্থাগুলির লক্ষ্য হল, উপাদান-সেবাগুলির জন্য সর্বনিম্ন ব্যয়ে সর্বাধিক সম্ভব পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করা এবং তার মধ্য দিয়ে সর্বাধিক মুনাফা উপার্জন করা। উৎপাদন-অপেক্ষকটি উৎপাদক সংস্থাকে তারই পথ নির্দেশ করে এবং সে পথ ধরেই উৎপাদক সংস্থা অগ্রসর হয়। সুতরাং উৎপাদক সংস্থাগুলির আচার-আচরণের বিশ্লেষণে, তার ভারসাম্যের অবস্থা ও শর্তাবলী নির্দেশে উৎপাদন-অপেক্ষক-এর ধারণাটি একটি মূল্যবান হাতিয়ারের কাজ করে।

৪. একটি পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাভিত্তিক উৎপাদন-অপেক্ষকের ক্ষেত্রে, উৎপাদক সংস্থা সর্বাধিক সম্ভব উৎপাদন ও ভারসাম্য অবস্থায় তখনই পৌঁছায় যখন তার কাছে প্রতিটি উপাদান-সেবার প্রান্তিক উৎপন্ন ও দামের অনুপাত পরস্পরের সমান হয়।

$$\text{অর্থাৎ} = \frac{MPx}{Px} = \frac{MPy}{Py} = \frac{MPz}{Pz} = 1.$$

(MPx হল x উপাদান-সেবার প্রান্তিক উৎপন্ন এবং Px হল x উপাদান-সেবার দাম, ইত্যাদি।) অর্থাৎ উৎপাদক সংস্থা যখন এরূপ পরিমাণে উপাদান-সেবাগুলি কেনে ও ব্যবহার করে যে, তাদের প্রত্যেকটির জন্য একটি অতিরিক্ত টাকা খরচ থেকে সমপরিমাণ প্রান্তিক উৎপাদন পায়, তখনি সে সর্বাধিক উৎপাদন ও ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছায়। এটি হল মার্শাল-প্রবর্তিত বিশ্লেষণ ধারা এবং ভোগীর ভারসাম্য বিশ্লেষণের মার্শাল-প্রবর্তিত ধারারই অনুরূপ।

৫. **দুটি পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবাভিত্তিক উৎপাদন অপেক্ষক: সম-উৎপন্ন বিশ্লেষণ ধারা:** (ক) ধরা যাক, অন্যান্য উপাদান-সেবা অপরিবর্তিত রেখে তার সাথে পুঁজি (যন্ত্রপাতি) ও শ্রম, এই দুটি পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবা ব্যবহার করে উৎপাদন করা হচ্ছে। এ অবস্থায় যে ফলাফল হয় নিচের সারণিতে তা দেখানো হল:

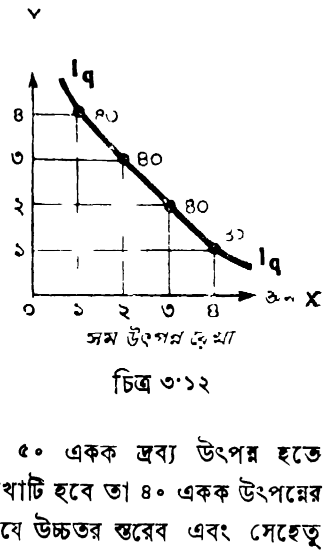
সারণি ৩·৫

পুঁজির একক	উৎপন্নের বিভিন্ন পরিমাণ			
৪	৪০	৫০	৬০	৭০
৩	৩০	৪০	৫০	৬০
২	২০	৩০	৪০	৫০
১	১০	২০	৩০	৪০
শ্রমের একক	১	২	৩	৪

দুটি পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবার সংমিশ্রণ ও পরিবর্ততার (substitution) দ্বারা কোন্ সুনির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন পাওয়া যেতে পারে তা উপরের সারণিতে

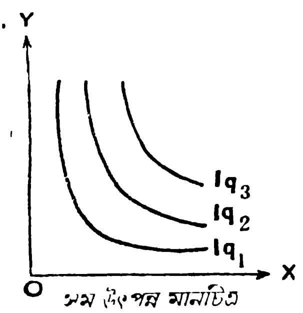
দেখানো হয়েছে। বামদিকের প্রথম কলমে নিচে থেকে উপরে পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং নিচে সমান্তরাল কলমে বামদিক থেকে ডানদিকে শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। ১ একক পুঁজি ও ১ একক শ্রমে যেমন সর্বনিম্ন পরিমাণ উৎপাদন (১০) হচ্ছে তেমনি ৪ একক পুঁজি ও ৪ একক শ্রমের দ্বারা সর্বাধিক পরিমাণ (৭০) উৎপাদন হচ্ছে। আবার, এও দেখা যাচ্ছে, পুঁজি ও শ্রমের উপাদান-সেবার বিভিন্ন সংমিশ্রণে (যথাক্রমে, ৪ একক পুঁজি ও ১ একক শ্রম, ৩ একক পুঁজি ও ২ একক শ্রম, ২ একক পুঁজি ও ৩ একক শ্রম এবং ১ একক পুঁজি ও ৪ একক শ্রমে) একই পরিমাণ দ্রব্য (৪০ একক) উৎপাদন করা যেতে পারে। এই সারণি অনুযায়ী, দেখা যাচ্ছে, উৎপাদন অপেক্ষকটিতে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের নিয়মটি কার্যকর রয়েছে। কেননা, ১ একক পুঁজি ও ১ একক শ্রমে ১০ একক দ্রব্য উৎপন্ন হচ্ছে। আর ২ একক পুঁজি ও ২ একক শ্রমে ৩০ একক উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং পরিবর্তনীয় উপাদান-সেবা দুটি দ্বিগুণ করা হলে উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি হচ্ছে।

(খ) ৩.৫ সারণির তথ্য নিয়ে ৩.১২ চিত্রে পুঁজি ও শ্রমের বিভিন্ন পরিমাণের সংমিশ্রণ দ্বারা ৪০ একক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের তথ্যটি বসিয়ে বিভিন্ন ৪০ একক উৎপাদন-বিন্দুগুলি একটি রেখা দিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই রেখাটিকে বলে সম-উৎপন্ন রেখা (equal product curve or iso-quant curve)। একে উৎপাদন-অপক্ষপাত রেখাও (production indifference curve) বলে।



চিত্র ৩.১২

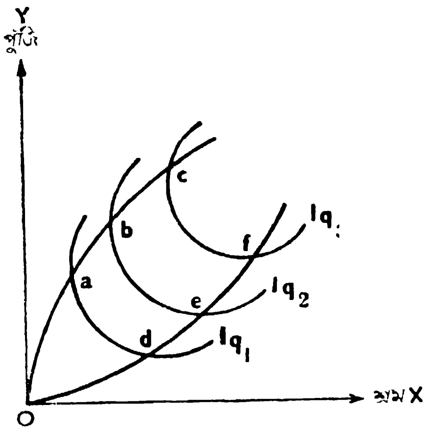
৩.১৩ চিত্রে দেখান হয়েছে, সম-উৎপন্ন রেখা একটি নয়, একাধিক হতে পারে। যেমন, ৩.৫ সারণি-তে দেখা যাচ্ছে, ৪ একক পুঁজি ও ২ একক শ্রম, কিংবা ৩ একক পুঁজি ও ৩ একক শ্রম, অথবা ২ একক পুঁজি ও ৪ একক শ্রম নিয়ে ৫০ একক দ্রব্য উৎপন্ন হতে পারে ইত্যাদি। এর ভিত্তিতে যে সম-উৎপন্ন রেখাটি হবে তা ৪০ একক উৎপন্নের সম-উৎপন্ন রেখার চেয়ে উচ্চতর স্তরের এবং সেহেতু ঐ রেখাটি তার ডানদিকে থাকবে। সুতরাং নিম্নতর স্তর থেকে ক্রমশ উচ্চতর স্তরে অবস্থিত সম-উৎপন্ন রেখাগুলি পর পর ডানদিকে দেখা দেয়, যেমন, Iq_1, Iq_2, Iq_3 ইত্যাদি। একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থিত সম-উৎপন্ন রেখার ছবিকে বলে সম-উৎপন্ন মানচিত্র। এর সঙ্গে সম-তৃপ্তি রেখা (অর্থাৎ অপক্ষপাত রেখা) ও অপক্ষপাত মানচিত্রকে তুলনা করা যেতে পারে। অপক্ষপাত রেখা ও অপক্ষপাত মানচিত্রের সঙ্গে অনেক



চিত্র ৩.১৩

বিষয়েই সম-উৎপন্ন রেখা ও সম-উৎপন্ন মানচিত্রের মিল আছে। তবে একটি প্রধান পার্থক্য হল, সম-উৎপন্ন রেখা ও মানচিত্রে উৎপাদনের পরিমাণটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট, কিন্তু অপক্ষপাত রেখা ও মানচিত্রে নির্দেশিত ভোগীর তৃপ্তি বা সন্তোষের পরিমাণটি অনুমান করা যায় না।

(গ) উৎপাদনের অর্থনীতিক লাভজনক অঞ্চলের সীমারেখা : **শৈলশিরা রেখা (Ridge Lines) :** এক-একটি সম-উৎপন্ন রেখা যে সব বিন্দু নিয়ে গঠিত সে বিন্দুগুলির প্রত্যেকটি দুটি উপাদান-সেবার (যেমন, পুঁজি ও শ্রমের) ভিন্ন ভিন্ন মিশ্রণ সূচিত করে। তবে এক একটি বিন্দু ভিন্ন ভিন্ন মিশ্রণে সৃষ্টি হলেও প্রতিটি বিন্দুতেই উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ একই হবে। যে কথাটা মনে রাখা দরকার তা হ'ল সমস্ত বিন্দুতেই উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ একই হবে। সুতরাং একটি বিন্দু থেকে আরেকটি বিন্দুতে গেলে, দুটি উপাদান সেবার মধ্যে একটির পরিমাণ বাড়বে ও অন্যটির পরিমাণ কমবে। অর্থাৎ একটি উপাদান-সেবার একটি একক যখন কমবে তখন তার স্থানে অন্য উপাদান-সেবার একটি একক বেশি ব্যবহৃত হবে। এইভাবে বিভিন্ন সংমিশ্রণে একটি উপাদান-সেবার সাথে অন্য উপাদান-সেবার পরিবর্ততা (substitution) চলতে থাকে।

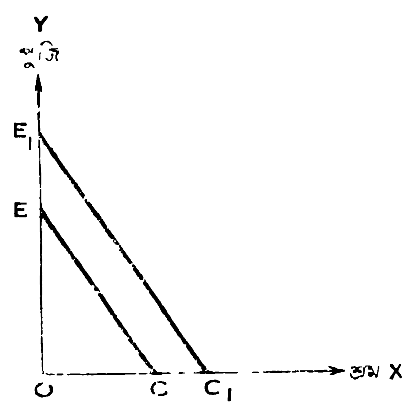


চিত্র ৩·১৪

তবে, যে বিষয়টি লক্ষণীয়, তা হল, একই সম-উৎপন্ন রেখার সমস্ত বিন্দুতে উৎপন্নের পরিমাণ এক হলেও, সেগুলিতে দুটি উপাদান সেবার যতগুলি ভিন্ন ভিন্ন সংমিশ্রণ থাকে, তার সবগুলি কিন্তু উৎপাদক সংস্থার পক্ষে লাভজনক বা ব্যয়-সাশ্রয়ী (economical) নাও হতে পারে। কারণ, তাতে উপাদান-খরচজনিত ব্যয়ের পরিমাণটা নির্ভর করে উপাদান-সেবা দুটির প্রত্যেকটির বাজার দাম ও দুটি উপাদান-সেবা নিয়োগের প্রয়োজনীয় পরিমাণের উপর। প্রত্যেকটি সম-উৎপন্ন রেখাতে তাই একটি করে নির্দিষ্ট সীমা আছে, যার মধ্যে অবস্থিত বিন্দুগুলিতে দুটি উপাদান-সেবার সবগুলি সংমিশ্রণই লাভজনক, কিন্তু যার বাইরে অবস্থিত বিন্দুগুলিতে কোন সংমিশ্রণই লাভজনক নয়। প্রত্যেকটি সম-উৎপন্ন রেখার কোন্ অংশের সংমিশ্রণগুলি লাভজনক তা জানতে হলে, তার কোন্ বিন্দুতে সে রেখাটি উল্লম্ব অক্ষরেখার সাথে সমান্তরাল এবং কোন্ বিন্দুতে সে রেখাটি অনুভূমিক অক্ষরেখাটির সাথে সমান্তরাল হয়ে পড়েছে তা অনুসন্ধান করতে হয়। যে বিন্দুতে একটি সম-উৎপন্ন রেখা লম্ব অক্ষরেখার সাথে সমান্তরাল হয়ে পড়ছে, সে বিন্দুতে উল্লম্ব অক্ষরেখায় যে উপাদান-সেবাটির (যেমন, ৩·১৪ চিত্রে পুঁজি ও a বিন্দু) পরিমাণ পরিমাপ করা হচ্ছে তার

প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য (0) হয়ে পড়ে এবং সম-উৎপন্ন রেখার ওই বিন্দুটির উপরের অংশে তার প্রান্তিক উৎপন্ন ঋণাত্মক (−) হয়ে পড়ে। তেমনি অনুভূমিক অক্ষরেখাটিতে যে উপাদান-সেবাটির পরিমাণ পরিমাপ করা হচ্ছে তার সাথে সম-উৎপন্ন রেখার যে বিন্দুটি সমান্তরাল হয়ে পড়ছে (যেমন ৩·১৪ চিত্রে শ্রম এবং d বিন্দু) সেখানে ওই উপাদান-সেবাটির প্রান্তিক উৎপন্ন শূন্য (0) এবং তার পরের বিন্দুগুলিতে প্রান্তিক উৎপন্ন ঋণাত্মক (−) হয়ে পড়ে। সুতরাং ৩·১৪ চিত্রে সম-উৎপন্ন রেখা Iq_1-এ a ও d বিন্দুর মধ্যবর্তী অংশে পুঁজি ও শ্রমের বিভিন্ন সংমিশ্রণ উৎপাদক সংস্থার কাছে লাভজনক, কিন্তু ওই বিন্দু দুটির বাইরের অংশের সংমিশ্রণগুলি লাভজনক নয়। তেমনি Iq_2, Iq_3 রেখাদুটিতেও যথাক্রমে b, e, ও c, f বিন্দুগুলির মধ্যবর্তী অংশগুলিতে উপাদান-সেবা দুটির সমস্ত সংমিশ্রণ লাভজনক কিন্তু তার বাইরের অংশের সংমিশ্রণগুলি লাভজনক নয়। এবার a, b, c বিন্দু তিনটি সংযুক্ত করে যে রেখাটি এবং d, e, f বিন্দু তিনটি সংযুক্ত করে যে রেখাটি পাওয়া গেল এই দুটি রেখা, দুই দিক থেকে বিভিন্ন সম-উৎপন্ন রেখার দুটি উপাদান-সেবার লাভজনক সংমিশ্রণের সীমান্তরেখা নির্দেশ করছে। এই দুটি রেখাকে শৈলশিরা রেখা (ridge line) বলে। এই দুটি রেখার মধ্যবর্তী অংশটিই হল আসলে উৎপাদক সংস্থার লাভজনক উপাদান-সংমিশ্রণ এলাকা এবং সেহেতু তার উৎপাদন-সম্ভাবনা অঞ্চল (production possibility area)।

(ঘ) **সম-ব্যয় রেখা** (the equal cost or iso-cost or equal outlay line) ঃ প্রত্যেক উৎপাদক সংস্থারই উপাদান-সেবা কেনার জন্য ব্যয়বরাদ্দ করতে হয়। ধরা যাক্, দুটি উপাদান-সেবা কেনার জন্য উৎপাদক সংস্থার যে ব্যয়বরাদ্দ রয়েছে তা দিয়ে তাকে লাভজনক হয় এমন পরিমাণে প্রয়োজনীয় উপাদান-সেবা দুটির সংমিশ্রণই কিনতে হবে। ৩·১৫ চিত্রে দেখানো হচ্ছে উৎপাদক সংস্থা পুঁজি ও শ্রম কেনার জন্য যে ব্যয়বরাদ্দ আছে তা দিয়ে কেবল OE পরিমাণ পুঁজি অথবা OC পরিমাণ শ্রম কেনা যায়। ওই বিন্দু দুটি সংযুক্ত করে যে EC রেখা পাওয়া গেল তা হল উৎপাদক সংস্থার সমব্যয় রেখা (ভোগীর বাজেট রেখার মত)। EC রেখার E এবং C-র মধ্যে বিভিন্ন বিন্দুতে পুঁজি ও শ্রমের বিভিন্ন সংমিশ্রণ রয়েছে কিন্তু যে কোন সংমিশ্রণ কিনলে মোট ব্যয় পড়বে একই। তাই একে সমব্যয় রেখা বলে। তেমনি পুঁজি ও শ্রম কেনার ব্যয়বরাদ্দ বেশি হলে উৎপাদন সংস্থার নতুন সমব্যয় রেখাটি EC রেখার ডানদিকে সরে গিয়ে ৩·১৫ চিত্রের E_1C_1 রেখায়

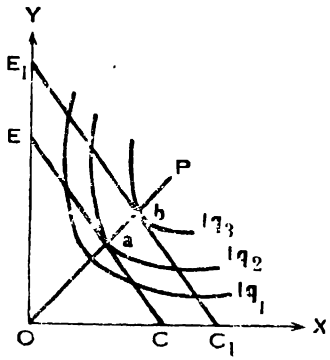


চিত্র ৩·১৫

পরিণত হতে পারে। এ ভাবে পুঁজি ও শ্রম কেনার ব্যয়বরাদ্দ যেমন যেমন হবে উৎপাদন সংস্থার সমব্যয় রেখাগুলিও তেমনিভাবে EC রেখার ডানদিকে. (ব্যয়বরাদ্দ বেশি হলে) অথবা বামদিকে (ব্যয়বরাদ্দ কম হলে) সরে সরে যাবে।

(ঙ) **উৎপাদকের ভারসাম্য : সর্বনিম্ন ব্যয়ের সংমিশ্রণ** (producer's equilibrium : the least cost equilibrium) : উৎপাদক সংস্থা তার সর্বাধিক মুনাফা উপার্জনের প্রয়োজনে সর্বদাই সবচেয়ে কম খরচে উৎপাদনের চেষ্টা করে এবং তা করতে গিয়ে উপাদান-সেবাগুলির এমন সংমিশ্রণ কিনতে চেষ্টা করে যাতে উপাদান-সেবাগুলি কিনতে তার সবচেয়ে কম খরচ পড়ে। এ কাজে যখন সে সফল হয়, তখন সে উৎপাদকের ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছায়।

৩·১৬ চিত্রে এই ভারসাম্য কেমন করে এবং কোথায় স্থির হয় তা দেখানো হয়েছে। (এখানে ভোগীর ভারসাম্য-অবস্থার বিশ্লেষণটি স্মরণ করা দরকার)।



চিত্র ৩·১

চিত্রে তিনটি সম-উৎপন্ন রেখা যথাক্রমে Iq_1, Iq_2, ও Iq_3 রয়েছে। EC এবং E_1C_1 হল উৎপাদক সংস্থার দুটি সম্ভাব্য সম-ব্যয় রেখা। EC রেখায় ব্যয়বরাদ্দ কম ও E_1C_1 রেখায় ব্যয়বরাদ্দ বেশি। সম-উৎপন্ন রেখা Iq_1 সম-ব্যয় রেখা EC-কে দুটি বিন্দুতে খণ্ডন করলেও, ওই দুটি বিন্দুর কোনটিই উৎপাদক সংস্থার পক্ষে উপাদান-সেবা কেনার গ্রহণযোগ্য বিন্দু নয়। কারণ, সমব্যয় রেখা EC আবার উচ্চতর সম-উৎপন্ন রেখা Iq_2-কে a বিন্দুতে স্পর্শক রূপে স্পর্শ করেছে। সুতরাং Iq_2 রেখার a বিন্দুতে যে সংমিশ্রণটি রয়েছে তা Iq_1 রেখায় যে কোন বিন্দুর সংমিশ্রণের চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং তা কিনতে উৎপাদক সংস্থার মোট ব্যয় তার বাজেটের মধ্যেই থাকবে। সুতরাং উৎপাদক সংস্থাটি Iq_2 রেখার a বিন্দুর সংমিশ্রণটিই কিনবে। তাহলেই সে ন্যূনতম ব্যয়ে সর্বোৎকৃষ্ট সংমিশ্রণ কিনতে পারবে। যদি তার বাজেট বা ব্যয়বরাদ্দ বেশি হয় তবে যে E_1C_1 সমব্যয় রেখায় খরচ করবে এবং তখন যেহেতু E_1C_1 রেখাটি উচ্চতর সম-উৎপন্ন রেখা Iq_3-কে b বিন্দুতে স্পর্শক রূপে স্পর্শ করেছে সেহেতু, তার পক্ষে ওই বিন্দুতে উপাদান-সেবা দুটি কেনাই হবে সর্বনিম্ন ব্যয়ে সর্বোৎকৃষ্ট উপাদান-সংমিশ্রণ কেনা। a ও b বিন্দু দুটি O বিন্দুর সঙ্গে সংযুক্ত করে OP রেখাটি টানা হয়েছে। এই OP রেখা হল উৎপাদক সংস্থার উৎপাদন সম্প্রসারণ পথ।

৪ পণ্যের দাম নির্ধারণ
COMMODITY PRICING

৪.১. বাজারের গঠন : কয়েকটি মূল ধারণা/ছক
Market Structures : Some Basic Concepts/Models

১. **মূল অর্থনৈতিক লক্ষ্য :** মানুষের অসীম অভাব ও উপকরণগুলির স্বল্পতা হল অর্থব্যবস্থার মূলভিত্তি। স্বল্প উপকরণগুলির সুদক্ষ ব্যবহার-ব্যবস্থাপনার দ্বারা মানুষের সর্বাধিক-সম্ভব অভাবপূরণ হল সমস্ত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার লক্ষ্য। এজন্য দরকার হল, একদিকে বিভিন্ন বিকল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপকরণগুলির সুদক্ষ বণ্টন, অন্যদিকে উপকরণগুলির পূর্ণ নিয়োগ।

২. **বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতি :** ভারত সহ পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ যে অর্থনীতিতে বাস করে তা হল বাজার-ভিত্তিক মিশ্র ধনতন্ত্রী অর্থনীতি। বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতিতে (market economy) বাজারের মারফত অর্থনীতির উপরোক্ত কাজগুলি আপনাআপনি সম্পাদিত হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তিবিশেষ বা সরকারের দ্বারা তা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় না। বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতি বলতে এমন একটি অবস্থা বোঝায় যেখানে—(ক) সম্পত্তির অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা রয়েছে; (খ) উৎপাদকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতা রয়েছে; (গ) ভোগীদের পছন্দমত জিনিস কেনার স্বাধীনতা রয়েছে; (ঘ) প্রতিযোগিতা রয়েছে; (ঙ) একদিকে উৎপাদক ও অন্যদিকে ভোগীদের আপন স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায় হল এই অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। উৎপাদকরা চায় সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা, ভোগীরা চায় অভাবের সর্বাধিক তৃপ্তি এবং (চ) অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারের সীমাবদ্ধ অংশগ্রহণ রয়েছে।

৩. **বাজারের ভূমিকা :** সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা, উৎপাদক ও ভোগীদের আপন আপন পছন্দমত চলার স্বাধীনতা এবং আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধির (self-interest) অভিপ্রায় ইত্যাদি বাজার-অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য। এই অবস্থায় উৎপাদক ও ভোগীদের, পণ্য ও উপকরণে বিক্রেতা ও ক্রেতাদের বেচাকেনার সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সংযোগ ঘটে বাজারের মারফত। বাজারের মারফত তা কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়। বিক্রেতা ও ক্রেতাদের পছন্দগুলি (choices) বিভিন্ন বাজারে যোগান ও চাহিদার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। পণ্যের ও উপকরণের দরদাম হল তার ফলাফল। ওই দরদামগুলি হল উপকরণের মালিক, কারবারের উদ্যোক্তা ও ভোগীদের কাছে এমন পথনির্দেশ যা দেখে তারা তাদের নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রত্যেকে আলাদা ভাবে সিদ্ধান্ত নেয় ও সে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন মত রদবদল করে। প্রতিযোগিতা হল এর মূল নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা আর মূল্যব্যবস্থা হল এর মূল সংগঠক শক্তি। মূল্যব্যবস্থাটি হল এমন এক বিশদ ব্যবস্থা যার মারফত অসংখ্য ব্যক্তিগত স্বাধীন পছন্দ পরি-

স্ফুট হয়, একত্রিত হয় ও একের সাথে অপরের ভারসাম্য স্থাপিত হয়। মূল্যব্যবস্থার হুকুম যারা মেনে নেয় তারা পুরস্কৃত হয়। যারা তা অগ্রাহ্য করে তারা দণ্ডিত হয়। মূল্যব্যবস্থার যোগসূত্র মারফত সমগ্র সমাজ স্থির করে—কি কি সামগ্রী উৎপন্ন হবে, কিভাবে দক্ষতার সাথে উৎপাদন সংগঠিত হবে এবং কিভাবে উৎপাদনশীল প্রচেষ্টাগুলির ফল অর্থনৈতিক কর্মে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বন্টিত হবে। ধনতান্ত্রিক সমাজে মূল্যব্যবস্থার দ্বারাই এই সব সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবে রূপায়িত হয়।

৪. **মূল্যব্যবস্থার কাঠামঃ** (ক) দেশের এক-একটি পরিবার দেশের অর্থনীতির এক একটি বুনিয়াদী একক। অর্থনীতিতে প্রতিটি এককের (অর্থাৎ পরিবারের) দু'রকমের ভূমিকা থাকে—পণ্যের ভোগীরূপে আর উপকরণের মালিকরূপে। নানা বস্তুগত দ্রব্য ও সেবাকর্মের জন্য এদের অভাব হল সীমাহীন। এরা প্রত্যেকেই উপকরণের মালিক বটে, তবে এদের মালিকানাধীন উপকরণের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ উপকরণ বিক্রি করে এদের যে আর্থিক আয় হয় সেটাও সীমাবদ্ধই হয়। এই আয়ে এরা বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যসামগ্রীর এমন সংমিশ্রণ কিনতে চেষ্টা করবে যে সংমিশ্রণ থেকে তারা সর্বাধিক পরিতৃপ্তি পাবে বলে মনে করবে। ভোগীরূপে এদের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাজার চাহিদা তালিকা রূপে দেখা দেয়। ভোগীরা সকলেই সর্বদা দামী পণ্যের পরিবর্তে সস্তা পণ্য ব্যবহার করতে চায় বলে এবং প্রতিটি পণ্যের ক্রেতা অনেক হওয়ায় কোন একজন ক্রেতা পণ্যের দাম ইচ্ছামত কমাতে পারে না। তাই পণ্যের চাহিদা রেখাটি বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী বা ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন হয়ে থাকে।

(খ) প্রতিযোগী উৎপাদক বা কারবারী সংস্থাগুলি হল পণ্যের বাজারে যোগানদার। এদের লক্ষ্য সর্বাধিক মুনাফা উপার্জন। এটা করতে গিয়ে এদের স্থির করতে হয়, কোন্ পণ্যটি এবং সেটি কি পরিমাণে উৎপাদন করলে সবচেয়ে লাভজনক হবে, এবং তা আকাঙ্ক্ষিত পরিমাণে উৎপাদনের জন্য উপকরণগুলির কোন্ সংমিশ্রণটি ব্যবহার করলে উৎপাদন খরচ সবচেয়ে কম হবে। কারবারীদের এই সিদ্ধান্তগুলি পণ্যের যোগান রেখার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। যোগান রেখাগুলি বাম দিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী বা ধনাত্মক ঢালসম্পন্ন। এর মানে হল, কম দামী পণ্যের বদলে বেশি দামী পণ্য উৎপাদন করলে তারা বেশি লাভবান হবে।

(গ) ভোগীদের পছন্দের প্রতিফলক চাহিদা রেখা ও উৎপাদকদের পছন্দের প্রতিফলক যোগান রেখা, এই দুটি মিলে পণ্যের ভারসাম্য দাম নির্ধারণ করে দেয়।

(ঘ) উৎপাদক বা কারবারী সংস্থা পণ্যের উৎপাদনের জন্য উপকরণ চায়। তাই এরা হল পণ্যের যোগানদার কিন্তু উপকরণের চাহিদাকারী। সবচেয়ে কম খরচে পণ্য উৎপাদন করে সবচেয়ে বেশি মুনাফা উপার্জনের উদ্দেশ্যে এরা সর্বদা দামী উপকরণের পরিবর্তে কম দামী উপকরণ ব্যবহার করতে চায়। তার মানে হল, এদের কাছে উপকরণের চাহিদা রেখাটি বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী বা ঋণাত্মক ঢাল সম্পন্ন। এ চাহিদা রেখা থেকে কোন্ দামে এরা কোন্ উপকরণ কতটা পরিমাণে কিনতে চায় তা জানা যায়।

(ঙ) দেশের পরিবারগুলিকে দুটি ভূমিকায় দেখা যায়: ভোগী হিসাবে ও মালিক হিসাবে। পরিবারগুলি ভূমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন (এটিকে উদ্যোগ-প্রতিভাও বলা যায়) প্রভৃতি উপকরণের যেমন মালিক তেমনি তারা এ সব উপকরণের যোগানদারও বটে। যোগানদার হিসাবে এদের কাজ হল, কারবারী সংস্থাগুলির কাছে প্রতিযোগিতামূলকভাবে ঐ সব উপকরণ যোগান দেওয়া। এখন যোগানদারেরা পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগী। এ সব প্রতিযোগী যোগানদারদের সিদ্ধান্তগুলি উপকরণের বাজারে যোগান রেখার আকারে দেখা দেয়। (অর্থাৎ উপকরণের বাজারে যোগানের দিকটি এদের সিদ্ধান্তের দ্বারাই নির্ধারিত হয়।) যোগান রেখাগুলি বাম দিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়, অর্থাৎ এদের ঢাল হয় ধনাত্মক। এর তাৎপর্য হল, যোগানদারেরা উপকরণ বিক্রি করে সর্বাধিক আয় উপার্জন করার উদ্দেশ্যে তাদের উপকরণগুলি যে নিয়োগের ক্ষেত্রে কম আয় হচ্ছে সে ক্ষেত্র থেকে যে নিয়োগের ক্ষেত্রে বেশি আয় হচ্ছে বা হতে পারে সে ক্ষেত্রে স্থানান্তর করার চেষ্টা সর্বাদাই করে থাকে।

(চ) এইভাবে, পরিবারগুলির পণ্যচাহিদা সংক্রান্ত ইচ্ছাগুলি এবং কারবারী সংস্থাগুলির পণ্য যোগান সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি মিলে একাদিক্রমে কতকগুলি পণ্য-দাম নির্ধারণ করে দেয়। তেমনি, কারবারী সংস্থাগুলির উপকরণের চাহিদা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি এবং পরিবারগুলির উপকরণ-যোগান সংক্রান্ত ইচ্ছাগুলি মিলে একাদিক্রমে কতকগুলি উপকরণ-দাম নির্ধারণ করে দেয়।

৫. বাজারের কয়েকটি মূল ছক : ভারতে বিভিন্ন পণ্যের বাজার অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন রকমের পরিস্থিতি রয়েছে এবং সেগুলি এত ভিন্ন ভিন্ন ধরনের যে, তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। এক দিকে দেখা যাবে, কোন পণ্যের শত শত উৎপাদক ও বিক্রেতা সংস্থা রয়েছে ও তাদের প্রত্যেকে বাজারে পণ্যটির মোট যোগানের অতি সামান্য অংশ সরবরাহ করছে। আবার অন্যদিকে হয়তো দেখা যাবে কোন বাজারে একজন মাত্র উৎপাদক ও যোগানদার রয়েছে এবং বাজারটিতে সে পূর্ণ আধিপত্য করছে। আবার দেখা যাবে, এই দু'টি চরম বিপরীত ধরনের বাজারের মাঝখানে এমন ধরনের পণ্যের বাজার আছে যাদের পরস্পরের মধ্যে কিছু কিছু মিল রয়েছে। স্পষ্টতই নানা রকমের বাজারের প্রত্যেকটি নিয়ে আলোচনা করা বাস্তবে অসম্ভব। সব মিশ্র ধনতন্ত্রী দেশেই মোটামুটি একই অবস্থা। বাজার সম্পর্কে আলোচনার এই অসুবিধা দূর করার জন্য অর্থনীতিবিদ্‌রা বাজারের কয়েকটি মূল ছক তৈরি করে নিয়ে আলোচনা করেন। সে ছকগুলির কোনটিই বাস্তবের কোন বাজারের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলবে না বটে, কিন্তু তা থেকে মোটামুটিভাবে নানা ধরনের বাজারে কি করে দরদাম নির্ধারিত হয় ও কারবারী সংস্থাগুলি তাদের বাঞ্ছিত উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করে তার আভাস পাওয়া যায়। এখানে আমাদের বাজারের আলোচ্য ছকগুলি হল : (ক) নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার; (খ) একচেটিয়া বাজার; (গ) অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার।

৬. **নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার** (market under perfect competition): নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারের কতকগুলি লক্ষণ আছে যা অন্যান্য বাজারে নেই: (ক) এই বাজারে বিক্রেতা ও ক্রেতার সংখ্যা অনেক; (খ) প্রতিযোগী বিক্রেতা বা উৎপাদক সংস্থাগুলি সকলেই একটি নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী একটি পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি করে। ফলে সব বিক্রেতার পণ্যই অবিকল একরকম হয়। তাই যে কোন বিক্রেতার কাছ থেকে পণ্যটি কিনলেই ক্রেতাদের চলে, কোন বিশেষ বিক্রেতার প্রতি তাদের পক্ষপাতিত্ব থাকে না। তাদের কাছে সব বিক্রেতার পণ্যই এক, তাই সমস্ত বিক্রেতার পণ্যই পরস্পরের সম্পূর্ণ পরিবর্ত (perfect substitutes)। (গ) কোন বিক্রেতাই এককভাবে বাজারে পণ্যটির মোট যোগান ও তার দাম নিজের ইচ্ছামত কমাতে বাড়াতে পারে না। কারণ বাজারে বহু বিক্রেতা মিলে পণ্যটির মোট যোগান এত বেশি পরিমাণে দেয় ও সে তুলনায় কোন একজন বিক্রেতার নিজের যোগানের পরিমাণ এত সামান্য যে, কোন বিক্রেতাই তার নিজের যোগান কমিয়ে বা বাড়িয়ে মোট যোগানের বিশেষ কোন হেরফের ঘটাতে পারে না এবং সেহেতু দামেরও কোন ওঠানামা ঘটাতে পারে না। এ বাজারে তাই যে কোন বিক্রেতাকে বাজার দাম মেনে নিয়ে পণ্যটি বেচতে হয়। তাই তাকে বলে দাম-গ্রহীতা (price taker)। সে দাম-নির্ধারক (price maker) হতে পারে না। সবাই মিলে উৎপাদন বাড়ালে বা কমালে মোট যোগান বাড়ে কিংবা কমে; (ঘ) নতুন উৎপাদক বা বিক্রেতা খুশিমত যে কোন সময়ে এই বাজারে বা শিল্পে যোগ দিতে পারে, পুরাতন উৎপাদক বা বিক্রেতাও যে কোন সময় ইচ্ছা করলে কারবার গুটিয়ে চলে যেতে পারে। এতে আইনগত, কারিগরী, আর্থিক বা অন্য কোন বাধা থাকে না; (ঙ) এ বাজারে পণ্যটি কি দামে বেচাকেনা হচ্ছে সে সম্পর্কে সমস্ত বিক্রেতা ও ক্রেতারা সম্পূর্ণ খবর রাখে। তাই কেউ কারো থেকে কম বা বেশি দামে বেচতে কিংবা কিনতে পারে না। বিক্রেতা ও ক্রেতারা সকলেই একদামে বেচাকেনা করে; (চ) বিক্রেতা ও ক্রেতারা পরস্পরের এত কাছাকাছি থাকে যে পরিবহণ খরচ কিছু লাগে না; (ছ) এ বাজারে সব বিক্রেতার পণ্য সম্পূর্ণ এক বলে কারো পণ্যের সঙ্গে অন্য কারো পণ্যের গুণাগুণের তারতম্য থাকে না। ক্রেতারাও তা জানে বলে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের কোন প্রয়োজন থাকে না। তাই পণ্য বিক্রির জন্য উৎপাদকদের বিজ্ঞাপন ও প্রচার বাবদ কোন অতিরিক্ত খরচ করতে হয় না।

দৃষ্টান্ত: কৃষিজাত পণ্যের বাজারগুলি সাধারণত নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারের অনেকটা কাছাকাছি হয়ে থাকে।

৭. **একচেটিয়া বাজার** (monopoly market): একচেটিয়া বাজারের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি হল: (ক) বাজারে তথা শিল্পে একটি মাত্র উৎপাদক ও বিক্রেতা বা যোগানদার সংস্থা থাকে। দ্বিতীয় কোন প্রতিযোগী সংস্থা থাকে না; (খ) একচেটিয়া কারবারীর পণ্যের অন্য কোন উৎপাদক নেই বলে, তার পণ্যটি হল অদ্বিতীয়, পরিবর্তহীন। তার কাছে ছাড়া ক্রেতারা অন্য কোথাও সে দ্রব্যটি

পাবে না, তাই সেটি কিনলে তার কাছ থেকেই কিনতে হবে, নয়তো সে জিনিসটি না কিনে ক্রেতাকে চলে যেতে হবে ; (গ) বাজারে পণ্যটির একমাত্র উৎপাদক ও যোগানদার হওয়ায়, একচেটিয়া কারবারী ইচ্ছামত তার উৎপাদন ও যোগান কমিয়ে বা বাড়িয়ে মোট যোগান কমাতে বা বাড়াতে পারে এবং দরকার হলে যোগান নিয়ন্ত্রণ করে দামকে বাড়াতে বা কমাতে পারে ; (ঘ) বাজারে একচেটিয়া কারবারীর প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকার কারণ হল, নতুন প্রতিযোগীর বাজারে প্রবেশের পথে কোন না কোন অর্থনীতিক আইনগত, কারিগরী, আর্থিক বাধা থাকে ; (ঙ) তার পণ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী একচেটিয়া কারবারী প্রচার ও বিজ্ঞাপনের আশ্রয় নিতে পারে আবার নাও নিতে পারে। নিলেও সেটা হয় প্রধানত জনসংযোগের উপায় হিসাবে। বিক্রি বাড়ানোর গরজে ততটা নয়। তাই এই বাবদে খরচও সে বেশি করে না।

দৃষ্টান্ত : ভারতে ডাক, তার ও টেলিফোন ব্যবস্থা, স্থানীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহকারী সংস্থা, হিন্দুস্থান অ্যান্টিবায়োটিকস, মফঃস্বল এলাকার বাস পরিবহণ ব্যবস্থা প্রভৃতি হল একচেটিয়া কারবারের দৃষ্টান্ত।

৮. **অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার** (market of imperfect competition) : নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার ও একচেটিয়া বাজার হল বাজারের দুটি চরম বিপরীত, সরল কাল্পনিক রূপ। বাস্তবের বাজারগুলি নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারও নয়, আবার পুরোপুরি একচেটিয়া বাজারও নয়, বরং এগুলি অবস্থান করে ঐ দুই বিপরীত বাজারের মাঝামাঝি জায়গায়। আবার এ বাজারগুলি হয়ও নানা রকমের। এসব বাজারে কম বেশি যেমন প্রতিযোগিতা থাকে, তেমনি আবার একচেটিয়া প্রভাবও থাকে। এ ধরনের বাজারকে বলে অনিখুঁত বাজার। নিখুঁত বাজারের লক্ষণ বা শর্তগুলির কোন একটির অভাব ঘটলেই, তত্ত্বগতভাবে সে বাজারকে অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার বলা হয়। অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার আবার অনেক রকমের হয়ে থাকে।

৮. (ক) অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারের মধ্যে একটি প্রধান বাজার হল **একচেটিয়া ঝোঁকমূলক প্রতিযোগিতার বাজার** (market of monopolistic competition)। এর প্রধান লক্ষণগুলি হল : (১) এই বাজারে বা শিল্পে নিখুঁত প্রতিযোগিতার মত অনেক বিক্রেতা থাকতে যেমন পারে তেমনি কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই মোট যোগানের এমন একটি অংশ যোগান দেয় যা অল্প হলেও একেবারে নগণ্য নয় ; (২) এই বাজারে প্রতিযোগীরা একই জাতীয় দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করলেও একের সাথে অন্যের দ্রব্যের কিছু না কিছু পার্থক্য থাকে। সে পার্থক্য বাস্তব হতে পারে আবার কাল্পনিকও হতে পারে। সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বীদের পণ্যগুলি প্রতিযোগিতার বাজারের মত পরস্পরের নিখুঁত পরিবর্ত (perfect substitutes) না হয়ে, কাছাকাছি পরিবর্ত দ্রব্য (close substitutes) হয়ে থাকে। একে বলে পণ্য পৃথকীকরণ (product differentiation)। প্রতিযোগীদের সংখ্যাধিক্যের জন্য এই বাজারে যেমন প্রতিযোগিতা থাকে, তেমনি প্রত্যেকের পণ্যের বিশিষ্টতা বা পণ্য-পৃথকী-

করণের দরুন প্রত্যেক বিক্রেতাকে খানিকটা পরিমাণে একচেটিয়া ক্ষমতা এনে দেয় ; (৩) পণ্য পৃথকীকরণের ফলে প্রত্যেক বিক্রেতার নিজ পণ্যটির দামের উপর খানিকটা পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা স্থাপিত হয় এবং সে কারণে তার পক্ষে পণ্যটির বিক্রি না কমিয়ে দাম বাড়ানো সম্ভব হয়। এটা এজন্য সম্ভব হয় যে, পণ্য পৃথকীকরণের ফলে প্রত্যেক বিক্রেতারই পণ্যের কিছু না কিছু অনুরক্ত খরিদ্দার থাকে, পণ্যটির দাম সামান্য বাড়লেও যারা অন্যত্র চলে যায় না। তবে, বিক্রেতার সংখ্যা যত বেশি হবে এবং তারা যত কাছাকাছি থাকবে, নিজের পণ্যের দামের উপর প্রত্যেক বিক্রেতার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তত কম হবে। নিজের অনুরক্ত ক্রেতাদের নিয়ে প্রত্যেক বিক্রেতার একটি গণ্ডীবদ্ধ নিজস্ব বাজার থাকে যেখানে সে একক বিক্রেতা ; (৪) এই বাজারে নতুন প্রতিযোগী বিক্রেতার প্রবেশ পথ বন্ধ থাকে না বটে, কিন্তু প্রবেশ করাটা নিখুঁত বাজারের মত সহজও থাকে না। নতুন প্রতিযোগীর একদিকে যেমন দরকার হয় যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজি, তেমনি প্রয়োজন হয় প্রতিষ্ঠিত বিক্রেতাদের কাছ থেকে তাদের অনুরাগী খরিদ্দারদের একাংশকে নিজের পণ্যের দিকে আকৃষ্ট করার। স্পষ্টতই, এ দুটো কাজের কোনটিই খুব সহজ নয় ; (৫) পণ্য পৃথকীকরণের দরুন এ বাজারে বিক্রেতাদের মধ্যে খরিদ্দার আকর্ষণ করা ও বিক্রি বাড়ানোর জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। প্রধানত বিক্রেতাদের পণ্যের দাম নিয়েই এ প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। প্রত্যেক বিক্রেতাই নিজের পণ্যটিই যে শ্রেষ্ঠ এটা ক্রেতাদের কাছে প্রমাণ করতে চায়। এ উদ্দেশ্যে তারা বিজ্ঞাপন ও প্রচারের মাধ্যমে নিজ নিজ পণ্যের উৎকর্ষ (এটা বাস্তবও হতে পারে, আবার কাল্পনিকও হতে পারে) সম্পর্কে জনমনে ধারণা সৃষ্টি করতে এক ধরনের প্রচার ও বিজ্ঞাপন-যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তা ছাড়া, খরিদ্দারদের কে কত বেশী সেবা (after sale service) করতে পারে তা নিয়েও বিক্রেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। এজন্য প্রত্যেক বিক্রেতার যে খরচ পড়ে তার পরিমাণ কম নয় এবং দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই খরচকে বলে বিক্রয় খরচ (selling cost)।

দৃষ্টান্ত : আসবাব ও জামা কাপড় প্রস্তুতকারী শিল্প, জুতা তৈরির শিল্প, শহরের খুচরা দোকানদার, মনোহারী দোকানদার, লণ্ড্রী, পেট্রল ও ডিজেল পাম্প স্টেশন, রেস্তোঁরা ও সেলুন এই জাতীয় বাজারের বাস্তব দৃষ্টান্ত।

৮. (খ) অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারের মধ্যে আরেকটি প্রধান বাজার হল **অলিগোপলি** বা মুষ্টিমেয় বিক্রেতার বাজার। অলিগোপলির লক্ষণগুলি হল :

(১) এই বাজারে উৎপাদক-বিক্রেতার সংখ্যা হল অল্প কয়েকটি (মুষ্টিমেয়)। তাদের প্রত্যেকের উৎপাদন ও যোগানের পরিমাণ বাজারে মোট যোগানের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (যেমন একটি বাজারে হয়ত ৫০টি উৎপাদক সংস্থার মধ্যে ৬টি মিলে মোট উৎপাদনের ৭০ শতাংশ যোগান দেয়)। এই মুষ্টিমেয় উৎপাদক-বিক্রেতা যেহেতু বাজারের মোট যোগানের একটা খুব বড় অংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করে থাকে সে জন্য এদের প্রত্যেকেই নিজস্ব পণ্যের বিক্রি বাড়াতে যে কারবারী নীতি গ্রহণ করে এবং বাজারে যে আচরণ করে তাতে বাজারের অন্যান্য প্রতি-

যোগীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রত্যেক বিক্রেতা তার পণ্যের দাম পরিবর্তন করবে কিনা, বিজ্ঞাপন বাবদ কত খরচ করবে, বিজ্ঞাপনের ধরন-ধারণ পাল্টাবে কি না, নিজ পণ্যের গুণ ও মানের কোন পরিবর্তন ঘটাবে কি না, এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার আগে প্রত্যেক বিক্রেতাকেই সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হয়, তার কাজের ফলে প্রতিযোগীদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে এবং কি ধরনের প্রতিশোধমূলক পাল্টা ব্যবস্থা তারা নিতে পারে। প্রতিযোগীদের মধ্যে এই রকম পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং একের নীতি ও আচরণের দ্বারা অন্যদের প্রভাবিত হওয়া অলিগোপলির একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য, যা অন্য কোন বাজারে দেখা যায় না।

(২) দু'রকম অলিগোপলি দেখা যায়। যে সব অলিগোপলির বাজারে উৎপাদকরা কাঁচামাল বা অর্ধপ্রস্তুত সামগ্রী উৎপাদন করে, সে বাজারে সব প্রতি-যোগীর পণ্যই একটি নির্দিষ্ট মানের হতে দেখা যায়। সে সব বাজারে পণ্যপৃথকী-করণ থাকে না। যেমন, ভারতে ইস্পাত, দস্তা, তামা, সীসা, সিমেন্ট, রেয়ন প্রভৃতি শিল্প-কাঁচামালের বাজারে অল্প কয়েকটি উৎপাদক সংস্থার আধিপত্য দেখা যায় এবং তাদের ঐ সব পণ্য মোটামুটি একই মানের। পণ্যপৃথকীকরণ সেখানে নেই। কিন্তু সম্পূর্ণ তৈরী পণ্যের অলিগোপলি বাজারে যথেষ্ট পণ্যপৃথকীকরণ দেখতে পাওয়া যায়। ভারতে মোটরগাড়ি, স্কুটার, টায়ার, সাইকেল, সাবান, সিগারেট, রেডিও, টিভি, ব্লেড ইত্যাদির বাজার পণ্যপৃথকীকৃত অলিগোপলি বাজারের দৃষ্টান্ত।

(৩) বাজার দামের উপর অলিগোপলির কোন একজন আধিপত্যকারী বিক্রেতার যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে তা কিন্তু প্রতিযোগীদের প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থার ভয়ে সে পুরোপুরি খাটাতে পারে না। একজন দাম কমিয়ে নিজের বিক্রি বাড়াতে চেষ্টা করলে আর সবাই মিলে নিজেরা বাঁচার জন্য এমনভাবে প্রতিযোগিতা করে দাম কমাতে শুরু করবে, যার ফলে দামের লড়াই লেগে যাবে, ক্রমাগত দাম কমতে থাকবে ও সকলেরই সমূহ ক্ষতি হবে। তাই কেউ সহসা দাম কমাতে সাহস করে না। আবার, কেউ দাম বাড়ালে তার দেখাদেখি প্রতিযোগীরা কেউ দাম বাড়ায় না। ফলে যে দাম বাড়ায় তার বিক্রি পড়ে যায়। সুতরাং এ বাজারে কোন বিক্রেতা সহজে স্থিতাবস্থা নষ্ট করতে চায় না। এ অসুবিধা এড়ানোর জন্য অলি-গোপলির বিক্রেতারা কয়েকজন মিলে গোষ্ঠী গড়ে তোলে। তারপর নিজেদের মধ্যে যোগসাজসের মাধ্যমে একমত হয়ে (collusive group agreement) গোষ্ঠীগতভাবে দাম কমায় বা বাড়ায়। এরকম ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারীর মতই অলিগোপলির একটি বিক্রেতাগোষ্ঠী দামের উপর নিয়ন্ত্রণ খাটাতে পারে।

(৪) এ বাজারে বর্তমান বিক্রেতারা নতুন কোন প্রতিযোগীকে সহজে ঢুকতে দেয় না এবং যাতে কেউ ঢুকতে না পারে সেজন্য নানারকম বাধা সৃষ্টি করে। গুরুত্ব-পূর্ণ জিনিসের পেটেন্ট রাইট, কাঁচামালের যোগান নিজেদের মুঠোর মধ্যে আনা ইত্যাদি হল এক ধরনের বাধা; বর্তমান বিক্রেতাদের সুপরিচিত পণ্যগুলির অনুরক্ত

খরিদ্দারদের অস্তিত্ব আরেকটি বাধা। তবে তা সত্বেও এ বাজারে একচেটিয়া বাজারের মত নতুন প্রতিযোগীর প্রবেশ পথ একেবারে বন্ধ থাকে না। প্রবেশ করা কঠিন হলেও, অসম্ভব নয়।

(৫) প্রচার বিজ্ঞাপনের জন্য অলিগোপলির বিক্রেতারা যথেষ্ট খরচ করে থাকে।

দৃষ্টান্ত: ভারতে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় ৮ জন/১০ জন বড় বড় বিক্রেতা বা কারবারী রয়েছে। সেগুলিকে অলিগোপলির দৃষ্টান্ত বলে গণ্য করা যেতে পারে।

নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণ
Pricing under Perfect Competition

৪.২. ভারসাম্য দাম নির্ধারণ
Determination of Equilibrium Price

১. বাজারে বা শিল্পে নিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকলে, মোট চাহিদা ও মোট যোগানের দ্বারা পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়। দাম নির্ধারণে চাহিদা ও যোগান, কোনটির গুরুত্ব কম নয়।

২. ব্যক্তিগত চাহিদার (তালিকা বা রেখার) সমষ্টি নিয়ে বাজারের মোট চাহিদা (তালিকা বা রেখা) গঠিত হয়। মোট চাহিদা রেখার ঢাল হল ঋণাত্মক (−)। অর্থাৎ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, ক্রেতারা কম দামে বেশি পরিমাণে ও বেশি দামে কম পরিমাণে কিনতে চায়।

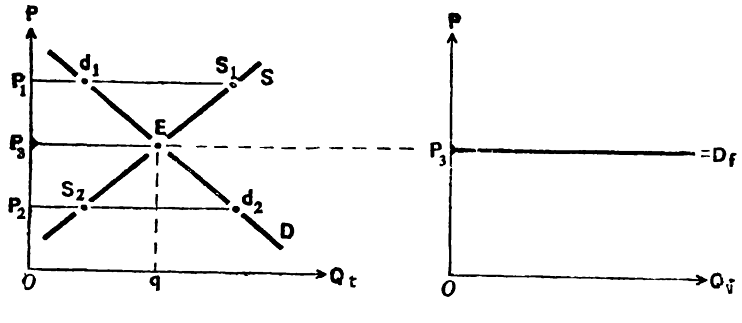
৩. উৎপাদক সংস্থাগুলির বা বিক্রেতাদের প্রান্তিক খরচগুলির (রেখাগুলির উৎপাদন বন্ধের বিন্দুর উপর দিকের অংশগুলির) সমষ্টি নিয়ে বাজারের বা শিল্পের মোট যোগান (রেখা) গঠিত হয়। যোগান রেখার ঢাল ধনাত্মক (+) অর্থাৎ, যোগানদার বা বিক্রেতারা কম দামে কম পরিমাণে ও বেশি দামে বেশি পরিমাণে পণ্যটি যোগান দিতে বা বেচতে চায়।

সারণি ৪.১ : চাহিদা, যোগান ও দাম

দাম	চাহিদার পরিমাণ	যোগানের পরিমাণ	অতিরিক্ত চাহিদা	অতিরিক্ত যোগান	দামের অবস্থা
৩ টাকা	১০০ (P_1d_1)	৫০০ (P_1s_1)	–	৪০০(d_1s_1)	কমবে ↓ (OP_1)
২ „	৩০০ (P_3E)	৩০০ (P_3E)	–	—	ভারসাম্য (OP_3)
১ „	৫০০ (P_2d_2)	১০০ (P_2s_2)	৪০০ (s_2d_2)	—	বাড়বে ↑ (OP_2)

৪. কোন একটি দামে চাহিদার চেয়ে যোগান বেশি হলে দাম কমে, চাহিদার পরিমাণ বাড়ে ও যোগানের পরিমাণ কমে। কোন একটি দামে যোগানের চেয়ে চাহিদা বেশি হলে দাম বাড়ে, চাহিদা কমে ও যোগান বাড়ে। ৪.১ সারণিতে ও ৪.১ চিত্রে এ পরিস্থিতিটি দেখান হয়েছে।

৫. চাহিদা, যোগান ও দামের এমনি ক্রমাগত ওঠানামা ঘটতে ঘটতে এক সময়ে দামটি এমন হয় যে, ঐ দামে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ পরস্পরের সমান হয়ে পড়ে। ওই দামটিকে বলা হয় ভারসাম্য দাম এবং ভারসাম্য দামের স্তরে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণে যে সমতা সৃষ্টি হয়, সেটি হল ভারসাম্য পরিমাণ। জ্যামিতির ও অর্থনীতিবিদ্‌দের ভাষায়, চাহিদা রেখার ঢাল ঋণাত্মক ও যোগান রেখার ঢাল ধনাত্মক বলে ওই রেখাদুটি একটি মাত্র বিন্দুতেই পরস্পরকে ছেদ করে। সে বিন্দুটিকে বলে অদ্বিতীয় ভারসাম্য বিন্দু। ঐ বিন্দুটি একটি অদ্বিতীয় ভারসাম্য দাম এবং চাহিদা ও যোগানের অদ্বিতীয় ভারসাম্য পরিমাণটিকে নির্দেশ করে। ঐ দামে ক্রেতারা যে পরিমাণে পণ্যটি কিনতে চায়, বিক্রেতারাও ঠিক সেই পরিমাণে পণ্যটি বেচতে চায়। এ ভারসাম্য পরিমাণটি অদ্বিতীয় এ কারণে যে, কোন ক্রেতার চাহিদা অপূর্ণ থাকে না, কোন বিক্রেতার পণ্য পড়ে থাকে না, সবটাই বিক্রি হয়ে যায়। ৪·১ সারণিতে ২ টাকা দাম ও ৪·১ চিত্রের OP_3 দামটি হল ভারসাম্য দাম এবং চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ ৩০০ বা P_3E (অর্থাৎ Oq) হল ভারসাম্য পরিমাণ।



[ক] [খ]

চিত্র ৪·১

৬. যতদিন চাহিদা ও যোগানের অবস্থার পরিবর্তন না ঘটবে ততদিন ঐ ভারসাম্য দামেই বাজারে পণ্যটির বেচাকেনা চলবে। চাহিদার বা যোগানের যে কোন একটির বা উভয়েরই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে, চাহিদা ও যোগান রেখার (অর্থাৎ মোট চাহিদা ও মোট যোগানের) স্থান পরিবর্তন ঘটবে এবং নতুন চাহিদা ও নতুন যোগান রেখা দুটি নতুন ভারসাম্য বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে নতুন ভারসাম্য দাম ও নতুন ভারসাম্য চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেবে। আবার নতুন কোন পরিবর্তন না ঘটা পর্যন্ত ঐ দামেই বাজারে বেচাকেনা চলতে থাকবে।

৭. নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতারা কেউই এককভাবে বাজারের মোট যোগানকে প্রভাবিত করতে পারে না বলে প্রত্যেক বিক্রেতাই ভারসাম্য দামটি মেনে নিতে বাধ্য হয়। এ বাজারে বিক্রেতা হচ্ছে দাম গ্রহীতা (price-taker)। বাজারে

প্রচলিত নির্দিষ্ট দামেই তাকে পণ্য বিক্রি করতে হবে—বিক্রির পরিমাণ কমই হ'ক বা বেশিই হ'ক। এ বাজারে একজন বিক্রেতা প্রচলিত দামে (অর্থাৎ দাম না কমিয়ে) চাহিদা অনুসারে যত খুশি বিক্রি করতে পারে। তাই তার কাছে ঐ দাম রেখাটি অনুভূমিক সমান্তরাল হয়ে পড়ে [৪'১ (খ) চিত্রের দাম রেখা P_3]। ঐ দাম রেখাটিই কার্যত তার কাছে পণ্যটির চাহিদা রেখায় পরিণত হয়। [৪'১ (খ) চিত্রের $P_3 = Df$ রেখা]।

৪. ৩. সময় ও ভারসাম্য
Time and Equilibrium

১. চাহিদা ও যোগান, এই দুটি শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই বাজারে পণ্যের ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয়। কিন্তু সময়ের তারতম্য অনুসারে দামের উপর চাহিদা ও যোগানের প্রভাবের হেরফের ঘটে। **সময় যত কম হবে, দামের উপর চাহিদার প্রভাব তত বেশি হবে, এবং সময় যত বেশি হবে, দামের উপর যোগানের প্রভাব তত বেশি হবে।** যোগান নির্ভর করে উৎপাদনের সংগঠন এবং কারিগরী কৌশল ও উপাদান-যোগানের উপর। ফলে, যখন ইচ্ছা তখন যোগানের পরিবর্তন ঘটানো যায় না। কারণ, চাহিদার পরিবর্তনের সাথে নিজের সামঞ্জস্য ঘটাতে যোগান বেশি সময় নেয়।

২. সময়কে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা হয়। (ক) **অত্যল্পকালীন সময় বা বাজার কাল** (market period) ঃ যে সময়ে যোগানের পরিমাণ বিন্দুমাত্র বাড়ানো বা কমানো যায় না, তা হল বাজার কাল বা অত্যল্পকালীন সময়। এই সময়ে বিক্রেতা বা উৎপাদক সংস্থাগুলির কাছে বিক্রির জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের যে মজুত-সম্ভার (stock) থাকে, তাই হল মোট যোগানের সর্বোচ্চ সীমা।

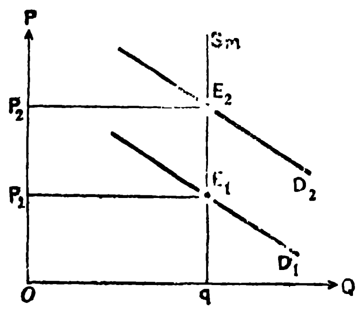
(খ) **স্বল্পকালীন সময়** (short period or short run) ঃ যে সময়ে বর্তমান উৎপাদক সংস্থাগুলি তাদের বর্তমান যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা পর্যন্ত উৎপাদনের ও যোগানের পরিমাণ বাড়াতে পারে তা হল স্বল্পকালীন সময়। এই সময়ে নতুন কোন প্রতিযোগীর বাজারে যোগ দেওয়া কিংবা বর্তমান কোন কারবারী সংস্থার পক্ষে নতুন যন্ত্রপাতি বসিয়ে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো যেমন সম্ভব নয়, তেমনি বর্তমান কোন কারবারী সংস্থার পক্ষে বাজার বা শিল্প পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া অথবা যন্ত্রপাতির পরিমাণ কমিয়ে উৎপাদন ক্ষমতা কমানোও সম্ভব নয়। এ সময়ে চাহিদার সাথে যোগানের **আংশিক সামঞ্জস্য** ঘটতে পারে।

(গ) **দীর্ঘকালীন সময়** (long period or long run) ঃ যে সময়ে বর্তমান উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি তাদের উৎপাদন ক্ষমতা ও আয়তন বাড়িয়ে বা কমিয়ে এবং বাজারে বা শিল্পে নতুন প্রতিযোগী সংস্থা প্রবেশ করে বা বাজার বা শিল্প থেকে পুরনো কারবারী সংস্থা প্রস্থান করে বাজারের মোট উৎপাদন ও যোগান বাড়াতে বা কমাতে পারে সে সময়টি হল দীর্ঘকালীন সময়। এ সময়ে চাহিদার সাথে যোগানের **সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য** ঘটতে পারে।

৩. অত্যল্পকালীন বাজারে দাম নির্ধারণ (market price determination) :

(১) অন্য যে কোন সময়ের বাজারের মতই অত্যল্পকালীন বাজারেও চাহিদা রেখা ও যোগান রেখার ছেদ বিন্দুর দ্বারা ভারসাম্য দাম ও চাহিদা-যোগানের ভারসাম্য পরিমাণ নির্ধারিত হয়। এই দামকে বলে বাজার দাম। এটা হল **অত্যল্পকালীন ভারসাম্য দাম**। এই বাজারে যোগানের পরিমাণ সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকে এবং বিক্রেতাদের হাতে যে পরিমাণে পণ্যটি রয়েছে তার সমস্তটাই তারা যে দামে পারে বিক্রি করে দিতে চায়। সুতরাং অত্যল্পকালীন বাজারে পণ্যের যোগান রেখা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপকতাহীন, সরল উল্লম্বরেখায় পরিণত হয়। ফলে, বাজার দাম প্রধানত চাহিদার উপরই নির্ভর করে। চাহিদা বেশি হলে বাজার দাম বেশি হবে, চাহিদা কম হলে বাজার দাম কম হবে। বাজার দাম বেশি হলে কারবারী সংস্থাগুলির যথেষ্ট মুনাফা হয় ; কম হলে তাদের লোকসান হতে পারে। তাই **বাজার দামের সাথে বিক্রেতাদের প্রান্তিক কিংবা গড় খরচের বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকে না**। দাম তার বেশিও হতে পারে, আবার কমও হতে পারে।

(২) ৪·২ চিত্রে বাজার দাম কি ভাবে নির্ধারিত হয় তা দেখানো হয়েছে। বিক্রেতাদের কাছে Oq পরিমাণে পণ্যটি রয়েছে। তারা এর সমস্তটাই যে দাম পাবে সেই দামেই বেচে দিতে চায়। তাই যোগান রেখা Smq একটি সরল লম্বরেখায় পরিণত হয়েছে। চাহিদা কম হলে চাহিদা রেখা হবে D_1। এটি যোগান রেখা Smq-কে E_1 বিন্দুতে ছেদ করবে। E_1 হল বাজার-ভারসাম্য বিন্দু। এ ভারসাম্য বিন্দু অনুযায়ী ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হবে OP_1 এবং ভারসাম্য চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ হবে Oq। চাহিদা যদি বেশি হয়, তাহলে চাহিদা রেখা হবে D_2। এটি যোগান রেখা Smq-কে E_2 বিন্দুতে ছেদ করবে। E_2 হবে ভারসাম্য বিন্দু। এই বিন্দু অনুসারে ভারসাম্য দাম হবে OP_2 এবং চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য পরিমাণ হবে Oq।



চিত্র ৪·২ : বাজার দাম নির্ধারণ

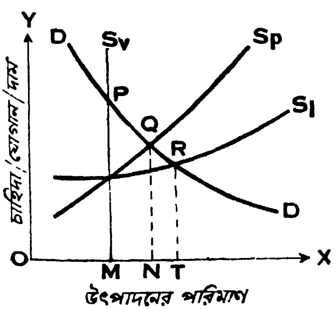
৪. স্বল্পকালীন বাজারে দাম নির্ধারণ : (ক) কিন্তু স্বল্পকালীন বাজারে (বা শিল্পে) উৎপাদক সংস্থার সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকলেও, তাদের নিজ নিজ উৎপাদন ক্ষমতার সীমার মধ্যে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী তারা উৎপাদনের পরিমাণ কমাতে বা খানিকটা বাড়াতে পারে। তাই স্বল্পকালীন বাজারে শিল্পের যোগান রেখা (অর্থাৎ মোট যোগান রেখা) অত্যল্পকালীন বাজারের যোগান রেখার মত উল্লম্ব রেখা না হয়ে, বাম দিক থেকে ডান দিকে খানিকটা খাড়াখাড়িভাবে উর্ধ্বগামী হয়। কারণ স্বল্পকালীন সময়ে উৎপাদন বাড়াতে গেলে খরচ অপেক্ষাকৃত বেশি

পড়ে। ৪·৩ চিত্রে স্বল্পকালীন বাজারের যোগান রেখা Sp ঐ রকম ধনাত্মক ঢাল নিয়ে ডান দিকে উর্ধ্বগামী হয়েছে। এবার চাহিদা রেখা DD যোগান রেখা Sp-কে Q বিন্দুতে ছেদ করে ভারসাম্য দাম QN ও চাহিদা-যোগানের ভারসাম্য পরিমাণ ON নির্ধারণ করে দিচ্ছে।

(খ) অত্যল্পকালীন বাজারের ভারসাম্য দাম (PM) এবং চাহিদা যোগানের ভারসাম্য পরিমাণের (OM) তুলনায় স্বল্পকালীন বাজারে ভারসাম্য দাম কম (QN) এবং চাহিদা-যোগানের ভারসাম্য পরিমাণ (ON) বেশি হয়। তার কারণ, এই বাজারে চাহিদার সাথে যোগান নিজের সামঞ্জস্য ঘটাতে খানিকটা সুযোগ পায়; তাতে যোগান খানিকটা বাড়তে পারে।

(গ) স্বল্পকালীন বাজারে যোগান চাহিদার সাথে খানিকটা সামঞ্জস্য ঘটাতে পারে। তাই উৎপাদক সংস্থাগুলি এ বাজারে এমন পরিমাণে উৎপাদন করে ও যোগান দেয় যাতে স্বল্পকালীন ভারসাম্য দামে তাদের প্রান্তিক খরচটা অন্তত ওঠে (অর্থাৎ দাম=প্রান্তিক খরচ) এবং সে প্রান্তিক খরচ অন্তত তাদের স্বল্পকালীন পরিবর্তনীয় গড় খরচের কম না হয় (উৎপাদন বন্ধের বিন্দুর বেশি বা অন্ততপক্ষে ঐ বিন্দুর সমান হওয়া চাই)। ঐ ভারসাম্য দাম সব উৎপাদক সংস্থার প্রান্তিক খরচের সমান হলেও কোন সংস্থার গড় খরচ তার কম হতে পারে এবং হলে তার অতিরিক্ত মুনাফা হবে ; কোন সংস্থার গড খরচ তার বেশি হতে পারে, এবং হলে তার সাময়িক লোকসান হবে। অত্যল্পকালীন বাজারের ভারসাম্য দামের সাথে প্রান্তিক বা গড় উৎপাদন খরচ, এ দু'টির কোনটিরই সম্পর্ক থাকে না।

৫. **দীর্ঘকালীন বাজারে ভারসাম্য দাম নির্ধারণ ঃ** (ক) দীর্ঘকালীন সময়ে নতুন উৎপাদক সংস্থা শিল্পে (অর্থাৎ বাজারে) প্রবেশ করতে পারে আবার পুরাতন সংস্থা কারবার গুটিয়ে নিতে পারে। তাই এ বাজারে উৎপাদক সংস্থার সংখ্যায় পরিবর্তন ঘটে। উৎপাদন সংস্থাগুলি তাদের উৎপাদন ক্ষমতাও বাড়াতে বা কমাতে পারে। সুতরাং এ বাজারে প্রতিযোগিতার দরুন ও উৎপাদক সংস্থাগুলির সংখ্যা এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতার পরিবর্তনের দ্বারা শিল্পের মোট যোগান অত্যন্ত পরিবর্তনশীল হয় ও সকলেই সর্বনিম্ন গড খরচে উৎপাদন করে ও যোগান দেয়। এবং দাম শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক সংস্থার প্রান্তিক ও গড় খরচের সমান হয়ে পড়ে। কারও যেমন কোন অতিরিক্ত মুনাফা হয় না, তেমনি লোকসানও হয় না। স্বাভাবিক মুনাফা সমেত সমস্ত খরচ উঠে আসে। তাই যোগান রেখাটির ধনাত্মক ঢাল খুব কম হয় ও একই পরিমাণ উৎপাদনে স্বল্পকালীন সময়ের তুলনায় দীর্ঘকালীন সময়ে খরচ কম পড়ে। স্বল্পকালীন সময়ের তুলনায় দীর্ঘকালীন সময়ে ভারসাম্য দাম



চিত্র ৪·৩

কম ও ভারসাম্য চাহিদা-যোগানের পরিমাণ বেশি হয়। ৪·৩ চিত্রে দেখা যাচ্ছে, চাহিদার রেখা DD দীর্ঘকালীন যোগান রেখা S1-কে স্বল্পকালীন ভারসাম্য বিন্দু Q-এর নিচে অবস্থিত R বিন্দুতে ছেদ করে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম RT ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য চাহিদা-যোগানের পরিমাণ OT নির্ধারণ করে দিয়েছে।

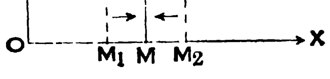
(খ) এবার অত্যল্পকালীন, স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন, এই তিনটি সময়ের তিনটি প্রতিযোগিতার বাজারের ভারসাম্য দাম ও ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণের তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে অত্যল্পকালীন বাজারের ভারসাম্য দাম সবচেয়ে বেশি (PM) ও ভারসাম্য উৎপাদন সবচেয়ে কম (OM), তুলনায় স্বল্পকালীন বাজারে ভারসাম্য দাম তার কম (QN) ও ভারসাম্য উৎপাদন তার বেশি (ON) এবং দীর্ঘকালীন বাজারে ভারসাম্য দাম সবচেয়ে কম (RT) ও ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি (OT) হয়েছে। অতএব সময় যত কম হবে ভারসাম্য দাম তত বেশি ও ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ তত কম এবং সময় যত বেশি হবে ভারসাম্য দাম তত কম ও ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ তত বেশি হবে।

৪· ৪· উৎপাদন বিধি ও দীর্ঘকালীন দাম

Laws of Returns and Long-run Price

১. শিল্পে উৎপাদনের তিনটি বিধি বা অবস্থার যে কোন একটি সক্রিয় থাকতে পারে: ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি (Law of Diminishing Returns); সমানুপাতিক উৎপাদন বিধি (Law of Constant Returns); এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বিধি (Law of Increasing Returns)।

২. ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি সক্রিয় হলে, উৎপাদন বাড়ালে প্রান্তিক খরচ ও গড় খরচ ক্রমশ বাড়ে। সুতরাং প্রতিটি উৎপাদক সংস্থার প্রান্তিক খরচ ও গড় খরচ বাড়ে এবং শিল্পের যোগান রেখা বাম দিক থেকে ডান দিকে ক্রমশ ঊর্ধ্বগামী হয়।

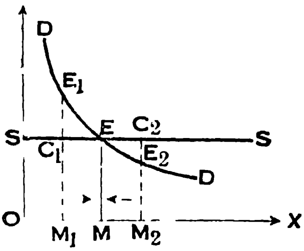


চিত্র ৪·৪

৪·৪ চিত্রে ঊর্ধ্বগামী যোগান রেখা SS শিল্পে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন ও ক্রমবর্ধমান খরচ বিধির ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই অবস্থায় চাহিদা রেখা DD এবং যোগান রেখা SS পরস্পর বিপরীতমুখী বলে একটি মাত্র বিন্দু (E)-তে পরস্পরকে ছেদ করে একটি মাত্র ভারসাম্য দাম (EM) ও একটি মাত্র ভারসাম্য উৎপাদন ও চাহিদা-যোগানের পরিমাণ (MO) নির্দিষ্ট করে দেবে এবং চাহিদা ও যোগানের অবস্থা না বদলানো পর্যন্ত তা স্থায়ী ভারসাম্য হয়ে থাকবে। ঐ দামটি ছাড়া অন্য কোন দামে স্থায়ী ভারসাম্য ঘটবে না দাম EM-এর কম হলে চাহিদা বাড়বে, যোগান কমবে। দাম EM-এর বেশি হলে চাহিদা কমবে, যোগান বাড়বে। ভারসাম্য হবে না। শেষ পর্যন্ত ভারসাম্য ঘটবে EM দামে।

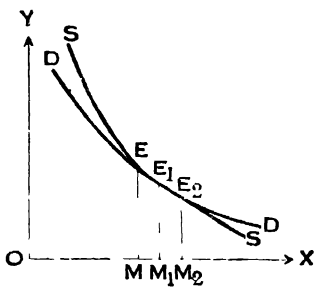
৩. শিল্পে সমানুপাতিক বা সমহার উৎপাদন বিধি চালু থাকলে উৎপাদনের

পরিবর্তনের সাথে প্রান্তিক ও গড় খরচও আগাগোড়া সমহারে বাড়বে ও কমবে। তাই যোগান রেখাটি হবে অনুভূমিক সমান্তরাল (৪·৫ চিত্রে যোগান রেখা SS)। চাহিদা রেখা (DD) যথারীতি বাম দিকে উপর থেকে ডান দিকে নিচে নামতে নামতে যোগান রেখাকে একটি মাত্র বিন্দুতে (E) ছেদ করে একটি মাত্র ভারসাম্য দাম (EM) ও একটি মাত্র ভারসাম্য উৎপাদন ও চাহিদার পরিমাণ (OM) স্থির করে দেবে। দাম তার কম বা বেশি হলে, চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য ঘটবে না। একবার ভারসাম্য দাম প্রতিষ্ঠিত হলে, যতক্ষণ পর্যন্ত না চাহিদা ও যোগানের যে কোন একটির বা উভয়েরই অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে, ততক্ষণ ঐ ভারসাম্য দাম স্থায়ী হবে।



চিত্র ৪·৫

৪. শিল্পে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বিধি চালু হলে উৎপাদন বাড়ালে গড ও প্রান্তিক খরচ কমবে এবং উৎপাদন কমালে গড় ও প্রান্তিক খরচ বাড়বে। অর্থাৎ ক্রমহ্রাসমান খরচ বিধি সক্রিয় হবে। এই পরিস্থিতিতে, চাহিদা রেখা (DD) ও যোগান রেখা (SS) উভয়েই বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হবে (চিত্র ৪·৬)। দুটি রেখাই ডান দিকে নিম্নগামী হতে গিয়ে একটি মাত্র বিন্দুতে কিংবা একাধিক বিন্দুতে ছেদ করতে পারে অথবা কিছু দূর পর্যন্ত পরস্পর মিশে যেতে পারে (চিত্র ৪·৬)। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে একাধিক ভারসাম্য বিন্দুর সৃষ্টি হতে পারে। তাহলে কোন্ বিন্দুটি ভারসাম্য বিন্দু হয়ে ভারসাম্য দাম ও উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করবে (৪·৬ চিত্রে ভারসাম্য দাম EM, E_1M_1, ও E_2M_2 এবং ভারসাম্য পরিমাণ OM, OM_1 এবং OM_2) তা আগে থেকে বলা যায় না। তা ছাড়া, এই পরিস্থিতিতে নিখুঁত প্রতিযোগিতাও টিকতে পারে না। কারণ, প্রতিযোগী উৎপাদক সংস্থাগুলির মধ্যে যাদের প্রান্তিক ও গড খরচ কম তারা প্রতিযোগিতা করে ক্রমশ দাম কমাতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত যার প্রান্তিক ও গড খরচ সবচেয়ে কম সেই সংস্থাটি সবচেয়ে কম দামে পণ্যটি বিক্রি করে অন্য সকলকে বাজার থেকে হটিয়ে দিয়ে বাজারটি দখল করে নিজে একচেটিয়া কারবারীতে পরিণত হবে। অর্থাৎ নিখুঁত প্রতিযোগিতায় ক্রমবর্ধমান উৎপাদনবিধি চালু হলে শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা নষ্ট হয়ে একচেটিয়া কারবারের উৎপত্তি হয়।



চিত্র ৪·৬

৪. ৫. চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন ও ভারসাম্য

Changes in Demand and Supply and Equilibrium

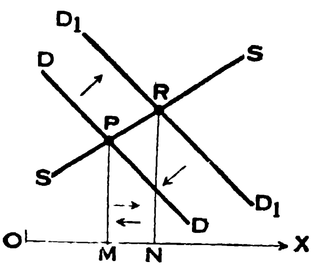
১. চাহিদা ও যোগানের সুনির্দিষ্ট অবস্থায় বাজারে যে ভারসাম্য দেখা দেয়,

চাহিদা অথবা যোগানের যে কোনটির কিংবা উভয়েরই পরিবর্তন ঘটলে সে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে বাজারের নতুন অবস্থা অনুযায়ী নতুন দামে নতুন ভারসাম্য দেখা দেয়।

২. ভোগীদের আয় ও ব্যয়, রুচি ও পছন্দ, বিকল্প পণ্যের দাম, জনসংখ্যা, টাকার যোগান, কর, দামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান প্রভৃতির পরিবর্তনের ফলে চাহিদার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। চাহিদার অবস্থার পরিবর্তন হলে চাহিদার হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হতে পারে। চাহিদা কমে গেলে চাহিদা রেখা বাম দিকে সরে যাবে। চাহিদা বেড়ে গেলে চাহিদা রেখা ডান দিকে সরে যাবে।

৩. উপকরণ বা উপাদান-সেবাগুলির দক্ষতা, দাম, কারিগরী কৌশল ও উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন, উৎপাদকদের বাজেট রেখার পরিবর্তন প্রভৃতির ফলে যোগানের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তার ফলে যোগান কমে যেতে অথবা বেড়ে যেতে পারে। যোগান কমে গেলে যোগান রেখা বাম দিকে সরে যায়। যোগান বেড়ে গেলে যোগান রেখা ডান দিকে সরে যায়।

৪. **কেবল চাহিদার পরিবর্তন:** (ক) চাহিদা বাড়লে—নতুন চাহিদা রেখা (৪·৭ চিত্রে চাহিদা রেখা D_1D_1) আগেকার চাহিদা রেখার (৪·৭ চিত্রে চাহিদা রেখা DD) ডান দিকে সরে যাবে। যোগান রেখা অপরিবর্তিত থাকছে বলে ধরে নিলে, এবার যোগান রেখায় (৪·৭ চিত্রে যোগান রেখা SS) উচ্চতর একটি বিন্দুতে (৪·৭ চিত্রে R বিন্দু) নতুন চাহিদা রেখা ছেদ করবে। ফলে নতুন ভারসাম্য দাম (৪·৭ চিত্রে RN) আগের ভারসাম্য দামের (৪·৭ চিত্রে PM) চেয়ে বেশি হবে। নতুন ভারসাম্য চাহিদা-যোগান উৎপাদনের পরিমাণও আগের চেয়ে (৪·৭ চিত্রে OM) বেশি হবে (৪·৭ চিত্রে ON)। অর্থাৎ, যোগান অপরিবর্তিত থেকে চাহিদা বাড়লে, ক্রেতারা আগের চেয়ে বেশি দামে, আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে পণ্যটি কিনবে। তবে, যোগান অপরিবর্তিত থাকলেও, যোগান রেখা যদি স্থিতিস্থাপক হয় (অর্থাৎ যোগান রেখার ঢাল কম হলে) চাহিদার বৃদ্ধিতে দামের বৃদ্ধি কিছুটা কম হবে। তা না হলে, দামের বৃদ্ধি কিছুটা বেশি হবে।

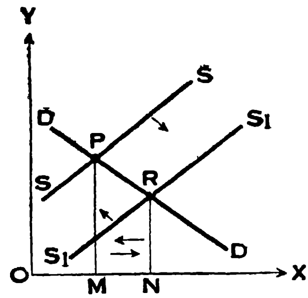


চিত্র ৪·৭

(খ) চাহিদা কমে গেলে—আগের চাহিদা রেখার (ধরা যাক, ৪·৭ চিত্রে চাহিদা রেখা D_1D_1) বাম দিকে নতুন চাহিদা রেখা (ধরা যাক, ৪·৭ চিত্রে চাহিদা রেখা DD) সরে যাবে। এবার অপরিবর্তিত যোগান রেখার (৪·৭ চিত্রে যোগান রেখা SS) নিচের কোন বিন্দুতে নতুন চাহিদা রেখাটি ছেদ করবে (৪·৭ চিত্রে P বিন্দু)। ফলে নতুন ভারসাম্য দাম (৪·৭ চিত্রে PM) আগের ভারসাম্য দামের চেয়ে (৪·৭ চিত্রে RN) কম হবে। নতুন ভারসাম্য চাহিদা-যোগান উৎপাদনের পরিমাণ (৪·৭ চিত্রে OM) আগের ভারসাম্য পরিমাণের চেয়ে (৪·৭ চিত্রে ON) কম হবে।

অর্থাৎ যোগান অপরিবর্তিত থেকে যদি চাহিদা কমে যায়, তাহলে ক্রেতারা আগের চেয়ে কম দামে, আগের চেয়ে কম পরিমাণে পণ্যটি কিনবে। যোগান অপরিবর্তিত থাকলেও, যদি তা স্থিতিস্থাপক হয় তাহলে দামের বৃদ্ধি কম হবে। তা না হলে, দামের বৃদ্ধি বেশি হবে।

৫. **কেবল যোগানের পরিবর্তন**ঃ (ক) যোগান বাড়লে—নতুন যোগান রেখা (৪·৮ চিত্রে S_1S_1 রেখা) আগের যোগান রেখার (৪·৮ চিত্রে SS রেখা) ডানদিকে সরে যাবে এবং অপরিবর্তিত চাহিদা রেখার (৪·৮ চিত্রে DD রেখা) নিচের কোন বিন্দুতে (৪·৮ চিত্রে R বিন্দু) ছেদ করে নতুন ভারসাম্য দাম (৪·৮ চিত্রে RN) ও নতুন ভারসাম্য চাহিদা-যোগান ও উৎপাদনের পরিমাণ (৪·৮ চিত্রে ON) নির্ধারণ করে দেবে। নতুন ভারসাম্য দামটি আগের ভারসাম্য দামের চেয়ে (৪·৮ চিত্রে PM) কম হবে ও নতুন ভারসাম্য পরিমাণটি আগের ভারসাম্য পরিমাণের চেয়ে (৪·৮ চিত্রে OM) বেশি হবে। অর্থাৎ চাহিদা অপরিবর্তিত থেকে যোগান বাড়লে, ক্রেতারা আগের চেয়ে কম দামে, আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে কিনবে। চাহিদা অপরিবর্তিত থাকলেও, তার স্থিতিস্থাপকতা বেশি হলে (অর্থাৎ চাহিদা রেখার ঢাল কম হলে) দাম সামান্য কমবে। তা না হলে দাম বেশি কমবে।



চিত্র ৪·৮

(খ) যোগান কমলে—নতুন যোগান রেখা (ধরা যাক ৪·৮ চিত্রে SS রেখা) আগের যোগান রেখার (৪·৮ চিত্রে S_1S_1 রেখা) বাম দিকে সরে যাবে এবং অপরিবর্তিত চাহিদা রেখার (৪·৮ চিত্রে DD রেখা) উপর দিকে কোন বিন্দুতে (৪·৮ চিত্রে P বিন্দু) ছেদ করে, নতুন ভারসাম্য দাম (৪·৮ চিত্রে PM) ও নতুন ভারসাম্য চাহিদা-যোগান উৎপাদনের পরিমাণ (৪·৮ চিত্রে OM) স্থির করে দেবে। নতুন ভারসাম্য দামটি (PM) আগের ভারসাম্য দামের (RN) চেয়ে বেশি এবং নতুন ভারসাম্য পরিমাণটি (OM) আগের ভারসাম্য পরিমাণের (ON) চেয়ে কম হবে। অর্থাৎ, চাহিদা অপরিবর্তিত থেকে যোগান কমে গেলে ক্রেতারা আগের চেয়ে বেশি দামে আগের চেয়ে কম পরিমাণে কিনবে। চাহিদা অপরিবর্তিত থাকলেও, তা যদি স্থিতিস্থাপক হয়, তাহলে দাম বেশি বাড়বে না। তা না হলে দাম বেশি বাড়বে।

৬. **সুতরাং চাহিদার কিংবা যোগানের কিংবা উভয়ের পরিবর্তনে, পুরনো ভারসাম্য নষ্ট হয়ে নতুন ভারসাম্য রচিত হয়। কিন্তু নতুন ভারসাম্য দাম ও ভারসাম্য পরিমাণ আগের তুলনায় বেশি হবে এবং হলে কতটা বেশি হবে না কি কম হবে এবং হলে কতটা কম হবে তা নির্ভর করে —(১) চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের পারস্পরিক অনুপাতের উপর; এবং (২) চাহিদা ও যোগানের তুলনামূলক স্থিতিস্থাপকতার উপর।**

৪. ৬. কারবারী সংস্থার ভারসাম্য
Equilibrium of the Firm

(ক) **স্বল্পকালীন ভারসাম্য ঃ** ১. নিখুঁত প্রতিযোগিতায় যে কোন কারবারী সংস্থার কাছে তার দ্রব্যের চাহিদা রেখা হল সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। অর্থাৎ মোট চাহিদা ও মোট যোগানের দ্বারা নির্ধারিত দামে সে যে কোন পরিমাণে তার উৎপন্ন বিক্রি করতে পারে। বেশি পরিমাণে বেচতে হলে তাকে দাম কমাতে হয় না। তাই তার উৎপন্নের ও বিক্রির পরিমাণ যাই হোক, তার কাছে সর্বদা **দাম = গড় আয় = প্রান্তিক আয়** [P = AR = MR] হয়ে থাকে।

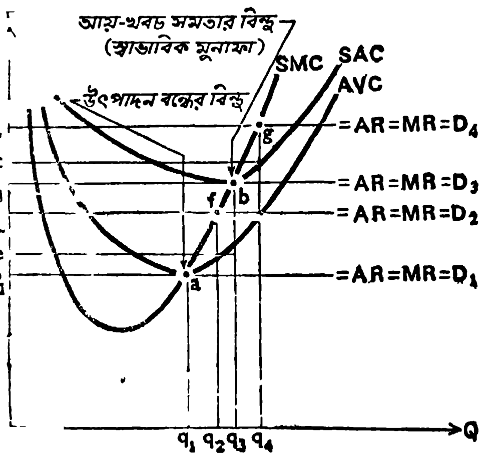
২. কারবারী সংস্থাগুলির লক্ষ্য সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা উপার্জন। মোট খরচের তুলনায় মোট বিক্রয়লব্ধ আয় যত বেশি হবে, তার মুনাফার পরিমাণও তত বেশি হবে। বাজার দাম বেশি হলে মোট খরচের তুলনায় মোট আয় বেশি হবে। তখন তারা এমন পরিমাণে পণ্যটি উৎপাদন করে যাতে মুনাফা সর্বাধিক হয়। সেটা ঘটলে, যতক্ষণ পর্যন্ত দামের এবং তার উৎপাদন খরচের অবস্থার পরিবর্তন না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কারবারী সংস্থাটি ঐ দামে ঐ পরিমাণই উৎপাদন করতে থাকে, তা আর কমাতে বা বাড়াতে চায় না। এই অবস্থাটাকে বলে কারবারী সংস্থার **ভারসাম্যের অবস্থা**। এবং এটা হল তার **সর্বাধিক মুনাফায় ভারসাম্যের অবস্থা**। কিন্তু স্বল্পকালীন সময়ে বাজার দামের উপর কোন কারবারী সংস্থারই হাত থাকে না। বাজার দাম মেনে নিয়ে সে দামেই তাকে বেচতে হয়। দাম বেশি না হয়ে যদি কম হয়, সে দামে পণ্য বিক্রি করে মুনাফা দূরে থাকুক, উৎপাদনের পুরো খরচ তার নাও উঠতে পারে। তখন সে চেষ্টা করে লোকসানের পরিমাণটা ন্যূনতম করতে। দাম এবং তার উৎপাদন খরচ অনুযায়ী তখন এমন পরিমাণে উৎপাদন করা সে স্থির করে, যাতে তার লোকসান ন্যূনতম হয়। সেটা ঘটলে, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ দামের পরিবর্তন না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ দামে ঐ পরিমাণেই উৎপাদন ও বিক্রি করতে থাকে। এটাও তার **আরেক ভারসাম্যের অবস্থা**, তবে **ন্যূনতম লোকসানে ভারসাম্যের অবস্থা**। আবার এমনও হতে পারে যে, বাজার দামে তার উৎপাদন বিক্রি করে সে তার পুরো উৎপাদন খরচ উঠিয়ে নিতে পারছে, মোট বিক্রয়লব্ধ আয় ও মোট খরচ পরস্পরের সমান হচ্ছে। অতিরিক্ত মুনাফা অর্থাৎ মোট খরচের অতিরিক্ত আয় কিছু হচ্ছে না। এটা হল স্বল্পকালীন সময়ে কারবারী সংস্থার **আরেক রকম ভারসাম্যের অবস্থা, স্বাভাবিক মুনাফায় ভারসাম্যের অবস্থা**। এটা অবশ্য স্বল্পকালীন সময়ে কদাচিৎ ঘটে।

৩. এভাবে, যে বাজার দামে সমস্ত কারবারী সংস্থা স্বল্পকালীন ভারসাম্যে পৌঁছায় সে দামটা হয়ে দাঁড়ায় **শিল্পের স্বল্পকালীন ভারসাম্য** দাম। ঐ দামে তখন কোন সংস্থা তার উৎপাদন খরচ অনুযায়ী সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা লাভ করে, কোন সংস্থা তার উৎপাদন খরচ অনুযায়ী ন্যূনতম লোকসান দেয়, কিন্তু সকলেই স্বল্পকালীন সময়ের ভারসাম্যে থাকে।

৪. বাজার দাম অনুযায়ী কি পরিমাণে উৎপাদন করলে সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা লাভ করা যাবে কিংবা লোকসানের পরিমাণ ন্যূনতম হবে এবং আদৌ উৎপাদন করা উচিত হবে কিনা, তা কারবারী সংস্থা তার **প্রান্তিক খরচ, গড় খরচ** এবং **গড় পরিবর্তনীয় খরচের** সাহায্যে স্থির করে। স্থির খরচ বা গড় স্থির খরচ তার বিবেচনায় স্বল্পকালীন সময়ে প্রাধান্য পায় না। কারণ, দাম কম হলে, সে পুরো স্থির খরচটা লোকসান দিতেও রাজী থাকে। তবে, স্বাভাবিকভাবেই সে স্থির খরচের যতটা সম্ভব তোলার চেষ্টা অবশ্যই করে। উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখলেও স্থির খরচটা উৎপাদককে বাধ্যতামূলকভাবেই বহন করতে হয়। তার অর্থ হল, উৎপাদন বন্ধ রাখলে তার লোকসান শুধু স্থির খরচ। কিন্তু উৎপাদন করে যেতে থাকলে তাকে পরিবর্তনীয় খরচ বহন করতে হয়। সুতরাং উৎপাদন বন্ধ না রেখে, উৎপাদন করা হলে তাকে পরিবর্তনীয় খরচের সবটা তুলতেই হবে। এটা সম্ভব না হলে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়াই তার পক্ষে যুক্তিযুক্ত। তাতে লোকসান হবে কম, শুধু স্থির খরচটাই হবে তার লোকসানের পরিমাণ। তাই **দাম যদি গড় পরিবর্তনীয় খরচের কম হয় সে উৎপাদন বন্ধ করে দেয়।** দামটা অন্তত গড় পরিবর্তনীয় খরচের সমান না হলে সে উৎপাদন করে না। **দাম যদি গড় পরিবর্তনীয় খরচের বেশি হয়,** তাহলে সে-দামে বিক্রি করলে গড় পরিবর্তনীয় খরচ ছাড়াও গড় স্থির খরচ কিছুটা (অর্থাৎ পরিবর্তনীয় খরচের সবটা এবং স্থির খরচের খানিকটা) উঠবে। **দাম যদি গড় খরচের সমান হয়** তাহলে সে দামে পরিবর্তনীয় এবং স্থির খরচের সবটা উঠে আসবে এবং তাতে তার বিক্রয়লব্ধ আয় ও মোট খরচ পরস্পরের সমান হবে এবং উৎপাদক স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করবে। **দাম যদি গড় খরচের বেশি হয়** তাহলে তার সব খরচ উঠেও অতিরিক্ত অর্থাৎ অস্বাভাবিক মুনাফা হবে। কিন্তু দামটা গড় পবিবর্তনীয় খরচের সমান বা বেশি হলে, কারবারী সংস্থা কতটা উৎপাদন করবে তা স্থির কবতে গিয়ে সাহায্য নেয় **প্রান্তিক খরচের**। অতিরিক্ত একটি একক উৎপাদন করতে যে খরচ পড়ে সেটাই হল প্রান্তিক খরচ। প্রান্তিক খরচ যদি দামের কম হয় তবে সেটা উৎপাদকের পক্ষে লাভজনক। কারণ প্রতিটি অতিরিক্ত একক উৎপাদন করতে যা খরচ পড়ছে অতিরিক্ত এককের দাম ঐ খরচ থেকে বেশি হওয়ার ফলে উৎপাদক সংস্থার অতিরিক্ত আয়ের পরিমাণও বাড়ছে। স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদক তার উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে চাইবে। উৎপাদনের পরিমাণ সে যত বাড়াবে, তার প্রান্তিক খরচও তেমনি বাড়তে থাকবে। অবশেষে উৎপাদনের পরিমাণ এমন একটা স্তরে আসে যেখানে **প্রান্তিক খরচ = দাম = প্রান্তিক আয়**। এ স্তরে পৌঁছবার পর উৎপাদন বাড়াবার কোন যুক্তি থাকে না। কারণ তাতে তার প্রান্তিক খরচ প্রান্তিক আয়ের বেশি হয়ে যায় ও মোট বিক্রয়লব্ধ আয় কমে যায়। সুতরাং, (১) প্রতিটি কারবারী সংস্থা **দাম ও প্রান্তিক খরচ** অনুযায়ী যে পরিমাণ উৎপাদন করলে দাম = প্রান্তিক খরচ = প্রান্তিক আয় হয় ঠিক সে পরিমাণই উৎপাদন করে; (২) যে পরিমাণ উৎপাদনে প্রান্তিক খরচ ক্রমবর্ধমান অবস্থায় (↑) দামের সমান হয়

(=প্রান্তিক আয়), সেই পরিমাণে উৎপাদন করা সে স্থির করে ; (৩) ঐ অবস্থায় প্রান্তিক খরচ [যেটা ক্রমবর্ধমান অবস্থায় (↑) = দাম = প্রান্তিক খরচ] যদি গড় পরিবর্তনীয় খরচের বেশি (> AVC) কিন্তু গড় খরচের কম (< AC) হয় তাহলে তার ন্যূনতম লোকসানে ভারসাম্য ঘটে ; (৪) ঐ অবস্থায় প্রান্তিক খরচ [যেটা ক্রমবর্ধমান অবস্থায় (↑) = দাম = প্রান্তিক আয়] যদি গড খরচের সমান (= AC) হয় তাহলে স্বল্পকালীন স্বাভাবিক মুনাফায় তার ভারসাম্য ঘটে ; (৫) ঐ অবস্থায় প্রান্তিক খরচ [যেটা ক্রমবর্ধমান অবস্থায় (↑) = দাম = প্রান্তিক আয়] যদি গড খরচের বেশি (> AC) হয়, তাহলে সর্বাধিক সম্ভব মুনাফায় তার ভারসাম্য ঘটে।

৫. ৪·৯ চিত্রে বাজার দামের সাথে কোন কারবারী সংস্থা কি ভাবে এবং কোথায় তার উৎপাদনের পবিমাণেব সামঞ্জস্য ঘটায় এবং তার মধ্য দিয়ে স্বল্পকালীন ভারসাম্যে পৌছায় তা দেখান হল। চাবটি কল্পিত বাজার দাম P_1, P_2, P_3, P_4 অনুযায়ী নিখুঁত প্রতিযোগিতায় কারবাবী সংস্থার কাছে তার পণ্যের চাহিদা রেখাগুলি সবই অনুভূমিক অক্ষরেখা OQ-এর সমান্তরাল। সেই কারণে, এই চাবটি দামের প্রত্যেকটিতেই দাম = প্রান্তিক আয় = গড আয়। SMC হল তার স্বল্পকালীন প্রান্তিক খরচ রেখা, AVC হল তার গড পরিবর্তনীয় খরচ রেখা এবং SAC হল তার গড খবচ রেখা। a বিন্দু হল তার গড় পরিবর্তনীয় খরচ রেখা AVC-র সর্বনিম্ন বিন্দু। এই বিন্দুতে তাব প্রান্তিক খবচ রেখা SMC গড় পরিবর্তনীয় খরচ বেখা AVC-কে নিচে থেকে ছেদ করে উপরে উঠেছে। সুতরাং এখানে প্রান্তিক খরচ ক্রমবর্ধমান (↑) = গড পরিবর্তনীয় খরচ (SMC ↑ = AVC)। এই বিন্দুতে দাম রেখা P_1 স্পর্শক রূপে গড পরিবর্তনীয় খরচ রেখা (AVC)-কে স্পর্শ করেছে। সুতরাং এখানে Price = MC ↑ = AVC। দাম যদি OP_1 হয় তাহলে সে Oq_1 পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করলেও করতে পাবে এবং করলে শুধু তার



চিত্র ৪·৯ : কারবারী সংস্থার ভারসাম্য

পরিবর্তনীয় খরচ উঠবে কিন্তু স্থির খরচ একটুও উঠবে না। এখানে তার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় P_1Oq_1a ক্ষেত্র ($= OP_1$ দাম $\times Oq_1$ পরিমাণ উৎপন্ন) = মোট পরিবর্তনীয় খরচ (P_1Oq_1a ক্ষেত্র = গড় পরিবর্তনীয় খরচ $aq_1 \times Oq_1$ পরিমাণ উৎপন্ন)। এই দামে উৎপাদন করলে বাজারে তার পণ্যটি শুধু চালু রাখার জন্যই

সে উৎপাদন করবে। কিন্তু দাম যদি OP_1-এর কম হয় তাহলে সে মোটেই উৎপাদন করবে না। তাই a বিন্দুটিকে **উৎপাদন বন্ধের বিন্দু** বলে।

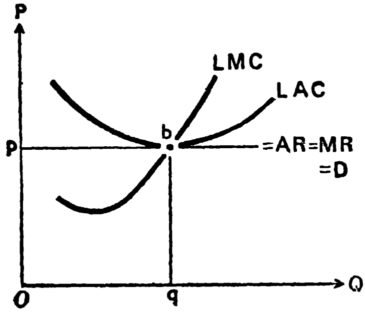
৬. দাম বেড়ে যদি OP_2 হয়, তাহলে কারবারী সংস্থাটি উৎপাদনের পরিমাণ Oq_2 পর্যন্ত বাড়াবে। কারণ, ঐ পরিমাণ উৎপাদন করলে উৎপাদনের যতটুকু পর্যন্ত প্রান্তিক খরচ দামের কম থাকে ততটুকু উৎপাদন করে কম প্রান্তিক খরচের পুরো সুবিধাটা আদায় করে নেওয়া যায়। তার পরে অবশ্য প্রান্তিক খরচ বেড়ে দামের (এবং প্রান্তিক আয়ের) সমান হয় ($SMC\uparrow = P = MR$)। এই পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রি করায় তার মোট বিক্রয় লব্ধ আয় হবে দাম $OP_2 \times$ উৎপন্ন Oq_2। কিন্তু তার মোট পরিবর্তনীয় খরচ হবে গড পরিবর্তনীয় খরচ $eO \times$ উৎপন্ন Oq_2। সুতরাং সে মোট পরিবর্তনীয় খরচের চেয়ে $P_2e \times$ উৎপন্ন Oq_2 পরিমাণ বেশি বিক্রয়লব্ধ আয় পাচ্ছে। এটা হল স্থির খরচের একটা অংশ। পুরো স্থির খরচ এই দামে উঠছে না। সুতরাং OP_2 দামে Oq_2 পরিমাণ উৎপাদন করে সে যে ভারসাম্যে পৌঁছেছে সেটা হল তার **ন্যূনতম লোকসানের ভারসাম্য**। এই দামে সে যদি Oq_2 পরিমাণের কম উৎপাদন করে তাতে যেমন তার লোকসানটা বেশি হবে, তেমনি Oq_2 পরিমাণের বেশি উৎপাদন করলেও তার লোকসানটা বেশি হবে। আর যদি সে এই দামে উৎপাদন বন্ধই করে দেয় তাহলে লোকসান আরও বেশি হবে। কারণ তখন তাকে পুরো স্থির খরচ লোকসান দিতে হবে, আর এখন সে তবু স্থির খরচের খানিকটা তুলতে পারছে। দাম ভবিষ্যতে বাড়বে এই আশায় সে এই ন্যূনতম লোকসান দেবে এবং যতদিন দাম না বদলাচ্ছে ততদিন সে এই পরিমাণই উৎপাদন ও বিক্রি করবে।

৭. দাম যদি বেড়ে OP_3 হয় তাহলে সেও উৎপাদনের পরিমাণ Oq_3 পর্যন্ত বাড়াবে। কারণ ঐ পরিমাণ উৎপন্নের প্রান্তিক খরচ (ক্রমবর্ধমান অবস্থায়) দামের ও প্রান্তিক আয়ের সমান হয়েছে ($P = MC\uparrow = SAC$)। Oq_3 পরিমাণ উৎপন্নের মোট বিক্রয়লব্ধ আয় (= দাম $OP_3 \times$ উৎপন্ন Oq_3) = মোট খরচ (= গড় খরচ $bq_3 \times$ উৎপন্ন Oq_3)। OP_3 দামে Oq_3 উৎপাদন ও বিক্রি করে মোট স্থির খরচ এবং মোট পরিবর্তনীয় খরচ উঠে আসছে এবং এর মধ্যেই উদ্যোক্তার প্রাপ্য স্বাভাবিক মুনাফা ধরা রয়েছে বলে, OP_3 দামে Oq_3 উৎপন্নের ভারসাম্যকে স্বল্পকালীন সময়ের **স্বাভাবিক মুনাফায় ভারসাম্য বলে**। **স্বল্পকালীন সময়ে** এই ধরনের ভারসাম্য অবশ্য কদাচিৎ ঘটে। OP_3 দামে এই Oq_3 পরিমাণ উৎপাদনেই সর্বাধিক সম্ভব স্বাভাবিক মুনাফা হচ্ছে।

৮. দাম যদি বেড়ে Op_4 হয়, তাহলে কারবারী সংস্থাটি উৎপন্নের পরিমাণ Oq_4 পর্যন্ত বাড়াবে, তার বেশি নয়। কারণ, ঐ পরিমাণ উৎপন্নের প্রান্তিক খরচ = দাম (= প্রান্তিক আয়)। এখানে মোট বিক্রয় লব্ধ আয় (= দাম $OP_4 \times$ উৎপন্ন Oq_4) > মোট উৎপাদন খরচ (= গড় খরচ $Oc \times$ উৎপন্ন Oq_4)। সুতরাং এখানে মোট স্থির খরচ এবং মোট পরিবর্তনীয় খরচ উঠেও (স্বাভাবিক মুনাফার)

মুনাফা ভোগ করবে না। সকলেই কেবল স্বাভাবিক মুনাফা (যা গড় খরচের অন্তর্ভুক্ত) পাবে। বাজার দামটি শেষ পর্যন্ত ওঠানামার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকালীন সময়ে এই স্তরে পৌঁছালে তা **দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম** (long-run normal price) বলে গণ্য হয়। তখন কারবারী সংস্থাগুলিও **দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে পৌঁছেছে** বলা যায়।

৭. ৪·১০ চিত্রে একটি কারবারী সংস্থার দীর্ঘকালীন ভারসাম্য উৎপন্ন ও দামের ছবি দেওয়া হয়েছে। Op হল দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম। Oq পরিমাণ উৎপন্নের গড় খরচ bq হল দাম Op-র সমান। এই পরিমাণ উৎপন্নে সংস্থাটির মোট বিক্রয়লব্ধ আয় (= দাম Op × উৎপন্ন Oq) = মোট খরচ (= গড় খরচ bq × উৎপন্ন Oq)। অতএব অতিরিক্ত মুনাফা হল শূন্য (0)। এইটি হল কারবারী সংস্থার দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের অবস্থা। একবার এই ভারসাম্যে পৌঁছালে, যতদিন না চাহিদা বা যোগানে নতুন কোন পরিবর্তন ঘটছে ততদিন এই ভারসাম্যটি স্থায়ী হবে। এবং ততদিন কোন সংস্থাই তাব উৎপন্নের পরিমাণে কোন পবিবর্তন ঘটাতে রাজী হবে না। কারণ এই অবস্থাতেই সে সর্বাধিকসম্ভব মুনাফা ভোগ করছে; উৎপন্নের পরিমাণ বাড়ালে বা কমালে তাব মুনাফা সর্বাধিক থাকবে না।



চিত্র ৪·১০ : কারবারী সংস্থার দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

৮. **শিল্পের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য :** যখন নিখুঁত প্রতিযোগিতায় শিল্পের অন্তর্গত সমস্ত কারবারী সংস্থাই ন্যূনতম গড় খরচে উৎপাদন ও গড় খরচের সমান দামে বিক্রি করে তখন প্রতিটি সংস্থাই দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে পৌঁছায়, প্রত্যেকের উৎপন্নের পরিমাণ তখন স্থিতিশীল হয়। তখন গোটা শিল্পেব উৎপন্নের পরিমাণও স্থিতিশীল হয়, শিল্পটিও তখন ভারসাম্যে পৌঁছায়। তখন তার উৎপন্নের পরিমাণ বা মোট যোগানের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে না। হ্রাস বা বৃদ্ধির কোন কারণও থাকে না। ন্যূনতম গড় খরচে উৎপন্নের পরিমাণকে 'কাম্য উৎপন্ন' (optimum output) বলে। এটা হল দক্ষতার পরিচায়ক। ভোগীরা তখন বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতায় সর্বনিম্ন দামে পণ্য কিনতে ও ভোগ করতে পারে। এর অর্থ, ভারসাম্য উৎপন্নের পরিমাণটি উৎপাদন করতে সমাজের ন্যূনতম পরিমাণ উপাদান সেবা-সমষ্টি খরচ হয়।

তবে তার অর্থ এই নয় যে, কারবারী সংস্থাগুলি জেনেশুনে ইচ্ছে করে তা করে। তারা বাজার দাম ও উৎপাদন খরচের পরিস্থিতিতে প্রতিযোগিতার দ্বারা বাধ্য হয়ে সর্বাধিক মুনাফা উপার্জনের তাগিদে পরিচালিত হয়েই ন্যূনতম খরচে কাম্য উৎপন্নের পরিমাণটি উৎপাদন করে। তারা যদি তা না করে তাহলে তাদের আর্থিক লোকসানই হবে।

৭. বাজার দাম এবং স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দামের তুলনাঃ

বাজার দাম	স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম	দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম
১. এটি হল অতি অল্পকালীন বাজারে চাহিদা ও যোগানের ক্ষণ-স্থায়ী ভারসাম্য দাম।	১. এটি হল বাজারের স্বল্পকালীন ভারসাম্য দাম।	১. এ হল বাজারের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম।
২. এর সাথে উৎপন্নের প্রান্তিক ও গড় খরচের বা গড় পরিবর্তনীয় খরচের কোন সম্পর্ক নেই। তাই এটি উৎপাদন খরচের খুব বেশি বা অনেক কমও হতে পারে।	২. এটি স্বল্পকালীন প্রান্তিক খরচের সমান হলেও গড় পরিবর্তনীয় খরচের কম হয় না এবং গড় খরচের কম বা বেশি হতে পারে।	২. এটি দীর্ঘকালীন প্রান্তিক খরচ ও দীর্ঘ-কালীন ন্যূনতম গড় খরচের সমান হয়। তার বেশিও নয়, কমও নয়।
৩. এর উপর যোগানের প্রভাব নেই বললেই হয়। চাহিদার প্রভাব সর্বপ্রধান।	৩. এর উপর চাহিদার প্রভাবের পাশাপাশি যোগানেরও খানিকটা প্রভাব খাটে।	৩. এর উপর যোগানের প্রভাবই সব চেয়ে বেশি।
৪. এটি হল বাস্তব দাম। পণ্য সর্বদা এই দামেই বিক্রি হয়।	৪. বাস্তবে স্বল্পকালীন দাম বলে আলাদা কোন দাম নেই। বাজার দাম ওঠানামার মধ্য দিয়ে স্বল্পকালীন সময়ে ক্রমশ স্বল্পকালীন প্রান্তিক খরচের সমান ও গড় পরিবর্তনীয় খরচের সমান বা তার বেশি এবং স্বল্পকালীন গড় খরচের কম, সমান বা তার বেশি হয়ে যখন সংশ্লিষ্ট উৎপন্নের পরি-মাণের স্থিতি ঘটায় বা প্রায় ঐ অবস্থার কাছা-কাছি আসে তাকে স্বল্প-কালীন স্বাভাবিক দাম বলে গণ্য করা হয়।	৪. এটি কখনও বাস্তবে দেখা দেয় না। কারণ বাস্তব অবস্থা সর্বদাই পরিবর্তনশীল। তবে, বাজার দামের গতিটা দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দামের অর্থাৎ দীর্ঘকালীন ভারসাম্য স্তরের দিকেই থাকে।

একচেটিয়া বাজার
Market Under Monopoly

৪. ৭. একচেটিয়া কারবারের উৎপত্তির কারণ
Causes of Monopoly

বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজার বলতে শিল্পে একটি মাত্র উৎপাদক ও বিক্রেতা কারবারী সংস্থার অস্তিত্ব বোঝায়। বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজারের উদ্ভবের কারণ হল—(১) এই বাজারে নতুন প্রতিযোগী সংস্থার প্রবেশের পথে এমন বাধা থাকে যা পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন। এবং (২) একচেটিয়া কারবারী সংস্থাটির উৎপন্ন দ্রব্যটির সন্তোষজনক বিকল্প থাকে না। যে সব কারণে বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজারে নতুন প্রতিযোগীর প্রবেশের বাধা সৃষ্টি হয় তা হল :

১. **অপরিহার্য কাঁচামালের একক মালিকানা :** কোন পণ্য উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য কোন কাঁচামাল যদি কোন বেসরকারী সংস্থার মালিকানায় থাকে তাহলে সে নতুন প্রতিযোগীদের ঐ শিল্পে প্রবেশের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে পারে। কানাডার ইণ্টারন্যাশন্যাল নিকেল কোম্পানী সারা পৃথিবীর মোট নিকেলের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগের মালিক। দক্ষিণ আফ্রিকার ডি বীয়ারস কোম্পানী পৃথিবীর অধিকাংশ হীরার খনির মালিক। এভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর বেসরকারী মালিকানার জোরে কোন বেসরকারী শিল্প সংস্থা সম্ভাব্য প্রতিযোগীদের বাজারে প্রবেশের পথ বন্ধ করে নিজের একচেটিয়া কারবার স্থাপন করতে পারে।

অন্যায় প্রতিযোগিতা : প্রতিযোগী সংস্থাগুলির উৎপন্ন দ্রব্য সম্পর্কে অপপ্রচার করে, তারা যাতে ঋণ না পায় সেজন্য ব্যাঙ্কের উপর চাপ সৃষ্টি করে, তারা যাতে কাঁচামাল না পায় সেজন্য কাঁচামালের সরবরাহকারীদের উপর চাপ দিয়ে, অত্যন্ত কম দামে নিজের দ্রব্যটি বিক্রি করে ও সে দামে প্রতিযোগীদেরও পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করে লোকসানের বোঝায় তাদের দেউলিয়া করে বাজার থেকে উৎখাত করে, অনেক সময় শক্তিশালী কোন কারবারী সংস্থা বাজারে নিজের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে।

৩. **'পেটেণ্ট' স্বত্ব :** গবেষণার দ্বারা উদ্ভাবিত নতুন কোন দ্রব্য কিংবা নতুন কোন উৎপাদন প্রক্রিয়া যাতে অন্য কেউ আত্মসাৎ করতে না পারে সে উদ্দেশ্যে পেটেণ্ট আইনের দ্বারা তার উদ্ভাবনকারীকে নির্দিষ্টকালের জন্য তা ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করার একমাত্র আইনস্বীকৃত অধিকার দেওয়া হয়। ফলে, নির্ধারিত কালের জন্য পেটেণ্ট স্বত্বের অধিকারী ঐ দ্রব্য উৎপাদন কিংবা উৎপাদন প্রক্রিয়াটি ব্যবহারের একমাত্র অধিকার লাভ করে একচেটিয়া কারবারে পরিণত হয়। এই-ভাবে অনেক শিল্প সংস্থার উন্নতি ও প্রসার ঘটেছে। এদেশে টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল কোং লিঃ (টিস্‌কো), দিল্লী ক্লথ অ্যাণ্ড জেনারেল মিল্‌স (ডি. সি. এম.), হিন্দুস্থান মোটরস প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত।

৪. **বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যয়সংকোচ:** আধুনিক কারিগরী বিদ্যা এমনই যে, বহু শিল্পের ক্ষেত্রেই শিল্প সংস্থার উৎপাদনের মাত্রাটি বাজারের তুলনায় অত্যন্ত বড় না হলে খুব কম গড় খরচে তা উৎপাদন করা এবং বিশেষ কম দামে তা বিক্রি করা সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে তাই দেখা যায় দুটি বা তিনটি প্রতিষ্ঠান প্রায় গোটা শিল্পটা দখল করে রয়েছে এবং নতুন ও ছোট ছোট প্রতিযোগীরা তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হচ্ছে। যে বিপুল পরিমাণ পুঁজি নিয়োগ করলে তেমন বৃহদায়তন সংস্থা গড়ে তোলা যায় সে পরিমাণ পুঁজি সংগ্রহ করা সম্ভাব্য প্রতিযোগী সংস্থাগুলির পক্ষে কঠিন হলে শিল্পটি একচেটিয়া কারবারী সংস্থার অধীন হয়ে পড়ে।

৫. **অত্যাবশ্যকীয় জনসেবা সংস্থা:** কোন কোন শিল্পে বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যয়সংকোচগুলি এত বেশি প্রকট এবং সেখানে প্রতিযোগিতা এত বেশি অপচয়মূলক ও অসুবিধাজনক যে, সে সব ক্ষেত্রে একটি মাত্র কারবারী সংস্থাই বাঞ্ছনীয়। অর্থবিদ্যায় এদের **স্বাভাবিক একচেটিয়া সংস্থা** বলে গণ্য করা হয়। সরকার এদের একমাত্র সংস্থা রূপে কারবার চালানোর অনুমতি দিয়ে থাকে। এরা অত্যাবশ্যকীয় জনসেবা সংস্থা (public utilities) নামে পরিচিত। রেল ও সড়ক পরিবহণ সংস্থা, জল, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংস্থা, সংসরণ সংস্থা প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত।

তবে বাজারে নতুন প্রতিযোগীর প্রবেশ সম্পূর্ণ বন্ধ হতে খুব কমই দেখা যায়। কারণ কারিগরী বিদ্যার অবিরাম অগ্রগতি ঘটার ফলে একচেটিয়া সংস্থার আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হতে পারে এবং বাজারে নতুন প্রতিযোগী প্রবেশ করতে পারে। পুরনো পেটেণ্ট স্বত্বের জোরে যে একচেটিয়া আধিপত্য ছিল নতুন দ্রব্য উৎপাদন প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের দ্বারা তা নষ্ট হতে পারে। নতুন গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল আবিষ্কৃত হয়ে পুরনো অপরিহার্য কাঁচামালের গুরুত্ব কমিয়ে দিতে পারে। সুতরাং বিশুদ্ধ একচেটিয়া কারবার এই সব কারণে বাস্তবে খুব কম দেখা যায় এবং তেমন কোন কারবারী সংস্থা যদি দেখাও যায় তবে তার পক্ষে সরকারের অনুমোদন ছাড়া বেশি দিন টিকে থাকা কঠিন।

বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যয়সংকোচের কারণে এবং অত্যাবশ্যকীয় জনসেবা শিল্পগুলির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দক্ষতার দিক থেকে একচেটিয়া কারবার বাঞ্ছনীয় বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণের উপর বেসরকারী মালিকানা এবং অন্যায় প্রতিযোগিতা, এই দুটি কারণে যে বেসরকারী একচেটিয়া কারবার দেখা দেয় তা অবাঞ্ছিত।

৪. ৮. একচেটিয়া বাজারে ভারসাম্য দাম ও উৎপন্নের পরিমাণ নির্ধারণ
Price and Output Equilibrium under Monopoly

১. **একচেটিয়া কারবারীর পণ্যের চাহিদা:** বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার বাজারের পণ্যটির মোট চাহিদা রেখার ঢাল ঋণাত্মক (–); কিন্তু সে বাজারে যে

কোন একটি কারবারী সংস্থাকে বাজার দাম মেনে নিয়ে সে দামেই কম বা বেশি পরিমাণে পণ্যটি বেচতে হয়। তাই, যে কোন কারবারী সংস্থার কাছে তার দ্রব্যের চাহিদা রেখা বা বিক্রয় রেখা কিন্তু অসীম স্থিতিস্থাপক ও অনুভূমিক সমান্তরাল হয়। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে বা শিল্পে একটি মাত্র কারবারী সংস্থা থাকে বলে গোটা বাজারের বা শিল্পের পণ্যটির চাহিদা রেখা যা, একচেটিয়া সংস্থাটির চাহিদা বা বিক্রয় রেখাও তাই,- এবং সেটি হল ঋণাত্মক ঢালবিশিষ্ট চাহিদা রেখা। সুতরাং বিক্রির পরিমাণ বাড়াতে হলে একচেটিয়া সংস্থাকে পণ্যের দাম কমাতেই হয়। দাম বাড়ালে তার বিক্রির পরিমাণ কমে, দাম কমালে তার বিক্রির পরিমাণ বাড়ে। দাম কতটা কমালে বিক্রির পরিমাণ কতটা বাড়বে সেটা অবশ্যই **চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার** উপর নির্ভর করে। সুতরাং কি পরিমাণে উৎপাদন করবে ও বেচবে তা স্থির করতে গিয়ে সে অনিবার্যভাবে দামটাও স্থির করে দেয়। এই জন্য বলা হয়, একচেটিয়া কারবারী হল দাম নির্ধারণকারী (price maker)।

২. **একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক আয়ঃ** বাজারটি বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার হোক কিংবা বিশুদ্ধ একচেটিয়া কিংবা অন্য যে রকমেরই হোক, **দাম সর্বদাই গড়**

সারণি ৪·৫

চাহিদা				উৎপাদন খরচ		ভারসাম্যের শর্ত	
বিক্রির পরিমাণ Q ×	দাম P =	মোট আয় TR	প্রান্তিক আয় MR	মোট খরচ TC	প্রান্তিক খরচ MC	সর্বাধিক মুনাফা TR-TC =TP	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
০	২০	০	-	১০	—	—১০	
১	১৮	১৮	১৮	১৮	৮	০	MR > MC
২	১৬	৩২	১৪	২৩	৫	৯	↓
৩	১৪	৪২	১০	২৪	১	১০	↓
৪	**১২**	**৪৮**	**৬**	**৩০**	**৬**	**১৮**	**MR = MC**
৫	১০	৫০	২	৩৮	৮	১২	↑
৬	৮	৪৮	—২	৪৯	১১	—১	↑
৭	৬	৪২	—৬	৬৪	১৫	—২২	MR < MC

আয়ের সমান হয় (কারণ, বিক্রয়লব্ধ মোট আয় = দাম × বিক্রীত একক সংখ্যা এবং গড় আয় = বিক্রয়লব্ধ মোট আয় ÷ বিক্রীত একক সংখ্যা)। চাহিদা রেখা ভিন্ন ভিন্ন দামে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ চাহিদা ও বিক্রয়ের ইঙ্গিত দেয়। সুতরাং চাহিদা

রেখাটাকে দাম রেখা ও গড় আয়ের রেখা বলেও গণ্য করা হয়। বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতায় কোন বিক্রেতার কাছে তার দ্রব্যের চাহিদা রেখা অসীম স্থিতিস্থাপক (অর্থাৎ অনুভূমিক সমান্তরাল) বলে একটি একক কম বিক্রি করা হলে যে দামে তা বিক্রি করা হয়, একটি একক বেশি বিক্রি করা হলেও সেই একই দামে বিক্রি করা হয়। তাই বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার বাজারে যাই দাম, গড় আয়ও তাই প্রান্তিক আয়ও তাই। অর্থাৎ দাম = গড় আয় = প্রান্তিক আয়. (P = AR = MR)।

৩. কিন্তু বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা থাকে বলে, তার পণ্যের চাহিদা রেখা আর গোটা বাজারের চাহিদা রেখা একই হয় বলে এবং চাহিদা রেখাটি ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন বলে, একটি একক বেশি বেচতে গেলেও একচেটিয়া কারবারীকে দাম কমাতে হয়। এর ফলে বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজারে বিক্রির প্রথম এককটি ছাড়া বাকি সব এককে প্রান্তিক আয়, দাম ও গড আয়ের সমান না হয়ে, কম হয়। বিক্রির পরিমাণ বাড়াতে গিয়ে একচেটিয়া কারবারী দাম যতই কমায়, ততই প্রান্তিক আয় কমে এবং দাম ও গড আয়ের সাথে প্রান্তিক আয়ের পার্থক্যটা বাড়ে। ৪.৫ সারণিতে তা দেখান হয়েছে।

যে একচেটিয়া কারবারী সমস্ত ক্রেতার কাছে একই দামে তার পণ্য বেচে, বিক্রি বাডাতে গিয়ে দাম কমানোর ফলে, যে দামে সে অতিরিক্ত এককটি বিক্রি করে তার আয় একদিকে ততটুকু বাড়ে বটে, কিন্তু অন্য দিকে আগের এককগুলি সে যে দামে বিক্রি করতে পারত তার চেয়ে এখন কম দামে সেগুলি বিক্রি করায়, নতুন দামটা পুরনো দামের যতটুকু কম, ঐ এককগুলির প্রতিটির পিছু বিক্রয়-লব্ধ আয় ততটা করে কমে। যেমন, একচেটিয়া কারবারী ১ একক ১৮ টাকায় বিক্রি করে। কিন্তু ২ একক প্রতিটি ১৮ টাকা দামে বিক্রি না করে ১৬ টাকা দামে বিক্রি করে। তাতে তার আয় দ্বিতীয় এককটি বিক্রি করে যেমন ১৬ টাকা বাড়ল, তেমনি প্রথম এককটিও ১৮ টাকার বদলে ১৬ টাকায় বিক্রি করে ২ টাকা আয় কমল। অতএব ১৬ টাকা দামে ২ একক বিক্রি করে তার মোট আয় বাডল ১৪ টাকা। সুতরাং যে দামে সে পণ্য বিক্রি করে, মোট আয় তার চেয়ে কম পরিমাণে বাড়ে; অর্থাৎ প্রান্তিক আয় দামের কম হয় [$MR < P$ কিংবা $P > MR$]। এই কারণে দামের বা গড় আয়ের রেখার (অর্থাৎ চাহিদা রেখার) ঢাল ঋণাত্মক হয় বলে একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক আয়ের রেখা (১) গড় আয়ের রেখার বামদিকে অর্থাৎ নিচে থাকে এবং (২) তার ঢালও ঋণাত্মক হয়। ২.২০ চিত্রে (১.৭০ পৃষ্ঠা) একচেটিয়া কারবারীর গড় আয় রেখা AR এবং প্রান্তিক আয় রেখা MR দেখান হয়েছে।

৪. **একচেটিয়া কারবারীর উৎপাদন খরচ :** পণ্যের বাজারে একচেটিয়া কারবারী একমাত্র বিক্রেতা হলেও, আমরা ধরে নেব, উপাদান-সেবার বাজারে প্রতিযোগিতা রয়েছে এবং সেখান থেকেই একচেটিয়া কারবারী উপাদান-সেবা সংগ্রহ করে এবং প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদক সংস্থাগুলি যে সব কারিগরী কৌশল ব্যবহার করে একচেটিয়া কারবারীও সে সব কারিগরী কৌশল ব্যবহার করে। বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার কারবারী সংস্থার মতই একচেটিয়া কারবারীর উৎপাদনের আয়তন

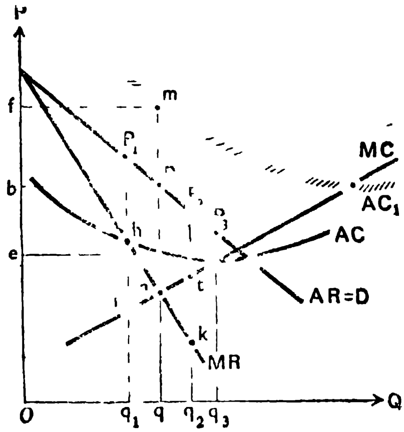
বা মাত্রাও **স্বল্পকালীন সময়ে** অপরিবর্তিত থাকে এবং সে কারণে, তার স্বল্পকালীন মোট উৎপাদন খরচও **স্থির খরচ** এবং **পরিবর্তনীয় খরচে** বিভক্ত এবং তার গড় পরিবর্তনীয় খরচ, গড় খরচ এবং প্রান্তিক খরচ রেখা স্বল্পকালীন সময়ে ইংরেজী 'V' অক্ষরের মত আকৃতি নেয়। অর্থাৎ উৎপন্নের পরিমাণ বাড়ানোর সাথে সাথে প্রথমে প্রান্তিক ও গড় খরচ কমে এবং পরে তা বাড়ে। ৪·৫ সারণির (৬) কলমে উৎপন্ন বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক খরচের প্রথমে হ্রাস ও পরে বৃদ্ধি দেখান হয়েছে। **দীর্ঘকালীন সময়ে** সে তার উৎপাদনের মাত্রা সর্বোত্তম রূপে অদলবদল করে নিতে পারে। নিখুঁত প্রতিযোগিতার মতই নিখুঁত একচেটিয়া কারবারীর দীর্ঘকালীন গড় খরচ এবং প্রান্তিক খরচ রেখাও ইংরেজী 'V' অক্ষরের মত আকৃতি নেয়, তবে স্বল্পকালীন রেখার তুলনায় দীর্ঘকালীন গড় ও প্রান্তিক খরচ রেখার ঢাল অনেক কম হয়।

৫. **দাম-উৎপন্ন ভারসাম্য:** নিখুঁত প্রতিযোগিতার কারবারী সংস্থার মত একচেটিয়া কারবারী সংস্থারও উদ্দেশ্য হল সর্বাধিকসম্ভব মুনাফা উপার্জন করা। এই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য একচেটিয়া কারবারী সংস্থা যে দাম ও উৎপন্নের পরিমাণ বেছে নেয় (অর্থাৎ যে দামে সে তার পণ্য বিক্রি করবে বলে এবং সেজন্য যে পরিমাণে সে তার পণ্য উৎপাদন করবে বলে স্থির করে) তা সে একদিকে তার পণ্যের **গড় আয় বা চাহিদা রেখা** ও তার উপর নির্ভরশীল **প্রান্তিক আয় রেখা** এবং অন্য দিকে তার **প্রান্তিক খরচ রেখার** সাহায্যে নির্ধারণ করে।

সর্বাধিকসম্ভব মুনাফা উপার্জনের জন্য একচেটিয়া কারবারী তার বিক্রয়লব্ধ মোট আয় সর্বাধিক পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টায় বিক্রিব ও উৎপন্নের পরিমাণ বাড়ায়। কিন্তু তা করতে গিয়ে তাকে একদিকে দাম ক্রমশ কমাতে হয় বলে তার প্রান্তিক আয় কমে, অর্থাৎ তার প্রান্তিক আয় রেখা ঋণাত্মক ঢাল নিয়ে বামদিক থেকে ডানদিকে ক্রমশ নিচে নামতে থাকে। অন্যদিকে প্রান্তিক খরচ ক্রমশ বাড়ে, অর্থাৎ প্রান্তিক খরচ রেখা ধনাত্মক ঢাল নিয়ে বামদিক থেকে ডানদিকে ক্রমশ উপরে উঠতে থাকে। সুতরাং একচেটিয়া কারবারী তার উৎপন্নের ও বিক্রির পরিমাণ ততক্ষণ পর্যন্ত বাড়ায়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রান্তিক আয় তার প্রান্তিক খরচের কম থাকে। অবশেষে একসময়ে তার উৎপন্নের পরিমাণ এমন হয়ে দাঁড়ায় যার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচ পরস্পরের সমান হয়ে পড়ে। তার প্রান্তিক খরচের রেখাটি সেখানে নিচে থেকে উপরে উঠতে গিয়ে প্রান্তিক আয় রেখাকে ছেদ করে। ৪·১১ চিত্রে a বিন্দুটি হল সেই ছেদবিন্দু। এই বিন্দুটি অনুসারে একচেটিয়া কারবারীর উৎপন্নের পরিমাণ হল Oq এবং প্রান্তিক খরচ = প্রান্তিক আয় = aq। a বিন্দু থেকে সোজাসুজি উপরের দিকে একটি রেখা টানলে তা গড় আয় বা চাহিদা রেখা AR (= D)-এ P বিন্দুতে পৌছায়। সুতরাং Oq উৎপন্নের দাম হল Pq।

প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচের সমতার বিন্দু দিয়ে নির্ধারিত Oq পরিমাণ উৎপন্ন Pq দামে বিক্রি করলেই একচেটিয়া কারবারীর বিক্রয়লব্ধ মোট আয় ও মুনাফা সর্বাধিক হবে। তার প্রমাণ, যদি সে Oq পরিমাণের চেয়ে কম

পরিমাণে, ধরা যাক Oq_1 পরিমাণে উৎপাদন করে ও তা P_1q_1 দামে বিক্রি করে তাহলে দেখা যাবে ওই পরিমাণ উৎপন্নে তার প্রান্তিক আয় hq_1-এর চেয়ে প্রান্তিক খরচ nq_1 তখনও কম বলে তার মুনাফা সর্বাধিক হবে না। তখন উৎপাদন আরও এক একক বাড়ালে তার খরচের চেয়ে আয় বেশি হবে। আবার যদি সে Oq পরিমাণের বেশি, যেমন Oq_2 পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রি করে তাহলে দেখা যাবে সেখানে তার প্রান্তিক খরচ (tq_2) তার প্রান্তিক আয় (kq_2) থেকে বেশি হয়ে গেছে বলে তার মুনাফা সর্বাধিক হবে না। কারণ শেষ এককটি উৎপাদনে যে খরচ পড়ছে সেটি বিক্রি করে সেটি থেকে আয় হচ্ছে কম, অর্থাৎ লোকসান হচ্ছে। সুতরাং মুনাফা সর্বাধিক সম্ভব করতে হলে একচেটিয়া কারবারীকে যতক্ষণ, (ক) প্রান্তিক আয় প্রান্তিক খরচের বেশি থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদন বাড়াতে হয় ; (খ) প্রান্তিক খরচ প্রান্তিক আয়ের বেশি থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদন কমাতে হয় ; এবং (গ) যে পরিমাণে উৎপাদনের প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক খরচ [MR = MC] হয় সে পরিমাণ উৎপাদন করতে হয়। এই হল তার ভারসাম্যের অবস্থা।



চিত্র ৪'১১ : একচেটিয়া বাজারের ও কারবারীর দাম-উৎপন্ন ভারসাম্য

৪'১১ চিত্রে Oq পরিমাণ উৎপন্ন Pq দামে বিক্রি করে একচেটিয়া কারবারীর মুনাফার পরিমাণ কত হচ্ছে তা berP ক্ষেত্র দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে। Oq পরিমাণ উৎপন্নের গড় খরচ হল rq (গড় খরচ রেখা AC) এবং দাম হল Pq। সুতরাং তার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হল bOqP ক্ষেত্র (= দাম Pq × উৎপন্ন Oq) এবং মোট খরচ হল eOqr ক্ষেত্র (= গড় খরচ rq × উৎপন্ন Oq)। সুতরাং নীট মুনাফা বা উদ্বৃত্ত আয় হল berP ক্ষেত্র। সুতরাং এখানে MR = MC শর্তে সে **সর্বাধিক নীট মুনাফার ভারসাম্যে** রয়েছে [$MR = MC < P > AC$]।

৪'৫ সারণিতে এই অবস্থাটি দেখান হয়েছে। ৪ একক উৎপন্নের প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক খরচ = ৬ টাকা। তখনই মুনাফার পরিমাণও সবচেয়ে বেশি। সুতরাং একচেটিয়া কারবারী ৪ একক উৎপাদন করবে ও ১২ টাকা দামে বেচবে। কিন্তু একচেটিয়া কারবারী সর্বদাই যে নীট মুনাফার ভারসাম্যে পৌঁছায় তা নয়। কখনও কখনও তাকে, চাহিদার মন্দার অবস্থায় বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার কারবারীর মত **ন্যূনতম লোকসানেও** ভারসাম্য লাভ করতে হয়। এরকম ক্ষেত্রেও ভারসাম্যের

শর্ত হল প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক খরচ [MR = MC]। তার গড় খরচ রেখা যদি AC না হয়ে AC_1 হয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে সে রেখাটি তার গড আয় বা চাহিদা রেখা AR-এর উপরে রয়েছে। সে ক্ষেত্রে তার প্রান্তিক খরচ ও প্রান্তিক আয়ের সমতার বিন্দু (a) অনুযায়ী ভারসাম্য উৎপন্নের পরিমাণ Oq হলেও, দাম হল Pq কিন্তু গড় খরচ হল mq। সুতরাং তার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হল bOqP ক্ষেত্র (= দাম Pq × উৎপন্ন Oq), কিন্তু তার মোট খরচ হল fOqm ক্ষেত্র (= গড় খরচ mq × উৎপন্ন Op)। সুতরাং নীট লোকসান হল fbPm ক্ষেত্র (= fOqm ক্ষেত্র – bOqP ক্ষেত্র)। কিন্তু Oq পরিমাণ ও Pq দামেই তার লোকসান ন্যূনতম হয় [MR = MC < P < AC]। উৎপাদনের পরিমাণ Oq অপেক্ষা কম কিংবা বেশি হলে তার লোকসানের পরিমাণ এর চেয়ে বেশি হবে। অতএব সাময়িকভাবে একচেটিয়া কারবারী এখানেই ভারসাম্য লাভ করবে।

সুতরাং, (১) একচেটিয়া কারবারীব ভারসাম্যের মূল শর্ত হল :

প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক খরচ < দাম [MR = MC < P]

(২) তার সর্বাধিক মুনাফার ভারসাম্যের শর্ত হল :

প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক খরচ এবং উভয়ই দামের কম কিন্তু দাম গড় খরচের বেশি [MR = MC < P > AC]।

(৩) তার ন্যূনতম লোকসানে ভারসাম্যের শর্ত হল :

প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক খরচ, উভয়ই দামের কম কিন্তু দামের চেয়ে গড খরচ বেশি [MR = MC < P < AC]।

৪. ৯. একচেটিয়া কারবারীর ক্ষমতার সীমা
Limits to the Power of a Monopolist

একচেটিয়া বাজারে একচেটিয়া কারবারী পণ্যের প্রতিদ্বন্দ্বীহীন একমাত্র বিক্রেতা বা যোগানদার বলে সে তার পণ্যের দাম যেমন নির্ধারণ করে তেমনি উৎপন্নের পরিমাণও স্থির করে। এই কারণে, প্রায়ই অভিযোগ করা হয় যে, একচেটিয়া কারবারী সর্বোচ্চ দামে তার পণ্য বিক্রি করে। বাস্তবে কিন্তু একচেটিয়া কারবারীর ইচ্ছামত দামে পণ্য বিক্রি করার ক্ষমতাটা কতকগুলি কারণে সীমাবদ্ধ :

১. একচেটিয়া কারবারীর লক্ষ্য হল সর্বাধিকসম্ভব পরিমাণে মুনাফা অর্জন। তার মোট মুনাফাটা নির্ভর করে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় ও মোট খরচের পার্থক্যের উপর এবং এই দুটিই আবার নির্ভর করে তার মোট বিক্রির পরিমাণ, পণ্যের দাম ও সে পণ্যের উৎপাদন খরচের উপর। সে যদি খুব চড়া দামে বিক্রি করে তাহলে তার মোট বিক্রির পরিমাণ কম হবে, প্রান্তিক আয় প্রান্তিক খরচের চেয়ে বেশি থেকে যাবে এবং তার মোট মুনাফা সর্বাধিক হবে না। সুতরাং একচেটিয়া কারবারীর পণ্যের চাহিদা এবং উৎপাদন খরচের অবস্থাটা তার উৎপন্নের পরিমাণ ও দাম নির্ধারণ ক্ষমতাটা খানিকটা কমিয়ে দেয়।

২. একচেটিয়া কারবারী বাজারে একমাত্র বিক্রেতা বলে তার আত্মগোপনের

উপায় থাকে না। সুতরাং সে তার একচেটিয়া ক্ষমতা পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা অর্জন করতে থাকলে শেষ পর্যন্ত তাকে ক্রেতাদের অর্থাৎ জনসাধারণের সমালোচনা সহ্য করতে হবে। ফলে বাজারে তার সুনাম নষ্ট হতে পারে, সরকার তার পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, একচেটিয়া কারবারী আচরণ দমন আইন পাস করতে পারে, নতুন প্রতিযোগীদের বাজারে প্রবেশের সুযোগ দিতে পারে এবং চরম ক্ষেত্রে একচেটিয়া শিল্পটির জাতীয়করণও করতে পারে। এই কারণে বিচক্ষণ ও একচেটিয়া কারবারীরা অনেক সময় কিছুটা মুনাফা ছেড়ে দেয়, ভারসাম্য উৎপন্ন ভারসাম্য দামে বিক্রি না করে তার চেয়ে কম দামে [দাম (=গড় আয়) যেখানে গড় খরচের সমান, সেই সীমার মধ্যে অবস্থানুযায়ী যে কোন দামে] অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে উৎপাদন ও বিক্রি করে থাকে (যেমন, চিত্র ৪·১১-এ Oq_4 পরিমাণ ও P_3 q_3 দাম।

৩. সর্বাধিক মুনাফা উপার্জনকারী একচেটিয়া কারবারী অল্পদিনের মধ্যেই সম্ভাব্য প্রতিযোগীদের আকৃষ্ট করে। তারা তখন (ক) একচেটিয়া বাজারে বা শিল্পে প্রবেশের কঠিন বাধাগুলি অতিক্রম করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিংবা (খ) সন্তোষজনক বিকল্প দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা করে। স্বল্পকালের মধ্যে সে চেষ্টা সফল না হলেও, দীর্ঘকালীন সময়ে তা সফল হয়। এই কারণেও বিচক্ষণ ও দূরদর্শী একচেটিয়া কারবারীরা কিছুটা কম মুনাফায় ভারসাম্য দামের চেয়ে কিছুটা কম দামে ও ভারসাম্য পরিমাণের চেয়ে কিছুটা বেশি পরিমাণে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি করে থাকে।

৪. ১০. দাম ভেদ

Price Discrimination

১. কোন কারবারী সংস্থা তার উৎপন্ন দ্রব্যটি একই সময়ে বিভিন্ন ক্রেতার কাছে একাধিক দামে বেচলে তাকে দাম ভেদ বলে। বাজারে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা থাকলে এটা কখনও সম্ভব হয় না। এটা সম্ভব হয় প্রধানত একচেটিয়া বাজারে কিংবা একচেটিয়া ঝোঁকমূলক প্রতিযোগিতার বাজারে। কিছুটা পরিমাণ একচেটিয়া ক্ষমতা না থাকলে দিনের পর দিন একই দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন দামে বিক্রি করা সম্ভব হয় না। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন দামে পণ্য বেচতে হলে দামের উপর বিক্রেতার বেশ খানিকটা নিয়ন্ত্রণ না থাকলে চলে না।

২. **দাম ভেদের বিভিন্ন রূপঃ** দামের ভেদ নানা রূপ নিয়ে থাকে। ডাক্তাররা অনেক সময়ই গরিব রোগীদের কাছ থেকে কম ফী নেয়, স্কুলে কলেজে গরিব ছাত্রছাত্রীরা বেতনের কনসেসন পায়; এ হল ক্রেতার **আয় অনুযায়ী দামের ভেদ**। ট্রেনে বা বিমানে বালক-বালিকাদের হাফটিকিটের ব্যবস্থা হল **বয়স ভেদে দামের ভেদ**। গৃহস্থ পরিবারে যে দামে বিদ্যুৎ বিক্রি করা হয় শিল্প-সংস্থায় তার চেয়ে কম দামে বিদ্যুৎ বিক্রি করাটা, রেলে বা লরী পরিবহণে বেশি পরিমাণের ও বেশি ওজনের দ্রব্যের জন্য কম হারে ভাড়ার ব্যবস্থাটা হল **ব্যবহার ভেদে**

দামের ভেদ। দেশের মধ্যে যে দামে পণ্য বিক্রি করা হয় তার চেয়ে বিদেশে কম দামে বিক্রি করা ('ডাম্পিং') হল ক্রেতাদের **অবস্থান ভেদে দামের ভেদ**। একই দ্রব্যের সাধারণ সংস্করণের চেয়ে বেশি দামে ডিল্যুক্স সংস্করণ বিক্রি করাটা হল দ্রব্যের **গুণ ভেদে দামের ভেদ**। সাধারণ আকারে বিক্রি করা দ্রব্যের তুলনায় বিশেষ বড় আকারে ('giant economy size') তা ভিন্ন দামে বিক্রি করাটা হল **আয়তন ভেদে দামের ভেদ**, ইত্যাদি।

৩. **দাম ভেদের পূর্বশর্ত**: দাম ভেদের অর্থ হল একই পণ্য একই সময়ে বিভিন্ন বাজারে একাধিক দামে বিক্রি করা। সুতরাং পণ্যটির কতকগুলি একক যে দামে বিক্রি করা হয়, তার অন্য এককগুলি তার চেয়ে কম দামে বিক্রি করা হয়। কিন্তু, কোন বিক্রেতা এরকমভাবে তার পণ্যের কতকগুলি একক যে দামে বিক্রি করে, পণ্যটির অন্য এককগুলি তার চেয়ে কম দামে বিক্রি করতে চায় কেন? কেন বিক্রেতা দাম ভেদের নীতি অনুসরণ করে? তার মূল কারণ হল, পণ্যটির বিভিন্ন ক্রেতা পণ্যটির জন্য বিভিন্ন দাম দিতে রাজী থাকে এবং এই অবস্থার সুযোগ নেওয়াটা বিক্রেতার পক্ষে লাভজনক হতে পারে। কিন্তু দাম ভেদের নীতিটা সফল হতে হলে তার উপযুক্ত কতকগুলি অবস্থা থাকা চাই। এগুলি হল দাম ভেদের পূর্ব শর্ত:

(ক) পণ্যটির যোগানের উপরে বিক্রেতার নিয়ন্ত্রণ থাকা চাই, অর্থাৎ, যে সব ক্রেতাদের কাছে বা যে সব বাজারে পণ্যটি বিক্রি করা হচ্ছে তাদের কাছে কতটা করে বিক্রি করা হবে তা বিক্রেতার নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়া চাই। যোগান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলে একই পণ্য ভিন্ন ভিন্ন দামে বিক্রি করা যায় না।

(খ) ক্রেতারা বা বাজারগুলি ভিন্ন ভিন্ন হওয়া চাই। ভৌগোলিক দূরত্ব বা শুল্ক প্রাচীর (বিদেশী বাজার) দ্বারা কিংবা ক্রেতাদের আয়ের পার্থক্য দ্বারা বাজারগুলি পরস্পরের থেকে আলাদা হতে পারে। বাজার যদি ভিন্ন না হয় তাহলে একই বাজারে একই পণ্য ভিন্ন ভিন্ন দামে বিক্রি করা যায় না।

(গ) ভিন্ন ভিন্ন বাজারে পণ্যটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ভিন্ন ভিন্ন হওয়া চাই। যেমন, দেশের বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য ও বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতা থাকলে, দেশের বাজারের তুলনায় বিদেশের বাজারে পণ্যটির চাহিদা বেশি স্থিতিস্থাপক হয়। ফলে দেশের বাজারের তুলনায় বিদেশের বাজারে পণ্যটি কম দামে বিক্রি করা হয়। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার অর্থ হল, বিভিন্ন ক্রেতারা পণ্যটির জন্য বিভিন্ন দাম দিতে রাজী।

(ঘ) যে বাজারে পণ্যটি কম দামে বিক্রি করা হচ্ছে সেখান থেকে কম দামে পণ্যটি কিনে এনে তা বেশি দামের বাজারে বিক্রি করা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। যদি এটা সম্ভব হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত দুটি বাজারে পণ্যটির দাম একই হয়ে যাবে এবং দাম ভেদ নীতি ব্যর্থ হবে।

৪. **দাম ভেদের ভিন্ন ভিন্ন বাজারে পণ্যের দাম-উৎপন্ন ভারসাম্য :** (ক) ধরা যাক, দামের ভেদ প্রবর্তনকারী একচেটিয়া কারবারী দুটি বাজারে তার পণ্য বিক্রি করে, কিন্তু তার পণ্যটা সে একটি কারখানাতেই উৎপাদন করে। সুতরাং সে যে পরিমাণেই পণ্যটি উৎপাদন করুক, তার উৎপাদনের আয়তন অনুযায়ী তার প্রান্তিক খরচ একটাই, প্রান্তিক খবচ রেখাও একটাই।

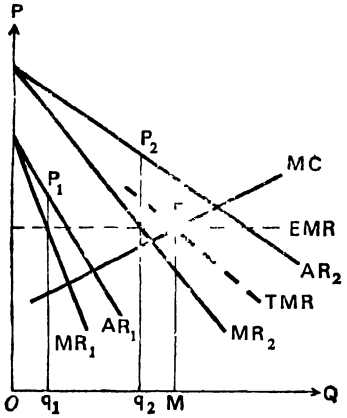
(খ) নির্দিষ্ট প্রান্তিক খরচে উৎপাদিত পণ্যটির মোট পরিমাণ সে দুটি বাজারের মধ্যে কিভাবে ভাগ করে, কোথায় কতটা পরিমাণে বিক্রি করবে? এর উত্তরে বলা যায়, প্রত্যেক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী সে এমন পরিমাণে এক একটি বাজারে পণ্যটি বিক্রি করবে, যে পরিমাণে বিক্রি করলে দুটি বাজারেই তার প্রান্তিক আয় পরস্পরের **সমান হয়**। প্রথম বাজারে একটি অতিরিক্ত একক বিক্রি করলে তার প্রান্তিক আয় যতটুকু হয় বা মোট আয় যতটুকু বাড়ে, দ্বিতীয় বাজারেও একটি অতিরিক্ত একক বিক্রি করলে তার প্রান্তিক আয় ততটুকু হয় বা মোট আয় ততটুকু বাড়ে, চাহিদা অনুযায়ী এমন ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে সে দুটি বাজারে পণ্য বিক্রি করবে। ধরা যাক, প্রথম বাজারে সে ২০০ একক ও দ্বিতীয় বাজারে সে ৫০০ একক বিক্রি করলে প্রত্যেক বাজারেই সে ৫ টাকা করে প্রান্তিক আয় পায়। সে যদি প্রথম বাজারে ১ একক বেশি ও দ্বিতীয় বাজারে ১ একক কম বিক্রি করতে চায়, তাহলে প্রথম বাজারে প্রান্তিক আয় কমে ৪ টাকা হবে, দ্বিতীয় বাজারে প্রান্তিক আয় বেড়ে ৬ টাকা হবে। তাতে তার ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। কারণ দ্বিতীয় বাজারে যে এককটি বিক্রি করে সে ৫ টাকা পেত সেটি প্রথম বাজারে মাত্র ৪ টাকায় বিক্রি করতে হবে এবং প্রথম বাজারে ৫ টাকার বেশি হারিয়ে সে দ্বিতীয় বাজারে ৫ টাকার কম পাবে। সুতরাং এ থেকে প্রমাণ হল, প্রত্যেক বাজারে সে ততটা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে পণ্যটি বিক্রি করবে যতটা করা হলে প্রত্যেক বাজারে তাব প্রান্তিক আয় একই হয় (অর্থাৎ **প্রথম বাজারের প্রান্তিক আয়=দ্বিতীয় বাজারের প্রান্তিক আয়** ইত্যাদি)।

(গ) একচেটিয়া কারবারীর মূল ভারসাম্য ঘটে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচের সমতার বিন্দুতে উৎপন্নের পরিমাণ নির্ধারণে। সুতরাং প্রতি বাজারে সে এমন পরিমাণে যোগান দেবে ও বিক্রি করবে যাতে কেবল প্রত্যেকটিতে সে সমান প্রান্তিক আয়ই পাবে না, সেই সাথে প্রত্যেক বাজারের প্রান্তিক আয় তার প্রান্তিক খরচেরও সমান হবে (অর্থাৎ **প্রথম বাজারের প্রান্তিক আয়=দ্বিতীয় বাজারের প্রান্তিক আয়=প্রান্তিক খরচ**)।

(ঘ) দুটি বাজারের চাহিদার অবস্থা অনুযায়ী, গড় আয় রেখার অবস্থা অনুযায়ী দাম অবশ্যই আলাদা হবে এবং প্রান্তিক খরচ ও প্রান্তিক আয়ের বেশি হবে (প্রথম বাজারের প্রান্তিক আয়=প্রান্তিক খরচ<দাম এবং দ্বিতীয় বাজারের প্রান্তিক আয়=প্রান্তিক খরচ<দাম)।

৫. ৪·১২ চিত্রে দাম ভেদকারী একচেটিয়া কারবারী কি অবস্থায় একই

সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বাজারে দাম-উৎপন্ন ভারসাম্যে পৌঁছায় তা দেখান হল।



চিত্র ৪·১২ : দাম ভেদকারী একচেটিয়া কারবারীর দাম-উৎপন্ন ভারসাম্য

একচেটিয়া কারবারী ১নং ও ২নং, এই দুটি বাজারে তার পণ্য বিক্রি করে। ১নং বাজারে তার চাহিদা বা গড় আয় রেখা হল AR_1 ও ২নং বাজারে তার চাহিদা বা গড় আয় রেখা হল AR_2। MR_1 ও MR_2 হল দুটি বাজারের দুটি প্রান্তিক আয় রেখা। দুটি বাজারের এই দুটি প্রান্তিক আয় রেখা পাশাপাশি যোগ দিয়ে তার মোট প্রান্তিক আয় রেখা TMR পাওয়া গেল। MC হল তার প্রান্তিক খরচ রেখা। E বিন্দুতে TMR রেখা ও MC রেখা ছেদ করে তার মোট উৎপাদনের পরিমাণ OM নির্ধারণ করে দিল। এই পরিমাণ উৎপন্নে তার প্রান্তিক খরচ = প্রান্তিক আয় = EM। তাব প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচের সমতার বিন্দু অনুসারে, সমান প্রান্তিক আয় রেখা EMR টানা হয়েছে। এই রেখাটি MR_1-কে যে বিন্দুতে ছেদ করেছে সেখানে তার মোট পরিমাণ উৎপাদনের প্রান্তিক খরচ EM তার প্রান্তিক আয় EM-এর সমান হয়েছে বলে ১নং বাজারে ভারসাম্য উৎপন্নের পরিমাণ Oq_1 নির্দিষ্ট করে দিল। একই ভাবে ২নং বাজারে ভারসাম্য উৎপন্নের পরিমাণ নির্দিষ্ট হল Oq_2। তার মোট উৎপন্ন OM এইভাবে ১নং বাজারে Oq_1 পরিমাণে ও ২ নং বাজারে Oq_2 পরিমাণে ভাগ হয়ে বিক্রি হবে। তাহলে দুটি বাজারে তার প্রান্তিক আয় পরস্পরের সমান এবং সেই সাথে সেটা তার প্রান্তিক খরচেরও সমান এবং ১নং বাজারে Oq_1 পরিমাণ পণ্য P_1q_1 দামে ও ২নং বাজারে Oq_2 পরিমাণ পণ্য P_2q_2 দামে বিক্রি হবে। এই অবস্থায় তার মোট মুনাফা সর্বাধিক হবে।

৬. দামের ভেদ কি বাঞ্ছনীয়? দাম ভেদকারী একচেটিয়া কারবারীরা একটি বাজারে কম দামে পণ্য বিক্রি করে সে লোকসানটা পুষিয়ে নেবার জন্য আরেকটি বাজারে অত্যন্ত চড়া দামে পণ্যটি বিক্রি করে সেখানকার ক্রেতাদের শোষণ করে, এবং উৎপাদনের উপকরণগুলির কাম্য ব্যবহার ও বণ্টন অত্যন্ত বেশি করে ক্ষুণ্ণ করে বলে অভিযোগ করা হয়।

এই অভিযোগের বিচারে দেখা যায় : (ক) ভিন্ন ভিন্ন বাজারে বা খরিদ্দারদের কাছে একই দামে পণ্যটি বিক্রি করলে একচেটিয়া কারবারীর যতটা মোট বিক্রয়লব্ধ আয় ও মুনাফা হয় সে তুলনায়, ভিন্ন ভিন্ন বাজারে ভিন্ন ভিন্ন দামে বেচলে তার **মোট বিক্রয়লব্ধ আয় ও মুনাফা অনেক বেশি হয়।**

(খ) সর্বত্র একই দামে পণ্য বিক্রি করলে একচেটিয়া কারবারী যে পরিমাণে

পণ্যটি বেচতে পারে ও উৎপাদন করে তার তুলনায় ভিন্ন ভিন্ন বাজারে ভিন্ন ভিন্ন দামে বেচলে তার **বিক্রির পরিমাণ ও মোট উৎপন্নের পরিমাণ বেশি হয়।**

(গ) ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি (অর্থাৎ ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন খরচের নিয়ম) সক্রিয় থাকলে দামভেদী একচেটিয়া কারবারের মোট উৎপাদনের পরিমাণ বেশি হওয়ার সাথে **উৎপাদনের প্রান্তিক ও গড় খরচ কমে যায়** বলে উৎপাদনের দক্ষতা বাড়ে।

(ঘ) দামের ভেদ ব্যবস্থায় কিছু ক্রেতাকে বেশি দামে পণ্য কিনতে হলেও এবং তা সমর্থনযোগ্য না হলেও, একথাও সত্য যে, তাদের হয়তো সে দাম দেবার ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ তারা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন। কিন্তু তার ফলে যদি অপেক্ষাকৃত গরিব ক্রেতারা অপেক্ষাকৃত কম দামে পণ্যটি ভোগ করতে পারে, তাহলে সমাজের **সামগ্রিক কল্যাণের দিক থেকে তা বাঞ্ছনীয়** বলে গণ্য **হতে পারে।**

অধ্যাপিকা জোন রবিনসনের মতে, সমাজের সামগ্রিক দিক থেকে দামের ভেদ ব্যবস্থাটা বাঞ্ছনীয় কিনা তা বলা অসম্ভব। যেখানে দাম ভেদের ফলে মোট উৎপাদন দামের ভেদহীন একচেটিয়া বাজারের তুলনায় বাড়ে সেখানে দাম ভেদ ব্যবস্থাটা তুলনায় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই সুবিধার পাশাপাশি একথাও মনে রাখতে হবে, দামের ভেদ বিভিন্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রের মধ্যে **উৎপাদনের উপকরণগুলির অপবণ্টন ঘটায়।**

একচেটিয়া ঝোঁকমূলক প্রতিযোগিতার বাজার
Market Under Imperfect Competition

৪. ১১. একচেটিয়া ঝোঁকমূলক প্রতিযোগিতার বাজারের পরিস্থিতি
Monopolistic Competition : Conditions

১. একচেটিয়া ঝোঁকমূলক প্রতিযোগিতার বাজার হল এমন একটি বাজার যেখানে যথেষ্ট পরিমাণ প্রতিযোগিতার সঙ্গে খানিকটা পরিমাণে একচেটিয়া ক্ষমতার পাশাপাশি ও মিশ্রিত অবস্থান রয়েছে। অর্থাৎ এই বাজারে প্রতিযোগী উৎপাদক সংস্থা বা বিক্রেতার সংখ্যা খুব একটা কম নয়। ফলে বাজারের মোট যোগানে প্রতিটি প্রতিযোগী সংস্থার নিজের অংশ বেশি নয় এবং সেহেতু বাজার দামের উপর তার নিয়ন্ত্রণ-প্রভাব সীমাবদ্ধ। প্রতিযোগীদের সংখ্যা কম না হওয়ায় তাদের মধ্যে যোগসাজশে যোগান কমানোর ও দাম বাড়ানোর গোপন বোঝাপড়ার সম্ভাবনা বিশেষ থাকে না। তারা কেউ প্রতিযোগীদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা মনে রেখে দাম ও উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে নিজের কর্মনীতি স্থির করে না। মোটামুটিভাবে এ হল এই বাজারে প্রতিযোগিতার চরিত্র ও ব্যাপ্তি।

২. কিন্তু এই বাজারে একচেটিয়া ক্ষমতার অস্তিত্বও রয়েছে এবং তা ঘটে পণ্যভেদ ব্যবস্থার (product differentiation) মারফত। নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্য উৎপাদিত হয় সুনির্দিষ্ট মান অনুযায়ী। তাই এক বিক্রেতার পণ্য থেকে আর এক বিক্রেতার পণ্যের কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু একচেটিয়া ঝোঁক-বিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারের একটি মূল বৈশিষ্ট্য হল সব বিক্রেতাই একজাতীয়

পণ্য বিক্রি করলেও, একের পণ্যের সাথে অন্যের পণ্যের কিছু না কিছু বাস্তব কিংবা কাল্পনিক পার্থক্য থাকেই। কাল্পনিক পার্থক্যটা সৃষ্টি করা হয় ক্রেতাদের মনে এবং তা করা হয় প্রচার বিজ্ঞাপনের দ্বারা। একে বলে পণ্যভেদকরণ। দোকানের বিশেষ অবস্থান, কর্মচারীদের মার্জিত ব্যবহার, সংস্থার সুনাম ইত্যাদি এর সহায়ক।

পণ্যভেদের ফলে, প্রথমত এই বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতার নিজের বিশিষ্ট পণ্যটির অনুরাগী খরিদ্দারদের নিয়ে এক একটি ছোট গণ্ডীবদ্ধ নিজস্ব উপ-বাজার (sub-market) সৃষ্টি হয়। যেখানে প্রত্যেক বিক্রেতা সীমাবদ্ধভাবে নিজের পণ্যটির যোগান ও তার দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সেখানে সে সীমাবদ্ধ একচেটিয়া কারবারী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক বিক্রেতা তার একচেটিয়া ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য মাঝে মাঝেই পণ্যটির পরিবর্তন ঘটায় (product variation) এবং প্রচার বিজ্ঞাপনের দ্বারা বিক্রি বাড়ানোর জোর চেষ্টা করে (sales promotion)। এটাও এক ধরনের প্রতিযোগিতা। তবে এটা দামের প্রতিযোগিতা নয় (non-price competition), অন্যান্য বিষয় নিয়ে সীমাবদ্ধ একচেটিয়া কারবারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা। এটা নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে কখনই দেখা যায় না। এটাকে প্রতিযোগিতার বাজারে একচেটিয়া কারবারের অংশ বলে মনে করা যায়।

৩. একচেটিয়া বাজারের তুলনায় এই বাজারে নতুন প্রতিযোগীর প্রবেশ সহজ হলেও, নিখুঁত প্রতিযোগিতার মত তা সহজ ও অবাধ নয়।

৪. এই বাজারে, পণ্যভেদের দরুন, সমস্ত প্রতিযোগী উৎপাদক সংস্থার পণ্যগুলি পরস্পরের নিকট পরিবর্ত (close substitute) হলেও নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারের মতো নিখুঁত পরিবর্ত (perfect substitute) নয়। আর প্রতিযোগীদের সংখ্যাও অনেক নয়। তাই এই বাজারে যে কোন উৎপাদক সংস্থার পণ্যের চাহিদা রেখাটি (বা গড় আয় রেখাটি) নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারের মত সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক (অনুভূমিক সমান্তরাল) নয়। আবার বিশুদ্ধ একচেটিয়া কারবারীর পণ্যের চাহিদা রেখার মত তা কম স্থিতিস্থাপকও নয়। তার পণ্যের চাহিদা রেখার স্থিতিস্থাপকতা কতটা হবে তা নির্ভর করে তার প্রতিযোগীদের সংখ্যা ও পণ্যভেদের মাত্রার (degree) উপর। প্রতিযোগীদের সংখ্যা যত বেশি এবং পণ্যভেদের মাত্রা যত কম হবে, তার পণ্যের চাহিদা রেখার স্থিতিস্থাপকতা তত বেশি হবে।

৫. ভারতে কিছু কিছু শিল্পে এই ধরনের বাজারের অস্তিত্বটি নিচের তথ্য থেকে অনুমান করা যেতে পারে:

শিল্প		উৎপাদক সংস্থার সংখ্যা
বনস্পতি তেল	...	৩৯
প্লাইউড	...	৬৭
ধাতব আসবাবপত্র	...	৫৮
টায়ার ও টিউব	...	২৮

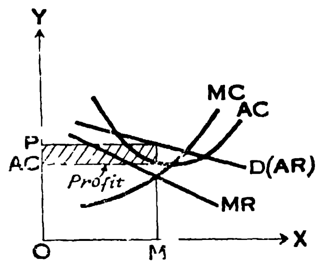
শিল্প		উৎপাদক সংস্থার সংখ্যা
রঙ ও বার্নিশ	...	৩৩
টয়লেটস	...	৪১
চীনামাটির দ্রব্য	...	৫৫
ইলেকট্রিক পাখা	...	৩৩
রেডিমেড জামা-কাপড়	...	৫৫

Annual Survey of Industries, 1965, Deptt. of Statistics, (C.T.O., Calcutta, 1968).

৪. ১২. দাম-উৎপন্ন ভারসাম্য
Price-Output Equilibrium

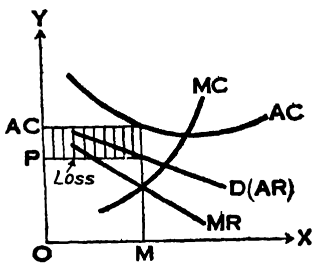
১. **স্বল্পকালীন ভারসাম্য**ঃ একচেটিয়া ঝোঁকবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারে যে কোন প্রতিযোগী কারবারী সংস্থা যেমন সর্বাধিক সম্ভব মুনাফায় ভারসাম্য লাভ করতে পারে, তেমনি ন্যূনতম লোকসানেও ভারসাম্য লাভ করতে পারে।

২. প্রত্যেক সংস্থাই নিজস্ব ছোট্ট গণ্ডীবদ্ধ বাজারে সীমাবদ্ধ একচেটিয়া কারবারী বলে, একচেটিয়া বাজারে ভারসাম্যের মূল নীতি অনুযায়ী প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচ রেখার ছেদ বিন্দু অনুযায়ী ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করবে এবং চাহিদা অর্থাৎ গড় আয় রেখার অবস্থান অনুযায়ী দাম ধার্য করবে। সে দামটি গড় খরচের কম হলে, তাতে অতিরিক্ত মুনাফাও করবে। ৪'১৩ চিত্রে ভারসাম্য OP দামে ও OM ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণে এ রকম অতিরিক্ত মুনাফায় ভারসাম্য দেখান হয়েছে।



চিত্র ৪'১৩

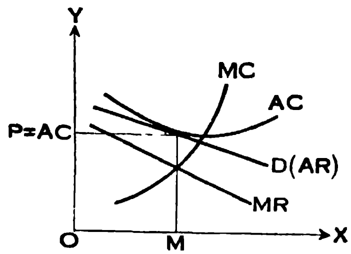
৩. ৪.১৪ চিত্রে OP দাম ও OM পরিমাণে ন্যূনতম লোকসানে ভারসাম্য দেখান হয়েছে। কারণ এখানে চাহিদা রেখার অবস্থান অনুযায়ী দামটি গড় খরচের চেয়ে কম। দাম যতটা কম ততটাই তার লোকসানের পরিমাণ।



চিত্র ৪'১৪

৪. **দীর্ঘকালীন ভারসাম্য**ঃ দীর্ঘকালীন সময়ে অবশ্য এই বাজারেও অতিরিক্ত মুনাফা কিংবা লোকসান চলতে পারে না। কারণ, অতিরিক্ত মুনাফা ঘটতে থাকলে নতুন প্রতিযোগীরা বাজারে যোগ দেবে। কারণ এই বাজারে নতুন প্রতিযোগীর প্রবেশ কঠিন নয়। ফলে প্রত্যেক পুরনো কারবারী সংস্থা যে পণ্য

বিক্রি করে সে পণ্যের নিকট পরিবর্ত দ্রব্যের (close substitutes) সংখ্যা বাড়বে এবং বাজারের মোট বেচাকেনায় প্রত্যেক কারবারী সংস্থার অংশ কমবে। সুতরাং প্রত্যেকের চাহিদা বা গড় আয় রেখা আরও বেশি স্থিতিস্থাপক হয়ে উঠবে। দাম কমতে থাকবে ও কমে যেখানে এলে তা গড় আয় রেখাকে স্পর্শ করবে (সমান হবে) সেখানেই তার ভারসাম্য দাম ও উৎপাদনের পরিমাণটি সে স্থির করবে। ৪·১৫ চিত্রে তা দেখান হয়েছে। OP ভারসাম্য দামটি গড় আয়ের সমান এবং সে অনুযায়ী ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণটি হয়েছে OM। এখানে অতিরিক্ত মুনাফা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কিন্তু দাম গড খরচের সমান হওয়ায় স্বাভাবিক মুনাফা থাকছে। নতুন কোন প্রতিযোগীরও সে কারণে আর এই বাজারে প্রবেশের কোন আগ্রহ নেই। আবার পুরনো কোন প্রতিযোগী সংস্থাও অন্য কোন দামে বিক্রি করার কথা চিন্তা করবে না। কারণ তাতে তার লোকসান ছাড়া লাভ হবে না।



চিত্র ৪·১৫

স্বল্পকালীন সময়ে লোকসান হতে থাকলে ধীরে ধীরে অনেক প্রতিযোগী বাজার ছেড়ে চলে যাবে। যারা থাকবে তাদের পণ্যের নিকট-পরিবর্তের সংখ্যা কমবে এবং বাজারের মোট বেচাকেনায় প্রত্যেকের নিজের অংশ বাড়বে। ফলে শেষ পর্যন্ত লোকসানটা দূর হয়ে প্রত্যেকে গড় খরচের সমান দামে পণ্য বেচবে এবং তাতে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে পারবে।

তবে, মনে রাখতে হবে, এই দীর্ঘকালীন ভারসাম্যটি একটি ঝোঁক মাত্র। অর্থাৎ দীর্ঘকালীন সময়ে একচেটিয়া ঝোঁকবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারের সমস্ত প্রতিযোগী কারবারী সংস্থার মধ্যেই ঐ দিকে যাবার ঝোঁকটি রয়েছে। বাস্তবে তা সবক্ষেত্রে নাও ঘটতে পারে। কারণ, পণ্যভেদের দ্বারা এ বাজারের প্রতিযোগী সংস্থাগুলি অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে।

৪. ১৩. বিক্রয় খরচ
Selling Cost

১. একচেটিয়া ঝোঁকবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রয় খরচ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়, যা নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত এবং বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজারে গুরুত্বহীন। প্রচার বিজ্ঞাপন অভিযান, পণ্য উন্নয়ন, বিক্রয় প্রসার (খরিদ্দারদের উপহার দেওয়া, ছাড় দেওয়া, কুপন দেওয়া) ইত্যাদির সাহায্যে পণ্যভেদ ব্যবস্থাটাকে শক্তিশালী করার জন্য এই বাজারের কারবারীরা প্রচুর টাকা খরচ করে থাকে। এর পক্ষে কিছু যুক্তি দেখান হয়। যেমন বলা হয়, এর দরুন: (ক) খরিদ্দারেরা তাদের পছন্দ অপছন্দ মত সঠিকভাবে কিনতে পারে; (খ) ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়; (গ) পণ্যের

গুণগত উৎকর্ষ বাড়ে ; (ঘ) মোট ব্যয় ও কর্মসংস্থান বাড়ে। এর বিরুদ্ধে যুক্তিস্বরূপ বলা হয়, এর ফলে : (ক) ক্রেতারা বিভ্রান্ত হয় ; (খ) উৎপাদন খরচের সাথে বিক্রির খরচ মিলে মোট খরচ অনেক বাড়িয়ে দেয়। সেটা বেশি দামের আকারে ক্রেতাদেরই বইতে হয়। (গ) প্রতিযোগীদের পারস্পরিক বিক্রয় খরচ মোট বিক্রিকে না বাড়িয়ে কেবল খরচটাই বাড়ায় ; (ঘ) মোট ব্যয় বাড়লেও কর্মসংস্থান বাড়ে কিনা সন্দেহ।

২. বিক্রয় খরচ পণ্যের চাহিদাকে বাড়াতে সমর্থ হলে, চাহিদা রেখা ডান দিকে সরে যায়। তার স্থিতিস্থাপকতাও নতুন করে নির্ধারিত হয় এবং তা আগের তুলনায় কম বা বেশি হতে পারে। কিন্তু বিক্রয় খরচ উৎপাদকের খরচ রেখাকেও প্রভাবিত করে। বিক্রয় খরচ ধরে তার মোট গড় খরচ ও মোট প্রান্তিক খরচ, উভয়ই বাড়ে। গড় খ·চ রেখা ডান দিকে সরে যায়। শেষ পর্যন্ত মুনাফা বাড়বে কিনা এবং বাড়লে তা কতটা বাড়বে, তা নির্ভর করে চাহিদা রেখা ও গড় খরচ রেখার কোন্‌টা সরে এসে কোথায় অবস্থান নিয়েছে তার উপর। চাহিদা রেখা গড় খরচ রেখার উপরে উঠলে মুনাফা হবে। কিন্তু তা স্থায়ী নাও হতে পারে। এমনকি লোকসানও ঘটতে পারে। সুতরাং বিক্রয় খরচের ফলাফল অনিশ্চিত এবং সেহেতু তার অনেকটাই অপচয়।

৪. ১৪. অলিগোপলি মুষ্টিমেয় বিক্রেতার বাজার
Oligopoly

১. অলিগোপলি হল ২-এর বেশি কিন্তু মুষ্টিমেয় সংখ্যক বিক্রেতার বাজার। ভারতে চুরুট (৪টি কোম্পানী), সিগারেট (১১টি কোম্পানী), অ্যালুমিনিয়াম (৩টি কোম্পানী), জুতা (৯টি কোম্পানী), ব্লেড (৭টি কোম্পানী), ট্রাকটার (১০টি কোম্পানী), টাইপরাইটার (৭টি কোম্পানী), স্পোর্টস দ্রব্য (৬টি কোম্পানী) প্রভৃতি শিল্প এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত।

২. অলিগোপলি বাজারের মুষ্টিমেয় বিক্রেতারা সকলে সম্পূর্ণ সমজাতীয় পণ্য (homogeneous product) বেচতে পারে কিংবা তাদের পণ্যে কিছুটা বাস্তব বা কাল্পনিক ভেদ (product differentiation) থাকতে পারে। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই বাজারের মোট যোগানের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিজেরা যোগান দেয়।

৩. অলিগোপলির উৎপত্তির প্রধান কারণ তিনটি : (ক) বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যয়সংকোচ। সুদক্ষভাবে উৎপাদন করতে গিয়ে বৃহদায়তনে উৎপাদন করতে হয় এবং তা করতে গিয়ে উৎপাদক সংস্থা বৃহৎ আয়তন লাভ করে। নতুন প্রতিযোগীদের পক্ষে তখন প্রথম থেকেই বৃহদায়তন নিয়ে বাজারে যোগ না দিলে চলে না এবং তা স্বভাবতই অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই বৃহৎ আয়তনবিশিষ্ট অল্প-সংখ্যক পুরাতন প্রতিযোগীরাই বাজারে আধিপত্য করে। (খ) প্রতিযোগী কারবারী সংস্থাগুলি বাজার দখল করার জন্য পরস্পরের সাথে একত্রীভূত (merger or amalgamation) হওয়া। এর ফলে প্রতিযোগীদের সংখ্যা কমে মুষ্টিমেয় হয়ে দাঁড়ায়।

(গ) চাহিদার প্রসার। পণ্যের চাহিদাটি সম্প্রসারণশীল হলে উদ্যোগী উৎপাদক সংস্থাগুলি আয়তন সম্প্রসারিত করে প্রাধান্য লাভ করে।

৪. অলিগোপলি বাজারের মূল বৈশিষ্ট্য হল মুষ্টিমেয় সংখ্যক প্রতিযোগীদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতা এবং প্রত্যেক সংস্থার দাম ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করতে গিয়ে প্রতিযোগীদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে ও প্রয়োজনে কি ধরনের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তা বিবেচনা করার বাধ্যবাধকতা।

৫. ফলে, অলিগোপলি বাজারে যত রকমের পরিস্থিতি অনুমান করা যায়, উৎপাদক সংস্থার দাম-উৎপন্ন ভারসাম্য বিশ্লেষণও তত রকমের হয়ে থাকে।

৫ উপাদান আয়ের বণ্টন
DISTRIBUTION OF FACTOR INCOMES

৫. ১. উপাদানের দাম ও আয়
Factor Prices and Factor Incomes

১. কোন পণ্য উৎপাদন করতে হলে কারবারী সংস্থাকে গৃহস্থ পরিবারগুলির কাছ থেকে ভূমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন এই উপাদানগুলির সেবা কিনতে হয়। টাকায় উপাদান-সেবাগুলির যে দাম দিতে হয় সেটা হল কারবারী সংস্থাগুলির আর্থিক খরচ, কিন্তু সেটাই হল আবার উপাদানের মালিক গৃহস্থ পরিবারগুলির আর্থিক আয়। সুতরাং **উপাদানের দাম** বা আর্থিক পারিশ্রমিক = **কারবারী** সংস্থার **আর্থিক খরচ** = উপাদানের মালিক গৃহস্থ পরিবারের **আর্থিক আয়**।

২. পণ্যের বাজার এবং উপাদানের বাজার, দু'টি বাজারই কারবারী সংস্থা ও গৃহস্থ পরিবারগুলিকে নিয়ে গঠিত। পণ্যের বাজারে কারবারী **সংস্থাগুলি হল** পণ্যের যোগানদার এবং গৃহস্থ পরিবারগুলি হল পণ্যের চাহিদাকারী। কিন্তু **উপাদানের বাজারে গৃহস্থ পরিবারগুলি হল** উপাদানের **যোগানদার** এবং **কারবারী সংস্থাগুলি হল** উপাদানের **চাহিদাকারী**।

৩. কোন নির্দিষ্ট সময়ে (যেমন, এক বৎসরে), কোন দেশে কারবারী সংস্থাগুলি উপাদানগুলির সাহায্যে যে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদন করে তার মোট আর্থিক মূল্যটা হল ঐ সময়ে সে দেশের **জাতীয় আয়**। চারটি উপাদানের সম্মিলিত সেবার বা কাজের দ্বারাই তা উৎপন্ন হয়। সুতরাং **জাতীয় আয়ের আর্থিক মূল্য = জাতীয় আয় উৎপাদনের মোট আর্থিক খরচ = চারটি উপাদানের মোট পারিশ্রমিক = চারটি উপাদানের** মালিক অর্থাৎ গৃহস্থ পরিবারগুলির **মোট আর্থিক আয়**।

৪. উপাদানগুলি তাদের কাজের দ্বারা এই আয় উপার্জন করে। তাই এটা হল তাদের কাজের দরুন আয় বা **ক্রিয়াগত আয়** (functional income)। চারটি উপাদানের চারটি ক্রিয়াগত আয়ের নাম হল খাজনা (ভূমির আয়), মজুরি (শ্রমের আয়), সুদ (পুঁজির আয়) এবং মুনাফা (সংগঠনের বা উদ্যোগের আয়)। কোন দেশের **জাতীয় আয় হল** এই চার রকম ক্রিয়াগত আয়ের সমষ্টি [জাতীয় আয় = মোট খাজনা + মোট মজুরি + মোট সুদ + মোট মুনাফা]।

৫. জাতীয় আয়ে কোন উপাদানের ক্রিয়াগত আয় বাবদ প্রাপ্য অংশ নির্ধারণের কাজটিকে বলে জাতীয় আয়ের **ক্রিয়াগত বণ্টন** (functional distribution of income)। কারবারী জগতে যদিও 'বণ্টন' (distribution) শব্দটির দ্বারা পণ্যের বেচাকেনা বা উৎপাদনকারীর কাছ থেকে ভোগীর কাছে পণ্য

পৌঁছানোর পদ্ধতি বা প্রণালীকে বোঝায়, অর্থবিদ্যায় কিন্তু 'বণ্টন' শব্দটির অর্থ হল উপাদানগুলির মধ্যে আয়ের বণ্টন বা উপাদান-আয় নির্ধারণ।

৬. কোন উপাদানের মোট আয় দু'টি অংশ নিয়ে গঠিত। একটি হল উপাদানটি যে কাজ করে সে কাজের জন্য পারিশ্রমিকের হার এবং অন্যটি হল কাজে নিযুক্ত উপাদানটির মোট এককগুলির সংখ্যা। তার মোট আয় হল, এই দু'টির গুণফল। অর্থাৎ উপাদানের মোট আয় = পারিশ্রমিকের হার বা সেবার দাম × কর্মে নিযুক্ত একক সংখ্যা [rate of remuneration or price of service × number of units employed]।

৭. উপাদানের দাম কি করে নির্ধারিত হয় তা পণ্যের দাম নির্ধারণের তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ উপাদানের চাহিদার কয়েকটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য রয়েছে: (ক) উপাদানের দ্বারা পণ্য উৎপাদিত হয়। সুতরাং উপাদানের চাহিদাটির উৎপত্তি হয় পণ্যের চাহিদা থেকে। সেজন্য উপাদানের চাহিদাকে বলে **উদ্ভূত চাহিদা** (derived demand)। (খ) কোন পণ্য উৎপাদন করতে চারটি উপাদানই একসঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। এ কারণে উপাদানের চাহিদা হল **সংযুক্ত চাহিদা** (joint demand)। তাদের একটির চাহিদা অন্যটির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কোন উপাদানের চাহিদা শুধু তার নিজের দামের উপরেই নয়, অন্যান্য উপাদানের যোগান ও দামের উপরেও নির্ভর করে। ফলে, উপাদানগুলির চাহিদার **পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা** (cross elasticity of demand) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যত বেশি হয়, উপাদানের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাও তত বাড়ে। (গ) পণ্যের যোগানের স্থিতিস্থাপকতার চেয়ে উপাদানের **যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কম** হয়। কারণ, উপাদানের যোগান বাড়াতে সময় লাগে।

এই সব কারণে, উপাদানের দাম কি করে নির্ধারিত হয় তা ব্যাখ্যা করার জন্য আলাদা তত্ত্বের দরকার হয়। তা ছাড়া, বিভিন্ন উপাদানের চাহিদা ও যোগানের অবস্থার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তাই প্রতিটি উপাদানের দাম বা আয় (খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা) নির্ধারণের জন্য আলাদা আলাদা তত্ত্বেরও দরকার হয়।

৫. ২. উপাদানের দাম নির্ধারণের তাৎপর্য
Significance of Factor Pricing

উপাদানের দাম নির্ধারণের প্রক্রিয়াটির আলোচনা নানা কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ: (১) সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের আর্থিক আয় যেসব বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয় তাদের মধ্যে উপাদানের দাম হল সর্বপ্রধান। কারবারী সংস্থাগুলি বিভিন্ন উপাদান-সেবা সংগ্রহের জন্য যে খরচ করে তাই খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা রূপে গৃহস্থ পরিবারগুলির কাছে আর্থিক আয়ের অবিরাম প্রবাহ হয়ে উপস্থিত হচ্ছে। গৃহস্থ পরিবারগুলির এই আর্থিক আয়ই দেশে (কারবারী সংস্থাগুলির দ্বারা উৎপাদিত) দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট চাহিদার পরিমাণটি স্থির করে দেয়। সে আয়ের দ্বারাই গৃহস্থ পরিবারগুলি দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মগুলি

কিনে ভোগ করে। অর্থনীতিক ব্যবস্থার একটি প্রধান কাজ 'কার জন্য উৎপাদন করা হবে' ('for whom to be produced') এইভাবেই সম্পাদিত হচ্ছে।

(২) উপাদানগুলির দাম অনুযায়ী গৃহস্থ পরিবারগুলি তাদের শ্রমশক্তি ও অন্যান্য উপাদান-সেবা কারবারী সংস্থাগুলিকে যোগান দিচ্ছে এবং কারবারী সংস্থাগুলি দাম অনুযায়ী তা কিনে নিয়ে বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদনে তা নিয়োগ করছে। সুতরাং উপাদানের দামের দ্বারা তাদের কোন্‌টি কতটা পরিমাণে কোন্ শিল্পে নিযুক্ত হবে অর্থাৎ বিভিন্ন শিল্পে বিভিন্ন পরিমাণে উপাদানগুলির নিয়োগ বা বণ্টন (allocation of resources as between different uses) আপনা থেকেই নির্ধারিত হচ্ছে। এইভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাব অন্যতম প্রধান কাজ 'কি ভাবে উৎপাদন করা হবে' ('how to produce') তা সম্পাদিত হচ্ছে।

(৩) কারবারী সংস্থাগুলির কাছে উপাদান সেবার দামগুলি হল উৎপাদন খরচ। তাই সর্বাধিকসম্ভব মুনাফা উপার্জনের উপযোগী পরিমাণে দ্রব্য (maximum profit output) সর্বনিম্ন খরচে উপাদান সমষ্টি (least cost combination of factors) নিয়োগেব দ্বাবা উৎপাদনেব চেষ্টা করতে হয়। উৎপাদনের নির্দিষ্ট কারিগরী কৌশল অনুযায়ী, কতটা কবে ভূমি, পুঁজি, শ্রম ও সংগঠন নিয়োগ করলে সর্বনিম্ন খরচে উৎপাদন কবা যাবে তা নির্ভর করে উপাদানের দামগুলির উপর।

(৪) উপাদানেব দাম নির্ধারণের প্রশ্নটির সাথে উপবোক্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি ছাডাও আবও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ন্যায়নীতি এবং সবকারী নীতির প্রশ্ন জড়িত। মিশ্র ধনতন্ত্রী সমাজে উপাদানগুলিব ক্রিয়াগত আয়-বণ্টন থেকে সমাজে ব্যক্তিগত আয়ে বৈষম্য ঘটে। জাতীয় আয়ে মজুরি ও মুনাফার আনুপাতিক অংশ কতটা হওয়া উচিত, তাতে কৃষক, শ্রমিক ও সুদভোগীদের আনুপাতিক অংশ কতটা হওয়া উচিত, ইত্যাদি প্রশ্নে সামাজিক ন্যায় বিচাব প্রতিষ্ঠা, উৎপাদনের দক্ষতা বজায় রাখা ও বিনিয়োগের বৃদ্ধি সাধন প্রভৃতি বিভিন্ন দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে সরকারকে আয় বণ্টনে বৈষম্য কমানোর উপযুক্ত নীতি গ্রহণ করতে হয়।

উপাদান-দাম (=আয়) নির্ধারণের সাধারণ তত্ত্ব
General Theory of Factor Pricing (=Income)

৫. ৩. আয় বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব
Marginal Productivity Theory of Distribution

১. উপাদানগুলির আয় বা উপাদান-সেবাগুলির দাম কি করে নির্ধারিত হয় সে সম্পর্কে অর্থবিদ্যায় প্রথম প্রচারিত তত্ত্বটির নাম হল প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব। এটি অর্থবিদ্‌দের মধ্যে নয়া-ক্লাসিক্যাল গোষ্ঠী নামে পরিচিত পণ্ডিতদের অবদান। কার্ল মেঙ্গার, বম বয়ার্ক, ওয়ালরাস, উইকস্টীড, এজওয়ার্থ ও ক্লার্ক প্রমুখ এর অন্যতম প্রবক্তা।

২. তত্ত্বটি হল: (১) পণ্য ও উপাদানের বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকলে, (২) বিভিন্ন নিয়োগের ক্ষেত্রে উপাদানগুলির নিখুঁত সচলতা থাকলে, (৩) প্রতিটি উপাদানের সমস্ত একক সমান দক্ষ হলে, (৪) উপাদানগুলি প্রয়োজনমত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য হলে, (৫) উপাদানগুলি পরস্পরের নিখুঁত পরিবর্ত হলে, (৬) পূর্ণ নিয়োগ থাকলে, (৭) দীর্ঘকালীন সময়ে—প্রতিটি উপাদানের দাম বা আয় তার **প্রান্তিক উৎপন্নের সমান হবে,** এবং মোট উৎপন্নটি চারটি উপাদানের মধ্যে নিঃশেষে বিভক্ত হয়ে পড়বে, কোন অবশিষ্টাংশ পড়ে থাকবে না।

৩. ব্যাখ্যা: (১) উপাদানগুলি হল উৎপাদনশীল; তাই এদের সাহায্যে পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এ কারণে উপাদানের চাহিদা হল উদ্ভূত চাহিদা (derived demand) এবং উৎপাদনশীলতার দরুনই উৎপাদকদের কাছে উপাদানের চাহিদা সৃষ্টি হয়। সে চাহিদা নির্ভর করে দু'টি বিষয়ের উপর—(ক) উপাদানটির উৎপাদনশীলতা (productivity) এবং (খ) উপাদানটির সাহায্যে যে পণ্যটি উৎপন্ন হয় তার বাজার দাম (price of the product)।

(২) নিখুঁত প্রতিযোগিতায় প্রতিটি উপাদানের বাজারে যে বাজার দাম থাকে, সে দামই প্রত্যেক উৎপাদক সংস্থাকে মেনে নিতে হয় (price-taker) এবং ঐ দামেই প্রত্যেক উপাদানের সমস্ত এককগুলি তাকে সংগ্রহ করতে হয়। অর্থাৎ নিখুঁত প্রতিযোগিতার উপাদান বাজারে প্রত্যেক উৎপাদক সংস্থার কাছে তার প্রতিটি উপাদানের দাম রেখা, অর্থাৎ যোগান রেখা হল একটি অনুভূমিক সমান্তরাল রেখা। সুতরাং তার কাছে প্রতিটি উপাদানের প্রান্তিক খরচ রেখা ও গড় খরচ রেখা ও দাম রেখা একটি মাত্র রেখায় পরিণত হয় (অর্থাৎ তার প্রান্তিক খরচ রেখা = গড় খরচ রেখা = দাম রেখা)।

(৩) উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধিটি (law of variable proportions) সক্রিয় থাকে। ঐ বিধি অনুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক ও গড় উৎপন্ন প্রথমে বাড়ে। পরে এক সময়ে দু'টিই, কিছুটা আগে বা পরে, সর্বাধিক হয়। পরে উভয়েই কমতে থাকে। অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ অপরিবর্তিত রেখে, একটি উপাদানের যদি একটি অতিরিক্ত একক বাড়ানো হয়, তাহলে মোট উৎপন্ন যতটুকু পরিমাণে বাড়ে তাই হল ঐ বর্ধিত উপাদানটির প্রান্তিক উৎপন্ন (marginal product)। যদি তার বস্তুগত পরিমাণটি ধরা হয় (যেমন অতিরিক্ত উৎপন্ন ১ গজ কাপড়) তাহলে সেটি হল প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্ন (marginal physical product or MPP)। কিন্তু তার দাম যদি ধরা হয় (যেমন ১ গজ কাপড় × ২৫ টাকা গজ = ২৫ টাকা) তবে সেটি হল প্রান্তিক উৎপন্নের আর্থিক মূল্য (value of the marginal product or VMP)। আর, ঐ অতিরিক্ত এক একক উপাদানটি নিয়োগের ফলে উৎপাদক সংস্থার মোট আয় যতটা বাড়ে তার পরিমাণ ধরলে (মোট বিক্রয় লব্ধ আয় যদি ২৫ টাকা বাড়ে), তাকে বলা হয় প্রান্তিক আয়

উৎপন্ন (marginal revenue product or MRP)। সুতরাং 'প্রান্তিক উৎপন্ন' কথাটির তিন রকম অর্থ হয়। এখানে আলোচনার জন্য 'প্রান্তিক উৎপন্ন' বলতে 'প্রান্তিক আয় উৎপন্নকে'ই ব্যবহার করা হল। 'গড় উৎপন্ন' (average product) শব্দটির দ্বারা তেমনি 'গড় আয় উৎপন্ন'কেই (average revenue product or ARP) বোঝান হচ্ছে। উৎপাদক সংস্থাগুলির কাছে প্রতিটি উপাদানের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখাই হল তার চাহিদা রেখা। এটি বাম দিকে উপর থেকে ডান দিকে ক্রমশ নিচে নামে, অর্থাৎ উপাদানের নিয়োগ যত বাড়তে থাকে ততই তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা (বা প্রান্তিক আয় উৎপন্ন) কমতে থাকে।

(৪) উৎপাদক সংস্থা যখন বাজার দামে কোন উপাদান (অর্থাৎ উপাদান-সেবা) সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে তখন, প্রথম দিকে বাজার দামের তুলনায় প্রান্তিক উৎপন্ন বা প্রান্তিক আয় উৎপন্ন বেশি থাকে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত সে উপাদানটির নিয়োগ বাড়াতেই থাকে। কিন্তু উপাদানটির নিয়োগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন কমতে থাকে। অবশেষে একসময়ে প্রান্তিক আয় উৎপন্ন উপাদানটির বাজার দামের সমান হয়ে পড়ে। ঐ অবস্থায় উপাদানটির যতগুলি একক নিয়োগ করা হয়েছে উৎপাদক সংস্থা ঐ উপাদানটির নিয়োগ তার বেশি বাড়ায় না। কারণ তাহলে অচিরেই বাজার দামের চেয়ে উপাদানটির প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন কম হয়ে পড়বে ও তার লোকসান ঘটবে। উৎপাদক সংস্থাগুলি ঠিক সেই পরিমাণে প্রতিটি উপাদান নিয়োগ করে, যতটা করা হলে প্রতিটি উপাদানের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন এবং তার বাজার দাম পরস্পরের সমান হয়ে পড়বে। আর তার ফলে উৎপাদক সংস্থাটি সর্বাধিক মুনাফায় ও সর্বনিম্ন খরচে উপাদানসমষ্টি নিয়োগে ভারসাম্য লাভ করবে। অর্থাৎ উপাদান নিয়োগে উৎপাদক সংস্থার ভারসাম্যের শর্তটি হল :

$$\frac{\text{শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন}}{\text{শ্রমের বাজার চলতি মজুরির হার}} = \frac{\text{পুঁজির প্রান্তিক আয় উৎপন্ন}}{\text{পুঁজির বাজার চলতি সুদের হার}}$$

$$= \frac{\text{জমির প্রান্তিক আয় উৎপন্ন}}{\text{জমির বাজার চলতি খাজনার হার}} = \frac{\text{উদ্যোগের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন হার}}{\text{উদ্যোগের বাজার চলতি মুনাফার হার}} = ১।$$

যতক্ষণ একটি উপাদানের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন অন্য একটি উপাদানের প্রান্তিক আয় উৎপন্নের চেয়ে বেশি থাকবে, ততক্ষণ উৎপাদক সংস্থাটি প্রথম উপাদানটির নিয়োগ বাড়াতে থাকবে ও দ্বিতীয়টির নিয়োগ কমাতে থাকবে। ফলে শেষ পর্যন্ত প্রথমটির প্রান্তিক আয় উৎপন্ন কমবে ও দ্বিতীয়টির প্রান্তিক আয় উৎপন্ন বাড়বে ও অবশেষে দুটিই পরস্পরের সমান হয়ে পড়বে।

(৫) নিখুঁত প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন সময়ে প্রতিটি উপাদানের দাম বা আয় শুধু তার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন নয়, তার গড় আয় উৎপন্নেরও সমান হয়। কারণ প্রান্তিক আয় উৎপন্ন গড় আয় উৎপন্নের চেয়ে কম হলে, (এবং প্রান্তিক আয় উৎপন্ন দামের সমান হয় বলে) ঐ দামে উপাদান সংগ্রহ করায় উৎপাদক সংস্থার লোকসান

হয়। সে লোকসান কমাতে সংস্থাটি উৎপাদন ও উপাদান নিয়োগ কমায়। ফলে তার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন বেড়ে গড় আয় উৎপন্নের সমান হয়। এইভাবে স্বল্পকালীন সময়ে প্রান্তিক আয় উৎপন্ন এবং গড় আয় উৎপন্নের মধ্যে ব্যবধান থাকলেও, দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদক সংস্থাগুলি এমনভাবে তাদের উপাদান নিয়োগ ও উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করে যার ফলে প্রতিটি উপাদানের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন ও গড় আয় উৎপন্ন পরস্পরের সমান হয়ে পড়ে।

(৬) উপাদানগুলির সচলতার দরুন দীর্ঘকালীন সময়ে সমস্ত শিল্পেই প্রতিটি উপাদানের এমন পরিমাণে নিয়োগ ঘটে যে প্রতি শিল্পে প্রতিটি উপাদানের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন ও গড় আয় উৎপন্ন এবং দাম (বা আয়) পরস্পরের সমান হয়ে পড়ে। কারণ, যতক্ষণ একটি শিল্পের তুলনায় আরেকটি শিল্পে একটি উপাদানের দাম, প্রান্তিক আয় উৎপন্ন ও গড় আয় উৎপন্ন বেশি থাকবে, ততক্ষণ উপাদানটির এককগুলি কম প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন ও কম উপাদান দামের শিল্পটি থেকে বেশি দাম ও প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের শিল্পটিতে চলে যেতে থাকবে। ফলে শেষ পর্যন্ত প্রথমটিতে দাম বা আয় কমবে ও দ্বিতীয়টিতে দাম বা আয় বাড়বে এবং অবশেষে দু'টিতেই তা পরস্পরের সমান হয়ে পড়বে।

(৭) সুতরাং প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব অনুযায়ী—(ক) প্রতিটি উপাদানের দাম বা আয় তার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন ও গড় আয় উৎপন্নের সমান হয়; (খ) প্রত্যেক উৎপাদক সংস্থা বা নিয়োগকারীর কাছে চারটি উপাদানের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন বা উৎপাদনশীলতা পরস্পরের সমান হয়; এবং (গ) সমস্ত শিল্পে সবগুলি উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বা প্রান্তিক আয় উৎপন্ন পরস্পরের সমান হয়। এই হল, নিখুঁত প্রতিযোগিতায় উপাদান বাজারে উপাদান নিয়োগে নিয়োগকারীরূপে উৎপাদক সংস্থাগুলির দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থা।

(৮) কিন্তু এই তত্ত্বে যে শর্তগুলি বর্তমান রয়েছে বলে অনুমান করা হয়েছে তার সবই হল অবাস্তব। তা ছাড়া, এই তত্ত্বটিতে উপাদানের দাম বা আয় কি করে নির্ধারিত হয় তা কিন্তু বলা হয়নি। বলা হয়েছে, উৎপাদক সংস্থাগুলি যে যে পরিমাণে বিভিন্ন উপাদান নিয়োগ করে তা তারা কিভাবে স্থির করে। সুতরাং উপাদান-দাম নির্ধারণের প্রশ্নটি এই তত্ত্বে স্পর্শ করা হয় নি।

৫. ৪. উপাদান-দাম নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব
Modern Theory of Factor Pricing

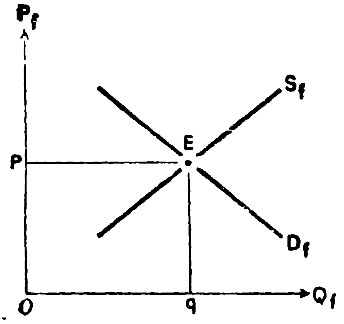
১. **তত্ত্ব ঃ** পণ্যের বাজারে পণ্যের দাম যেমন পণ্যের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়, তেমনি উপাদানের বাজারে উপাদানের দামও উপাদানের (বা উপাদান-সেবার) চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই হল উপাদান-গুলির মধ্যে আয় বণ্টনের (বা তাদের পারিশ্রমিক বা দাম নির্ধারণের) আধুনিক তত্ত্ব। এর আর এক নাম হল **বণ্টনের চাহিদা ও যোগানের তত্ত্ব**।

২. **উপাদানের চাহিদাঃ** কারবারী সংস্থাগুলি উপাদানের (বা উপাদান-সেবার) চাহিদাকারী বা ক্রেতা। তাদের কাছে উপাদানের চাহিদা নির্ভর করে উপাদানের বাজার দাম ও উপাদানের প্রান্তিক আয় উৎপন্নের (MRP) উপর। কোন উপাদানের নিয়োগ বাড়ানোর সাথে সাথে তার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন ক্রমশ হ্রাস পায়। সুতরাং কারবারী সংস্থার কাছে কোন উপাদানের **প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখাটি** বাম দিকে উপর থেকে ডানদিকে নিচে নামে, অর্থাৎ তার ঢাল হল ঋণাত্মক। কারবারী সংস্থার কাছে কোন উপাদানের প্রান্তিক আয় উৎপন্নের ঋণাত্মক ঢাল সম্পন্ন রেখাটিই হল ঐ উপাদানটির **চাহিদা রেখা।** প্রচলিত বাজার দামে প্রত্যেক কারবারী সংস্থা প্রতিটি উপাদান ঠিক সেই পরিমাণে নিয়োগ করে যতটা পরিমাণে নিয়োগের ফলে উপাদানের দাম তার প্রান্তিক আয় উৎপন্নের সমান হয়। প্রান্তিক আয় উৎপন্ন ক্রমহ্রাসমান বলে, উপাদানের বাজার দাম বেশি হলে তারা কম পরিমাণে, এবং বাজার দাম কম হলে বেশি পরিমাণে, উপাদানটি নিয়োগ করে। সুতরাং কারবারীসংস্থার কাছে উপাদানের চাহিদা রেখাটি কোন্ কোন্ দামে ঐ সংস্থা কি কি পরিমাণে উপাদান নিয়োগ করতে ইচ্ছুক তার ইঙ্গিত দেয়। (ব্যাখ্যা করে বলা যায়, যেমন পণ্যের চাহিদার ক্ষেত্রে ক্রেতারা দাম অনুযায়ী এমন পরিমাণ পণ্য কেনে, যতটা কিনলে দাম = প্রান্তিক উপযোগ হয় এবং প্রান্তিক উপযোগের ভিত্তিতে রচিত পণ্যের চাহিদা রেখা থেকে কোন্ কোন্ দামে ক্রেতারা কি কি পরিমাণে পণ্যটি কিনতে রাজী তার হদিস পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি)। প্রতিটি কারবারী সংস্থার প্রতিটি উপাদানের চাহিদা রেখাগুলি পাশাপাশি যোগ দিয়ে সেই শিল্পে উপাদানটির মোট চাহিদা রেখা তৈরী হয় (পণ্যের ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাগুলি যোগ দিয়ে যেমনভাবে বাজারে পণ্যের মোট চাহিদা রেখা তৈরী হয়, সেইভাবে)।

৩. **উপাদানের যোগানঃ** গৃহস্থ পরিবারগুলি উপাদানের মালিক হিসাবে কারবারী সংস্থাগুলিকে উপাদানের যোগান দেয়। যোগানের নিয়ম অনুযায়ী, পণ্যের যোগানের মতই উপাদানের যোগানও উপাদানের দামের উপর নির্ভর করে। উপাদানের দাম বেশি হলে উপাদানের যোগান বাড়ে, দাম কম হলে, যোগান কমে। সুতরাং উপাদানের যোগান রেখাটি ধনাত্মক ঢাল সম্পন্ন। অর্থাৎ সেটি বামদিকে নিচু থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী। অবশ্য জমি ও শ্রমের ক্ষেত্রে যোগান রেখা কিছুটা অন্যরকম হয়ে থাকে। সমাজে মোট জমির যোগান সীমাবদ্ধ বলে, সমগ্র সমাজের কাছে জমির যোগান রেখা একটি উল্লম্ব রেখার আকৃতি নেয়। কিন্তু বিভিন্ন শিল্পের কাছে জমির যোগান রেখা উল্লম্ব না হয়ে ধনাত্মক হতে পারে। যে শিল্পে জমি দাম কম পাবে সেখানে জমির যোগান কম এবং যে শিল্পে জমি দাম বেশি পাবে সেখানে তার যোগান বেশি হতে পারে। তেমনি অনেক সময় আবার মজুরির হার বেড়ে গেলে শ্রমের যোগান কমে যেতে পারে। কিন্তু এসব অসুবিধা সত্ত্বেও মোটের উপর উপাদানের যোগান রেখাকে ধনাত্মক ঢাল সম্পন্ন বলে কল্পনা করা যেতে পারে।

৪. **উপাদানের ভারসাম্য দাম নির্ধারণঃ** ৫·১ চিত্রে OPf হল উপাদানের

দাম অক্ষরেখা এবং OQf হল পরিমাণের অক্ষরেখা। Df হল যে কোন উপাদানের মোট চাহিদা রেখা (প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের ভিত্তিতে রচিত) এবং Sf হল উপাদানটির যোগান রেখা। E বিন্দুতে রেখা দুটি পরস্পরকে ছেদ করে উপাদানের বাজারে উপাদানটির ভারসাম্য দাম OP এবং ভারসাম্য চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ Oq নির্ধারণ করে দিয়েছে। এইভাবে উপাদানের বাজারে প্রত্যেকটি উপাদানের মোট চাহিদা ও মোট যোগানের দ্বারা তার দাম বা পারিশ্রমিকের হার নির্ধারিত হয়।



চিত্র ৫·১
উপাদানের দাম নির্ধারণ

খাজনা
Rent

৫. ৫. অর্থনীতিক খাজনা বা বিশুদ্ধ খাজনা
Economic Rent or True Rent

১. **সংজ্ঞা:** 'খাজনা' শব্দটির তিনটি অর্থ: (ক) সাধারণ মানুষের কাছে খাজনা বলতে বোঝায় বাড়ি, দোকানঘর, ফ্ল্যাট, জমি ইত্যাদির ব্যবহারের মূল্য-বাবদ মালিকের সাথে ব্যবহারকারীর চুক্তিবদ্ধ ভাড়া বা খাজনা। (খ) অর্থবিদ্যায় পুরাতন ক্লাসিক্যাল পণ্ডিতদের (ডেভিড রিকারডো প্রমুখ) মতে, **জমি** (অর্থাৎ বিনামূল্যে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক উপকরণের) ব্যবহারের বাবদ জমির ব্যবহারকারী জমির মালিককে যে দাম দেয় তাই হল খাজনা। (গ) আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে, উৎপাদনের **কোন উপাদান** ব্যবহারের বাবদ তার সুযোগ আয়ের বা ক্ষেত্রান্তর আয়ের (opportunity earnings or transfer earnings) অতিরিক্ত যে অর্থমূল্য দিতে হয় তাই হল খাজনা (বর্তমান আয় – সুযোগ আয়)। [উপাদানটি বর্তমানে যে কাজে নিযুক্ত রয়েছে সে কাজে নিযুক্ত না থেকে অন্য কিছু উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত হলে সেখানে যা উপার্জন করতে পারত সেই সম্ভাব্য উপার্জনকেই বলা হয় সুযোগ আয় বা ক্ষেত্রান্তর আয়।] সাধারণ মানুষের কাছে খাজনা শব্দটার প্রচলিত অর্থ থেকে অর্থবিদ্যায় খাজনা শব্দটির উপরোক্ত এবং বিশিষ্ট অর্থটিকে সুস্পষ্ট করার জন্য অর্থবিদ্যায় খাজনা শব্দটির পরিবর্তে 'অর্থনীতিক খাজনা' বা 'বিশুদ্ধ খাজনা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

২. **খাজনার প্রকৃতি:** মূল চরিত্রের বা প্রকৃতির দিক থেকে খাজনা হল উদ্বৃত্ত আয়, অতিরিক্ত আয়। কারণ, সমগ্র সমাজের দিক থেকে জমি বা প্রাকৃতিক উপকরণের যোগান সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ তার যোগান অস্থিতিস্থাপক। জমি ব্যবহারের জন্য দাম না দিলেও যেমন তার যোগান বিন্দুমাত্র কমবে

না, তেমনি তার ব্যবহার মূল্য বেশি হলেও তার যোগান বাড়বে না। অতএব **সমাজের দিক থেকে** বিবেচনা করলে, জমি বা কোন প্রাকৃতিক উপকরণের যোগান সুনিশ্চিত করার জন্য তার ব্যবহার বাবদ দাম দেবার কোন প্রয়োজনীয়তাই নেই। তবু, জমি বা প্রাকৃতিক উপকরণের যোগান অস্থিতিস্থাপক বলে এগুলির চাহিদা যখন বাড়ে এগুলির যোগান বর্ধিত চাহিদার সাথে তাল রাখতে পারে না। ফলে জমি বা প্রাকৃতিক উপকরণ চাহিদার চাপের জন্য বেশি ব্যবহার মূল্য আদায় করতে পারে। ঐ ব্যবহারমূল্যের সবটাই হল উদ্বৃত্ত আয় (surplus)। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে, ঐ ব্যবহার মূল্যের সবটা না হলেও, একটা অংশ হল খাজনা বা উদ্বৃত্ত আয়। এ উদ্বৃত্ত আয় শুধু জমি বা প্রাকৃতিক উপকরণই পায় না। যে কোন উপাদানই তার যোগানের তুলনায় চাহিদার আধিক্যের দরুন, তার সুযোগ আয় বা ক্ষেত্রান্তর আয়ের (transfer earning) তুলনায় অনেক সময় বেশি ব্যবহার মূল্য বা পারিশ্রমিক পেতে পারে। ঐ পারিশ্রমিকের মধ্যে ক্ষেত্রান্তর আয়ের অতিরিক্ত অংশটুকুই হল তার খাজনা জাতীয় আয় বা উদ্বৃত্ত আয়।

৫. ৬. রিকারডোর খাজনা তত্ত্ব
Ricardian Theory of Rent

১. ডেভিড রিকারডোর খাজনা তত্ত্বের মূল কথা হল তিনটি : (ক) জমির উর্বরতার দরুন ফসল ফলে। খাজনা হল ঐ উর্বরতা শক্তি ব্যবহারের দাম। (খ) চাষের অধীন সবচেয়ে নীরস জমির তুলনায় অপেক্ষাকৃত সরস জমিতে যে বাড়তি ফসল ফলে তাই হল ঐ সরস জমির উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা। (চাষী নিজে সে জমির মালিক হলে ঐ উদ্বৃত্ত সে-ই ভোগ করবে। নয়তো ঐ জমি নিয়ে অন্যান্য চাষীদের সাথে প্রতিযোগিতার দরুন উদ্বৃত্তের সবটাই জমির মালিককে সমর্পণ করতে বাধ্য হবে)। (গ) খাজনা বা উদ্বৃত্ত আয় কেবল সরস জমিতেই ঘটে, সবচেয়ে নীরস জমিতে নয়। কিন্তু সবচেয়ে নীরস জমিতে বা প্রান্তিক জমিতে ফসলের উৎপাদন খরচ দিয়েই ফসলের বাজার দাম নির্ধারিত হয়। যেহেতু নীরস জমিতে কোন খাজনা (বা উদ্বৃত্ত আয়) নেই ; সেহেতু নীরস জমির চাষের খরচের মধ্যে খাজনা বাবদ কোন খরচও থাকে না। তাই ফসলের দামটা খাজনা দিয়ে নির্ধারিত হয় না। বরং খাজনাই ফসলের দামের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

২. **ব্যাখ্যা :** (ক) 'জমি' বলতে রিকারডো সমগ্র সমাজের দিক থেকে মোট জমির কথা ভেবেছিলেন। সে দিক থেকে, জমি হল প্রকৃতির দান, তার কোন উৎপাদন খরচ বা যোগান-দাম নেই। সুতরাং চাষের যা কিছু খরচ, তা হল শ্রম ও পুঁজির দরুন।

(খ) সমাজে লোকসংখ্যা যখন কম, তুলনায় জমি অঢেল, তখন খাদ্যের চাহিদা কম বলে, স্বভাবতই সরস জমিতেই কেবল চাষ হবে। সব জমির উর্বরতা একই রকমের বলে সব চাষীর বিঘা প্রতি ফলনও এক হবে। ফলে কারও উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত আয় হবে না।

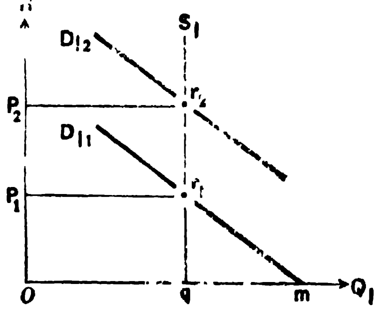
(গ) কিন্তু লোকসংখ্যা বাড়লে খাদ্যের চাহিদাও বাড়বে। এবং তখন আগের তুলনায় কম উর্বর জমিতে চাষ করতে চাষীরা বাধ্য হবে। একসাথে তখন একদল চাষী সরস জমিতে ও আরেকদল চাষী নীরস জমিতে চাষ করবে। এবার সরস জমির তুলনায় নীরস জমিতে (প্রান্তিক জমি) বিঘা প্রতি ফসলের উৎপাদন কম হবে। এবং নীরস জমির তুলনায় সরস জমিতে বিঘা প্রতি যতটুকু বেশি ফসল ফলবে তাই হবে সরস জমির উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা। এটা হল **ফলনের পার্থক্য-মূলক** খাজনা (differential rent)। জমির অবস্থানের পার্থক্যের কারণেও একই ভাবে পার্থক্যমূলক খাজনা দেখা দেয়।

(ঘ) লোকসংখ্যা বাড়লে খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধির দরুন, সরস জমির চাষীরাও তাদের জমিতে আরও বেশি শ্রম ও পুঁজি খাটিয়ে উৎপাদন বাড়াতে চেষ্টা করবে এবং ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি অনুসারে উৎপন্নের মোট পরিমাণ কমতে শুরু করবে। অবশেষে একসময়ে অতিরিক্ত (বা প্রান্তিক) একক শ্রম ও পুঁজি নিয়োগের দ্বারা উৎপন্ন ফসলের পরিমাণটির দাম চাষের খরচের সমান হয়ে পড়বে। ঐ প্রান্তিক একক শ্রম ও পুঁজির আগেকার এককগুলির দ্বারা উৎপন্ন ফসলের পরিমাণটি প্রান্তিক একক শ্রম ও পুঁজির দ্বারা উৎপন্ন ফসলের তুলনায় বেশিই ছিল এবং তা হল আগেকার একক শ্রম ও পুঁজির দ্বারা অর্জিত উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা। এইভাবে **প্রগাঢ় কৃষির** দ্বারাও খাজনার উৎপত্তি হয় এবং তা হল **স্বল্পতার দরুন** উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা (scarcity rent)।

৫. ৭. খাজনার আধুনিক তত্ত্ব
Modern Theory of Rent

১. **খাজনার আধুনিক তত্ত্ব** অনুযায়ী জমির খাজনা, জমির চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। জমির চাহিদা উৎপন্ন ফসলের চাহিদা থেকে দেখা দেয়। ফসলের চাহিদা বাড়লে জমির চাহিদা বাড়ে। ফলে খাজনাও বাড়ে।

২. **সমগ্র দেশের দিক থেকেঃ** জমির চাহিদা রেখা হল তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার বা প্রান্তিক আয় উৎপন্নের রেখা। তাই দেশের মোট জমির চাহিদা রেখাটির ঢাল হল ঋণাত্মক। কোন দেশে জমির মোট পরিমাণ সীমাবদ্ধ, অপরিবর্তনীয়। তাই কোন দেশে জমির মোট যোগান রেখাটি হল উল্লম্ব। ৫.২ চিত্রে জমির চাহিদা রেখা Dl_1 এবং যোগান রেখা Sl দেখান হয়েছে। মোট জমির পরিমাণ হল qO। কোন দেশে মোট যে পরিমাণ জমি রয়েছে তা প্রকৃতির দান এবং তার কোন উৎপাদন খরচও যেমন নেই, তেমনি কৃষি ছাড়া বিকল্প ব্যবহারের আর কোন



চিত্র ৫.২ : খাজনা

ক্ষেত্রও নেই। তাই তার সুযোগ খরচ বা ন্যূনতম যোগান দাম হল শূন্য (0)। জমির চাহিদা রেখা Dl_1 অনুভূমিক অক্ষরেখা Oq-র m বিন্দুতে গিয়ে মিলেছে। অর্থাৎ জমি ব্যবহারের দাম বা খাজনা শূন্য (0) হলে, দেশে জমির চাহিদা হয় Om পরিমাণ। কিন্তু দেশে এত জমি নেই, আছে শুধু Oq পরিমাণ। তাই চাহিদার চাপে ভারসাম্য দাম দাঁড়াল OP_1 বা r_1q, (চাহিদা রেখা Dl_1 ও যোগান রেখা Sl-এর ছেদ বিন্দু r_1 অনুযায়ী)। খাজনার পরিমাণ দাঁড়াল P_1Oqr_1 (=দাম OP_1 × জমির পরিমাণ Oq)। যদি দেশে খাদ্যের চাহিদা বাড়ে তাহলে নতুন চাহিদা রেখা হবে Dl_2। নতুন চাহিদা রেখা Dl_2 সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক যোগান রেখা Sl-কে উচ্চতর বিন্দু r_2-তে ছেদ করে খাজনার হার (অর্থাৎ জমি ব্যবহারের দামকে) OP_1 থেকে বাড়িয়ে OP_2-তে তুলবে। মোট খাজনা হবে P_2Oqr_2 (= দাম OP_2 × জমির পরিমাণ Oq)।

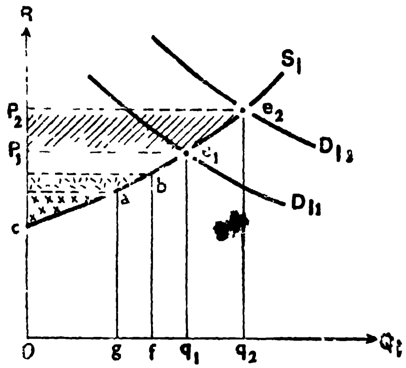
সামগ্রিকভাবে জমির কোন উৎপাদন খরচ ও বিকল্প ব্যবহার নেই বলে দেশের মোট জমির কোন ন্যূনতম যোগান দাম বা সুযোগ খরচও নেই। অর্থাৎ জমির যোগান দাম বা সুযোগ খরচ হল শূন্য (0)। তাই জমির **মোট পারিশ্রমিকটাই হল উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা**। যদি সরকার সেটা কর বসিয়ে নিয়েও নেয়, তাহলেও জমির যোগান একবিন্দুও কমবে না বা তার উৎপাদন ক্ষমতা একতিলও ক্ষুণ্ন হবে না।

এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে দেশের সব জমি সমান উর্বর এবং তাদের অবস্থানও একই রকমের। বাস্তবে কিন্তু বিভিন্ন জমির উর্বরতা ও অবস্থান বিভিন্ন। এ ধরনের বিভিন্নতা থাকলেও খাজনার আধুনিক তত্ত্বটি সপ্রমাণ করার ব্যাপারে কোন অসুবিধা হয় না। উর্বরতা এবং অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন জমির চাহিদা রেখা বিভিন্ন এবং যোগান বিভিন্ন হলেও, যোগান রেখাগুলি উল্লম্ব রেখা হবে। চাহিদা ও যোগান রেখার ছেদ বিন্দুর বিভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন জমির খাজনা বিভিন্ন হবে।

৩. **কোন একখণ্ড জমির বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের দিক থেকে (অর্থাৎ শিল্পের দিক থেকে) ঃ** সমগ্র দেশের দিক থেকে জমির কোন বিকল্প ব্যবহার নেই এবং মোট জমির পরিমাণ অপরিবর্তনীয়। সে কারণে জমির মোট যোগান রেখা উল্লম্ব হলেও, **এক খণ্ড জমির কোন দিক থেকে** তার **বহু বিকল্প ব্যবহার** সম্ভব এবং কোন শিল্পের বা ব্যবহারের ক্ষেত্রের দিক থেকে জমির যোগান অপরিবর্তনীয় নয়, বরং **পরিবর্তনীয়**। প্রতি খণ্ড জমির যোগান দাম তার সুযোগ খরচ অর্থাৎ বিকল্প আয় অর্থাৎ ক্ষেত্রান্তর আয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়। তার ব্যবহারের দাম বেশি দিতে চাইলে বিকল্প অন্যান্য ব্যবহারের ক্ষেত্র থেকে জমিখণ্ডগুলি এখানে চলে আসবে, অর্থাৎ এখানে তার যোগান বাড়বে এবং সেখানে তা দাম কম পাচ্ছে বলে সেখানে তার যোগান কমবে। পাট চাষী যদি ধান চাষীর তুলনায় জমি ব্যবহারের দাম বেশি দিতে চায় তাহলে ধান চাষীদের কাছে জমির যোগান কমবে ও পাট চাষীদের কাছে জমির যোগান বাড়বে। সুতরাং **কোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে জমিখণ্ডের যোগান রেখা উল্লম্ব না হয়ে ধনাত্মক ঢাল সম্পন্ন হয়,** অর্থাৎ **তার দাম বাড়ালে যোগান বাড়ে**। ৫·৩ চিত্রে কোন একটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে জমির যোগান রেখা Sl এই

রকম ধনাত্মক ঢাল সম্পন্ন। আর, জমির চাহিদা রেখা অবশ্যই ঋণাত্মক ঢাল সম্পন্ন হবে (৫·৩ চিত্রে জমির চাহিদা রেখা Dl_1 Dl_2 হল এই রকম রেখা)। এ রেখার এ রকম হবার কারণ হল জমির চাহিদা রেখাটি হল, জমির প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখা।

ধরা যাক, ধান চাষের ক্ষেত্রে জমির চাহিদা রেখা হল Dl_1, যোগান রেখা হল Sl এবং রেখা দু'টির ছেদ বিন্দু হল e_1 ; সুতরাং ধান চাষের ক্ষেত্রে জমি ব্যবহারের ভারসাম্য দাম হল OP_1 বা e_1q_1। এই দামের অর্থাৎ OP_1-এর সবটা কিন্তু জমির উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা নয়। ধান চাষের জন্য যদি Oq_1 পরিমাণ জমি লাগে তাহলে, চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী তা পেতে হলে OP_1 দামেই জমির মালিকদের কাছ থেকে চাষীদের তা পেতে হবে। কারণ Oq_1 পরিমাণ জমির শেষ এককের মালিক OP_1 দাম ছাড়া সে এককটি ধান চাষীকে ব্যবহার করতে দেবে না। কিন্তু Oq_1 জমির সব মালিকই যে ঐ দামে জমির যোগান দিতে রাজী ছিল তা নয়। তাদের মধ্যে অনেকে OP_1-এর চেয়ে কম দামেও জমি যোগান দিতে রাজী ছিল। যেমন, Og পরিমাণ জমির মালিক ag দামে, Of পরিমাণ জমির মালিক bf দামে জমি ব্যবহার করতে দিতে রাজী ছিল। বাস্তবিক পক্ষে, Oq_1 পরিমাণ জমির মধ্যে শেষ এককটি (Oq_1-th unit) ছাড়া আর সমস্ত এককগুলির মালিকরাই OP_1 দামের চেয়ে কম দামে তাদের জমিগুলি যোগান দিতে রাজী ছিল। অর্থাৎ তাদের জমিখণ্ডগুলির ন্যূনতম যোগান দাম ছিল OP_1-এর কম জমির যোগান Sl রেখা হল বিভিন্ন পরিমাণ জমির বা জমির বিভিন্ন এককের ন্যূনতম যোগান দামের সীমারেখা। জমিখণ্ডগুলির বিকল্প আয় বা সুযোগ খরচ কিংবা ক্ষেত্রান্তর আয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। সুতরাং Oq_1 পরিমাণ জমির ন্যূনতম যোগান দাম (= ক্ষেত্রান্তর আয় বা বিকল্প আয়) হল cOq_1e_1 ক্ষেত্রের সমান। কিন্তু OP_1 দামে Oq_1 পরিমাণ জমি তাদের মালিকরা ধান চাষীদের ব্যবহার করতে দিচ্ছে বলে জমির মালিকরা ধান চাষীদের কাছ থেকে Oq_1 পরিমাণ জমির মোট ব্যবহার মূল্য পাচ্ছে $P_1Oq_1e_1$ ক্ষেত্রের সমান। সুতরাং তারা OP_1 দামে Oq_1 পরিমাণ জমি ধান চাষীদের ব্যবহার করতে দিয়ে অতিরিক্ত আয় বা উদ্বৃত্ত আয় উপার্জন করছে $P_1Oq_1e_1$ ক্ষেত্র (= মোট দাম) - cOq_1e_1 ক্ষেত্র (= ক্ষেত্রান্তর আয় বা বিকল্প আয়) $= P_1ce_1$ ক্ষেত্র। এইটুকু হল জমির খাজনা।



চিত্র ৫·৩ : যে কোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে খাজনা

বাজারে খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়লে চালের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ধান চাষীদের কাছে জমির চাহিদাও বাড়বে। ফলে ধান চাষের জন্য জমির নতুন

চাহিদা রেখা হবে Dl_2। জমির চাহিদা রেখা Dl_2 এবং যোগান রেখা Sl-এর নতুন ভারসাম্য বিন্দু e_2 অনুযায়ী জমি ব্যবহারের দাম হবে এখন OP_2। ফলে ধান চাষের জন্য জমির মোট যোগান Oq_1 থেকে বেড়ে Oq_2 পরিমাণ হবে। (অর্থাৎ বৃদ্ধির পরিমাণ হল $q_1 q_2$) পাট ও অন্যান্য ফসলের চাষের অধীন যে জমি ছিল তা থেকে $q_1 q_2$ পরিমাণ জমি ধান চাষের জন্য চলে আসবে। অর্থাৎ ধানচাষীরা এখন বেশি দাম দিচ্ছে বলে জমির মালিকরা পাট চাষী বা অন্যান্য ফসলের চাষীদের জমির পরিমাণ কমিয়ে তা থেকে $q_1 q_2$ পরিমাণ জমি ধান চাষীদের যোগান দেবে। ধান চাষে জমি ব্যবহারের দাম OP_1 থেকে বেড়ে OP_2 হওয়ায়, $q_1 q_2$ পরিমাণ জমির একমাত্র শেষ এককটি (Oq_2-*th* unit) ছাড়া অন্য সব এককেরই ন্যূনতম যোগান দাম (= ক্ষেত্রান্তর আয়) ছিল OP_2 দামের কম। তারা সকলেই যেমন তাদের ক্ষেত্রান্তর আয়ের চেয়ে দাম যতটা বেশি ততটা উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা ভোগ করবে, তেমনি Oq_1 পরিমাণ জমিগুলির মালিকদেরও উদ্বৃত্ত আয়ের বা খাজনার পরিমাণটা আগের চেয়ে বেড়ে যাবে। এখন Oq_2 জমির মোট উদ্বৃত্ত আয় অর্থাৎ খাজনার পরিমাণ হবে P_2ce_2 ক্ষেত্র। ৫·৩ চিত্রে দেখা যাচ্ছে এ ক্ষেত্রটি = $P_2Oq_2e_2$ ক্ষেত্র − cOq_2e_2 ক্ষেত্র। ব্যাখ্যা করে বলা যায়, $P_2Oq_2e_2$ ক্ষেত্রটি হল Oq_2 জমির মোট দাম (বা মোট আয়), আর, cOq_2e_2 ক্ষেত্রটি হল ঐ জমির ন্যূনতম যোগান দাম (বা ক্ষেত্রান্তর আয়)। চাষীরা যদি জমির মালিক হয়, তবে তারা নিজেরাই এই উদ্বৃত্ত আয় ভোগ করবে। জমির মালিক আর কেউ হলে প্রতি-যোগিতার ফলে চাষীরা জমির মালিককে সবটা উদ্বৃত্ত আয় দিয়ে দিতে বাধ্য হবে।

সুতবাং খাজনার আধুনিক তত্ত্ব অনুযায়ী,—(১) চাহিদা ও যোগান দ্বারা জমির ব্যবহারের দাম নির্ধারিত হয়; (২) জমির প্রান্তিক আয় উৎপন্নের দ্বারা তার চাহিদা দাম এবং চাহিদা রেখা নির্ধারিত হয়; আর, জমির বিকল্প আয়ের (বা ক্ষেত্রান্তর আয়ের) দ্বারা তার ন্যূনতম যোগান দাম ও যোগান রেখা নির্ধারিত হয়; (৩) সমগ্র সমাজের দিক থেকে জমির বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর আয় নেই বলে তার কোন ন্যূনতম যোগান দাম নেই। এ কারণে, **সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে জমির আয়ের সবটাই হল উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা**; (৪) **কিন্তু প্রতি জমি-খণ্ডের একাধিক বিকল্প ব্যবহার আছে** বলে তার বিকল্প আয় (বা ক্ষেত্রান্তর আয়) আছে এবং তা দিয়ে তার ন্যূনতম যোগান দাম নির্ধারিত হয়; (৫) **তার বাস্তব আয় থেকে ক্ষেত্রান্তর আয়** বা ন্যূনতম যোগান দাম **যতটুকু কম ততটুকুই হল** তার **উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা**; (৬) **জমি ছাড়াও অন্য যে কোন উপাদানের বাস্তব আয়ের তুলনায় ক্ষেত্রান্তর** বা বিকল্প **আয় কম হতে পারে এবং** সেক্ষেত্রে তার **আয়ের মধ্যে উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা থাকতে পারে**।

৫. ৮. খাজনা ও দাম
Rent and Price

১. **খাজনার সাথে দামের সম্পর্কটা কি? অর্থাৎ, জমির খাজনার সাথে জমি**

ব্যবহারের জন্য যে দাম দিতে হয় তার সম্পর্কটা কি? কিংবা কোন উপাদানের আয়ে (=তার বাজার দাম) যে খাজনা বা উদ্বৃত্ত আয় থাকে বা থাকতে পারে তার সাথে ঐ উপাদানটির দামের সম্পর্কটা কি? জমির বা অন্য কোন উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনা নামে উদ্বৃত্ত আয়টা অন্তর্ভুক্ত থাকে বলেই কি তার দামটা বাড়ে, না, তার দামটা বাড়ে বলেই তার আয়ের মধ্যে তার বিকল্প আয়ের বা ক্ষেত্রান্তর আয়ের, (=তার ন্যূনতম যোগান দামের) অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত আয়টা ঘটে?

২. ধরা যাক, মালিকদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় জমি বন্দোবস্ত নিতে ধান চাষীদের বিঘা প্রতি ১০ টাকা করে ব্যবহার-মূল্য দিতে হচ্ছে (চলতি কথায় সাধারণ মানুষ যাকে 'খাজনা' বলে)। ধান চাষের জন্য জমির এই ব্যবহার মূল্যটা (১০ টাকা) ধার্য হয়েছিল তার ন্যূনতম যোগান দাম হিসাবে। সেটা আবার অন্য কোন ফসলের চাষী ১ বিঘা জমি ব্যবহারের জন্য (১০ টাকা) দেয় বলে ঐ টাকাই জমির বিকল্প আয় বা ক্ষেত্রান্তর আয় হিসাবে নির্ধারিত হয়েছিল। চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য দ্বারা নির্ধারিত, জমি ব্যবহারের ভারসাম্য দাম ছিল বিঘা প্রতি ১০ টাকা। কিন্তু দেশে খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় চালের দাম বেড়ে গেল। তখন ধান চাষীরা আরো বেশি পরিমাণে ধান চাষ করতে চাওয়ায় তাদের কাছে জমির চাহিদা বেড়ে গেল। তখন ধান চাষের ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের নতুন ভারসাম্য অনুসারে বিঘা প্রতি জমি ব্যবহারের দাম দাঁড়াল ১৫ টাকায়। অন্যান্য ফসলের চাষে বিঘা প্রতি জমির বিকল্প আয় ১০ টাকার তুলনায় এখন ধান চাষের ক্ষেত্রে জমি ব্যবহারের দাম বিঘা প্রতি ১৫ টাকা হওয়ায় অন্যান্য ফসলের চাষীদের কাছ থেকে মালিকরা জমি নিয়ে ধান চাষীদের বন্দোবস্ত দেবে ও এমনি করে অন্যান্য ফসলের অধীন জমির পরিমাণ কমবে ও ধান চাষের অধীন জমির পরিমাণ বাড়বে। কিন্তু ধান চাষের ক্ষেত্রে এখন বিঘা প্রতি জমির যে ১৫ টাকা করে ব্যবহার-মূল্য দিতে হচ্ছে, তার মধ্যে ঐ জমির বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর আয় হল ১০ টাকা, **বাকি ৫ টাকা হল বিকল্প আয়ের অতিরিক্ত আয় অর্থাৎ উদ্বৃত্ত আয়। এই উদ্বৃত্ত আয় হল খাজনা।** আগে জমির ব্যবহার মূল্য যখন বিঘা প্রতি ১০ টাকা ছিল, সেটা ছিল জমির বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর আয়ের সমান। তাতে বিকল্প আয়ের অতিরিক্ত কিছু, অর্থাৎ খাজনা বলে কিছু ছিল না। কিন্তু এখন জমির ব্যবহার মূল্য বেড়ে ১৫ টাকা হওয়ায়, তার মধ্যে বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর আয়ের অতিরিক্ত একটা অংশ অর্থাৎ খাজনা দেখা দিল। চালের দাম যদি আরও বাড়ে, তাহলে ধান চাষের জন্য জমির চাহিদা আরো বেড়ে গিয়ে ধান চাষের জন্য জমির ব্যবহার মূল্যটাকে ২০ টাকায় পরিণত করতে পারে। তখন ঐ ২০ টাকার মধ্যে খাজনার পরিমাণও বেড়ে ১০ টাকা হবে। সুতরাং **খাজনার জন্য দাম বাড়ে না। দাম বাড়লেই খাজনা দেখা দেয় এবং দাম বাড়লে খাজনাও বাড়ে।** কোন জমিখণ্ডের বা কোন উপাদানের খাজনা বা উদ্বৃত্ত আয় নির্ভর করে তার দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের দামের উপর। উৎপাদিত পণ্যের দাম বাড়লে, উপাদানটির চাহিদাও বাড়বে, ফলে

উপাদানটির ব্যবহারের দামও বাড়বে এবং তার ফলে তার আয়ের মধ্যে বিকল্প আয়ের বা ক্ষেত্রান্তর আয়ের তুলনায় অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত আয় অর্থাৎ অর্থনীতিক খাজনাও বাড়বে [৫·৩ চিত্রে দ্রষ্টব্য]।

৫. ৯. খাজনাজাতীয় আয়
Quasi Rent

১. ইংলণ্ডের অর্থনীতিবিদ্ ডেভিড রিকারডো সর্বপ্রথম খাজনা তত্ত্ব প্রচার করেন। তাঁর মতে খাজনা হল জমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের দাম এবং প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকদেব আয়। তাঁর মতে, কৃষি ছাড়া জমির কোন বিকল্প ব্যবহার নেই এবং সমাজের মোট জমির ও প্রাকৃতিক সম্পদের যোগানটিও সীমাবদ্ধ। তাই, সমাজেব দিক থেকে জমির কোন ন্যূনতম যোগান দামও নেই। অতএব ফসলের চাহিদা ও দাম বাড়লে জমিরও চাহিদা এবং ব্যবহারের দাম বাড়ে। **জমির বিকল্প ব্যবহার ও বিকল্প আয় নেই বলে তার ব্যবহার মূল্যের সবটাই হল উদ্বৃত্ত আয় বা অর্থনীতিক খাজনা।** জমির স্বল্পতা হল চিবস্থায়ী। সুতরাং জমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক উপকরণের খাজনা নামে উদ্বৃত্ত আয়টাও স্থায়ী বিষয়।

২. রিকারডোর পরে, ইংলণ্ডের অর্থনীতিবিদ্ আলফ্রেড মার্শাল এই অভিমত প্রকাশ করেন, মানুষেব দ্বারা তৈরী যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামের যোগান জমির মত চিরনির্দিষ্ট না হলেও, স্বল্পকালীন সময়ের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। স্বল্পকালীন সময়ে সে সবের যোগান বাড়ানো যায় না। কিন্তু স্বল্পকালীন সময়ে মানুষের তৈরী যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের চাহিদা যোগানের তুলনায় বেশি হতে পারে। স্বল্পকালীন সময়ে চাহিদা বৃদ্ধির দরুন এই সব যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম তাদের স্বাভাবিক আয়ের (=সেগুলি সচল ও সক্রিয় রাখার খরচ) অতিরিক্ত আয় উপার্জন করতে সক্ষম হতে পারে। স্বল্পকালীন সময়ে এই ধরনের উপকরণ তাদের স্বাভাবিক আয়ের অতিরিক্ত যে আয়টুকু উপার্জন করতে সক্ষম হয় মার্শাল তার নাম দিয়েছেন **খাজনা জাতীয় আয়**। মার্শালের মতে তা সম্পূর্ণ 'খাজনা' বলে গণ্য করা যায় না, কারণ ঐ উপকরণগুলির যোগান স্বল্পকালীন সময়ে অপরিবর্তনীয় বলে, কেবল স্বল্পকালীন সময়েই তাবা এই অতিরিক্ত আয়টুকু উপার্জন করতে পারে। এগুলি মানুষের তৈরী বলে, দীর্ঘকালীন সময়ে এদের যোগান বাড়ানো সম্ভব এবং তা বাড়েও। ফলে দীর্ঘকালীন সময়ে এদের চাহিদা ও যোগান ভারসাম্য লাভ করে এবং তাদের ভারসাম্য দাম সে ভাবেই নির্ধারিত হয়। সে দামে ঐ উপকরণগুলি তাদের দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক আয় উপার্জন করে। তখন স্বল্পকালীন অতিরিক্ত আয়টা (অর্থাৎ খাজনা জাতীয় আয়টা) সম্পূর্ণ দূর হয়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হঠাৎ জাহাজের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। ফলে জাহাজ ভাড়াও খুব বাড়ে। নতুন জাহাজ তৈরির সময় নেই বলে, পুরনো যত জাহাজ যেখানে পড়েছিল তা মেরামত করে তখন ভাড়া দেওয়া হতে থাকে। এইভাবে তখন

জাহাজগুলি তাদের স্বাভাবিক আয়ের থেকে অনেক বেশি উপার্জন করেছিল। এটা হল মার্শালের 'খাজনা জাতীয় আয়ের' একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত। সুতরাং মার্শালের মতানুসারে—'খাজনা জাতীয় আয়' হল: (১) মানুষের দ্বারা তৈরী যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের, (২) স্বল্পকালীন সময়ের জন্য, স্বাভাবিক আয়ের অতিরিক্ত উপার্জন; (৩) দীর্ঘকালীন সময়ে তা থাকে না।

৩. খাজনার আধুনিক তত্ত্বের ক্ষেত্রান্তর বা বিকল্প আয়ের ধারণাটির সাহায্যেও 'খাজনা জাতীয় আয়'-এর ব্যাখ্যা করা যায়। আধুনিক অর্থনীতিবিদরা কারবারী সংস্থার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় (total revenue) ও মোট পরিবর্তনীয় খরচের পার্থক্যটাকে (TR – TVC) তার স্বল্পকালীন 'খাজনা জাতীয় আয়' বলে গণ্য করেন। দীর্ঘকালীন সময়ে কারবারী সংস্থার 'খাজনা জাতীয় আয়' বলে কিছু থাকে না। কারণ, তখন তার মোট আয় ও মোট খরচ পরস্পরের সমান হয় (TR = TC)। মার্শালও কারবারী সংস্থার স্বল্পকালীন সময়ে পণ্যের গড়পড়তা মুখ্য খরচ বা পরিবর্তনীয় খরচের তুলনায় দাম যতটুকু বেশি হয় তাকে কারবারী সংস্থার 'খাজনা জাতীয় আয়' বলে গণ্য করেছেন।

৫. ১০. খাজনা ও অর্থনৈতিক প্রগতি
Rent and Economic Progress

১. অর্থনৈতিক প্রগতি বলতে প্রধানত তিনটি বিষয় বোঝাতে পারে: (১) কৃষি পদ্ধতির উন্নতি; (২) পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি; (৩) দেশবাসীর আয় ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নতি। জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে দেশের অগ্রগতির পরিচায়ক বলে গণ্য করা যায় কিনা তা বিতর্কের বিষয়। তবে, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে খাজনা যে প্রভাবিত হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই।

(১) খাজনার উপর কৃষিপদ্ধতির উন্নতির ফলাফল: দেশে উন্নত ধরনের কৃষি পদ্ধতি প্রবর্তিত হলে সাধারণভাবে জমির ফলন বাড়ে এবং তার ফলে ফসলের মোট উৎপাদন বাড়ে। চাহিদা অপরিবর্তিত থাকলে দেশে খাদ্যশস্যের দাম কমবে। ফলে জমির চাহিদাও কমবে এবং জমি ব্যবহারের দামও কমবে। তার ফলে জমি ব্যবহারের দামের মধ্যে বিকল্প আয়ের তুলনায় অতিরিক্ত আয় বা **অর্থনৈতিক খাজনাও কমবে।**

(২) খাজনার উপর পরিবহণের উন্নতির ফলাফল: পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি হলে অনেক দূরের জমি থেকেও কম খরচে বাজারে ফসল পৌঁছানো সম্ভব হবে। ফলে চাষের জন্য শহর-বাজারের কাছের জমির চাহিদা আগের তুলনায় কম হবে এবং দূরের জমির চাহিদা বাড়বে। কাছের জমির চাহিদা হ্রাসের ফলে তা ব্যবহারের দাম এবং সে দামের অন্তর্ভুক্ত বিকল্প আয়ের তুলনায় অতিরিক্ত আয় বা **অর্থনৈতিক খাজনাও কমবে।** আর অন্যদিকে, দূরের জমির চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় সে জমির ব্যবহারের দাম বাড়বে এবং সেখানে তার বিকল্প আয় কম বলে ঐ দামের অন্তর্ভুক্ত বিকল্প আয়ের অতিরিক্ত আয় বা **অর্থনৈতিক খাজনা বাড়বে।**

(৩) **খাজনার উপর আয়ের ও জীবনযাত্রার উন্নতির ফলাফল ঃ** দেশের জনসাধারণের আয় ও জীবনযাত্রার মান যখন অতি নিচু স্তর থেকে উপরে উঠতে শুরু করে, তখন খাদ্যশস্য সমেত সব রকম দ্রব্যের চাহিদাই তাদের কাছে বাড়তে থাকে (ভারতে যেমন হয়েছে)। ফলে খাদ্যের চাহিদা ও দাম বেড়ে যাওয়ায় চাষের জমির চাহিদা বাড়বে এবং জমি ব্যবহারের দামও বাড়বে। এ কারণে ঐ দামের অন্তর্ভুক্ত বিকল্প আয়ের তুলনায় অতিরিক্ত আয় বা অর্থনীতিক খাজনাও বাড়ে। দেশবাসীর আয় ও জীবনযাত্রার মান যখন ক্রমশ বেড়ে চলে তখন একটা নির্দিষ্ট সীমার পরে আয় যতটা বাড়ে খাদ্যের চাহিদা ও ভোগব্যয় তার চেয়ে অনেক কম বাড়ে। ফলে, তখন খাদ্যশস্যের দাম ও জমির চাহিদা আর বিশেষ বাড়ে না বলে জমি ব্যবহারের দাম এবং **খাজনাও** আর **বিশেষ বাড়ে না**।

৫. ১১. অন্যান্য উপাদানের আয়ে খাজনার অংশ
Rent Element in Other Factor Incomes

আধুনিক খাজনা তত্ত্বের মতে, কেবল জমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক উপকরণের আয়েই নয়, মজুরি (শ্রমের আয়), সুদ (পুঁজির আয়) এবং মুনাফার (সংগঠনের আয়) মধ্যেও বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর আয়ের (অর্থাৎ ন্যূনতম যোগান দামের) অতিরিক্ত আয় বা অর্থনীতিক খাজনার অংশ থাকতে পারে।

(১) **মজুরির মধ্যে খাজনার অংশ** (rent element in wages) ঃ লেদ মেশিনের শ্রমিকদের দৈনিক আট ঘণ্টা পরিশ্রমের প্রচলিত মজুরি যদি ১০ টাকা হয়, তাহলে যে কোন কারখানায় লেদ মেশিনের শ্রমিক নিতে হলে তাকে দৈনিক ১০ টাকা মজুরি দিতেই হবে। তা না হলে লেদচালক পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে ঐ ১০ টাকা মজুরির সবটাই হল শ্রমিকটির ক্ষেত্রান্তর বা বিকল্প আয়ের (transfer earning) সমান। কেননা অন্য কোন কারখানায় কাজ করলে সে দৈনিক ঐ মজুরিই পেত। যে কারবারী সংস্থা তাকে নিয়োগ করবে তার কাছে মজুরির ঐ ১০ টাকার সবটাই হবে শ্রমিকটিকে তার কাছে নিযুক্ত রাখার ন্যূনতম খরচ বা ক্ষেত্রান্তর খরচ (transfer payment)। কিন্তু নিয়োগকারী কারবারী সংস্থায় যদি লেদচালকের কাজের খুব বেশি চাহিদা থাকে এবং কোন লেদচালক যদি বেকার না থাকে (অর্থাৎ লেদচালকদের যোগান যদি অস্থিতিস্থাপক হয়) তাহলে অন্য কারখানার লেদচালকদের কিছুটা বেশি মজুরি দিয়ে, (ধরা যাক, ১০ টাকার বদলে ১২ টাকা দিয়ে) যোগাড় করতে হতে পারে। তখন পুরনো লেদচালক এবং নতুন লেদচালক সকলেই ১২ টাকা দৈনিক মজুরি পাবে। তখন নতুন ও পুরনো সব লেদচালকই তাদের ক্ষেত্রান্তর আয় ১০ টাকার চেয়ে ২ টাকা বেশি মজুরি উপার্জন করবে (তাদের মজুরি ১২ টাকা = ক্ষেত্রান্তর আয় ১০ টাকা + খাজনা বা উদ্বৃত্ত আয় ২ টাকা)।

অনেক ক্ষেত্রেই অনেকে তাদের কাজে খুব পারদর্শী বা সুদক্ষ হয়ে ওঠে। অর্থবিদ্যার ভাষায় এটা হল **বিশিষ্টতা লাভ**। এ ধরনের পারদর্শী লোকের জায়গায়

নতুন কোন লোক নিয়োগ করলে অসুবিধা হয়। কারণ, নতুন লোকের কাছ থেকে তেমন ভাল কাজ পাওয়া যায় না। ফলে ন্যূনতম যোগান দামের বা অন্যত্র বিকল্প আয়ের তুলনায় বর্তমান নিয়োগক্ষেত্রে এরা অনেকে বেশি উপার্জন করে। অর্থাৎ তখন তাদের উপার্জনের বেশির ভাগই হল উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা। যে চিত্রতারকা শর্টহ্যাণ্ড-টাইপরাইটিং জানে আবার চমৎকার অভিনয়ও করতে পারে, সে অভিনয়ে যে মোটা অর্থ উপার্জন করে সেটার অধিকাংশই হল তার বিকল্প আয়ের (পারসোন্যাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হিসাবে সে কাজ করলে যে বেতন পেত তার) উদ্বৃত্ত বা খাজনা। নাম করা ডাক্তার, উকীল, ব্যারিস্টারদের আয়ের অধিকাংশই হল খাজনা।

(২) **সুদের মধ্যে খাজনার অংশ** (rent element in interest): অর্থবিদ্যায় পুঁজি হল প্রকৃত পুঁজি বা পুঁজিদ্রব্য, যন্ত্রপাতি। তাতে যে আর্থিক পুঁজি খাটে (=ঐ যন্ত্রের দাম) তা হল কারবারী সংস্থার বিনিয়োগ। ঐ যন্ত্রটি উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করার জন্য বিনিয়োগ করা পুঁজিকে যে পারিশ্রমিক দিতে হয় তা হল পুঁজির সুদ। একটি যন্ত্রের যদি একাধিক বিকল্প ব্যবহার থাকে তা হলে অন্য কোন বিকল্প ব্যবহারে তার যে আয় হতে পারে তার দ্বারা কোন ক্ষেত্রে যন্ত্রটি ব্যবহারের দাম বা ন্যূনতম যোগান দাম বা সুদ নির্ধারিত হবে। কোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা হবে যন্ত্রটির ক্ষেত্রান্তর আয়। কিন্তু যদি কোন ক্ষেত্রে যন্ত্রটি তার থেকে বেশি আয় উপার্জন করে অর্থাৎ বেশি সুদ পায় তা হলে সে ক্ষেত্রে, ঐ সুদের মধ্যে ক্ষেত্রান্তর আয়ের অতিরিক্ত অংশটুকু হবে তার উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা।

কিন্তু অনেক যন্ত্র এমন যে, তা তৈরি করে একটি কারখানা বা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বসান হলে, স্বল্পকালীন সময়ে তার আর বিকল্প ব্যবহারের কোন সম্ভাবনা থাকে না। তখন তা একটি মাত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টতা বা বিশিষ্টতা লাভ করে। সেখানে তা ব্যবহার না করলেও চলে না। এরকম ক্ষেত্রে সে যন্ত্র থেকে যেটুকু আয় হয় তার সবটাই প্রায় খাজনা ধরা যেতে পারে। ধরা যাক, কোন একটি ক্ষেত্রে একটি যন্ত্র বসানো হয়েছে এবং তা থেকে যন্ত্র চালানোর খরচ বাদে বৎসরে ১ হাজার টাকা আয় হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, বাজারে পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ায় বৎসরে তা থেকে খরচ বাদে আয় হচ্ছে ৫ শত টাকা। এখানে যেহেতু যন্ত্রটির আর কোন বিকল্প ব্যবহারের সুযোগ নেই (একমাত্র বিকল্প হল যন্ত্রটি ব্যবহার না করে ফেলে রাখা) সেহেতু তার বিকল্প আয় হল শূন্য (তারও খরচ, অবচয় অবপূতি আছে); সে কারণে, স্বল্পকালীন সময়ে যন্ত্রটি চালু রাখার সুযোগ খরচ বাদে অতিরিক্ত আয় যতটুকু হবে তার সবটাই হল খাজনা (মার্শালের ভাষায় 'খাজনাজাতীয় আয়')। কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে, যন্ত্রটি যতদিন কর্মক্ষম থাকবে ততকাল যদি খরচ বাদে তা থেকে বিনিয়োগকারীর অন্যত্র অনুরূপ বিনিয়োগ থেকে যে পরিমাণ আয় হয় বা হতে পারে, অন্তত সে পরিমাণ আয় না হয় তাহলে সে ঐ যন্ত্রটি ব্যবহার করবে না। সুতরাং দীর্ঘকালীন সময়ে সুদ

ক্ষেত্রান্তর আয়ের সমান হয়ে পড়ে এবং তাতে খাজনা নামক কোন উদ্বৃত্ত আয় থাকে না।

(৩) **মুনাফার মধ্যে খাজনার অংশ** (rent element in profit) **:** স্বল্প-কালীন সময়ে, অন্যান্য উপাদানের মত সংগঠন ক্ষমতার যোগানও অস্থিতিস্থাপক হয়। কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে তার যোগান বৃদ্ধি সম্ভব। সুতরাং দীর্ঘকালীন সময়ে অন্যান্য বিকল্প ক্ষেত্রে সংগঠনের পারিশ্রমিক বা মুনাফা যা হবে, যে কোন একটি ক্ষেত্রেও তাই হবে। অর্থাৎ দীর্ঘকালীন সময়ে মুনাফার হার সংগঠন-ক্ষমতার ক্ষেত্রান্তর আয়ের সমান হয়। কিন্তু স্বল্পকালীন সময়ে পুঁজির মতই সংগঠন-ক্ষমতাও যেখানে নিযুক্ত থাকে সেখানেই সে ক্ষমতা 'বিশিষ্ট' হয়ে পড়ে। এর অর্থ হল, স্বল্পকালীন সময়ে সংগঠন ক্ষমতার বিকল্প ব্যবহারের সুযোগ থাকে না। তখন তার বিকল্প আয় শূন্য (0) হয়ে পড়ে। এ কারণে স্বল্পকালীন সময়ে মুনাফার সবটাই খাজনা বলে গণ্য করা যায়।

মজুরি
Wages

৫.১২. মজুরি
Wages

১. মানুষ পণ্য নয়। কিন্তু এই মানুষই দামের বিনিময়ে তার শ্রমশক্তিকে পণ্যের মত বিক্রি করে। যে দামে শ্রমশক্তি বিক্রি হয় তার নাম হল মজুরি, কিংবা আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে, মজুরির হার। অন্যান্য উপাদানের মতই এটা হল শ্রমনিয়োগকারী কারবারী (বা উৎপাদক) সংস্থার খরচ এবং উপাদান মালিকের (অর্থাৎ এক্ষেত্রে 'শ্রমিকের') আয়।

২. অর্থবিদ্যায় সমস্ত উপাদান-আয়ের মধ্যে মজুরির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। সমাজের ভোগী পরিবার বা গৃহস্থ পরিবারগুলির অধিকাংশেরই মজুরি হল আয়ের একমাত্র বা সর্বপ্রধান উৎস। কারখানার শ্রমিক, অফিস-কর্মী, ব্যবস্থাপনা-কর্মী, ডাক্তার, উকীল, শিক্ষক, ছোট কারবারী, কৃষক, কুটির শিল্পের কারিগর, প্রভৃতির আয় হল বাস্তবিক পক্ষে শ্রমের পারিশ্রমিক। সে হিসাবে, ভারতের মত দেশে মজুরি হিসাবে মোট আয় হল মোট জাতীয় আয়ের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি।

৩. মজুরি সম্পর্কে আলোচনায় মনে রাখতে হবে, মজুরি বলতে বোঝায় সময়ের নির্দিষ্ট একক পিছু (যেমন, ঘণ্টা বা দিন বা মাস পিছু) মজুরির বা পারিশ্রমিকের হার। কিংবা ফুরনে কাজ হলে, কাজের নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুযায়ী পারিশ্রমিকের বা মজুরির হার।

৫.১৩. প্রকৃত মজুরি ও আর্থিক মজুরি
Real and Nominal Wages

১. **আর্থিক মজুরি :** যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে কায়িক বা মানসিক শক্তি

ব্যবহার করে একজন ব্যক্তি যে আর্থিক আয় উপার্জন করে সেটা হল তার আর্থিক মজুরি। যেমন, দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দ্বারা দিন ১০ টাকা হিসাবে একজন শ্রমিক সপ্তাহে (৬ দিনে) ৬০ টাকা উপার্জন করলে সেটা হল তার আর্থিক মজুরি। কিংবা, প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা পরিশ্রমের জন্য ১০ টাকা মজুরি দেওয়া হলে, এটা আর্থিক মজুরির হার বলে গণ্য করা যায়। সুতরাং আর্থিক মজুরি নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপর: (১) মজুরির হার (সময়ের একক পিছু কিংবা ফুরনে কাজ হলে উৎপন্ন দ্রব্যের একক পিছু পারিশ্রমিক) এবং (২) যতটা সময় কাজ হয়েছে কিংবা ফুরনে কাজ হলে যে পরিমাণ কাজ করা হয়েছে। আর্থিক মজুরি থেকে কোন ব্যক্তির মোট উপার্জিত অর্থের পরিমাণ জানা যায়, কিন্তু তা থেকে তার প্রকৃত অর্থনীতিক অবস্থাটি কি তা বোঝা যায় না।

২. **প্রকৃত মজুরি:** শ্রমিকের প্রকৃত অর্থনীতিক অবস্থাটা কি তা জানতে হলে, তার আর্থিক মজুরি ছাড়াও আরো কতকগুলি বিষয় জানা দরকার হয়, যেমন, ঐ আর্থিক মজুরি দিয়ে সে কতটা দ্রব্যসামগ্রী কিনতে পাবে, তার কাজের শর্তাবলী কি রকম, আর্থিক মজুরি ছাড়া সে মালিক বা নিয়োগকর্তার কাছ থেকে আর কোন সুবিধা পায় কি না, সে কাজটি থেকে বেতন বাদে অতিরিক্ত আয়ের সুবিধা আছে কিনা, কিংবা অবসর সময়ে অতিরিক্ত আয় উপার্জনের সুযোগ আছে কিনা। তবেই শ্রমিকের প্রকৃত অর্থনীতিক অবস্থাটা কি তা জানা সম্ভব হয়।

মূল্যস্তর কম হলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক মজুরিতে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী কেনা যায়, মূল্যস্তর বেশি হলে সে তুলনায় কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী কিনতে পাওয়া যায়। কাজটি স্থায়ী হলে, ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা থাকলে, বিপজ্জনক না হলে, অবসরকালীন ভাতার ব্যবস্থা এবং এ ধরনের আরো সুযোগ সুবিধা থাকলে কাজের শর্তাবলী অনুকূল হয়। কাজটি অস্থায়ী হলে, উন্নতির সম্ভাবনা না থাকলে, কাজটি বিপজ্জনক হলে, অবসরকালীন ভাতা, ছুটি প্রভৃতির ব্যবস্থা না থাকলে কাজের শর্তাবলী প্রতিকূল বলে গণ্য হয়। আর্থিক মজুরি ছাড়াও অনেক কাজে, বিনা খরচায় পোশাক, স্বল্পদামে খাদ্যদ্রব্য, বিনা ভাড়ায় বা কম ভাড়ায় বাসস্থান প্রভৃতি সুবিধা পাওয়া যায়। শিক্ষকরা প্রাইভেট ট্যুশন করে অতিরিক্ত আয় উপার্জনের সুযোগ পান, অনেক কাজে অবসর সময়ে অন্যত্র পার্ট-টাইম কাজ করে অতিরিক্ত উপার্জনের সুযোগ থাকে।

আর্থিক মজুরির দ্বারা মূল্যস্তর অনুসারে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম কেনা যায়, এবং সেই সাথে কাজটির শর্তাবলী অনুযায়ী যেসব সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করা যায় তার সমষ্টিকে বলে প্রকৃত মজুরি। প্রকৃত মজুরির দ্বারাই শ্রমিকের প্রকৃত অর্থনীতিক অবস্থাটি জানা যায়।

সুতরাং প্রকৃত মজুরি নির্ভর করে: (১) আর্থিক মজুরির পরিমাণ, (২) দ্রব্য-মূল্যস্তর (বা টাকার ক্রয় ক্ষমতা), (৩) কাজের শর্তাবলী, (৪) অন্যান্য সুবিধা, এবং (৫) অতিরিক্ত আয় উপার্জনের সুযোগ ইত্যাদির উপর। আর্থিক মজুরির পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকলেও দ্রব্যমূল্যস্তর যত কম, কাজের শর্তাবলী যত অনুকূল

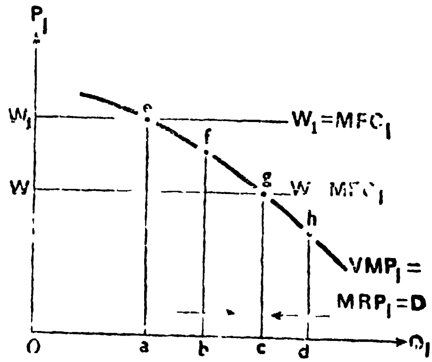
এবং অন্যান্য সুবিধা ও সুযোগ যত বেশি হবে, প্রকৃত মজুরিও তত বেশি হবে। দ্রব্য-মূল্যস্তর যত বেশি, কাজের শর্তাবলী যত প্রতিকূল এবং অন্যান্য সুবিধা ও সুযোগ যত কম হবে, প্রকৃত মজুরিও তত কম হবে।

৫. ১৪. মজুরি সম্পর্কে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব
Marginal Productivity Theory of Wages

১. **তত্ত্ব:** মজুরি সম্পর্কে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটির বক্তব্য হল: (১) উৎপন্ন দ্রব্য ও উপাদান-সেবা, উভয় বাজারেই যদি বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা থাকে, (২) উপাদানগুলি যদি প্রয়োজন মত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত করা যায়, (৩) প্রতিটি উপাদানের সমস্ত একক যদি সমান দক্ষ হয়, (৪) অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ অপরিবর্তিত রেখে তাদের সাথে যদি কোন উপাদান ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়, (৫) উপাদানগুলি যদি সচল থাকে, (৬) অপরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়মটি যদি সক্রিয় থাকে এবং (৭) দেশে যদি সমস্ত উপাদান সম্পূর্ণভাবে কাজে নিযুক্ত থাকে, তাহলে মজুরির হার শেষ পর্যন্ত শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের ও প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান হবে।

২. **ব্যাখ্যা:** (১) শ্রমের বাজারে ক্রেতা হল কারবারী সংস্থাগুলি। বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতায় শ্রমের বাজারে বহুসংখ্যক কারবারী সংস্থা থাকে এবং তাদের কেউই এককভাবে শ্রমের বাজারে চলতি মজুরির হার কমাতে পারে না। বাজারে যে মজুরির হার প্রচলিত থাকে সে-হারেই মজুরি দিয়ে প্রত্যেক কারবারী সংস্থা প্রয়োজন মত কম বা বেশি শ্রমিক সংগ্রহ করে। সুতরাং **যে কোন কারবারী সংস্থার কাছে** শ্রমের দাম বা **মজুরির হারের রেখাটি** ভূমিতল অক্ষরেখার **সমান্তরাল একটি রেখায় পরিণত হয়। এটি হল** বাস্তবিক পক্ষে যে কোন কারবারী সংস্থার কাছে **শ্রমের যোগান রেখা।**

৫.৪ চিত্রে OW মজুরির হার হলে, WW হল মজুরি হারের রেখা। এ রেখাটি OQ_1 রেখার অনুভূমিক সমান্তরাল। মজুরি হল কারবারী সংস্থার অন্যতম খরচ। সুতরাং মজুরির (হারের) রেখা WW-কে কারবারী সংস্থার খরচ রেখা বলেও গণ্য করা যায়। শ্রমিক নিয়োগ সংখ্যা যাই হোক না কেন, মজুরির হার যদি একই থাকে তাহলে মজুরির হার যা হবে, একজন অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগের খরচও সর্বদাই তার সমান হবে। সুতরাং মজুরির হার (OW) = শ্রমের প্রান্তিক খরচ (MFC_1) হবে। অর্থাৎ একই মজুরির হার ও প্রান্তিক শ্রম খরচে



চিত্র ৫.৪: শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ও মজুরির হার

কোন কারবারী সংস্থা যতজন ইচ্ছা শ্রমিক নিয়োগ করতে পারে। কারবারী সংস্থার কাছে **মজুরির রেখাই হল শ্রমের প্রান্তিক খরচ রেখা।**

(২) যে কোন কারবারী সংস্থার কাছে মজুরির হার হল শ্রমের যোগান দাম ও শ্রমের প্রান্তিক খরচ। ঐ খরচে সে কতজন শ্রমিক নিয়োগ করবে তা নির্ভর করে তার কাছে শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের উপর (VMP_1)। অন্যান্য উপাদান নিয়োগ অপরিবর্তিত রেখে একটি শ্রমিক বেশি নিয়োগ করলে মোট উৎপন্ন যতটুকু বাড়বে তা হল শ্রমের প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্ন (MPP); তার আর্থিক মূল্যটাই হল শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য (VMP_1)। শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য যতটা, শ্রমের চাহিদাকারী বা নিয়োগ কর্তা হিসাবে কারবারী সংস্থা কখনই তার বেশি পারিশ্রমিকে অতিরিক্ত একজন শ্রমিক নিয়োগ করতে রাজী হবে না। অর্থাৎ কারবারী সংস্থার কাছে শ্রমের চাহিদা দাম, শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। সুতরাং প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের রেখা হল **শ্রমের চাহিদা রেখা।** পণ্যের বাজারে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা থাকলে বাজার দামে শ্রমের প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্নের মূল্য যা হবে (VMP_1), ঐ প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্নটি বিক্রি করলে কারবারী সংস্থার মোট আয়ও ততটুকুই বাড়বে [=প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (MRP_1)]। সুতরাং উৎপন্নের বাজারে ও শ্রমের বাজারে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা থাকলে, শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য (VMP i) =শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (MRP_1) হবে। কিন্তু পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধিটি সক্রিয় থাকলে শেষ পর্যন্ত (অন্যান্য অপরিবর্তিত উপাদানের সাথে ক্রমশ শ্রমিক নিয়োগ বাড়ানো হতে থাকলে) শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন কমতে থাকবে। এ কারণে শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের রেখাটি বাম দিকে উপর থেকে ডান দিকে নিচে নামতে থাকে। অতএব প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের রেখা (=প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখা) একটি ঋণাত্মক ঢাল সম্পন্ন রেখার আকৃতি নেয়। এটিই কারবারী সংস্থার কাছে শ্রমের চাহিদা রেখা। ৫·৪ চিত্রে $VMP_1 = MRP_1$ রেখাটি হল সে রেখা।

(৩) একটি কারবারী সংস্থা শ্রমিক নিয়োগ করতে গিয়ে দেখল বাজারে প্রচলিত মজুরির হার হল OW। ফলে তার কাছে মজুরি হারের রেখা বা শ্রমের প্রান্তিক খরচ রেখা হল সমান্তরাল $WW = MFC_1$ রেখা। তার কাছে শ্রমের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের রেখা বা শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখা হল $VMP_1 = MRP_1$ রেখা। সে যদি Ob পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করে তাহলে তার কাছে মজুরির হার OW-এর চেয়ে শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য ও শ্রমের আয়-উৎপন্ন fb হবে বেশি। মজুরির হারের চেয়ে প্রান্তিক আয় উৎপন্ন এখানে বেশি বলে কারবারী সংস্থাটি Ob পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগে ক্ষান্ত না হয়ে শ্রমিক নিয়োগ আরও বাড়াবে। →তীর চিহ্ন দিয়ে তা দেখান হয়েছে। আবার যদি Od পরিমাণ শ্রমিক নিযুক্ত হয় তাহলে তখন মজুরির হার OW-র তুলনায় শ্রমের আয় উৎপন্ন hd হবে কম। এটা লোকসান। তাই তখন শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ কমানো হবে। কিন্তু Oc পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগে মজুরির হার OW=প্রান্তিক আয় উৎপন্ন

gc। সুতরাং মজুরির হার OW হলে কারবারী সংস্থাটি Oc পরিমাণ শ্রমিকই নিয়োগ করবে। কারণ ঐ পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগে মজুরির হার = শ্রমের আয় উৎপন্ন। এর কারণ, g বিন্দুতে শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য ও আয় উৎপন্ন রেখাটি ($VMP_1 = MRP_1$) নিচে নামতে নামতে মজুরির হারের ও শ্রমের প্রান্তিক খরচের রেখা ($WW = MFC_1$)-কে ছেদ করে নিচে নেমে গিয়ে ভারসাম্য শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ Oc নির্ধারণ করে দিয়েছে। বাজারে প্রচলিত মজুরির হার যদি OW না হয়ে OW_1 হয়, তাহলে মজুরির হার ও শ্রমের প্রান্তিক খরচ রেখা ($W_1W_1 = MFC_1$)-কে শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য ও প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখা ($VMP_1 = MRP_1$)-কে e বিন্দুতে ছেদ করে ভারসাম্য শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ Oa নির্ধারণ করে দেবে। কারণ, তখন OW_1 মজুরির হারে, Oa পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগের ফলে শ্রমের প্রান্তিক খরচ ও মজুরির হার শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন ও প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের সমান হবে। তবে, শ্রমের প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্ন এবং সেহেতু প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য ও শ্রমের আয় উৎপন্ন রেখা ঋণাত্মক ঢাল সম্পন্ন বলে, স্পষ্টতঃই মজুরির হার বেশি হলে শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ কম (যেমন OW মজুরির হারে Oa পরিমাণ) এবং মজুরির হার কম হলে শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ বেশি (যেমন, OW মজুরির হারে Oc) হবে।

অতএব, যে কোন মজুরির হারে প্রতিটি কারবারী সংস্থা ঠিক সেই সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে, যে পরিমাণ নিয়োগের ফলে মজুরির হার = শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য = শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন হয়।

(৪) **সমালোচনা :** এই তত্ত্বটির মূল দুর্বলতা হল, বাজারে প্রচলিত মজুরির হার কেন এবং কিভাবে যে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি কারবারী সংস্থার কাছে শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্নের সমান হয় তা ব্যাখ্যা করলেও, বাজারে প্রচলিত ঐ মজুরির হারটি কোন্ কোন্ বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয় সে প্রশ্নের উত্তর দেয় না।

৫. ১৫. মজুরির চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব
Demand and Supply Theory of Wages

১. আধুনিক অর্থবিদ্দের মতে, শ্রমের বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা বা অনিখুঁত প্রতিযোগিতা, যে অবস্থাই থাকুক না কেন, শ্রমের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা মজুরির হার নির্ধারিত হয়ে থাকে।

২. কিন্তু 'শ্রম' সমগুণসম্পন্ন একক নিয়ে গঠিত কোন উপাদান নয়। বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা-উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকরা হল আলাদা আলাদা গোষ্ঠী। কারণ, কোন দু'জন শ্রমিক যেমন ঠিক এক রকম নয় তেমনি ভিন্ন ভিন্ন কাজে নিযুক্ত শ্রমিক গোষ্ঠীর মধ্যেও রয়েছে গুণগত ও মানগত বিরাট পার্থক্য। প্রতি ক্ষেত্রে এরকম পৃথক পৃথক শ্রমগোষ্ঠীর চাহিদা ও যোগান দ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে তাদের মজুরির হার নির্ধারিত হয়।

৩. শ্রমের চাহিদা হল উদ্ভূত চাহিদা। এর উৎপত্তি শ্রমের উৎপাদনশীলতা

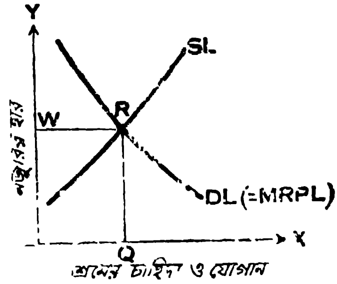
থেকে এবং তা নির্ভর করে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতার উপর। এ কারণে, নিয়োগকারী উৎপাদক সংস্থার কাছে শ্রমের চাহিদা-দাম শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের ও শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের বেশি হয় না। পণ্যের ও শ্রমের বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকলে এবং ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি সক্রিয় থাকলে, শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের (VMPL) ও শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের (MRPL) সমান হবে। (কিন্তু প্রতিযোগিতা অনিখুঁত হলে, শ্রমের চাহিদা-দাম শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের সমান হলেও শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের চেয়ে কম হবে।) শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন রেখাকে শ্রমের চাহিদা রেখা বলে গণ্য করা যায়। কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে শ্রমের চাহিদা রেখাটি এবং তার স্থিতিস্থাপকতা তিনটি মুখ্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে: (ক) উৎপাদনের কারিগরী অবস্থা; (খ) শ্রমিক গোষ্ঠীটির দ্বারা উৎপন্ন পণ্যের চাহিদা; (গ) অন্যান্য উপাদানের দাম।

৪. সব শ্রম সমরূপ নয় বলে শ্রমের সাধারণ মোট যোগান বলে কিছু নেই। তবু বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য শ্রমের স্বল্প ও দীর্ঘকালীন যোগান রেখা কল্পিত হয়ে থাকে। স্বল্পকালীন সময়ে শ্রমের যোগান নির্ভর করে: (ক) জনসংখ্যা; (খ) কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির অনুপাত; (গ) গড়পড়তা সাপ্তাহিক কাজের ঘণ্টা; (ঘ) দক্ষতা; (ঙ) কাজের প্রতি সাধারণ মানুষের মনোভাব—ইত্যাদির উপর। দীর্ঘকালীন সময়ে শ্রমের যোগান নির্ভর করে: (ক) জন্মহার ও মৃত্যুহার; এবং (খ) মজুরির হার বৃদ্ধির দীর্ঘকালীন প্রতিক্রিয়া—প্রভৃতির উপর। ধরে নেওয়া হয়, স্বল্পকালীন সময়ে মজুরির হারের হ্রাসবৃদ্ধিতে মানুষের কাজ করার ইচ্ছা প্রভাবিত হয় এবং দীর্ঘকালীন সময়ে মজুরির হারের বৃদ্ধিতে শ্রমের যোগান বাড়ে। তবে স্বল্পকালীন সময়ে মজুরির হার বাড়লে কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমের যোগান না বেড়ে, কমে যেতেও পারে। এটি হল যোগান রেখার সাধারণ আকৃতির (আগাগোড়া ধনাত্মক ঢালের) ব্যতিক্রমের ক্ষেত্র। (এরকম ক্ষেত্রে শ্রমের যোগান রেখা ডানদিকে উঠতে উঠতে বামদিকে মোড় নেয়। অর্থাৎ কম মজুরিতে শ্রমের যোগান বাড়ে ও বেশি মজুরিতে শ্রমের যোগান কমে।)

৫. যে পারিশ্রমিক পেলে শ্রমিকেরা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম যোগাতে রাজি হয়, তা হল শ্রমের যোগান দাম। সাধারণত, বেশি যোগান দামে শ্রমিকেরা বেশি পরিমাণে শ্রম সরবরাহে রাজি থাকে। তাই শ্রমের যোগান রেখাটির ঢাল হল ধনাত্মক (ডানদিকে উর্ধ্বগামী)। প্রত্যেক শ্রমগোষ্ঠীর শ্রমের যোগান-দাম, যোগান রেখা ও তার স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে: (ক) শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান, (খ) সুযোগ আয় বা বিকল্প আয়, (গ) শ্রমিকদের সংঘ শক্তি, (ঘ) দেশে কর্মসংস্থানের স্তর—ইত্যাদির উপর।

৬. মজুরির হার নির্ধারণ: নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রত্যেক শ্রম-গোষ্ঠীর শ্রমের চাহিদা ও যোগানের অবস্থা অনুযায়ী শ্রমের চাহিদা ও যোগান রেখার

ছেদ বিন্দুতে মজুরির ভারসাম্য হার নির্ধারিত হয়। ৫·৫ চিত্রে শ্রমের চাহিদা রেখা DL(=MRPL) ও যোগান রেখা SL-এর ছেদবিন্দু R অনুযায়ী মজুরির ভারসাম্য হার OW এবং শ্রমের চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য পরিমাণ OQ নির্ধারিত হয়েছে।



চিত্র ৫·৫

পণ্যের বাজার ও শ্রমের বাজার, উভয় ক্ষেত্রেই কিংবা দুটির মধ্যে যে কোন একটিতে, প্রতিযোগিতা অনিখুঁত হলে, মজুরির হার শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের চেয়ে কম হবে। ফলে শ্রমিক শোষণ ঘটবে।

৫.১৬ শ্রমিক ইউনিয়ন ও মজুরি Trade Unions and Wages

১. অর্থবিদ্যার বিশ্লেষণে দেখা যায়, পণ্য এবং উপাদানের বাজারে যদি বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা থাকে, তাহলে বাজারে প্রচলিত মজুরির হার প্রত্যেক কারবারী সংস্থায় শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের সমান হবে। কিন্তু তখন বাস্তবে মজুরির হার কম হলে শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ বেশি হবে। শ্রমিকেরা যদি ইউনিয়ন গড়ে মজুরি বৃদ্ধির দাবি করে এবং সে দাবি যদি নিয়োগ কর্তারা মেনে নেয়, তা হলে কর্মে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা কমবে। তবে, বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতায়ও, শ্রমিক ইউনিয়ন যদি সদস্যদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির চেষ্টা করে ও তাতে সফল হয়, তাহলে মজুরির হার বেড়ে নতুন উচ্চতর প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার সমান হবে।

২. উপাদানের বাজারে কম বা বেশি পরিমাণে একজন বা মুষ্টিমেয় একচেটিয়া প্রভাবশালী উপাদান-ক্রেতার বা চাহিদাকারীর (অর্থাৎ কারবারী সংস্থার) প্রাধান্য থাকলে শ্রমের দাম বা মজুরির হার শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের (= শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্নের) সমান না হয়ে তার কম হবে। সুতরাং শিল্পের অন্তর্গত সমস্ত কারবারী সংস্থার শ্রমিকরা সাধারণ ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে শ্রমের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে মজুরির হার বাড়াতে সক্ষম হতে পারে। শিল্পের সমস্ত শ্রমিকদের মজুরির **সাধারণ স্তর** ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ফলে বাড়তে পারে।

৩. অনেক ক্ষেত্রে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দ্বারা সমগ্র শিল্পের সকল শ্রেণীর বা অংশের শ্রমিকদের মজুরির হার বাড়ানো সম্ভবপর না হলেও, শিল্পটির বা যে কোন শিল্প সংস্থার **শ্রমিকদের কোন বিশেষ অংশের** মজুরির হার বাড়ানো সম্ভব হতে পারে। কোন শিল্পের বা কারবারী সংস্থার শ্রমিকদের একাংশ (যারা একই ধরনের কাজে নিযুক্ত রয়েছে এমন শ্রমিকরা) যদি নিজেদের ইউনিয়ন গঠন করে (বৃত্তিগত ইউনিয়ন বা 'ক্র্যাফ্‌ট্‌ ইউনিয়ন' যেমন রেলের গার্ড প্রভৃতিদের লোকো স্টাফ ইউনিয়ন, রাজমিস্ত্রীদের ইউনিয়ন, ইত্যাদি) মজুরি বৃদ্ধির দাবি করে, তাহলে তাদের প্রচেষ্টা সফল হতেও পারে। তবে তার সাফল্য নির্ভর করবে এই

বিষয়গুলির উপর : (১) নিয়োগকর্তা বা মালিকের কাছে তাদের শ্রমের (অর্থাৎ কাজের) চাহিদা অস্থিতিস্থাপক কি না (অর্থাৎ তাদের বাদ দিয়ে কাজ চালানো যায় কি না) ; (২) মোট উৎপাদন খরচের মধ্যে ঐ শ্রমিকদের মোট মজুরিটা তুলনায় সামান্য কি না ; (৩) ঐ শ্রমিকদের পরিবর্তে সে কাজটি অন্য শ্রমিকদের দিয়ে বা অন্য উপাদানের (যন্ত্র বা পুঁজি) দ্বারা করানো যায় কি না।

যদি তারা নিয়োগকর্তার কাছে অপরিহার্য হয়, যদি তাদের মোট মজুরি পণ্য উৎপাদনের মোট খরচের অতি সামান্য অংশ হয় এবং তারা যে ধরনের শ্রমের যোগান দেয় সে শ্রমেব যদি পরিবর্ত (substitute) না থাকে, তাহলে তাদের দাবি আদায়ে সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি হবে।

তবে নিয়োগকর্তা শ্রমিকদের কোন অংশের মজুবিবৃদ্ধির দাবি মেনে নিতে বাধ্য হলেও নিজের বিক্রিব ও মুনাফার পরিমাণ সব সময় বজায় রাখার চেষ্টা করে। এ উদ্দেশ্যে নিয়োগকর্তাকে যেটা বিশেষ ভাবে দেখতে হয় সেটা হল, যে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি হয়েছে তাদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক অথবা অস্থিতিস্থাপক। (ক) পণ্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হলে নিয়োগকর্তা চেষ্টা করে, বর্ধিত হারে মজুরি দিতে নিয়োগকর্তার যে অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে সে খরচের টাকাটা অন্যান্য শ্রমিকদের (অর্থাৎ যারা ট্রেড ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ হয়নি বা যারা অদক্ষ) মজুরি কমিয়ে পুষিয়ে নিতে যাতে তার সংস্থার মোট মজুরি-খরচটা অপরিবর্তিত থাকে। এটা করা সম্ভব হলে শ্রমিকদের একাংশের মজুরির হার বাড়লে অন্য অংশেব মজুরির হার কমে। (খ) পণ্যটির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হলে নিয়োগকারী কারবারী সংস্থা শ্রমিকদের কোন অংশের মজুরি না কমিয়ে মজুরি বৃদ্ধির জন্য তাকে যতটা অতিরিক্ত ব্যয় করতে হচ্ছে তার সবটুকুই ক্রেতাদের কাছ থেকে তুলে নেবার জন্য পণ্যের দামটা বাড়িয়ে দিতে পারে।

৪. কিন্তু সদস্যদের মজুরির হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষমতা দু'টি বিষয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ : (ক) শ্রমের দ্বারা **উৎপন্ন দ্রব্যটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মাত্রা**—শ্রমশক্তি হল একটি উপাদান এবং উপাদান হিসাবে তার চাহিদা সৃষ্টি হয় তার দ্বারা তৈরী পণ্য বা সেবাকর্মটির চাহিদা থেকে। মজুরি বাড়ালে পণ্য উৎপাদনের খরচ বাড়ে। পণ্য উৎপাদনের খরচ বাড়লে এটাই স্বাভাবিক যে, উৎপাদনকারী সংস্থা পণ্যের দামটি বাড়াতে চাইবে। পণ্যটির দাম বাড়ান হলে পণ্য বিক্রির ওপর কি প্রতিক্রিয়া হবে তা নির্ভর করবে পণ্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক না অস্থিতিস্থাপক তার ওপর। পণ্যটির চাহিদা যদি বেশি স্থিতিস্থাপক হয় তবে পণ্যের দাম বাড়ালে পণ্যটির চাহিদা কমবে। পণ্যটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যত কম হবে পণ্যটির দাম বাড়ালে চাহিদা হ্রাসের সম্ভাবনাও তত কম হবে। সুতরাং পণ্যটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশি হলে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির চেষ্টা সফল হবার সম্ভাবনা কম। আর, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম হলে মজুরি-বৃদ্ধির চেষ্টায় সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি হবে। (খ) শ্রমের পরিবর্ত-উপাদানের (পুঁজির) **পরিবর্ততার স্থিতিস্থাপকতার** (elasticity of substitution) মাত্রা

—শ্রমের পরিবর্তে পুঁজি ব্যবহার করা যত সহজে সম্ভব হবে মজুরি বৃদ্ধির সম্ভাবনা তত কম হবে; শ্রমের পরিবর্তে পুঁজি ব্যবহার করা যত কঠিন হবে মজুরি বৃদ্ধির সম্ভাবনা তত বেশি হবে। তবে শ্রমের পরিবর্ত হিসাবে পুঁজি ব্যবহার করা যদি সহজ হয়, তাহলেও পুঁজির যোগান যদি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া না যায়, অর্থাৎ পুঁজির যোগান যদি স্থিতিস্থাপক না হয়, তাহলে মজুবি বৃদ্ধি মেনে নিতে নিয়োগকর্তা বাধ্য হতে পারে।

৫. ১৭. মজুরির সাধারণ স্তর নির্ধারণ
Determinants of the General Level of Wages

১. মজুরির সাধারণ স্তর হল দেশে সমস্ত ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের বিভিন্ন ধরনের মজুরির হারের গড। আর্থিক মজুরির গড় হলে তাকে বলে আর্থিক মজুরির সাধারণ স্তর। প্রকৃত মজুরির গড হলে বলে প্রকৃত মজুরির সাধারণ স্তর। প্রকৃত মজুরির সাধারণ স্তর-এর ধাবণাটি হল বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

২. প্রকৃত মজুরির সাধারণ স্তর তিনটি প্রধান বিষয়ের উপর নির্ভব করে: (ক) শ্রমের উৎপাদনশীলতা; এটি হল মজুরির স্তবেব মূল বনিয়াদ। (খ) বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনীতিক, রাষ্ট্রনীতিক প্রতিষ্ঠানিক উপাদানের প্রভাব—সমাজব্যবস্থা, সামাজিক ধ্যান ধারণা, প্রথা, রীতি নীতি, শ্রমিক আন্দোলনের সবলতা ও দুর্বলতা, শ্রমের সচলতা বা তার অভাব, নিয়োগকাবী সংস্থাগুলির প্রভাব প্রতিপত্তি, সংখ্যা, ও একচেটিয়া ক্ষমতা, সরকারী শ্রমনীতি, বিভিন্ন সরকারী আইন ও বিধিব্যবস্থা, জাতীয় আয়ে বণ্টন-বৈষম্যের মাত্রা, কর্মসংস্থানেব স্তর প্রভৃতি মজুরির স্তরকে গভীর-ভাবে প্রভাবিত করে। (গ) বহির্বাণিজ্যের শর্তাবলী (অর্থাৎ রপ্তানির সাথে আমদানির বিনিময় হার) অনুকূল হলে কম পরিমাণে রপ্তানির দ্বারা তুলনায় বেশি পরিমাণে পণ্য আমদানি করা যায়। তাতে দেশেব প্রকৃত আয় বাডে এবং সমাজের অন্যান্য অংশের সাথে শ্রমিকরাও তার সুফলের অংশ পায়। এর ফলে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি বা আয় বাড়ে। বাণিজ্যের শর্ত প্রতিকূল হলে এর বিপরীত অবস্থা ঘটে।

সুদ
Interest

৫. ১৮. সুদ
Inte:est

১. সুদ হল অন্যের অর্থ বা ঋণ ব্যবহারের দাম। ঋণ ব্যবহারের জন্য দেয় এ দামই হল অর্থনীতিক সুদ বা খাঁটি সুদ বা নীট সুদ। সুদটা টাকাতেই দেওয়া হয় এবং যত টাকা ঋণ করা হয় তার একটা নির্দিষ্ট শতাংশ সুদ রূপে হিসাব করা হয়। কারণ এটাই ঋণদাতা ও খাতক উভয়ের পক্ষে সুবিধাজনক।

২. কিন্তু ঋণ, অর্থাৎ আর্থিক ঋণ নিজে কোন অর্থনীতিক উপকরণ নয়। কারণ

টাকা নিজে উৎপাদনশীল নয়। কারণ শুধু টাকা দিয়ে কোন কিছুই উৎপাদন করা যায় না। তবু কারবারীরা যে টাকা ঋণ করে তার কারণ ঐ টাকা দিয়ে তারা কারখানা, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, ইত্যাদি পুঁজিদ্রব্য খরিদ করতে পারে। এবং ঐ পুঁজিদ্রব্যগুলি উৎপাদনের কাজে সাহায্য করে। তাই, টাকা বা আর্থিক পুঁজির ব্যবহারটা কিনে কারবারীরা তার মারফত আসলে প্রকৃত পুঁজিদ্রব্যের ব্যবহারটাই কিনে থাকে। এই কারণে, দরকারী পুঁজিদ্রব্য কেনার উদ্দেশ্যে কারবারীরা যে টাকা ধার করে তার উপর দেয় সুদের হার কখনও পুঁজিদ্রব্যের অনুমিত প্রান্তিক আয় উৎপন্নের বেশি হয় না।

৩. **সুদের হারের বিভিন্নতার কারণঃ** অর্থবিদ্যার আলোচনায় সুদের হার কিভাবে নির্ধারিত হয়, তা আলোচনা করা হয় বলে, মনে হতে পারে যে সুদের হার বুঝি একটি মাত্রই হয়ে থাকে। বাস্তবে কিন্তু সুদের হারের যথেষ্ট বিভিন্নতা দেখা যায়। তার কারণগুলি হল: (ক) বিভিন্ন ধরনের ঋণের আদায়ের ঝুঁকি বিভিন্ন মাত্রার। ঝুঁকি যত বেশি, সুদের হার তত বেশি হয়। (খ) বিভিন্ন ঋণের মেয়াদ বিভিন্ন। যে ঋণের মেয়াদ যত বেশি তার সুদের হার তত বেশি। (গ) ঋণের পরিমাণের বিভিন্নতার দরুন সুদের হার বিভিন্ন হয়। ঋণের পরিমাণ বেশি হলে সুদের হার বেশি হয়। (ঘ) বিভিন্ন ঋণের উদ্দেশ্য বিভিন্ন। ভোগের জন্য ঋণের সুদের হার বেশি, কারবারের ও উৎপাদনের জন্য ঋণের সুদের হার কম হয়। কৃষি ঋণের সুদের হার শিল্প বা ব্যবসায়ের ঋণের জন্য সুদের হারের চেয়ে বেশি হয়। (ঙ) ঋণের বাজারের অনিখুঁত অবস্থার দরুন সুদের হারের বিভিন্নতা ঘটে। এজন্য স্থানীয় ও গ্রাম্য মহাজনের ঋণের সুদের হার বেশি এবং শহর নগরে ব্যাঙ্কের ঋণের সুদের হার কম হয়। উৎপাদনের উদ্দেশ্যে যে ঋণ নেওয়া হয়, উৎপন্ন সম্পদ থেকে তার উপর সুদটা সহজেই দেওয়া যায় বলে সুদ পাওয়াটা সুনিশ্চিত হয়। কিন্তু ভোগের জন্য যে ঋণ দেওয়া হয় তার উপর সুদ দেওয়ার ও পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা থাকে না। তাই উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নেওয়া ঋণের ঝুঁকি কম ও ভোগের উদ্দেশ্যে নেওয়া ঋণের ঝুঁকি বেশি। তেমনি, কৃষির ফসলটা অনিশ্চিত প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে বলে শিল্পের জন্য ঋণের তুলনায় কৃষি ঋণের ঝুঁকি বেশি। তাই, শিল্প ঋণের তুলনায় কৃষি ঋণের উপর সুদের হার বেশি হয়।

(৪) ঋণের মেয়াদের উপরও সুদের হার নির্ভর করে। **ঋণের মেয়াদ** যত বেশি, সুদের হারও তত বেশি হয়। এ কারণে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের তুলনায় স্বল্পমেয়াদী ঋণের সুদের হার কম হয়।

(৫) ঋণের পরিমাণের উপরও সুদের হার নির্ভর করে। **ঋণের পরিমাণ** যত বেশি, সুদের হার তত কম হয়। কারণ, ঋণের মেয়াদ ও ঝুঁকি এক, এরকম দুটি ঋণের ক্ষেত্রে, ঋণের জন্য ঋণদাতার যে মোট খরচ খরচা পড়ে তা অল্প ও বেশি পরিমাণের ক্ষেত্রে মোটামুটি এক বলে, তা তুলতে হলে, স্বল্প পরিমাণ ঋণের উপর সুদের হারটা বেশি হয়ে যায়।

অর্থনীতিবিদরা যাকে **বিশুদ্ধ সুদের হার** (=আর্থিক পুঁজির ব্যবহারের দাম)

বলে গণ্য করেন, দীর্ঘমেয়াদী সরকারী ঋণের উপর সুদের হারটাকে তার নিকটতম বাস্তব দৃষ্টান্ত বলে ধরা যায়। কারণ এর ঝুঁকি ও খরচ-খরচা সামান্যতম এবং বাজারের তারতম্যের দ্বারা এটি বিশেষ প্রভাবিত হয় না।

৫. ১৯. সুদ ও পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব

Interest and Marginal Productivity Theory of Capital

১. প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব অনুযায়ী, সুদের হার পুঁজির প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের (=প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের) সমান হয়।

২. **পুঁজির চাহিদা:** পুঁজি উৎপাদনশীল বলে কারবারী সংস্থাগুলির কাছে পুঁজির চাহিদা দেখা দেয়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়মটির দরুন শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি উপাদানেরই প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্ন (MPP), প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য (VMP) ও প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন (MRP) কমতে থাকে। পণ্যের ও পুঁজির বাজারে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা থাকলে, (পুঁজির প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য ও প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন পরস্পরের সমান হয় এবং) কোন কারবারী সংস্থার কাছে পুঁজির প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের রেখাটি (=প্রান্তিক আয় উৎপন্নের রেখাটি) ঋণাত্মক ঢাল নিয়ে বাম দিকে উপর থেকে ডান দিকে নিচে নামে। কোন কারবারী সংস্থাই পুঁজি ব্যবহারের জন্য তার প্রান্তিক আয়-উৎপন্নের চেয়ে বেশি দাম দেবে না। তাই যে কোন কারবারী সংস্থার কাছে পুঁজির প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের রেখাটি (=প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন রেখা) হল পুঁজির চাহিদা রেখা।

৩. **পুঁজির যোগান:** পুঁজির বাজারে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা থাকলে, যে কোন কারবারী সংস্থা বাজারে প্রচলিত সুদের হারে তার যতটা পরিমাণ পুঁজি প্রয়োজন (কম বা বেশি) তা সংগ্রহ করতে পারে। সুতরাং কারবারী সংস্থার কাছে বাজারে প্রচলিত সুদের হার বা পুঁজি ব্যবহারের দাম যা, পুঁজির দরুন প্রান্তিক খরচও তাই হয়। সুতরাং তার কাছে সুদের হার রেখা (=পুঁজির প্রান্তিক খরচ রেখা) অনুভূমিক রেখার সমান্তরাল একটি রেখায় পরিণত হয়।

৪. **ভারসাম্য:** যতক্ষণ পর্যন্ত কারবারী সংস্থার কাছে বাজারে প্রচলিত সুদের হারের তুলনায় (=পুঁজির প্রান্তিক খরচ) পুঁজির আয় উৎপন্ন বা প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য বেশি থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে পুঁজি ঋণ করতে থাকে। ফলে শেষ পর্যন্ত সে ঠিক ততটা পরিমাণে পুঁজি ঋণ করে, যতটা পরিমাণে পুঁজি ব্যবহার করলে বাজারে প্রচলিত সুদের হার (=পুঁজির প্রান্তিক খরচ) এবং পুঁজির প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য (=পুঁজির আয়-উৎপন্ন) পরস্পরের সমান হবে। জ্যামিতির ভাষায়, পুঁজির চাহিদা রেখাটি (=প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের রেখা = পুঁজির আয়-উৎপন্ন রেখা) উপর থেকে নিচে নামতে গিয়ে যে বিন্দুতে বাজারে প্রচলিত সুদের হারের রেখাটিকে (=পুঁজির প্রান্তিক খরচের রেখাকে) ছেদ করবে, সে বিন্দু অনুযায়ী কারবারী সংস্থার ব্যবহার্য পুঁজির পরিমাণ নির্ধারিত হবে। সুদের হার বেশি হলে কারবারী সংস্থায় পুঁজি নিয়োগের পরিমাণ কম ও সুদের হার কম হলে পুঁজি নিয়োগের পরিমাণ বেশি হবে; এবং নিয়োগের পরিমাণটি সর্বদাই ততটা হবে, যতটা

হলে বাজারে প্রচলিত সুদের হার = পুঁজির প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য (= পুঁজির প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন) হয়।

৫. ২০. সুদ সম্পর্কে ঋণযোগ্য তহবিলের তত্ত্ব

The Loanable Funds Theory of Interest

১. নয়া-ক্লাসিক্যাল পণ্ডিতদের অভিমত এই, ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা সুদের হার নির্ধারিত হয়ে থাকে।

২. ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা: (ক) সমাজে ঋণযোগ্য তহবিলের মোট চাহিদার একটি প্রধান অংশ হল বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে পুঁজিদ্রব্য কেনার জন্য কারবারীদের কাছে ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা। এ হল বিনিয়োগের (Investment) জন্য চাহিদা। তা করতে গিয়ে কারবারীদের যথাসম্ভব হিসাব করতে হয়, ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা মনে রেখে, ঐ প্রস্তাবিত ঋণ নিয়ে তা বিনিয়োগের দ্বারা, নতুন পুঁজিদ্রব্যের দামবাবদ খরচ, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও তা ব্যবহারের খরচ-খরচা বাদে সম্ভাব্য নীট আয় কতটা হতে পারে। ঐ নীট সম্ভাব্য আয়টাকে যে পুঁজিদ্রব্যটি কেনা হবে তার দামের শতাংশ রূপে প্রকাশ করা যায় এবং তা সুদের হারের সাথে তুলনীয়। নতুন কেনা পুঁজিদ্রব্যের দামের শতাংশ রূপে প্রকাশিত তার সম্ভাব্য নীট আয়টাই হল পুঁজিদ্রব্যটির প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন। ঐ নতুন পুঁজিদ্রব্যটি কেনার জন্য যে ঋণযোগ্য তহবিল দরকার তার দামটা হল অবশ্যই তার উপর সুদের হারটি। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে, কারবারীরা সেই পরিমাণ অবধি ঋণযোগ্য তহবিল চাইবে, যতটা ঋণ নিলে প্রস্তাবিত নতুন পুঁজিদ্রব্যের দামের শতাংশরূপে প্রকাশিত তার সম্ভাব্য নীট আয়টি ঋণযোগ্য পুঁজি সুদের হারের সমান হবে। তার বেশি নয়।

(খ) গৃহস্থ পরিবারগুলির কাছেও ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা জন্মায় যখন তারা তাদের চলতি আয়ের নগদ সম্পদের অতিরিক্ত খরচ (কেনাকাটার জন্য) করতে চায়। [অর্থনীতিতে এটাকে বলা হয় অসঞ্চয় (dissaving]। সেটা বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদির জন্য যেমন হতে পারে, তেমনি রেডিও, টিভি, রেফ্রিজারেটার, স্কুটার, মোটর গাড়ি কেনার জন্য হতে পারে। আবার বাড়ি তৈরির জন্যও হতে পারে।

(গ) সমাজের সমস্ত ব্যক্তি, পরিবার ও সংস্থাগুলি **তিনটি উদ্দেশ্যে** তাদের একটি অংশ নগদ তহবিলরূপে হাতে ধরে রাখতে চায়। এদের মধ্যে একটি হল, দৈনন্দিন প্রয়োজনে ব্যয় (transaction motive), দ্বিতীয়টি হল আকস্মিক প্রয়োজন (precautionary motive) এবং তৃতীয়টি হল সুযোগ পেলে লাভজনক সুদে টাকা ঋণ দিয়ে বাড়তি আয় উপার্জন করা (speculative motive)। এই তিনটি উদ্দেশ্যে যে মোট নগদ টাকা সবাই হাতে ধরে রাখতে চায় তাকে এক-কথায় বলা যায় হাতে অলস নগদ টাকা মজুদ রাখার চাহিদা (hoarding)। এটাকে নগদ পছন্দ (liquidity preference) বলেও অভিহিত করা হয়।

(ঘ) কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, পুরসভা প্রভৃতিও বিনিয়োগ ও ভোগব্যয় উভয় প্রয়োজনে ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদাকারী হতে পারে।

সবটা মিলিয়ে যে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঋণযোগ্য তহবিলের মোট চাহিদা গঠিত হয়। যে কোন চাহিদা রেখার মতই ঋণযোগ্য তহবিলের মোট চাহিদা রেখাটির ঢাল ঋণাত্মক হয়। অর্থাৎ সুদের হার কম হলে ঋণযোগ্য তহবিলের মোট চাহিদা বেশি এবং সুদের হার বেশি হলে ঋণযোগ্য তহবিলের মোট চাহিদা কম হয়।

৫·৬ চিত্রে বিভিন্ন সুদের হারে ঋণযোগ্য তহবিলের মোট চাহিদা রেখা DLF (= I (বিনিয়োগ চাহিদা) + H (অলস নগদ টাকা হাতে মজুদ রাখার চাহিদা) + DS (অসঞ্চয় বা ভোগের উদ্দেশ্যে ঋণের চাহিদা) দেখান হয়েছে।

৩. **ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান :** ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান আসে চারটি উৎস থেকে : ব্যাঙ্কঋণ, সঞ্চয়, অলস নগদ তহবিল পরিত্যাগ এবং অবিনিয়োগ। (ক) ব্যাঙ্কঋণ : বর্তমান কালে ঋণযোগ্য তহবিলের যোগানের একটি প্রধান উৎস হল ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা প্রদত্ত ঋণ। সুদের হার বাড়লে এর যোগান বাড়ে, সুদের হার কমলে এর যোগান কমে।

(খ) সঞ্চয় : ব্যক্তি, পরিবার ও বিবিধ সংস্থাগুলির সঞ্চয়ের সমষ্টি হল সমাজের মোট সঞ্চয় এবং তা হল ঋণযোগ্য তহবিলের যোগানের অন্যতম প্রধান উৎস। সুদের হার বাড়লে সঞ্চয়ে উৎসাহ বাড়ে, সুদের হার কমলে সঞ্চয়ের উৎসাহ কমে।

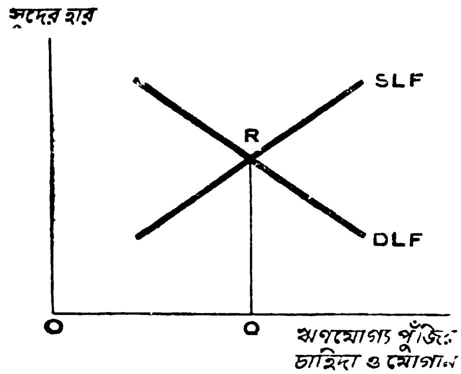
(গ) অলস নগদ তহবিল পরিত্যাগ : সুদের হার বাড়লে সকলে তাদের হাতে ধরে রাখা নগদ তহবিল থেকে ঋণ দিয়ে সুদ হিসাবে অতিরিক্ত আয় উপার্জনের সুযোগ নিতে উৎসাহিত হয়। এবং তার ফলে হাতে ধরে রাখা নগদ তহবিলের পরিমাণটি কমে। সুদের হার কমলে নগদ তহবিল থেকে ঋণ দিতে অনিচ্ছা বাড়ে, ফলে অলস নগদ তহবিলের পরিমাণটি বাড়ে।

(ঘ) অবিনিয়োগ : অবিনিয়োগ বলতে শিল্প সংস্থার পুঁজিদ্রব্য ও মজুদ সম্ভারের ক্ষয়কে বোঝায়। সাধারণত কারবারী সংস্থার চলতি আয় থেকে এই ক্ষয় পূরণ করা হয়। কিন্তু, অনেক সময় শিল্পের কাঠামগত পরিবর্তন ঘটলে, কিংবা কোন প্রকল্প অলাভজনক বলে দেখা গেলে, তাতে বিনিয়োজিত পুঁজিদ্রব্যের ক্ষয় পূরণ করা হয় না এবং সংশ্লিষ্ট মজুদ সম্ভার কমতে দেওয়া হয়। এর ফলে সংস্থার নগদ তহবিল বাড়ে। বাজারের সুদের হার লাভজনক বলে গণ্য হলে তখন ঐ বর্ধিত নগদ তহবিল থেকে চলতি সুদের হারে ঋণ দিয়ে আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। মুনাফার হারের তুলনায় সুদের হার বেশি হলে সাধারণত এই ধরনের ঘটনা ঘটে। এইভাবে অবিনিয়োগ ঋণযোগ্য তহবিলের যোগানের অন্যতম উৎসে পরিণত হয়। সুদের হার বাড়লে এই উৎস থেকে ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান বাড়ে, সুদের হার কমলে ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান কমে।

ঋণযোগ্য তহবিলের মোট যোগান হল এই চারটি উৎসের যোগানের সমষ্টি এবং

তা ৫·৬ চিত্রে SLF [= M (ব্যাঙ্ক ঋণ) + S (সঞ্চয়) + DH (অলস নগদ তহবিল পরিত্যাগ) + DI (অবিনিয়োগ)] রেখা দিয়ে দেখান হয়েছে।

৩. ভারসাম্য সুদের হার : ৫·৬ চিত্রে ঋণযোগ্য তহবিলের মোট চাহিদা রেখা DLF ও মোট যোগান রেখা SLF-এর ছেদবিন্দু R-এ ভারসাম্য সুদের হার RQ নির্ধারিত হয়েছে। ফলে ঋণযোগ্য তহবিলের ভারসাম্য চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে OQ।



চিত্র ৫·৬

৪. সমালোচনা : তত্ত্বটির সমর্থকদের মতে সুদের অন্যান্য তত্ত্বের তুলনায় এটি বেশি সন্তোষজনক। কারণ শুধু সঞ্চয়, বিনিয়োগ বা নগদ পছন্দ নয়, ব্যাঙ্ক ঋণ, অসঞ্চয় ও অবিনিয়োগ প্রভৃতি অন্যান্য বাস্তব উপাদানগুলিকেও হিসাবের মধ্যে এনে তত্ত্বটিকে অনেক বাস্তবসম্মত করা হয়েছে।

কিন্তু কীন্‌সের মতে, এই তত্ত্বের একটি প্রধান ত্রুটি হল, এতে জাতীয় আয় অপরিবর্তিত থাকছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এই শর্তটি অবাস্তব। কারণ, সুদের হারের পরিবর্তনে জাতীয় আয়েরও পরিবর্তন ঘটে।

অধ্যাপক অ্যাক্‌লের মতে, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও আয়, প্রভৃতিকে এই তত্ত্বে প্রবাহ (flow) বলে গণ্য করা হয়েছে। আবার হাতে ধরে রাখা অলস নগদ তহবিল (hoarding) ও ঐ নগদ তহবিল পরিত্যাগ, এই দু'টিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ-বাচক অর্থাৎ পরিবর্তনশীল বলে গণ্য করা হয়েছে। ফলে, তত্ত্বটি অযৌক্তিক হয়ে পড়েছে।

তাই বর্তমানে, হিকস ও হ্যানসেন সুদের হার নির্ধারণ সম্পর্কে একটি নতুন তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন। এই তত্ত্বে একদিকে বিনিয়োগ-চাহিদা ও সঞ্চয় এবং অন্যদিকে ব্যাঙ্কঋণ ও নগদ পছন্দ এই দু'টি অনার্থিক এবং দু'টি আর্থিক উপাদানের ভিত্তিতে সুদের হার নির্ধারণের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, পরিকল্পিত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্য দ্বারা জাতীয় আয়ের ভারসাম্য এবং ব্যাঙ্কঋণ ও নগদ পছন্দ দ্বারা আর্থিক ভারসাম্য—এই দু'টি ভারসাম্য একযোগে ঘটে এবং তারই মাধ্যমে সুদের হার নির্ধারিত হয়ে থাকে। এবং অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, সুদের হার ও জাতীয় আয়ের স্তর পরস্পরকে নির্দিষ্ট করে দেয়।

৫. ২১. সুদ সম্পর্কে কীন্‌সের নগদ পছন্দ তত্ত্ব
Keynes' Liquidity Preference Theory

১. কীন্‌সের মতে, সুদের সঙ্গে পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বা সঞ্চয়ে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের কোন সম্পর্ক নেই। সুদ হল নিছক একটি আর্থিক বিষয়,

কেবল নগদ অর্থ ব্যবহারের দাম মাত্র। নগদ অর্থের মোট চাহিদা ও মোট যোগানের দ্বারা সুদের হার নির্ধারিত হয়। তাঁর মতে, মানুষ সাধারণত তার বিত্তসম্পত্তি (assets) লগ্নিপত্র (security) রূপে ধরে না রেখে নগদ অর্থের আকারে হাতে রাখাটাই বেশি পছন্দ করে। তিনি মানুষের এই ইচ্ছার নাম দিয়েছেন 'নগদ পছন্দ' (liquidity preference)। সমাজের সকলে মিলে নগদ পছন্দ হিসেবে মোট যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখতে চায়, কীন্‌সের মতে তাই হল কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমাজে অর্থের মোট চাহিদা। নগদ পছন্দ ছাড়াতে মানুষকে রাজি করাতে হলে তাকে সেজন্য পুরস্কার দিতে হয়। সুদ হল সেই পুরস্কার।

২. **নগদ অর্থের চাহিদা :** তিনটি কারণে মানুষেব এই নগদ পছন্দ বা টাকার চাহিদার উৎপত্তি ঘটে : (ক) প্রথমত প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার ও সংস্থারই প্রতিদিনের খরচের জন্য হাতে নগদ টাকা রাখতে হয় ; এটা হল দৈনন্দিন লেন-দেনের উদ্দেশ্যে (transaction motive) নগদ টাকার চাহিদা ; সুদের হারের ওঠানামায় এর পরিবর্তন ঘটে না। (খ) নানা ধরনের আকস্মিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য ও (precautionary motive) কিছু না কিছু অর্থ সকলকেই হাতে রাখতে হয়। সুদের হারের ওঠানামায় এর পরিমাণের ইতরবিশেষ হয় না। (গ) সুদের হারের ওঠানামার সুযোগ নিয়ে বাড়তি আয় উপার্জনের উদ্দেশ্যেও (speculative motive) মানুষ সম্ভব মত কিছু নগদ অর্থ সর্বদা হাতে রাখতে চায় এবং এজন্য তারা সুযোগমত লগ্নিপত্রের ফাটকা জাতীয় কেনাবেচায় অংশ নেয়। স্বভাবতই এই উদ্দেশ্যে মানুষের নগদ পছন্দের পরিমাণটি সুদের হারের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে এবং তার সাথে পরিবর্তিত হয়। সুদের হার বাড়লে এর পবিমাণ কমে (কারণ, তখন নগদ টাকা হাতে ফেলে না রেখে লগ্নিপত্রে খাটানো বেশি লাভজনক) এবং সুদের হার কমলে এটি বাড়ে (কারণ, তখন নগদ টাকাটা লগ্নিপত্রে খাটিয়ে আয় বিশেষ বাড়ানোর সম্ভাবনা কমে যায়)। কীন্‌সের মতে, তাই যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে দেশে টাকার মোট চাহিদা হল, উপরোক্ত তিনটি উদ্দেশ্যে নগদ টাকা হাতে ধরে রাখার ইচ্ছের সমষ্টি।

৩. **টাকার যোগান :** কীন্‌সের মতে, টাকার মোট যোগান, বিশেষত স্বল্প-কালীন সময়ে (short period) সুদের হারের উপর নির্ভর করে না। তার মোট যোগান আসে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা থেকে এবং তার পরিমাণ নির্ভর করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের নীতির উপর।

৪. **সুদের হার নির্ধারণ :** যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে, টাকার মোট চাহিদা বা নগদ পছন্দ এবং টাকার মোট যোগান, এই দুটি বিষয়ের দ্বারা ভারসাম্য সুদের হার স্থির হয়ে থাকে। টাকার যোগান স্থির থেকে, নগদ পছন্দ বা টাকার মোট চাহিদা বাড়লে সুদের হার বাড়বে ; নগদ পছন্দ বা টাকার চাহিদা কমলে সুদের হার কমবে। আর নগদ পছন্দ বা টাকার মোট চাহিদা যদি স্থিব থাকে তবে টাকার যোগান বাড়লে সুদের হার কমবে ; টাকার যোগান কমলে সুদের হার বাড়বে ;

সুদের হার এমনি করে টাকার মোট চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে দেয়।

৫. **সমালোচনা:** পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার সঙ্গে সুদের হারের কোন সম্পর্ক নেই। কীন্‌সের এই অভিমতটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। সুদের হার নিছক একটি আর্থিক বিষয় নয়। নগদ টাকার চাহিদা ও যোগান ছাড়াও আরও অন্যান্য বিষয়ের উপর সুদের হার নির্ভর করে। কীন্‌সের তত্ত্বে সে বিষয়গুলি উপেক্ষা করা হয়েছে।

৫. ২২. সুদের হার ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি
Interest and Economic Progress

১. একদিকে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি আর অন্যদিকে জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি হল অর্থনৈতিক অগ্রগতির সারবস্তু। উৎপাদনশীলতা বাড়লে আয় বাড়ে এবং আয় বাড়লে মানুষের সঞ্চয়ের ক্ষমতা ও ইচ্ছা বাড়ে। আয় যত বাড়ে, ভোগব্যয় তত বাড়ে না বলে সঞ্চয়ের পরিমাণও বাড়ে। সমাজে মোট সঞ্চয় বাড়লে পুঁজির যোগান বাড়বে। তাই সুদের হার কমবে। এই কারণে পৃথিবী জুড়েই সুদের হার হ্রাসের ঝোঁক দেখা যায়।

২. অর্থনৈতিক অগ্রগতির দরুন সুদের হার কমছে বলে এমন আশঙ্কা হতে পারে যে, এক সময়ে পুঁজির মোট চাহিদার তুলনায় মোট যোগান বেশি হয়ে গেলে সুদের হারটি শূন্যে পরিণত হবে। অর্থাৎ তখন বিনাসুদে ঋণ পাওয়া যাবে; পুঁজি ব্যবহারের জন্য কোন দাম দিতে হবে না।

৩. কিন্তু অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে সুদের হার ক্রমশ কমলেও তা কখনও শূন্যে পরিণত হওয়ার কোন আশঙ্কা বা সম্ভাবনা নেই। কারণ: (ক) আয় বাড়লে মানুষের চাহিদার বৈচিত্র্যও বাড়বে এবং জনসংখ্যা বাড়লে মোট চাহিদাও বাড়বে। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পুঁজির চাহিদাও বাড়বে ছাড়া কমবে না তাই পুঁজির যোগান থেকে পুঁজির চাহিদার পরিমাণ কম হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

(খ) সুদের হার শূন্যে পরিণত হওয়ার অর্থ হল পুঁজির প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্ন (MPP) এবং প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য (=প্রান্তিক আয় উৎপন্ন)-ও শূন্যে পরিণত হবে। বাস্তবে তা অসম্ভব। কারণ তা হলে পুঁজির উৎপাদনশীলতা শূন্যে পরিণত হবে। অর্থাৎ পুঁজি আর উৎপাদনশীল থাকবে না। পুঁজি যদি উৎপাদনশীল না থাকে তাহলে সেটা আর উৎপাদনের উপাদান বলেও গণ্য হবে না। কিন্তু পুঁজির উৎপাদনশীলতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে এবং পুঁজি আর উৎপাদনের উপাদান থাকবে না—এরকম অবস্থা কল্পনাও করা যায় না।

(গ) সঞ্চয়কারীদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি হয়তো বিনাসুদেও সঞ্চয় করতে পারে কিন্তু অধিকাংশ সঞ্চয়কারী সঞ্চয়ের পুরস্কার রূপে সুদ না পেলে (সেটা যত কমই হোক) আদৌ সঞ্চয় করতে রাজী হবে না। কারণ সঞ্চয় করতে গেলে বর্তমান অভাবের কিছুটা অপূর্ণ রাখতে হয়, ভবিষ্যতে তা পূর্ণ করার জন্য অপেক্ষা করতে হয়

এবং সেটা অবশ্যই কষ্টকর। সুদ না থাকলে, অধিকাংশ সঞ্চয়কারী সঞ্চয় না করলে আর্থিক পুঁজির যোগান কমে যাবে। ঋণ দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়বে। ঋণের চাহিদা থেকে যোগান কমে গেলে তখন আবার সুদ অর্থাৎ পুঁজিব্যবহারের দাম দিতেই হবে।

মুনাফা
Profit

৫. ২৩. মুনাফা ও মুনাফার প্রকৃতি
Profit and its Nature

১. কারবারীর কাছে 'মুনাফা' হল কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণের দাম (মজুরি, খাজনা ও ভাড়া এবং সুদ ইত্যাদি) বাবদ মোট খরচ বাদে মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের উদ্বৃত্ত বা অবশিষ্ট অংশ ($TR - TC = Profit$)।

২. অর্থবিদ্যায় মুনাফা বলতে **বিশুদ্ধ মুনাফা বা অর্থনীতিক মুনাফা** বোঝায়। এই বিশুদ্ধ বা অর্থনীতিক মুনাফা হল কারবারী সংস্থার যাবতীয় সুস্পষ্ট ও অন্তর্নিহিত খরচ বাদে কারবারের মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের উদ্বৃত্ত বা অবশিষ্টাংশ। যা কিছু উপাদান বা উপকরণ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয় সে সব উপাদান বা উপকরণ বাজার থেকে দাম দিয়ে সংগ্রহ করতে হতে পারে অথবা উৎপাদকের নিজস্ব মালিকানাধীনও হতে পারে। কিন্তু দু'টি ক্ষেত্রেই ঐ সব উপাদানের দামটা নির্ধারিত হয় তাদের সুযোগ খরচের (opportunity cost) দ্বারা। বাজার থেকে যে বাজার দামে উপাদান কেনা হয় সেটা যেমন তার সুযোগ খরচের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে এবং সে জন্য খরচটাকে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় থেকে তা বাদ দিতে হবে, তেমনি নিজস্ব উপাদান যা উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়েছে তা এখন দাম দিয়ে কেনা না হয়ে থাকলেও তা ব্যবহারের দাম বাবদ তার সুযোগ খরচটাও বিক্রয়লব্ধ মোট আয় থেকে বাদ দেওয়া উচিত। সুতরাং **উৎপাদনের সুস্পষ্ট ও অন্তর্নিহিত, খরচ বাদে বিক্রয়লব্ধ মোট আয়ের যে উদ্বৃত্ত বা অবশিষ্ট অংশ থাকে, তাকে কারবারের অর্থনীতিক বা বিশুদ্ধ মুনাফা বলা যায়।**

৩. সুতরাং বিশুদ্ধ বা অর্থনীতিক মুনাফা উৎপাদন খরচের অংশ বা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। মুনাফা হল কারবারী সংস্থার যাবতীয় **খরচ বাদে উদ্বৃত্ত আয়।** এবং তা হল উদ্যোক্তার বা সংগঠকের প্রাপ্য।

৪. বিশুদ্ধ বা অর্থনীতিক মুনাফা কম হতে পারে, বেশি হতে পারে, ধনাত্মক (+) হতে পারে, শূন্য (0) হতে পারে, আবার ঋণাত্মকও (−) হতে পারে। এর পরিমাণ কখনও চুক্তির দ্বারা আগে থেকে স্থির করা থাকে না বা অন্যান্য উপাদানের পারিশ্রমিক দেবার আগে কখনও উদ্যোক্তাকে মুনাফা দেবার প্রশ্ন ওঠে না। অন্যান্য উপাদানের আয়ের সাথে মুনাফার এইখানে পার্থক্য।

৫.২৪ মুনাফার উপাদান
Elements of Profit

১. অর্থনীতিক বা বিশুদ্ধ মুনাফার কোন্ কারণে উৎপত্তি ঘটে? দেশের অর্থনীতি নিখুঁত প্রতিযোগিতামূলক হলেও তা যদি **পরিবর্তনহীন** হয়, অর্থাৎ উপকরণের যোগান, কারিগরী জ্ঞান, ভোগীদের রুচি ও পছন্দ ইত্যাদি যদি দিনের পর দিন একই রকম থাকে, তাহলে একদিকে উৎপাদন খরচ ও যোগান এবং অন্যদিকে চাহিদা ও বিক্রয়লব্ধ আয় আগাগোড়া একই রকম থাকবে। এ অবস্থায় ভবিষ্যৎ অর্থনীতিক অবস্থাটা সকলেরই জানা থাকে এবং এ ব্যাপারে কোন অনিশ্চয়তা থাকে না। ফলে প্রথম দিকে মোট খরচের তুলনায় মোট বিক্রয়লব্ধ আয় বেশি বা কম হলেও, শেষ পর্যন্ত নতুন কারবারী সংস্থার প্রবেশ বা পুরনো কারবারী সংস্থার প্রস্থানের ফলে কারবারী সংস্থাগুলির মোট বিক্রয়লব্ধ আয় ও মোট খরচ (=সুস্পষ্ট+অন্তর্নিহিত) পরস্পরের সমান হয়ে পড়বে এবং বিশুদ্ধ মুনাফা বা উদ্বৃত্ত কিছু থাকবে না। অর্থাৎ পরিবর্তনহীন অর্থনীতিতে (static economy) বিশুদ্ধ মুনাফা দেখা দিতে পারে না।

২. বাস্তব জগতে অর্থনীতিটা পরিবর্তনহীন নয়, **পরিবর্তনশীল** (dynamic) এবং সে কারণে অর্থনীতিক **ভবিষ্যৎটা** হল অনিশ্চয়তায় ভরা। কারবারের উদ্যোক্তাকে এই ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয় এবং প্রতিযোগিতায় জয়লাভের জন্য **নিত্য নতুন** দ্রব্যসামগ্রী এবং উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া **উদ্ভাবন** করার চেষ্টা **করতে হয়**। তা ছাড়া, প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও আবার বাস্তবের বাজারে অনেক ক্ষেত্রেই **কম বা বেশি মাত্রায়** কারবারী সংস্থাগুলির কিছুটা **একচেটিয়া আধিপত্য** থাকে। এই তিনটি হল বিশুদ্ধ বা অর্থনীতিক মুনাফার উৎস বা কারণ। আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে তাই মুনাফার প্রধান উপাদান হল তিনটি :

(১) **ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা ও মুনাফা :** বাস্তবের অর্থনীতি গতিশীল বা অতি পরিবর্তনশীল বলে তা অনিশ্চয়তায় ভরা। তবে, তার মধ্যে কতকগুলি বিষয়ের অনিশ্চয়তা, যেমন, দুর্ঘটনা, চুরি, খরা বা বন্যা ও লুঠতরাজ ইত্যাদির ঝুঁকি বীমা গ্রহণের দ্বারা, প্রিমিয়াম বাবদ সামান্য আর্থিক খরচের দ্বারা এড়ানো যায়। কিন্তু, বাজারের উঠতি, পড়তি, মন্দা ও অবনতি, অর্থনীতিক কাঠামর পরিবর্তন কিংবা সরকারী নীতির পরিবর্তনের দরুন চাহিদা (কারবারের বিক্রয়লব্ধ আয়) এবং যোগানের (উৎপাদন খরচের) পরিবর্তনগুলি আগে থেকে কখনই সঠিকভাবে অনুমান করা যায় না। বীমা গ্রহণের দ্বারাও এইসব অভাবিত পরিবর্তনের ঝুঁকি এড়ানো যায় না। সুতরাং গতিশীল অর্থনীতির এই সব অনিশ্চিত পরিবর্তনের ঝুঁকি নিয়েই উদ্যোক্তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথাসাধ্য অনুমানের ভিত্তিতে কাজ করতে হয়। এর মধ্যেই তাদের পণ্যের দাম ও উৎপাদনের পরিমাণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাদের অনুমানগুলি ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর সাথে মিলে গেলে প্রভূত মুনাফা হবে, আর না মিললে মুনাফা সামান্য হবে কিংবা বিশেষ লোকসান ঘটবে।

এই ধরনের ঝুঁকি না নিলে সমাজে উৎপাদনের কাজটি বন্ধ হয়ে যাবে, মানুষের অভাবের তৃপ্তিসাধন ঘটান সম্ভব হবে না। কিন্তু এমন অনিশ্চিত ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির সংখ্যা বেশি নয়। তাই সমাজে উপযুক্ত সংখ্যক উদ্যোক্তার যোগান পেতে হলে, অন্তত দীর্ঘকালীন সময়ে, এমন একটা পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকা উচিত যাতে উদ্যোক্তা অনিশ্চিত ঝুঁকি নেবার অনিচ্ছা কাটিয়ে উঠতে আগ্রহী হয়। এ পুরস্কারটা হবে উদ্যোক্তার উপযুক্ত পরিমাণ উদ্বৃত্ত আয়। সুতরাং **বিশুদ্ধ মুনাফার একটি অংশ হল অনিশ্চিত ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার।**

(২) **উদ্যোগ, নব নব উদ্ভাবন ও মুনাফা:** অনিশ্চয়তা ও তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে টিকে থাকার জন্য, উৎপাদন খরচ কমানোর চেষ্টায় কারবারী সংস্থাগুলি একদিকে নতুন নতুন উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া এবং পণ্য বণ্টন পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করতে চেষ্টা করে, অন্যদিকে বিক্রয়লব্ধ আয় বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করার চেষ্টা করে। উদ্যোক্তাদের অবিরাম উদ্যোগের দ্বারা বিভিন্ন শিল্পে ও বিভিন্ন সময়ে অসমগতিতে পরিবর্তন ঘটতে থাকে ও সে কারণে নতুন অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। যে উদ্যোক্তা অন্য প্রতিযোগীর আগে নতুন কোন পদ্ধতির উদ্ভাবনে ও প্রবর্তনে সফল হয় সে উদ্যোক্তা সাময়িকভাবে কিছুকালের জন্য তার প্রতিযোগীদের তুলনায় অতিরিক্ত আয় বা বিশুদ্ধ মুনাফা ভোগ করে। সুতরাং **বিশুদ্ধ মুনাফার একটি অংশ হল নব নব উদ্ভাবনের পুরস্কার।**

(৩) **একচেটিয়া কারবার ও মুনাফা:** মুনাফার আরেকটি উৎস হল বাজারের উপর একচেটিয়া আধিপত্য বা একচেটিয়া কারবার। উৎপাদন খরচের তুলনায় চাহিদা প্রবল হলে, একচেটিয়া কারবারী সংস্থা বাজারের উপর তার আধিপত্য থাকার জন্য উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়ে ও উৎপন্ন দ্রব্যের দাম খানিকটা বাড়িয়ে অনিশ্চিত ঝুঁকি খানিকটা কমাতে পারে এবং তার ফলে কিছু পরিমাণে উদ্বৃত্ত আয় ভোগ করতে পারে। এক্ষেত্রে তার অতিরিক্ত আয় বা বিশুদ্ধ মুনাফাটা ঘটে মূলত উৎপাদন বা যোগান কমিয়ে কৃত্রিম অভাব (artificial scarcity) সৃষ্টির দ্বারা। সুতরাং **মুনাফার একটি অংশ হল কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির দ্বারা একচেটিয়া কারবারের উপার্জিত আয়।**

৫.২৫. স্বাভাবিক মুনাফা
Normal Profit

১. স্বাভাবিক মুনাফা-কে 'মুনাফা' বলা হলেও, বাস্তবিক পক্ষে এ হল উদ্যোক্তার যোগান দাম বা ন্যূনতম পারিশ্রমিক, যার কমে কোন উদ্যোক্তাকে তার বর্তমান কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত রাখা যাবে না। সুতরাং স্বাভাবিক মুনাফা হল উদ্যোক্তার সুযোগ খরচ (=যার বিকল্প আয়)। অতএব **স্বাভাবিক মুনাফা হল উৎপাদন খরচের অংশ,** বিশুদ্ধ মুনাফার অংশ বা **উদ্বৃত্ত আয়ের অংশ নয়।** এ হল মার্শালের অভিমত।

২. অধ্যাপিকা যোন রবিনসনের মতে, **দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পের** ভারসাম্য অবস্থায় উদ্যোক্তা পারিশ্রমিক রূপে এই স্বাভাবিক মুনাফা পেয়ে থাকে।

৩. সুতরাং **স্বাভাবিক মুনাফা**, নামে মুনাফা হলেও, **আসলে তা উৎপাদন খরচের অংশ**। স্বাভাবিক মুনাফা পণ্যের গড় উৎপাদন খরচের (AC) অন্তর্ভুক্ত। দাম গড খরচের কম হলে স্বাভাবিক মুনাফা ($P < AC$) ওঠে না, গড় খরচের সমান হলে ($P = AC$) স্বাভাবিক মুনাফা ওঠে, গড় খরচের বেশি হলে ($P > AC$) স্বাভাবিক মুনাফাব বেশি উদ্বৃত্ত আয় বা বিশুদ্ধ মুনাফা ঘটে। তাই **স্বল্পকালীন সময়ে** দাম গড় খরচের কম হলে **স্বাভাবিক মুনাফা নাও হতে পারে**, কিন্তু **দীর্ঘকালীন সময়ে স্বাভাবিক মুনাফা না হলে কোন উদ্যোক্তা এবং কারবারী সংস্থাই তার বর্তমান ক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকবে না,** বর্তমান শিল্প পরিত্যাগ করে অন্য শিল্পে যোগ দেবে।

৫. ২৬. মুনাফার হারের সমতার ঝোঁক

Profit Tends to Equality

১. স্বল্পকালীন সময়ে কোন শিল্পে কাববারী সংস্থাগুলির উৎপাদনের মাত্রার বিভিন্নতা এবং অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচেব বিভিন্নতার দরুন বাজার দাম কোন কারবারী সংস্থার গড খবচের কম হতে পারে, আবার কোন সংস্থার গড খরচের বেশি হতে পারে। তাই স্বল্পকালীন সময়ে কেউ ন্যূনতম লোকসান দিতে পারে, কেউ সর্বাধিক বিশুদ্ধ মুনাফা উপার্জন করতে পারে। লোকসান এবং বিশুদ্ধ মুনাফার পরিমাণও বিভিন্ন কাববাবী সংস্থায় বিভিন্ন রকম হয়। তাই **স্বল্পকালীন সময়ে** যে কোন শিল্পে **কারবারী সংস্থাগুলির মুনাফার হার কখনো একরকম হয় না**।

২. কিন্তু স্বল্পকালীন সময়ে যে উদ্যোক্তাব লোকসান হয় সে **দীর্ঘকালীন সময়ে** লোকসান দূব করাব চেষ্টায় উৎপাদনের মাত্রা বদল কবতে চেষ্টা করে। এ কাজে সফল না হলে সে শিল্প ছেড়ে চলে যায়। যাব বিশুদ্ধ মুনাফা হয় সেও সেই মুনাফা আরো বাড়াতে চেষ্টা করে। ফলে, দীর্ঘকালীন সময়ে কারবারী সংস্থাগুলির আয়তন ও সংখ্যার পরিবর্তন দ্বারা মোট চাহিদার সাথে মোট যোগানের এমন সামঞ্জস্য ঘটে যে, দাম শেষ পর্যন্ত প্রতিটি সংস্থার উৎপাদনের গড় খরচের সমান হয়ে পড়ে প্রত্যেক সংস্থা তখন শুধু স্বাভাবিক মুনাফা উপার্জন করে। তখনই শিল্পের ভারসাম্য দেখা দেয়। কারণ ঐ অবস্থায় আর কোন সংস্থা তার আয়তন বাড়াতে বা কমাতে চায় না, পুরনো কোন সংস্থা আর শিল্প ছেড়ে চলে যেতে চায় না কিংবা নতুন কোন প্রতিযোগী সংস্থাও শিল্পে যোগ দেয় না। সুতরাং **দীর্ঘকালীন সময়ে যে কোন শিল্পে সমস্ত কারবারী সংস্থার মুনাফার হার এক হয়ে** (= স্বাভাবিক মুনাফা) **পড়ার ঝোঁক থাকে**।

৩. দীর্ঘকালীন সময়ে যে কোন শিল্পের অন্তর্গত সমস্ত কারবারী সংস্থার মুনাফার হার যেমন এক হয়ে পড়ার (= স্বাভাবিক মুনাফা) ঝোঁক থাকে, তেমনি **সকল শিল্পের মধ্যেও ঐ একই ঝোঁক** (অর্থাৎ মুনাফার হার = স্বাভাবিক মুনাফা)

দেখা দেয়। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত একটি শিল্পের তুলনায় আরেকটি শিল্পে মুনাফার হার বেশি থাকে ততক্ষণ কম মুনাফার শিল্প ছেড়ে বেশি মুনাফার শিল্পে কারবারী সংস্থাগুলি যোগ দিতে থাকে এবং শিল্পগুলির অন্তর্গত কারবারী সংস্থার সংখ্যা ও তাদের আয়তনের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অতএব প্রতিটি শিল্পে মুনাফার হার স্বাভাবিক মুনাফার সমান না হওয়া পর্যন্ত **কোন শিল্পেই এককভাবে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দেখা দেয় না।** সব শিল্পে মুনাফার হার এক হয়ে পড়লেই (=স্বাভাবিক মুনাফা) প্রতিটি শিল্পে ও সব শিল্পে একযোগে ভারসাম্য দেখা দেয়।

৪. কিন্তু এ হল 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে' দীর্ঘকালীন সময়ে কি ঘটতে পারে বা কোন্ ঘটনা ঘটার অনিবার্য সম্ভাবনা রয়েছে তার অর্থনীতিক বিশ্লেষণ মাত্র। বাস্তবে যে কোন নির্দিষ্ট কালই হল কোন না কোন স্বল্প-কালীন সময় এবং 'অন্যান্য অবস্থা' কখনই 'অপরিবর্তিত' থাকে না। বাস্তব জগৎ অতি পরিবর্তনশীল। সুতরাং বাস্তবে যে কোন শিল্পের অন্তর্গত কারবারী সংস্থা-গুলির মুনাফার হারের যেমন যথেষ্ট পার্থক্য থাকে এবং থাকবে, তেমনি বিভিন্ন শিল্পের মুনাফার হারেরও পার্থক্য থাকে এবং থাকবে। অতএব, **মুনাফার হারের 'সমতার ঝোঁকটি' হল এমন একটি সুদূর সম্ভাবনা যা বাস্তবে কখনও রূপ নিতে পারে না।**

৫.২৭. মুনাফার ঝুঁকি বহন তত্ত্ব
Risk Theory of Profit

১. **তত্ত্ব ঃ** অধ্যাপক হলের মতে, কারবারী উদ্যোগ নিতে হলেই উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি নিতে বা বইতে হয়। ঝুঁকি-বহনই হল মুনাফার মূল কারণ ও ভিত্তি। এই ঝুঁকি হল, বর্তমানে যে পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে, ভবিষ্যতে সে পণ্য বিক্রি নাও হতে পারে। ফলে উদ্যোক্তার লোকসান হতে পারে। ভবিষ্যতে লোকসানের সম্ভাবনাই হল কারবারীর ঝুঁকি। এই লোকসান উদ্যোক্তা ছাড়া অন্য কোন উপাদানের মালিকরা বহন করে না। অথচ ঝুঁকি না বইলে কোন কিছুরই উৎপাদন সম্ভব নয়। তাই ঝুঁকি বহনই হল উৎপাদনের একটি অপরিহার্য উপাদান। সুতরাং সমাজের নানা অভাব পরিতৃপ্তির জন্য ঝুঁকিবহনকারীদের এগিয়ে আসার প্রয়োজন দেখা দেয়। উপযুক্ত পুরস্কার ছাড়া কেউ এই কাজে অগ্রসর হবে না। মুনাফাই হল সে পুরস্কার। তাই মুনাফাকে উদ্বৃত্ত আয় বলে গণ্য না করে উৎপাদনের স্বাভাবিক খরচ বলে ধরতে হবে। এই হল মুনাফা সম্পর্কে ঝুঁকি-বহন তত্ত্ব।

২. **সমালোচনা ঃ** (ক) কার্ভারের মতে, মুনাফা ঝুঁকি বহনের পুরস্কার নয়, বরং সেটা হল ঝুঁকি এড়ানোর পুরস্কার। কারণ, যে উদ্যোক্তা যত দক্ষ সে তত বেশি সাফল্যের সাথে ঝুঁকি এড়াতে পারে এবং তত বেশি মুনাফা উপার্জন করতে পারে। তাই ঝুঁকিবহনের দরুন নয়, ঝুঁকি এড়ানোর দরুনই মুনাফার উৎপত্তি ঘটে।

(খ) সব ঝুঁকির দরুন মুনাফা হয় না। নাইটের মতে, ঝুঁকি দু'রকমের ঃ নিশ্চিত ও জানা ঝুঁকি এবং অনিশ্চিত ও অজানা ঝুঁকি। নিশ্চিত ও জানা ঝুঁকি-

গুলি আগে থেকেই বীমার সাহায্যে দূর করা যায়। অনিশ্চিত ও অজানা ঝুঁকির বেলায় তা করা যায় না। সুতরাং মুনাফাকে বলা যেতে পারে অনিশ্চিত ও অজানা ঝুঁকি বহনের পুরস্কার।

৫.২৮. মুনাফার অনিশ্চয়তা-বহন তত্ত্ব
Uncertainty-bearing Theory of Profit

১. **তত্ত্ব ঃ** অধ্যাপক নাইটের মতে, কারবারী ঝুঁকি দু'রকমের। নিশ্চিত ও জানা ঝুঁকি, যেমন, অগ্নিকাণ্ড, ঝড়, ভূমিকম্প, জাহাজডুবি ইত্যাদি, বা চুরি, তহবিল তছরুপ, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি। আগে থেকেই বীমার সাহায্যে এ সব ঝুঁকির দরুন সম্ভাব্য লোকসানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এ কারণে বলা যায়, এই ধরনের ঝুঁকি উদ্যোক্তারা বহন করে না। সে জন্য উদ্যোক্তা যে মুনাফা অর্জন করে তার মধ্যে এ ধরনের ঝুঁকি বহনের পুরস্কারের কোন প্রশ্নই থাকে না। তবে আরেক রকমের ঝুঁকি আছে যা আগে থেকে জানা যায় না বা তার প্রকৃতিও নিশ্চিত নয়। যেমন, প্রতিযোগিতার ঝুঁকি, চাহিদার পরিবর্তনের ঝুঁকি, নতুন যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, নতুন উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তনের দরুন বা সরকারী নীতি পরিবর্তন কিংবা মন্দার দরুন লোকসানের সম্ভাব্য ঝুঁকি। বীমার সাহায্যে এই ধরনের ঝুঁকি দূর করা যায় না। এগুলির হাত থেকে উদ্যোক্তা রেহাই পায় না। সুতরাং এই ধরনের ঝুঁকি বহনের দরুনই উদ্যোক্তা মুনাফা নামক পুরস্কার পায়। ত না হলে কেউ এর ঝুঁকি বহন করত না। যে কাজে অনিশ্চিত ঝুঁকি যত বেশি, তাতে মুনাফাও তত বেশি হয়ে থাকে।

২. **সমালোচনা ঃ** (ক) উদ্যোক্তার কাজ শুধু অনিশ্চিত ঝুঁকি বহন করা নয়। উদ্যোগ গ্রহণ, অন্যান্য উপাদানগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রভৃতি কাজও তাকে করতে হয়। তাই মুনাফা কেবল অনিশ্চিত ঝুঁকি বহনের পুরস্কার হতে পারে না। (খ) অন্যান্য কারণেও মুনাফার উৎপত্তি ঘটে (যেমন অনিখুঁত প্রতিযোগিতা ইত্যাদি)।

৫.২৯. মুনাফার গতীয় তত্ত্ব
Dynamic Theory of Profit

১. **তত্ত্ব ঃ** অধ্যাপক ক্লার্কের মতে সমাজের গতীয় পরিবর্তনের (dynamic changes) দরুন মুনাফার উৎপত্তি ঘটে।

পরিবর্তনহীন বা স্থির অর্থনীতিতে চাহিদা, যোগান, জনসংখ্যা, আয়, উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদনের পরিমাণ প্রভৃতিতে কোন পরিবর্তন ঘটে না। দিনের পর দিন কেবল একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। তাই সেখানে আগে থেকেই সব জানা থাকে। চাহিদা ও যোগান এমন দামে ভারসাম্য লাভ করে যে দাম গড় খরচের সমান। স্বাভাবিক মুনাফা ঐ গড় খরচের অন্তর্ভুক্ত থাকে বটে, কিন্তু সেটা উদ্যোক্তার ব্যবস্থাপনাগত কাজের পারিশ্রমিকের বেশি হয় না। তাই স্থির অর্থনীতিতে কোন উদ্বৃত্ত আয় বা বিশুদ্ধ মুনাফার উৎপত্তি হয় না।

কিন্তু অর্থনীতি যদি পরিবর্তনশীল বা গতিশীল হয়, যেমন বাস্তবের অর্থনীতি হয়ে থাকে, তাতে সর্বদাই চাহিদা ও যোগান সমেত সবকিছুর পরিবর্তন ঘটছে। ফলে দাম ও উৎপাদন খরচের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে কখনও লোকসান কখনও বা উদ্বৃত্ত আয় দেখা দিচ্ছে।

২. **সমালোচনা:** (ক) যে কোন পরিবর্তনেই যে মুনাফার উৎপত্তি হয়, এ ধারনা ঠিক নয়। কেবল অনিশ্চিত ও অজানা পরিবর্তনের ফলেই তা হতে পারে। কিন্তু এই অনিশ্চিত ঝুঁকি বহনের বিষয়টি এই তত্ত্বে উপেক্ষা করা হয়েছে। (খ) উদ্যোক্তার দক্ষতাকেও এই তত্ত্বে অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

৬. বিনিময়ের উপায়

৭. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

৮. বাণিজ্য চক্র

৯. রাষ্ট্রের অর্থসংস্থান

১০. তুলনামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

৬ বিনিময়ের উপায়

MECHANISM OF EXCHANGE

৬. ১. অর্থের প্রকৃতি
Nature of Money

১. 'যন্ত্রবিদ্যায় যেমন চাকা, বিজ্ঞানে যেমন অগ্নি, রাষ্ট্রনীতিতে যেমন ভোট, অর্থনীতিতে তেমনি মানুষের সামাজিক অস্তিত্বের বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে অর্থ হল এমন একটি অপরিহার্য উদ্ভাবন যার উপর বাদবাকি আর সমস্তই নির্ভরশীল' (ক্রাউদার)। 'পুঁজি' (অর্থাৎ পুঁজিদ্রব্য) 'এবং বিশেষায়ণের সাথে অর্থ হল আধুনিক অর্থনৈতিক জীবনের তৃতীয় দিক। অর্থের ব্যবহার ছাড়া আমাদের বর্তমান শ্রম বিভাগ ও বিনিময় ব্যবস্থা অসম্ভব হয়ে পড়ত' (স্যামুয়েলসন)।

২. আধুনিক অর্থনীতি বিশেষভাবেই অর্থের উপর নির্ভরশীল। গৃহস্থ পরিবারগুলি (বা ভোগী এককগুলি) তাদের উপাদান-সেবা আর্থিক দামে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে, যে আয় উপার্জন করে তা হল আর্থিক আয়। অভাবপূরণের দ্রব্য ও সেবাকর্ম তারা আর্থিক দামে অর্থ ব্যয় করে কেনে। আর্থিক ব্যয়ের তুলনায় আর্থিক আয় বেশি হলে তাদের আর্থিক সঞ্চয় ঘটে। কারবারী সংস্থাগুলি যে পুঁজি কারবারে বিনিয়োগ করে তা হল আর্থিক পুঁজি। উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করে যে অর্থ তারা পায় তা হল তাদের আর্থিক আয়। আর্থিক আয় থেকে আর্থিক ব্যয় বাদ দিলে তাদের যে মুনাফা হয় সেটা হল আর্থিক মুনাফা।

৩. কিন্তু, এত গুরুত্ব সত্ত্বেও, **অর্থের জন্য অর্থোপার্জন কখনও মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয় ; অর্থ হল উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়মাত্র।** উদ্দেশ্যটি হল অভাবের তৃপ্তিসাধন। অর্থ ব্যবহার না করে মানুষের অভাব যেভাবে ও যতটা পরিমাণে তৃপ্ত হতে পারে, অর্থ ব্যবহারের সাহায্যে তার চেয়ে অনেক ভালভাবে ও বেশি পরিমাণে মানুষের অভাব তৃপ্ত হতে পারে বলেই অর্থের এই গুরুত্ব। তা ছাড়া অর্থের আর কোন সার্থকতা নেই।

৬. ২. অর্থের কাজ
Functions of Money

১. অর্থের মূল কাজ হল চারটি : (ক) অর্থ যাবতীয় সম্পদের মূল্য পরিমাপের মাপকাঠির কাজ করে, কাজ করে হিসাবের একক রূপে ; (খ) অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম রূপে কাজ করে ; (গ) অর্থ ঋণ দান ও ঋণ পরিশোধের উপায় রূপে কাজ করে এবং (ঘ) অর্থ সমাজে সঞ্চয়ের বাহন রূপে কাজ করে।

(ক) **অর্থ** যাবতীয় সম্পদের, দ্রব্য ও সেবাকর্মের **মূল্য পরিমাপের সাধারণ মাপকাঠি** রূপে কাজ করে (common measure of value)। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, গভীরতা মাপার জন্য যেমন ফুট, গজ, মিটার; ওজন মাপার জন্য যেমন গ্রাম, কেজি, কুইণ্টাল, লিটার, মেট্রিক টন, তেমনি সম্পদের মাপকাঠি হল অর্থ। অর্থ হল সম্পদের মূল্য হিসাব করার একক (unit of account)। ধান ও কাপড়, এই দুটি সম্পদের মূল্য পরিমাপের যদি কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি না থাকে তা হলে ধানের সাথে কাপড়ের বিনিময় হবে কি করে? দু'জনের গরজ অনুযায়ী যদি বিনিময়ের হার ঠিক হয়, তা হলে প্রতিবার চাষী তার ধানের সাথে যত জিনিসের বিনিময় করবে (তেল, নুন, মশলা, চিনি, পেরেক, থালা, বাসন ইত্যাদি) ততবার বিনিময়ের হার নতুন করে স্থির করতে হবে এবং তা হিসাব করার জন্য অনেক সময়ও লাগবে। কিন্তু সমস্ত সম্পদের মূল্য অর্থের দ্বারা পরিমাপ করার ব্যবস্থা হওয়ার ফলে বহু শ্রম ও সময় বেঁচে গেছে। প্রতিটি সামগ্রীর আর্থিক মূল্য থেকে অতি সহজেই সম্পদের বিনিময় মূল্য পাওয়া যায়। ধানের মণ যদি ১০০ টাকা, আর ১ থান কাপড়ের দাম যদি ২০ টাকা হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ বলে দেওয়া যায়, ১ মণ ধানের বদলে ক'থান কাপড় পাওয়া যাবে। মূল্য পরিমাপ করতে হলে মূল্যের হিসাবটারও একটা একক চাই। ধানের মূল্য ১০০ টাকা, একথা বলার মানে হল, মূল্য হিসাব করার ন্যূনতম একক হল এক টাকা এবং ধানের মূল্যটা হল ১০০টি এক টাকার সমান। সুতরাং যা মূল্য পরিমাপের মাপকাঠি হবে, সেটা সেই সাথে মূল্য হিসাব করার এককও হতে হবে। অর্থ একই সাথে মূল্যের মাপকাঠির ও হিসাবের একক রূপে কাজ করে শ্রম ও সময় বাঁচিয়ে দিয়েছে।

(খ) **অর্থ দ্রব্য ও সেবাকর্ম বিনিময়ের মাধ্যম** (medium of exchange) রূপে কাজ করে। চাষী ধান বেচে টাকা নেয়, সে টাকা দিয়ে তাঁতীর কাছ থেকে কাপড় কেনে। তাঁতী সে টাকা দিয়ে কলুর কাছ থেকে তেল কিনে নেয়। অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে চাষীকে চাষের কাজে, তাঁতীকে কাপড় বোনার কাজে, কলুকে তেল উৎপাদনের কাজে মনোযোগ দিতে সাহায্য করেছে, এতে শ্রমবিভাগ সম্প্রসারিত হয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে। মানুষের সময় ও শ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছে। অর্থ মূল্যের পরিমাপ ও হিসাবের একক হওয়ার সাথে সাথে বিনিময়ের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

(গ) **অর্থ ঋণ পরিশোধের উপায়** (standard of deferred payment or unit of contract) হিসাবে কাজ করে। আমরা যখন দোকান থেকে বাকিতে জিনিস কিনি তখন দোকানদার আমাদের কত টাকার জিনিস দেওয়া হল তার হিসাব যেমন দেয় (কারণ তখন টাকাটা হিসাবের একক রূপে কাজ করে), তেমনি আমরা তাকে পরে তত টাকা দেব বলেও রাজী হই। এক্ষেত্রে টাকাটা ঋণ পরিশোধের উপায় হিসাবেও কাজ করছে। নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদে ঋণ দেওয়া নেওয়া এবং তা পরিশোধের

ক্ষেত্রে অর্থের ভূমিকাটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জিনিস কিনে যেমন টাকায় দাম শোধ করা খুবই সুবিধাজনক, তেমনি টাকায় ঋণ নিয়ে টাকায় তা শোধ করাও সুবিধাজনক। কারণ ধারে জিনিস কিনে ফের সে জিনিস দিয়ে ঋণ শোধ করতে হলে ঠিক সেই একই গুণমানের জিনিস সংগ্রহ করার দুশ্চিন্তা ও অসুবিধা ভোগ করতে হয়। কিন্তু অর্থের দ্বারা ঋণ পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দিলে তখন কেবল অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্যের ওঠানামার ঝুঁকিটাই নিতে হয়, আর কোন অসুবিধা থাকে না। সুতরাং ঋণ পরিশোধের উপায় রূপে কাজ করে অর্থ সমাজে ঋণের প্রসার ঘটিয়ে বেচাকেনা এবং উৎপাদনবৃদ্ধিতে সাহায্য করছে।

(ঘ) **অর্থ সঞ্চয়ের বাহন** (store of value) রূপে কাজ করে। চাষী যে ফসল ফলায় সেটা তার আয়। তা থেকে সংসারের খোরাকী বাদে যে ধান থাকে তার খানিকটার বিনিময়ে সে তেল, নুন, কাপড় কেনে। এই দু'টো হলো তার ব্যয়। মোট ফসল থেকে এই ব্যয় বাদে যে ধান তার থাকে সেটা তার সঞ্চয়। এই সঞ্চিত ধানটা ঘরে রাখতে হলে ধানের গোলা বরতে হয়। তার জন্য জায়গা চাই। গোলা থেকে ধানটা ইঁদুরে খেয়ে ফেলতে পারে। চোরে চুরি করতে পারে। আগুনে, বৃষ্টিতে ধানটা নষ্ট হতে পারে। দ্রব্যসামগ্রীতে সঞ্চয় করলে এই অসুবিধা। তা না করে চাষী তার সবটা উদ্বৃত্ত ধান অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে সে টাকাটা কাছে সাবধানে রাখতে পারে, ব্যাঙ্কে বা পোস্ট অফিসে রাখতে পারে। তাতে চোরের ভয়, ডাকাতের ভয়, আগুনে বা বৃষ্টিতে ক্ষতির ভয় থাকে না। আবার সুদ হিসাবে বাড়তি আয়ও হয়। সঞ্চিত অর্থ থেকে সে যে কোন সময় তার দরকারী জিনিস কিনতে পারে। তাতেও কোন অসুবিধা নেই। অর্থের সাহায্যে সঞ্চয়ের ফলে সঞ্চয়ের কাজটা অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। সঞ্চিত অর্থ হাতে থাকা মানেই হল প্রয়োজন মত যে কোন দরকারী জিনিস কেনার ক্ষমতা হাতে রাখা। কারণ অর্থই হল বিনিময়ের মাধ্যম।

২. **অর্থের সংজ্ঞা ঃ** অর্থের এই চারটি মূল কাজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বিনিময়ের মাধ্যম এবং ঋণ পরিশোধের উপায় রূপে কাজ। বাকি দুটি কাজ অর্থাৎ মূল্যের পরিমাপক ও হিসাবের একক এবং সঞ্চয়ের বাহনরূপে কাজ প্রথমোক্ত কাজ দুটিরই অন্তর্গত। এই কাজগুলি সম্পাদন করার জন্য সমাজে প্রথমে বারবার সেই সব পণ্যদ্রব্য ব্যবহারের পরীক্ষা করা হয়েছে যা সকলেই চায়, যা ছোট ছোট অংশে ভাগ করা চলে, যা সহজে একজায়গায় জড়ো করে রাখা যায়, যা সহজে স্থান থেকে স্থানান্তরে বহন করা যায় এবং যার মূল্য সহজে নষ্ট হয় না। এই কারণে অতীতে মানব সমাজে নুন, লোহা, অস্ত্রশস্ত্র, কড়ি, গরু, ছাগল, শুঁটকী মাছ, হাতীর দাঁত ইত্যাদি অনেক কিছুই অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অবশেষে অর্থরূপে ব্যবহৃত হওয়ার মত উপযুক্ত দ্রব্যরূপে মানুষের দৃষ্টি বিশেষভাবে পড়ে সোনা ও রূপার উপর। আরো আধুনিক কালে সোনা রূপার পরিবর্তে কাগজের টাকা ও ব্যাঙ্কের ঋণ

অর্থ রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই কারণে, আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে, অর্থ বলতে নির্দিষ্ট কোন দ্রব্য বোঝায় না। **বেচাকেনায় ও ঋণ পরিশোধে যা সর্বজনগ্রাহ্য, অর্থবিদ্যায় তাকেই অর্থ বলে গণ্য করা হয়।**

৬. ৩. মুদ্রামান ব্যবস্থা
Monetary Systems

১. **মুদ্রামান ব্যবস্থা কাকে বলে :** সমাজে অর্থের প্রচলনের সূত্রপাত যখন হল তখন থেকেই মানুষ অর্থের একটা অসুবিধা অনুভব করেছে। সেটা হল এই, অর্থের মূল্য হয় বাড়ে, নয় কমে, অথচ অন্যান্য সম্পদের মূল্যের মাপকাঠি রূপে ব্যবহৃত হতে হলে অর্থের নিজের মূল্যটা স্থিতিশীল হওয়া নিতান্তই দরকার। অর্থের একটি একককে অর্থাৎ একটি টাকায় যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী কিনতে পাওয়া যায় তাই হল টাকার মূল্য বা ক্রয়শক্তি। সেটা যদি আজ একরকম, কাল অন্যরকম হয়, তাহলে হিসাবপত্র, ঋণের লেনদেন, বেচাকেনায় নানা গোলমাল ঘটবে। কাজ-কারবারে অসুবিধা হবে। তাই সমাজে অর্থের প্রচলনের পর অর্থের মূল্য যাতে স্থিতিশীল থাকে সে উদ্দেশ্যে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মানুষ নানা রকম বিধি-ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছে। **অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে অর্থের মূল্য স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে যে সকল বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, সে সবকে এককথায় বলে মুদ্রামান ব্যবস্থা।** আজ অবধি পৃথিবীতে যতরকমের মুদ্রামান ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে তা মূলত দু'রকমের : ধাতু-মুদ্রামান এবং কাগজী মুদ্রামান ব্যবস্থা ; ধাতু-মুদ্রামান ব্যবস্থা আবার দু'রকমের : (ক) একধাতুমান, যেমন স্বর্ণমান বা রৌপ্যমান এবং (খ) দ্বিধাতুমান, যেমন সংযুক্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যমান। **দেশের মূল বা প্রধান বা মানমুদ্রা (standard money) শুধু সোনার হলে তাকে স্বর্ণমান, সোনা ও রূপা উভয়ের হলে তাকে দ্বিধাতুমান এবং কাগজের হলে, তাকে কাগজী মুদ্রামান বলে।**

২. **স্বর্ণমান** (gold standard) **:** একধাতুমানের মধ্যে বয়সের দিক দিয়ে রৌপ্যমান বেশি প্রাচীন হলেও তুলনায় স্বর্ণমানই বেশি বিখ্যাত। ১৮৭৯ সাল থেকে ১৯১৪ সাল এবং ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর নানা দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল। স্বর্ণমান তিন রকমের হলেও তার মূল কথা হল, এই মুদ্রা ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট বিশুদ্ধতা ও ওজনের সোনার মূল্য দিয়ে, দেশের প্রধান বা মান ও বিহিত মুদ্রার (standard and legal tender money) অর্থাৎ যে মুদ্রার মূল্য অনুযায়ী দেশের অন্যান্য মুদ্রার মূল্য নির্দিষ্ট করা হয় এবং যে মুদ্রা আইনসঙ্গতভাবে বেচাকেনায় ও ঋণ পরিশোধে ব্যবহার করা যায়, তার মূল্য নির্দিষ্ট করা হয়। এজন্য নির্দিষ্ট বিশুদ্ধতা ও ওজনের স্বর্ণমুদ্রা দেশের মান ও বিহিত মুদ্রারূপে প্রচলিত ও ব্যবহৃত হত কিংবা দেশে কাগজের মুদ্রা বিহিত এবং মানমুদ্রারূপে প্রচলিত হলেও

ঐ কাগজী মুদ্রার বিনিময়ে, নির্দিষ্ট দামে নির্দিষ্ট বিশুদ্ধতা ও ওজনের স্বর্ণপিণ্ড বিক্রি করার ভার সরকার নিত।

বৈশিষ্ট্য ঃ (ক) এতে দেশের মান ও বিহিত মুদ্রার মূল্য নির্দিষ্ট বিশুদ্ধতা ও ওজনের সোনার মূল্য দিয়ে নির্ধারিত হত; (খ) নির্দিষ্ট বিশুদ্ধতা ও ওজনের সোনা জমা দিলে সরকারী টাঁকশাল থেকে বিনা মাশুলে বা নির্ধারিত মাশুলে সম-মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা সরবরাহ করা হত, কিংবা কাগজী মুদ্রা প্রচলিত থাকলে তার বিনিময়ে নির্দিষ্ট দামে নির্দিষ্ট বিশুদ্ধতা ও ওজনের স্বর্ণপিণ্ড সরকারী খাজাঞ্চীখানা থেকে বিক্রি করা হত। এইভাবে কাগজের টাকা সোনায় ভাঙিয়ে দিয়ে অর্থের স্বর্ণমূল্য স্থির রাখা হত; (গ) দেশের মধ্যে কি পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকবে তা নির্ভর করত সরকারের হাতে সোনার সংরক্ষিত তহবিলের উপর। সেটা বাড়লে স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ বাড়ত, সেটা কমলে স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ কমত; (ঘ) অবাধে দেশ থেকে বিদেশে সোনা রপ্তানি হতে এবং বিদেশ থেকে দেশে সোনা আমদানি হতে দেওয়া হত এবং (ঙ) যে সব দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল, তাদের প্রত্যেকের মুদ্রার স্বর্ণমূল্য অনুযায়ী পরস্পরের মুদ্রার বিনিময় হার নিজে থেকে স্থির হয়ে যেত।

সুবিধা ঃ (ক) নির্দিষ্ট বিশুদ্ধতা ও ওজনের সোনার মূল্য দিয়ে দেশের মান ও বিহিত মুদ্রার দাম নির্ধারিত হত, সোনার সংরক্ষিত তহবিলটির উপর মুদ্রার সরবরাহ নির্ভর করত ও স্বর্ণমূল্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারিত হত বলে, এটি সরকারের হস্তক্ষেপমুক্ত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল; (খ) দেশের মূল মুদ্রাটি সোনার হওয়ায় কিংবা সোনায় কাগজী মুদ্রা ভাঙিয়ে দেবার ব্যবস্থা থাকায় এর উপর সহজেই মানুষের বিশ্বাস জন্মাত; (গ) মুদ্রার স্বর্ণমূল্য নির্দিষ্ট হওয়ায় অর্থের অভ্যন্তরীণ মূল্য (অর্থাৎ দেশের মধ্যে অর্থের মূল্য) ও বৈদেশিক মূল্য (অর্থাৎ বিনিময় হার) স্থিতিশীল হত; (ঘ) বিনিময়-হার স্থিতিশীল হত বলে বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তারলাভ করত।

অসুবিধা ঃ (ক) এটা বাস্তবিক পক্ষে খুব স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা ছিল না। এটা সচল রাখতে সরকারকে নানারূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হত; (খ) মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার স্থির রাখতে গিয়ে সোনার অবাধ আমদানী-রপ্তানী চলতে দিতে হত এবং তার ফলে সোনার সংরক্ষিত তহবিল বাড়লে দেশের মধ্যে টাকার যোগান বাড়াতে এবং সংরক্ষিত তহবিল কমলে টাকার যোগান কমাতে হত। ফলে দেশের মধ্যে মূল্যস্তর ঘন ঘন ওঠানামা করত; (গ) দেশের সোনার সংরক্ষিত তহবিলটি অল্প হলে অবাধে সোনা রপ্তানী হতে দিলে সংকট উপস্থিত হত। এ কারণে অনেক দেশই শেষ পর্যন্ত স্বর্ণমান বজায় রাখতে পারে নি; (ঘ) এতে মুদ্রা তৈরির জন্য সোনা কিনতে যেমন অনেক অর্থব্যয় হত, তেমনি সোনার টাকা প্রচলিত থাকলে হাতে হাতে তা ক্ষয় পেত বলে দেশের ক্ষতিও হত।

৩. **দ্বিধাতুমান** (bi-metallism) **ঃ** দ্বিধাতু মুদ্রামান-ব্যবস্থায় একই সঙ্গে সোনা ও রূপার মুদ্রা পাশাপাশি দেশের মান ও বিহিত বা প্রধান মুদ্রা রূপে

প্রচলিত থাকত। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ড ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য প্রধান দেশে এই জাতীয় মুদ্রামান-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

বৈশিষ্ট্য : (ক) এই ব্যবস্থায় দেশের মধ্যে দুটি ভিন্ন ধাতুর, (সোনা ও রূপার) মুদ্রা মানমুদ্রা ও বিহিত মুদ্রা হিসাবে চালু থাকত; (খ) দুটি মুদ্রার বিনিময়ের হার তাদের ধাতুমূল্যের দ্বারা নির্দিষ্ট থাকত (যেমন, সোনার দাম যদি রূপার দামের ১০ গুণ হয় এবং ১টি সোনার টাকায় যদি ১ আউন্স সোনা ও ১টি রূপার টাকায় যদি এক আউন্স রূপা থাকে, তাহলে ১টি সোনার টাকা = ১০টি রূপার টাকা); (গ) সরকারের খাজাঞ্চীখানা সোনা ও রূপা নিয়ে বিনামাশুলে সমমূল্যের সোনা ও রূপার টাকা সরবরাহ করার ভার নিত; (ঘ) দেশে সোনা ও রূপার অবাধ আমদানি-রপ্তানি চলতে দেওয়া হত।

সুবিধা : (ক) সোনার চেয়ে রূপার দাম কম। তাই দেশে স্বর্ণমান থাকলে সোনার টাকার জন্য যে পরিমাণ সোনা কিনতে হত ও সেজন্য যে অর্থব্যয় হত ও হাতে হাতে সোনার টাকা চালু থাকলে সোনা যতটা ক্ষয় পেত, সোনার টাকার সাথে রূপার টাকা চালু থাকলে ততটা খরচ পড়ত না। সোনার দাম বাড়লে, টাকার চাহিদা মত রূপার টাকার যোগান বাড়িয়ে দেশে টাকার যোগান চাহিদার সমান রাখা যেত।

(খ) দ্বিধাতুমানে দেশের মুদ্রার মূল্য বা ক্রয়-ক্ষমতা বেশি স্থিতিশীল হত। কারণ সোনা ও রূপার মধ্যে, যদি নতুন খনি আবিষ্কারের দরুন রূপার বাজারদাম কমে যেত, তাহলে রূপা সস্তা হওয়ায় বিভিন্ন দেশের সরকার বেশি করে রূপার মুদ্রা তৈরি করার চেষ্টায় রূপা বেশি করে কিনত। ফলে চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় রূপার দাম যতটা কমে গিয়েছিল ততটা কম থাকত না, বাড়ত। সোনার ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটত। সুতরাং দেশে দেশে দ্বিধাতুমান থাকলে সোনা ও রূপা, কোন ধাতুর বাজার দামই বিশেষ কমত না। ফলে, সোনার এবং রূপার টাকার ক্রয়-ক্ষমতা বা মূল্যও স্থিতিশীল থাকত।

অসুবিধা : গ্রেশামের বিধি (Gresham's law) **:** কিন্তু দ্বিধাতুমান বাস্তবে একধাতুমানে পরিণত হত। এই ছিল দ্বিধাতুমানের সবচেয়ে বড় অসুবিধা।

ধরা যাক, ভারতে দ্বিধাতুমান রয়েছে। সোনার দাম রূপার দামের দশগুণ। একটি সোনার টাকায় ১ আউন্স সোনা ও ১টি রূপার টাকায় ১ আউন্স রূপা আছে। সুতরাং সরকারীভাবে সোনা ও রূপার টাকার মূল্যের অনুপাত বা বিনিময়-হার হল ১টি সোনার টাকা = ১০টি রূপার টাকা। একে বলে টাঁকশালের দর (mint parity or mint rate)। দু'টি টাকাই দেশে মান ও বিহিত মুদ্রা। কিন্তু সোনা ও রূপার বাজারে প্রতিদিন সোনা ও রূপার চাহিদা এবং যোগান অনুযায়ী ধাতু দু'টির বাজারদর ওঠানামা করবেই। প্রথমে সোনার ও রূপার বাজারদর অনুযায়ী ১ আউন্স সোনার দাম ১০ আউন্স রূপার দামের সমান ছিল বলে সরকারী

দরটাও তাই স্থির হয়েছিল। সুতরাং তখন টাঁকশালের সরকারী দর ও বাজারদর দু'টি পরস্পরের সমান ছিল।

কিছুকাল পরে, বাজারে সোনার তুলনায় রূপার দর পড়ে গেলে ১ আউন্স সোনার দাম ১১ আউন্স রূপার দামের সমান হল। সরকারী দর ঘন ঘন বাড়ান কমান যায় না বলে টাঁকশালের দর ১টি সোনার টাকা (=১ আউন্স সোনা)=১০টি রূপার টাকা (=১০ আউন্স রূপা) থাকল। এখন টাঁকশালের দর ও বাজারদরের এই পার্থক্যের সুযোগ নেবার জন্য চতুর ব্যক্তিরা তৎপর হবে। তারা বাজারে প্রতিটি সোনার টাকা (=১ আউন্স সোনা) দিয়ে ১১ আউন্স করে রূপা কিনবে ও তা থেকে ১০ আউন্স রূপা টাঁকশালে জমা দিয়ে ১টি করে সোনার টাকা নেবে। হাতে থাকবে ১ আউন্স করে রূপা। সেটাই মুনাফা। এইভাবে প্রতি ১০টি সোনার টাকায় তারা বাজার থেকে ১১০ আউন্স রূপা নেবে এবং টাঁকশালে ঐ ১১০ আউন্স রূপা জমা দিয়ে ১১টি করে সোনার টাকা নেবে। তা ছাড়া সরকারের ট্যাক্স ও অন্যান্য পাওনা বাবদ সবাই সরকারকে রূপার টাকা দেবে। ফলে সরকারের হাতেও আর কোন সোনার টাকা অবশিষ্ট থাকবে না, বাজারেও আর সোনার টাকা চলতে দেখা যাবে না। সর্বত্রই কেবল রূপার টাকায় লেনদেন চলবে। সোনার টাকা অদৃশ্য হয়ে যাবে। রূপার তুলনায় সোনার দাম যদি কমে তাহলে তখন বাজার থেকে রূপার টাকা অদৃশ্য হবে, শুধু সোনার টাকা চালু থাকবে। অর্থাৎ **টাঁকশালের দরের তুলনায় যে ধাতুর বাজারদর কম হবে, সে ধাতুর টাকাটা তখন হবে 'খারাপ টাকা' এবং সেই ধাতুর টাকাই সর্বত্র সকলে ব্যবহার করবে। এবং টাঁকশালের দরের তুলনায় যে ধাতুর বাজারদর বেশি হবে সে ধাতুর টাকাটা তখন হবে 'ভালো টাকা', সে ধাতুর টাকা বাজার থেকে অদৃশ্য হবে**। সরকারী টাঁকশালের দর ঘন ঘন বদলায় না, কিন্তু সোনা ও রূপার বাজারদর সর্বদাই ওঠানামা করে বলে, দ্বিধাতু মানে কার্যত, যে কোন সময়ে একটি মাত্র ধাতুর টাকাই ('খারাপ টাকা', যার বাজারদরটা টাঁকশালের দরের চেয়ে কম) বাজারে চালু থাকত, অন্য ধাতুর টাকাটা ('ভালো টাকা', যার বাজারদর টাঁকশালের দরের চেয়ে বেশি) অদৃশ্য হয়ে যেত। এই ছিল দ্বিধাতুমানের সবচেয়ে বড় অসুবিধা।

১৬শ শতাব্দীতে রাণী প্রথম এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ডে দ্বিধাতুমান ছিল এবং তখন রাণী নতুন সোনার টাকা চালু করার পর যখন দেখা গেল বাজার থেকে সেগুলি উধাও হয়ে গেছে এবং পুরানো রূপার টাকাগুলিই সর্বত্র চলছে, তখন স্যার টমাস গ্রেশামের উপর এর কারণ অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হয়। অনুসন্ধানের পর গ্রেশাম যে কারণটি দেখান, তা একটি বিখ্যাত বাক্যে পরিণত হয়েছে : 'খারাপ টাকা ভালো টাকাকে বাজার থেকে তাড়িয়ে দেয়' (bad money drives good money out of the market')। দ্বিধাতুমানের এই বৈশিষ্ট্যটিই গ্রেশামের বিধি নামে অর্থবিদ্যায় স্থান লাভ করেছে।

৪. **কাগজী মুদ্রামান** (paper standard) **:** বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশে যে মুদ্রামান-ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে, তা স্বর্ণমান বা রৌপ্যমানের মত এক ধাতুমানও নয় কিংবা দ্বিধাতুমানও নয়। কোন ধাতুমানই এখন আর কোথাও প্রচলিত নেই। এখন সর্বত্র যা প্রচলিত, তার নাম হল কাগজী মুদ্রামান। এই ব্যবস্থায় কাগজের টাকাই হল দেশের মান এবং বিহিত মুদ্রা বা প্রধান মুদ্রা। সেই সাথে অল্প মূল্যের নিকৃষ্ট ধাতুমুদ্রাও প্রচলিত থাকে মানুষের সুবিধার জন্য। তার সরকারী মূল্যের চেয়ে ধাতুমূল্য কম। কাগজের টাকার কোন স্বর্ণমূল্য নেই (অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিশুদ্ধতা ও ওজনের সোনার মূল্য দিয়ে টাকার মূল্য বেঁধে দেওয়া হয় না)। কিংবা কাগজের টাকা বা নোট, সোনা কিংবা রূপার টাকায় ভাঙানো যায় না অথবা তা নিয়ে নির্দিষ্ট দামে সোনা বা রূপার ধাতুখণ্ড বিক্রির ভারও সরকার নেয় না। দেশের প্রয়োজন বুঝে সরকার কাগজের নোট বাজারে ছাড়ে। ভারতে এক টাকার নোট হল দেশের মান ও বিহিত মুদ্রা। অন্যদেশের কাগজের টাকার সাথে দেশের কাগজের টাকার বিনিময় হার সরকার বেঁধে দেয় এবং তা বজায় রাখার ভার নেয়। দেশের মধ্যে টাকার ক্রয়-ক্ষমতা বা অভ্যন্তরীণ মূল্য বজায় রাখার দায়িত্বও সরকারের।

সুবিধা : (ক) এই ব্যবস্থায় খরচ অত্যন্ত কম। কারণ, প্রধান মুদ্রা ধাতুর নয় বলে সোনা বা রূপার মতো মূল্যবান ধাতু কিনতে হয় না ; সোনা বা রূপার টাকা চালু থাকলে ব্যবহারের ফলে তা ক্ষয় হওয়ার দরুন যে ক্ষতি হত তা হয় না। কাগজের নোট ছাপানোর খরচ যেমন কম তেমনি পুরনো নোটের বদলে নতুন নোট বিলির খরচও অল্প ; (খ) এই ব্যবস্থায় সোনা বা রূপার একটা মজুদ তহবিল কোন কোন দেশে রাখা হয় বটে, কিন্তু তার পরিমাণ অল্প এবং তার সাথে প্রচলিত কাগজের নোটের পরিমাণের কোন সম্পর্ক থাকে না ; (গ) এই ব্যবস্থাটি স্থিতি-স্থাপক। অর্থাৎ দরকার মত সহজেই নোট প্রচারের পরিমাণ বাড়ানো-কমানো যায় ; (ঘ) কাগজের নোট সহজেই স্থান থেকে স্থানান্তরে বহন করা যায়।

অসুবিধা : (ক) কাগজের নোট সহজেই নষ্ট হয় ; (খ) বিদেশীরা কাগজের টাকায় তাঁদের রপ্তানী দ্রব্যের দাম নেয় না ; (গ) অতি সহজে সরকার নোট প্রচারের পরিমাণ বাড়াতে পারে বলে প্রয়োজনের তুলনায় কাগজের টাকার পরিমাণ বেশি হয়ে গিয়ে দেশে ক্রমাগত মূল্যস্তর বৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতি ঘটাতে পারে এবং ঘটিয়েও থাকে।

৫. **নোট প্রচারের পদ্ধতি** (methods of note issue) **:** কাগজের টাকা প্রচারের চারটি প্রধান পদ্ধতি দেখা যায়।

(ক) **বিনা জামিনে সর্বাধিক সীমার ব্যবস্থা** (maximum fiduciary system) **:** এই পদ্ধতিতে কাগজের নোটের জন্য জামিন হিসাবে কোন মূল্যবান ধাতুর সংরক্ষিত তহবিল থাকে না। আইনের দ্বারা একটি সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত নোট প্রচারের ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয়। কাগজের নোট সোনা বা রূপার টাকায়

ভাঙানোর ব্যবস্থা থাকে না। কখন কতটা পরিমাণ নোট ছাপানো ও প্রচার করা হবে তা সরকারের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়।

(খ) **বিনা জামিনে নির্দিষ্ট সীমার ব্যবস্থা** (fixed fiduciary system) : এই পদ্ধতিতে **নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত** সরকারকে বিনা জামিনে নোট প্রচারের এবং তার বেশি হলে সমান মূল্যের সোনার জামিনে অতিরিক্ত নোট প্রচারের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ইংলণ্ডে এই পদ্ধতি প্রচলিত।

(গ) **আনুপাতিক জামিনের ব্যবস্থা** (proportional reserve system) : এই পদ্ধতিতে যত টাকার নোট ছাপা হয় তার একটা নির্দিষ্ট শতাংশের হিসাবে (২০%, ২৫%, ৩০%, ৪০%, ইত্যাদি) মূল্যবান ধাতুর তহবিল জামিন হিসাবে রাখা হয়। এই ব্যবস্থায় মূল্যবান ধাতুর তহবিল কিছুটা রাখতে হওয়ায় খানিকটা খরচ পড়ে। জামিন তহবিল না বাড়ালে নোট প্রচারের পরিমাণ বাড়ানো যায় না। ভারতে ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত অনেকটা এই ধরনের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

(ঘ) **ন্যূনতম জামিন তহবিল ব্যবস্থা** (minimum reserve system) : এই পদ্ধতিতে নোট প্রচারের কোন উর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয় না। লোকের বিশ্বাস অর্জনের জন্য সামান্য, ন্যূনতম পরিমাণ মূল্যবান ধাতুর তহবিল রাখা হয়। তবে তার সাথে নোট প্রচারের পরিমাণের কোন সম্পর্ক থাকে না। মূল্যবান ধাতু বা ধাতু মুদ্রায় নোটগুলি ভাঙিয়ে দেওয়া হয় না। এতে সহজেই নোট প্রচারের পরিমাণ বাড়ানো-কমানো যায়। ভারতে বর্তমানে এই পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। অনেকের মতে এটি সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি।

৬.৪. অর্থ ও দামস্তর
Money and Prices

১. **অর্থের মূল্য** (value of money) : মূল্য বললে সাধারণত কোন বস্তুর বিনিময়-মূল্য বা অর্থের দ্বারা প্রকাশিত সে বস্তুটির দাম বোঝায়। সে বস্তুটি কিনতে কত টাকা লাগে তা বোঝায় (যেমন রুই মাছের দাম ১৬ টাকা কেজি)। কিন্তু অর্থের মূল্য বা টাকার দাম বলতে কি বোঝায়? দ্রব্যসামগ্রী টাকাতে বেচাকেনা হয়। টাকা তো জিনিসপত্রের মত বেচাকেনা হয় না। তাহলে টাকার দাম কথাটার অর্থ কি? টাকা দিয়ে টাকার দাম প্রকাশ করা যায় না, যেমন মাছ দিয়ে মাছের দাম বা ধান দিয়ে ধানের দাম প্রকাশ করা যায় না। জিনিসের দাম যেমন টাকায় প্রকাশ করতে হয়, তেমনি টাকার দামও জিনিস দিয়ে প্রকাশ করতে হয়। **একটি টাকায়** (অর্থাৎ অর্থের একটি একক দিয়ে) **যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী কেনা যায়, তাই হল টাকার দাম বা টাকার ক্রয়শক্তি, অর্থের মূল্য।**

২. টাকার দাম আর দ্রব্যসামগ্রীর দামের সম্পর্কটা অতি ঘনিষ্ঠ। এদের একটির দ্বারা আরেকটির দাম প্রকাশিত হয়। তবে, সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হলেও বিপরীত।

একটা বাড়লে আরেকটা কমে। মাছের কেজি যদি ১০ টাকা থেকে বেড়ে ২০ টাকা হয় তাহলে মাছের দাম বাড়ল। কিন্তু টাকার দাম? আগে ১ টাকায় ১০০ গ্রাম মাছ পাওয়া যেত, এখন পাওয়া যাবে ৫০ গ্রাম। তাহলে মাছের দাম বেড়ে যাওয়ায় টাকার দাম কমল, অন্তত মাছ কেনার ক্ষেত্রে। সব জিনিসপত্রের দামের গড়কে বলে মূল্যস্তর। মূল্যস্তর বাড়লে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে বোঝায়, আর বোঝায়, টাকার দামটা কমেছে। মূল্যস্তর কমলে জিনিসের দাম কমেছে বোঝায়, আর বোঝায় টাকার দাম বেড়েছে। মূল্যস্তর স্থির থাকলে টাকার দামটাও স্থির থাকে।

৬.৫. টাকার দাম বাড়ে বা কমে কেন?
Why Does Value of Money Change?

১. **টাকার পরিমাণ-তত্ত্ব** (quantity theory of money) **:** টাকার দাম অথবা মূল্যস্তর ওঠানামা করে। একথা সকলেরই জানা আছে। এর কারণ কী? অতি অল্প দিন আগে পর্যন্তও এর কারণের ব্যাখ্যা দিত অর্থবিদ্যার যে তত্ত্বটি তার নাম হল অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব। এই তত্ত্বটির মতে, টাকার মূল্যটা নির্ভর করে তার পরিমাণ বা যোগানের উপর। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, দেশের মধ্যে প্রচলিত টাকার পরিমাণ কম হলে তার দাম হবে বেশি, প্রচলিত টাকার পরিমাণ বেশি হলে তার দাম হবে কম। টাকার পরিমাণ বেড়ে দ্বিগুণ হলে মূল্যস্তর বেড়ে দ্বিগুণ হবে ও টাকার দাম কমে আগের তুলনায় অর্ধেক হবে; টাকার পরিমাণ কমে অর্ধেক হলে মূল্যস্তর কমে অর্ধেক ও টাকার দাম বেড়ে আগের তুলনায় দ্বিগুণ হবে। অর্থাৎ টাকার পরিমাণ যে অনুপাতে বাড়ে মূল্যস্তরও সেই অনুপাতে বাড়ে এবং টাকার দাম তার বিপরীত অনুপাতে কমে, এবং টাকার পরিমাণ যে অনুপাতে কমে মূল্যস্তরও সেই অনুপাতে কমে, এবং টাকার দাম তার বিপরীত অনুপাতে বাড়ে। এই হল বিখ্যাত অর্থের পরিমাণ-তত্ত্বের বক্তব্য।

২. **ব্যাখ্যা :** অর্থের পরিমাণ-তত্ত্বটি সর্বপ্রথম প্রচার করেন ইতালীয় অর্থনীতিবিদ্ দাভানৎসাত্তি (Davanzatti) ১৫৮৮ সালে। পরে ডেভিড রিকারডো, ডেভিড হিউম ও জে. এস. মিল প্রমুখ ব্রিটিশ ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্‌রা এই তত্ত্বটি সংস্কার ও পুনঃপ্রচার করেন। কিন্তু আধুনিক কালে তত্ত্বটি জনপ্রিয় করে তোলেন মার্কিন অর্থনীতিবিদ্ আরভিং ফিশার। ১৯১১ সালে প্রকাশিত 'অর্থের ক্রয়-ক্ষমতা' নামক তাঁর পুস্তকে ফিশার একটি সমীকরণের আকারে তত্ত্বটি উপস্থাপিত করেন। তার কিছুকাল পরে ইংলণ্ডের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ মার্শাল, পিগু, কানান, রবার্টসন ও কীন্‌স্ এই তত্ত্বটি ভিন্নতরভাবে একটি ভিন্নতর সমীকরণের সাহায্যে উপস্থিত ও ব্যাখ্যা করেন।

আমরা এখানে অর্থের পরিমাণ-তত্ত্ব সম্পর্কে **ফিশারের সমীকরণটি** আলোচনা করব।

ফিশারের মতে—(ক) বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজটিই হল অর্থের সর্বপ্রধান কাজ। অর্থের জন্য অর্থ কেউ চায় না, **দ্রব্য ও সেবাকর্ম বেচাকেনার জন্যই সকলে অর্থ চায়।** সমাজে অর্থের চাহিদা এই কারণেই।

(খ) একটি **নির্দিষ্টকালে** (period of time) সমাজে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম বেচাকেনা হয়, তার মোট মূল্যই হল সে সময়ে অর্থের মোট চাহিদা দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট বেচাকেনার পরিমাণ = অর্থের মোট চাহিদা)।

(গ) যে কোন নির্দিষ্টকালে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের বেচাকেনার পরিমাণের মোট মূল্য হল, দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের পরিমাণ ও গড়পড়তা দামের গুণফল (দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট পরিমাণ × গড় দাম = দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট মূল্য)।

(ঘ) সুতরাং যে কোন নির্দিষ্টকালে দেশে **অর্থের মোট চাহিদা** = **দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট পরিমাণ × গড় দাম।** দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট পরিমাণটিকে যদি T ধরা হয় এবং গড় দামকে যদি P ধরা হয়, তাহলে যে কোন নির্দিষ্ট কালে দেশের অর্থের মোট চাহিদা = T × P।

[ধরা যাক, কোন নির্দিষ্ট কালে একটি দেশে কেবল ১,০০০ মণ ধান উৎপন্ন হল ও বাজারে চাষীরা তা বিক্রির জন্য নিয়ে এল। ধানের দর হল ৫০ টাকা। সুতরাং সে ধানের মোট দাম হল = ১,০০০ মণ ধান × ৫০ টাকা = ৫০,০০০ টাকা। অতএব, (টাকার চাহিদাকারী হিসাবে ধানের বিক্রেতাদের কাছে, অর্থাৎ দেশে, টাকার মোট চাহিদা হল ৫০,০০০ টাকা।]

(ঙ) যে কোন নির্দিষ্ট **মুহূর্তে** (moment or point of time) দেশে **টাকার যোগান** হল সে মুহূর্তে ক্রেতাদের কাছে যে পরিমাণ টাকা আছে শুধু তার সমষ্টি (total quantity of money)। এটাকে M ধরা যেতে পারে। কিন্তু যে কোন নির্দিষ্ট **কালে** (period of time) এক একটি টাকা দ্রব্য ও সেবাকর্ম বেচাকেনায় একাধিক বার ব্যবহার করা যায়। ঐ সময়ের মধ্যে একটি টাকা যদি গড়পড়তা ৫ বার ব্যবহার করা হয় তাহলে ১ টাকা ৫ টাকার সমান বেচাকেনার কাজ করে ৫ টাকার সমান হয়ে দাঁড়ায়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি টাকা যতবার বেচাকেনার কাজ করে ততবার মানুষের হাত বদলায়। তাকে বলে টাকার **প্রচলন বেগ** (velocity of circulation of money)। এটাকে V ধরা যেতে পারে। তাই **যে কোন নির্দিষ্ট কালে টাকার যোগান হল টাকার মোট পরিমাণ** (যা **টাকার পরিমাণ এবং টাকার গড়পড়তা প্রচলন বেগের গুণফল** = M × V)।

[ধরা যাক যে, কোন নির্দিষ্ট কালে দেশে টাকার মোট পরিমাণ (M) রয়েছে ৫,০০০ এবং টাকার গড়পড়তা প্রচলন বেগ (V) হল ১০। সুতরাং তখন দেশে টাকার মোট যোগান = M × V = ৫,০০০ × ১০ = ৫০,০০০]।

(চ) যে কোন **নির্দিষ্ট কালে, বিক্রেতারা** তাদের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের

৩. **অর্থের পরিমাণ-তত্ত্বের মূল্যায়ন :** অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্তও অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের বক্তব্যকে সঠিক বলে মনে করা হত। কিন্তু এর ত্রুটিগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ায় এখন তা বর্জন করা হয়েছে। সংক্ষেপে এর কারণ হল,

(ক) যে কোন নির্দিষ্ট কালে 'অন্যান্য অবস্থাগুলি'ও অর্থাৎ, V এবং V′ ও T এবং M-এর সাথে M′-এর অনুপাত বদলায়। সুতরাং P বা মূল্যস্তরের পরিবর্তন শুধু টাকার যোগানের উপর নির্ভর করে না বা শুধু যে সেজন্যই বদলায় তা নয়।

(খ) কীন্‌স্‌ ও আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে শুধু টাকার যোগান নয়, দেশে আয়ের স্তরের উপরেও মূল্যস্তর নির্ভর করে। আয় বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা ও দাম বাড়বে এবং টাকার দাম কমবে। আয় কমলে এর বিপরীত হবে।

(গ) পরিমাণ-তত্ত্ব আমাদের শেখায় যে টাকার যোগান বাড়লে মূল্যস্তর বাড়বে। গত ১৯২৯-৩৩ সালে যখন পৃথিবীব্যাপী মন্দা দেখা দিয়েছিল, তখন দেশে দেশে মূল্যস্তর অত্যন্ত কমে যায়। সে মূল্যস্তর বাড়ানোর জন্য তখন অনেক দেশে টাকার যোগান বাড়ানো হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল তাতে মূল্যস্তর বাড়ল না। সুতরাং টাকার যোগান বাড়লে মূল্যস্তর সব সময়ে যে বাড়ে তা নয়।

তবে, ত্রুটি সত্ত্বেও, পরিমাণ-তত্ত্বের মধ্যে খানিকটা সত্যতা আছে। টাকার যোগান বাড়লে মূল্যস্তর অধিকাংশ সময়েই কিছু না কিছু বাড়েই। অর্থাৎ টাকার যোগান পরিবর্তিত হলে মূল্যস্তর ও টাকার দামের কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটেই থাকে।

৬. ৬. মূল্যস্তরের পরিবর্তনের পরিমাপ : সূচক সংখ্যা
Index Number

১. **সূচক সংখ্যা :** মূল্যস্তরের ওঠানামা বা হ্রাসবৃদ্ধি (অর্থাৎ টাকার দামের পরিবর্তন) যার সাহায্যে পরিমাপ করা যায় তাকে বলে মূল্যস্তরের সূচক সংখ্যা। মূল্যস্তরের সূচক সংখ্যা হল কোন নির্দিষ্ট সময়ে (যেমন কোন বৎসরে) কতকগুলি বেছে নেওয়া দ্রব্য ও সেবাকর্মের গড় দামের নির্দেশক একটি সাংকেতিক সংখ্যা। আরেকটি নির্দিষ্ট সময়ে (যেমন আরেকটি বৎসরে) ঐ একই বেছে নেওয়া দ্রব্য ও সেবাকর্মের গড় দামের নির্দেশক আরেকটি সাংকেতিক সংখ্যার (বা সূচক সংখ্যার) সাথে তুলনামূলকভাবে তা প্রকাশ করা হয়। ঐ সংখ্যা দুটির পার্থক্য থেকে মূল্যস্তরের পরিবর্তনটা পরিমাপ করা যায়।

২. **সূচক সংখ্যা তৈরি করার নিয়ম :** (ক) যে সময়ের বা বৎসরের মূল্যস্তরের সাথে আরেকটি বৎসরের মূল্যস্তরের পার্থক্যটা পরিমাপ করা হবে তাকে বলে **ভিত্তি বৎসর** (base year)। প্রথমেই ভিত্তি বৎসর হিসাবে এমন একটি বৎসরকে **বেছে নিতে হয়**, যে বৎসর মূল্যস্তর মোটামুটি **স্বাভাবিক** ছিল। (খ) সকলের ব্যবহার্য **গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি দ্রব্য ও সেবা বেছে নিতে হয়।** দ্রব্যগুলির সংখ্যা খুব বেশি হলে হিসাবের অসুবিধা হবে, আবার কম হলে হিসাবটি

ঠিক হবে না। (গ) বেছে নেওয়া দ্রব্য ও সেবাগুলির দাম সংগ্রহ করতে হবে। পাইকারী দাম সহজে যোগাড় করা যায় বলে পাইকারী দামের ভিত্তিতেই হিসাবটি করা হয়। (ঘ) ভিত্তি বৎসরে প্রতিটি দ্রব্যের দামের আপেক্ষিক সংখ্যা ১০০ ধরা হয়, হিসাবের সুবিধার জন্য। (ঙ) আপেক্ষিক সংখ্যাগুলির যোগফলকে দ্রব্যের সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলে ভাগফলটিকে মূল্যস্তরের সূচক সংখ্যা বলে ধরা হয়। এই হল **সরল সূচক সংখ্যা** তৈরির প্রণালী।

এবার কাল্পনিক তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৬২ সালকে ভিত্তি বৎসর ধরে তিনটি বাছাই করা গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যের মূল্যের ভিত্তিতে, ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে মূল্য-স্তরের পরিবর্তন পরিমাপ করা হল।

	ভিত্তি বৎসর ১৯৬১ সাল		১৯৬২ সাল	
দ্রব্য	কেজি প্রতি দাম	আপেক্ষিক সংখ্যা	কেজি প্রতি দাম	আপেক্ষিক সংখ্যা
১. চাল	১·৫০ টা.	১০০	৩·০ টা.	২০০
২. তেল	৫·০ „	১০০	১১·০ „	২২০
৩. মাছ	৫·০ „	১০০	১৫·০ „	৩০০
		৩ | ৩০০		৩ | ৭২০
১৯৬১ সালের মূল্যস্তরের সূচক সংখ্যা = ১০০			১৯৭৭ সালের মূল্যস্তরের সূচক সংখ্যা = ২৪০	

গুরুত্বসংযুক্ত সূচক সংখ্যা : উপরের সূচক সংখ্যা হল সরল সূচক সংখ্যা (simple index number)। এতে সমস্ত দ্রব্যকে সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এরা সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। আয় কম থাকলে মানুষ মাছ বাদ দিতে পারে। তাই চাল ও তেলের চেয়ে মাছের গুরুত্ব কম। আবার আয় আরো কম হলে মানুষ শুধু নুন ভাত খায়, তেল কেনে না। তাই মাছের চেয়ে তেলের গুরুত্ব বেশি হলেও চালের তুলনায় তেলের গুরুত্ব কম। তাই সূচক সংখ্যা তৈরি করতে হলে দ্রব্যগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব হিসাবে ধরা উচিত। সে সূচক সংখ্যাকে বলে গুরুত্বসংযুক্ত সূচক সংখ্যা। এটি তৈরি করার নিয়ম হল : (১) অনুমানের ভিত্তিতে প্রতিটি দ্রব্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ করে সেই গুরুত্ব অনুযায়ী এক একটি সংখ্যা বসাতে হয়। এগুলি হবে গুরুত্ব নির্দেশক সংখ্যা। তারপর দ্রব্য-মূল্যের আপেক্ষিক সংখ্যাগুলিকে গুরুত্ববাচক সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হয়।

(২) গুণফলগুলি যোগ দিয়ে গুরুত্ববাচক সংখ্যাগুলির সমষ্টি দিয়ে তাকে ভাগ করতে হয়। ভাগফলটি হল গুরুত্ববাচক সূচক সংখ্যা। নিচে তার দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

ভিত্তি বৎসর ১৯৬১ সাল						১৯৬৮ সাল				
দ্রব্য	কেজি প্রতি দাম	আপেক্ষিক সংখ্যা	×	গুরুত্ব বাচক সংখ্যা	= গুণফল		আ: সং	×	গুরুত্ব বাচক সং	= গুণফল
১. চাল	১·৫০ টা.	১০০	×	৮	=৮০০	৩·০ টা.	২০০	×	৮	=১৬০০
২. তেল	৫·০ „	১০০	×	৫	=৫০০	১১·০ „	২২০	×	৫	=১১০০
৩. মাছ	৫·০ „	১০০	×	২	=২০০	১৫·০ „	৩০০	×	২	=৬০০
				১৫	১৫০০	১৯৭৭ সালের			১৫	৩৩০০
১৯৬১ সালের গুরুত্বসংযুক্ত সূচক সংখ্যা···					১০০	গুরুত্বসংযুক্ত সূচক সংখ্যা				···=২২০

৩. **সূচক সংখ্যার প্রয়োজনীয়তা :** দ্রব্য মূল্যস্তরের সূচক সংখ্যার দ্বারা : (ক) দ্রব্য মূল্যস্তর কতটা বেড়েছে বা কমেছে এবং টাকার দাম কতটা কমেছে বা বেড়েছে তা জানা যায় এবং তা'র বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন কিনা স্থির করা যায়। (খ) জনসাধারণের জীবনধারণের মান কতটা বেড়েছে বা কমেছে তা বোঝা যায়। (গ) একই সময়ে দুই দেশের মূল্যস্তরের সূচক সংখ্যা থেকে দুটি দেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা খানিকটা আন্দাজ করা যায়। (ঘ) দেশে মজুরি, বেতন ও মহার্ঘভাতা ইত্যাদির হ্রাস বৃদ্ধির দরকার কিনা এবং তা কতটা পরিবর্তন করা প্রয়োজন তা স্থির করা যায়।

৪. **সূচক সংখ্যার ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা :** সূচক সংখ্যা তৈরি করার কতকগুলি অসুবিধা আছে। সে কারণে যে কোন সূচক সংখ্যারই কতকগুলি ত্রুটি থেকে যায়। এই ত্রুটিগুলির দরুন সূচক সংখ্যার উপযোগিতা সর্বদাই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। সে ত্রুটিগুলি হল : (ক) বাস্তবে 'স্বাভাবিক বৎসর' বাছাই করা কঠিন। যে বৎসর মূল্যস্তর বেশিও ছিল না আবার কমও ছিল না, এমন বৎসরকে স্বাভাবিক বৎসর বলে। কিন্তু এমন বৎসর খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত। (খ) উপযুক্ত দ্রব্য ও সেবাকর্ম বাছাই করাও কম কঠিন নয়। সঠিক সূচক সংখ্যা তৈরি করতে হলে সব জিনিসের দামই হিসাবে ধরা উচিত কিন্তু সেটা কার্যত অসম্ভব। তাই অধিকাংশ দ্রব্যই বাদ যায়। কোন্ দ্রব্য বাদ দেওয়া হবে আর কোন্ দ্রব্যগুলি গ্রহণ করা হবে তা স্থির করা কম কঠিন নয়। যে রকম সামগ্রী বেছে নেওয়া হবে, ফলাফলটি তার উপরই

বিক্রয় করছেন। (গ) সাধারণ মানুষের সুবিধা-অসুবিধা বুঝতে হলে খুচরা দামের ভিত্তিতে সূচক সংখ্যা তৈরি করা উচিত। কিন্তু সেটা আকারপ্রকারগত অসম্ভব। তাই পাইকারী দরটাই গ্রহণ করা হয়। অথচ পাইকারী ও খুচরা দরের মধ্যে তফাত থাকে। (ঘ) দুটি নির্দিষ্ট সময়ের বা বৎসরের মধ্যে একই দ্রব্যের গুণ ও মান বদলে যেতে পারে। কিন্তু সূচক সংখ্যায় তা ধরা পড়ে না। (ঙ) গুরুত্ব সংযুক্ত সূচক-সংখ্যায় গুরুত্ববাচক যে সব সংখ্যা গ্রহণ করা হয় তা এক একজনের বিবেচনায় এক একরকম এবং কাল্পনিক হবে। (চ) দামের গড় হিসাব করার পদ্ধতি নানা রকমের আছে এবং এক এক পদ্ধতির ফলও এক এক রকমের। এই সকল ত্রুটির দরুন কোন সূচক সংখ্যাকেই নির্ভুল বলে গণ্য করা যায় না।

৬. ৭. মুদ্রাস্ফীতি
Inflation

মুদ্রাস্ফীতি ঃ মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। **গ্রেগরী, হট্রে, কেমেরার** প্রভৃতি অর্থবিজ্ঞানীরা অনেকেই অর্থের পরিমাণের ভিত্তিতে এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁদের মতে, দেশে দ্রব্যসামগ্রীর যোগানের তুলনায় অর্থের যোগান বেশি হলে ঐ অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা বলা যায়। **পিগু** আয়-ব্যয়প্রবাহের ধারণাটির ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা দিয়েছেন, মুদ্রাস্ফীতি হল এরূপ এক অবস্থা যেখানে আয়-উপার্জনকারী কার্যাবলীর (অর্থাৎ উৎপাদন) তুলনায় আর্থিক আয় বেশি বাড়ছে। **কুলবর্ণ** বলেছেন মুদ্রাস্ফীতি হল এরূপ এক পরিস্থিতি যেখানে অতি অল্প পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর পিছনে অত্যধিক পরিমাণ অর্থ ধাবিত হচ্ছে। **ক্রাউথার** বললেন, মুদ্রাস্ফীতি এমন এক অবস্থা যেখানে অর্থের মূল্য কমে যাচ্ছে অর্থাৎ দামস্তর বাড়ছে।

কিন্তু আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীরা মুদ্রাস্ফীতির এই সব সংজ্ঞায় সন্তুষ্ট নন। কারণ: (১) দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও **দামস্তর না বাড়লেও মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে পারে।** উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন খরচ কমলেও যদি দামস্তর না কমে, তবে তাও মুদ্রাস্ফীতি বলে গণ্য করা যায়। সুতরাং অর্থের আধিক্য মুদ্রাস্ফীতির পক্ষে প্রয়োজনীয় হলেও কেবল তার অস্তিত্বই মুদ্রাস্ফীতি ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। (২) **কীন্‌সের** মতে মুদ্রাস্ফীতি হল এরূপ এক পরিস্থিতি যেখানে দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগানের তুলনায় কার্যকর চাহিদা বেশি হয়ে পড়ছে। সাম্প্রতিক কালের অর্থবিজ্ঞানীরা আরও অগ্রসর হয়ে বলছেন, মুদ্রাস্ফীতি হল মূলত এরূপ এক চাহিদা-যোগানের **অ-ভারসাম্যের পরিস্থিতি** যাতে ক্রয়শক্তির (অর্থাৎ অর্থের) সম্প্রসারণ দামস্তর বাড়িয়ে দেয় কিম্বা অর্থের সম্প্রসারণটা নিজেই দামস্তরের বৃদ্ধির ফল হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং সমকালীন অর্থবিজ্ঞানীদের মতে, **মুদ্রাস্ফীতি হল অর্থের যোগান, উৎপাদন ও ভোগ এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে অসঙ্গতির ফল।** সাধারণত

দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পায়, কিন্তু দামস্তর না বাড়লেও তা ঘটতে পারে।

মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক (inflationary gap) ঃ কীন্‌স মুদ্রাস্ফীতি বিশ্লেষণ করার জন্য 'মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক' নামক ধারণাটি ব্যবহার করেছিলেন। কীন্‌সের মতে, মুদ্রাস্ফীতি ঘটার আগেকার দামস্তর অনুযায়ী বর্তমান বাজারে ক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মোট দামের তুলনায় তার উপর অনুমিত সম্ভাব্য মোট ব্যয় যতটা বেশি, তাই হল মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক। অর্থাৎ এ হল দেশের মোট ব্যবহারযোগ্য আয় (disposable income) এবং আগেকার দামস্তরে ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মোট দামের মধ্যে ব্যবধান [ব্যবহারযোগ্য আয়-ভিত্তিমূলক দামস্তরে ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মোট দাম = মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক]। যতক্ষণ পর্যন্ত আগেকার দামস্তরে যথেষ্ট পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পযন্ত মুদ্রাস্ফীতিমূলক কোন ফাঁকের উদ্ভব হতে পারে না। কিন্তু আগেকার দামস্তরে ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মোট দাম অপেক্ষা তাদের উপর সমাজের আকাঙ্ক্ষিত সম্ভাব্য ব্যয় বেশি হলেই মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক দেখা দেবে। এই ফাঁক যত বেশি হবে, ততই মুদ্রাস্ফীতির চাপ বেশি হবে এবং দামস্তর ততই বাড়বে। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁকের ধারণাটির সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা ও তার চাপ পরিমাপ করা যায়।

মার্কিন অধ্যাপক ওয়ারবার্টন মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁকের একটি বাস্তবসম্মত ও সাধারণ বুদ্ধিজাত সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে সমাজের মোট আর্থিক আয়প্রবাহ থেকে ভোগব্যয়, পুঁজিদ্রব্যের উপর ব্যয় এবং সরকারী কর রাজস্ব, এই তিনটির সমষ্টি বাদ দিলে মুদ্রাস্ফীতিমূলক সম্ভাব্য ফাঁক পাওয়া যায়। সরকার যে নূতন ঋণ সংগ্রহ করেছেন তা মুদ্রাস্ফীতিমূলক সম্ভাব্য ফাঁক থেকে বাদ দিলে মুদ্রাস্ফীতিমূলক যথার্থ ফাঁক পাওয়া যায় [মোট আর্থিক আয়প্রবাহ - (ভোগব্যয় + বিনিয়োগ ব্যয় + সরকারী কর রাজস্ব) = মুদ্রাস্ফীতি-মূলক সম্ভাব্য ফাঁক। মুদ্রাস্ফীতিমূলক সম্ভাব্য ফাঁক - নূতন সংগৃহীত সরকারী ঋণ = মুদ্রাস্ফীতিমূলক যথার্থ ফাঁক]। মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁকের এইরূপ ধারণা ও সমীকরণটি ভারতের মত দেশগুলির পক্ষে মুদ্রাস্ফীতিমূলক ফাঁক পরিমাপের উপযোগী।

মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ

ক. কারণ অনুসারে প্রকারভেদ ঃ ১. 'কারেন্সী ইনফ্লেশন' বা সরকারী নগদ মুদ্রাস্ফীতি—সরকারের দ্বারা প্রচলিত কাগজের টাকা বা নোটের অতিরিক্ত প্রচলনের দরুন দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটলে তাকে কারেন্সী ইনফ্লেশন বা সরকারী নগদ মুদ্রাস্ফীতি বলে।

২. **ক্রেডিট ইনফ্লেশন বা ঋণস্ফীতি**—ব্যাঙ্কঋণ বা ব্যাঙ্কের আমানতের অত্যধিক সম্প্রসারণের দরুন দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলে তাকে ঋণস্ফীতি বলে।

৩. **ঘাটতি ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি**—সরকারী মোট আয় অপেক্ষা মোট ব্যয় বেশি হওয়ার ফলে দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটতে থাকলে (বলা বাহুল্য সরকারী মুদ্রা প্রচলনের পরিমাণের ও ব্যাঙ্কঋণের সম্প্রসারণের মধ্য দিয়েই তা ঘটে), তাকে ঘাটতি ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

৪. **মুনাফা ও মজুরিবৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি**—মুনাফা ও মজুরি বৃদ্ধির দরুন দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটলে তাকে মুনাফা ও মজুরিবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

৫. **চাহিদাবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি**—সরকারী বা বেসরকারী বা উভয় ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ ব্যয়ের দরুন, দ্রব্যসামগ্রীর মোট কার্যকর চাহিদা মোট উৎপন্ন বা মোট যোগানের অতিরিক্ত হয়ে পড়লে দামস্তরের যে ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটে তাকে চাহিদাবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

৬. **উৎপাদন-খরচবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি**—কাঁচামালের দাম, মজুরি ইত্যাদির বৃদ্ধির দরুন উৎপাদন খরচ বাড়তে থাকলে তার ফলে দামস্তরের যে ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটে তাই উৎপাদন-খরচবৃদ্ধির দরুন মুদ্রাস্ফীতি।

খ. গতিবেগ অনুসারে প্রকারভেদ ঃ ১. **মৃদু মুদ্রাস্ফীতি**—দামস্তর অতি ধীরে ধীরে অথচ ক্রমাগত বাড়তে থাকলে তাকে ধীরগতি বা মৃদু মুদ্রাস্ফীতি বলে।

২. **পদসঞ্চারী মুদ্রাস্ফীতি**—দামস্তরের বৃদ্ধির হার বাড়লে ও তা প্রকট হলে তাকে পদসঞ্চারী মুদ্রাস্ফীতি বলে।

৩. **ধাবমান বা অতি মুদ্রাস্ফীতি**—দামস্তর বৃদ্ধির হার অত্যধিক হলে এবং দ্রুতবেগে তা বাড়তে থাকলে তাকে ধাবমান বা অতি মুদ্রাস্ফীতি বলে।

গ. মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা ও তা দমন করা হচ্ছে কিনা তদনুসারে প্রকারভেদ ঃ ১. প্রচ্ছন্ন বা অন্তর্নিহিত মুদ্রাস্ফীতি—যখন দেশে মানুষের হাতে বিপুল পরিমাণে সঞ্চিত অর্থ জমতে থাকে অথচ দ্রব্যসামগ্রীর অভাবে বা নানা প্রকার সরকারী বিধি-নিষেধের (রেশনিং প্রভৃতির দরুন এবং যুদ্ধের সময়) দরুন তা ব্যয় করার কোন সুযোগ থাকে না, উদ্যোক্তারা নূতন পুঁজিদ্রব্যের জন্য ফরমাস ইত্যাদি দিতে পারে না, ঐরূপ পরিস্থিতিকে প্রচ্ছন্ন বা অন্তর্নিহিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। ঐ সঞ্চিত অর্থ ব্যয়রূপে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাওয়া মাত্র যথার্থ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে।

২. **অদমিত মুদ্রাস্ফীতি**—দেশে ক্রমাগত দামস্তর বাড়তে থাকলে এবং তাকে দমন করার জন্য কোনপ্রকার ব্যবস্থা গৃহীত না হলে তাকে খোলাখুলি বা অদমিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

৩. **অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি**—দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি দমন করার জন্য সরকার থেকে দামনিয়ন্ত্রণ, রেশনিং, কোম্পানীর লভ্যাংশ বণ্টন সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা,

মুনাফার নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সীমার বেশী মুনাফার উপর কর ধার্য করা বা তা বাধ্যতা-মূলকভাবে সঞ্চয় করা, ভোগ্যপণ্য-ঋণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি নানারূপ বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ দ্বারা সমাজের মোট ব্যয়বৃদ্ধি রোধ করা হলে, দামস্তরের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে ঐ মুদ্রাস্ফীতি ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের হাতে সঞ্চিত অলস নগদ তহবিল, ব্যাঙ্কে বর্ধিত আমানতী জমা ও অন্যান্য প্রায় নগদ সম্পত্তির বর্ধিত তহবিলের রূপ ধারণ করতে পারে। এইরূপ পরিস্থিতিকে অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

ঘ. কীন্‌সীয় প্রকারভেদ : ১. প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি—কীন্‌সের মতে মাত্র পূর্ণ-নিয়োগের স্তরেই প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি বলতে এরূপ পরিস্থিতি বোঝায় যখন আর্থিক ব্যয় (= অর্থের যোগান) যে অনুপাতে বাড়ে দামস্তরও সেই অনুপাতে বাড়ে। কারণ তখন উৎপাদন সর্বোচ্চ সীমায় পৌছায় বলে, আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন কিছুমাত্র না বেড়ে সমানুপাতে শুধুই দামস্তর বাড়বে।

২. অর্ধ মুদ্রাস্ফীতি-কীন্‌সের মতে পূর্ণনিয়োগ স্তরের নিচে দেশে যখন উপাদানসমূহের কতকাংশ কর্মহীন থাকে, ঐ পরিস্থিতিতে আর্থিক ব্যয় (= অর্থের যোগান) বাড়লে নিয়োগ বাড়ে এবং ফলে উৎপাদন কতকাংশে বাড়ে বলে দামস্তর আদৌ বাড়ে না অথবা বাড়লেও সামান্য অনুপাতে বাড়ে। শেষোক্ত অবস্থাকে 'সেমি-ইনফ্লেশন' বা অর্ধ-মুদ্রাস্ফীতি বলা যায়।

চাহিদাবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি : কার্যকর চাহিদাবৃদ্ধি এবং উৎপাদন খরচবৃদ্ধি, এরা মুদ্রাস্ফীতির মূলগত কারণ হলেও, এদের দু'য়ের মধ্যে মুখ্য কারণটি হল কার্যকর চাহিদার বৃদ্ধি। কারণ, যদি কার্যকর চাহিদা না বেড়ে শুধুই উৎপাদন-খরচ বাড়ে, তবে তাতে বিক্রয় কমবে, উৎপাদন ও নিয়োগ কমবে। ফলে, তাতে ভোগ্যদ্রব্যের দামস্তর ক্রমাগত বাড়তে পারে না।

মুদ্রাস্ফীতির প্রক্রিয়াতে কার্যকর চাহিদার ভূমিকাটি অনুধাবনের জন্য তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কার্যকর চাহিদার সম্প্রসারণ তিন রকমের হতে পারে। (১) **স্বয়ম্ভূত সম্প্রসারণ :** উৎপাদন-খরচ না বাড়লেও, কার্যকর চাহিদার যে সম্প্রসারণ ঘটে তাই হল চাহিদার **স্বয়ম্ভূত সম্প্রসারণ**। উৎপাদন-খরচ বাড়ার ফলে, অথবা তা বাড়বে বলে অনুমানের উপর ভিত্তি করে, চাহিদার এইরূপ সম্প্রসারণ ঘটে না। সুতরাং উৎপাদন-খরচের বৃদ্ধি না ঘটা সত্ত্বেও কার্যকর চাহিদার এই প্রকার সম্প্রসারণের ফলে মোট ব্যয় বাড়ে। (২) **প্রণোদিত সম্প্রসারণ :** উৎপাদন-খরচ বাড়ার প্রত্যক্ষ ফলরূপে চাহিদার যে সম্প্রসারণ ঘটে তা হল কার্যকর চাহিদার প্রণোদিত সম্প্রসারণ। এতে উৎপাদন-খরচ বাড়ার দরুন যারা বর্ধিত আয় (খরচ ও দামবৃদ্ধির ফলে) লাভ করে অথবা বর্ধিত ব্যয় করে (খরচ ও দামবৃদ্ধির দরুন) তাদের ঐ আয় অথবা ব্যয়-বৃদ্ধি উৎপাদন-খরচ না বাড়লে ঘটত না। যেমন, শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রমিকসংঘের চাপে মজুরি বৃদ্ধি

মেনে নিলে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ করে কিংবা সঞ্চিত নগদ তহবিল ভেঙ্গে বর্ধিত হারে মজুরি দিতে পারে। অথবা, শ্রমিকরা অধিক মজুরি পাওয়ায় কিস্তিবন্দী বা ভাড়া-ক্রয় শর্তে নানারূপ স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য কিনতে পারে। তাতে এইরূপ বেচাকেনার পরিমাণ বাড়লে সেজন্য ব্যাঙ্ক থেকে ব্যবসায়ীরা বেশি করে ঋণ নেবে। ফলে তা আবার ভোগকারী ঋণের সম্প্রসারণ ঘটতে পারে। (৩) **পুরক বা সমর্থনমূলক সম্প্রসারণ ঃ** তা ছাড়া **কার্যকর চাহিদার** আরও এক প্রকারের সম্প্রসারণ ঘটতে পারে। তা হল **পুরক বা সমর্থনমূলক সম্প্রসারণ**। উৎপাদন-খরচবৃদ্ধির জন্য পাছে কর্মহীনতা বাড়ে এই আশঙ্কায় সরকার একপে বিবিধ আর্থিক ও ফিসক্যাল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে যার ফলে কার্যকর চাহিদার খনিজ সম্প্রসারণ ঘটে। যেমন, আর্থিক কর্তৃপক্ষ (কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক) ব্যাঙ্কগুলির বাধ্যতামূলক জমার অনুপাত কমিয়ে কিংবা সরকারী ব্যয় বাড়িয়ে নিয়োগ এবং কার্যকর চাহিদা বাড়াতে চেষ্টা করে থাকে। এই ভাবে কার্যকর চাহিদার স্বয়ম্ভূত, প্রণোদিত এবং সমর্থনমূলক বা পুরক সম্প্রসারণ চাহিদাবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করতে পারে।

উৎপাদন খরচবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি ঃ শ্রম-খরচ এবং অন্যান্য খরচ-বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফলরূপে ভোগ্য পণ্যসামগ্রীর দামস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধিই হল উৎপাদন-খরচবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি। উৎপাদন-খরচের বৃদ্ধিও নানা প্রকারের হতে পারে। যেমন ঃ (১) কোন কাঁচামাল উৎপাদনের বা যোগা-নের ক্ষেত্রে যদি একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে তবে তা দামবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিলে, উৎপাদন খরচের যে বৃদ্ধি ঘটবে তা হল উৎপাদন খরচের **স্বয়ম্ভূত বৃদ্ধি**। (২) আবার কোন শ্রমিকসংঘের চাপে যদি নিয়োগকর্তারা মজুরির এরূপ বৃদ্ধি মেনে নেয় যা হয়ত তারা শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত রাখবার জন্য নিজেরাই (শ্রমিক আন্দোলন ছাড়াই) মেনে নিত, তবে ঐরূপ মজুরিবৃদ্ধির দরুন উৎপাদন-খরচের বৃদ্ধিকে **সাড়ামূলক বা প্রতিযোগিতামূলক বৃদ্ধি** বলা যায়। (৩) আবার প্রকৃত আয় বাড়ানোর উদ্দেশ্যে শ্রমিক বা অন্যান্য উপাদানগুলির পারিশ্রমিক বৃদ্ধি আদায়ে সক্ষম হলে তাকে **আক্রমণাত্মক** বা **আগ্রাসী উৎপাদন-খরচবৃদ্ধি** রূপে গণ্য করা হয়। (৪) বর্তমান প্রকৃত আয় বজায় রাখার জন্য উপাদানগুলি যদি বর্ধিত পারিশ্রমিক চায় ও তা আদায়ে সক্ষম হয় তবে সেজন্য উৎপাদন খরচের বৃদ্ধিকে **আত্মরক্ষামূলক বৃদ্ধি** বলে গণ্য করা যায়।

চাহিদাবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি ও খরচবৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতির পার্থক্য করার গুরুত্ব

১. **এ দু'টির মধ্যে পার্থক্যকরণের দ্বারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মজুরি ও দাম নির্ধারণ পদ্ধতিগুলির উপর আলোকপাত করা যায়।** দামস্তর যে শুধু আর্থিক নীতি ইত্যাদির মত কয়েকটি ব্যাপক বিষয়ের উপরই নির্ভর করে না, তা যে সমকালীন মজুরি-দাম নির্ধারণকারী বিবিধ প্রতিষ্ঠানগত শক্তির উপরও নির্ভরশীল তা বোঝা যায়। ফলে, সরাসরি সামগ্রিক চাহিদার নিয়ন্ত্রণ দ্বারা কিংবা

মজুরি ও দাম নির্ধারণকারী বিবিধ প্রতিষ্ঠানগত শক্তিগুলিকে প্রভাবিত করে আমরা দামের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

২. কোন একটি মাত্র কারণে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে না, এই পার্থক্যকরণের দ্বারা তা আমরা বুঝতে পারি। তা ছাড়া, সব মুদ্রাস্ফীতির ঘটনা এক জাতীয় নয় ব'লে তাদের সবগুলির বিরুদ্ধে যে একই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া চলে না সেটাও এর থেকে উপলব্ধি করা যায়।

মুদ্রাসংকোচন (Deflation): মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত অবস্থাই হল মুদ্রাসংকোচন। অর্থাৎ, দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদির উৎপাদন বা যোগানের তুলনায় আর্থিক আয়-ব্যয়প্রবাহের ক্রমাবনতি ঘটতে থাকলে দামস্তরের যে ক্রমাগত নিম্নগতি দেখা দেয় তাকে মুদ্রসংকোচনের পরিস্থিতি বলা যেতে পারে।

মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের অর্থনীতিক ফলাফল (economic effects of inflation and deflation): **১. উৎপাদন:** মুদ্রাস্ফীতির দরুন দামস্তরের বৃদ্ধির ফলে মুনাফা বৃদ্ধির লোভে নিয়োগকারীরা উপাদানগুলির নিয়োগ বাড়াতে থাকে এবং তার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ তথা জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়, তাতে দেশ পূর্ণনিয়োগের স্তরে পৌছাতে পারে এবং উপাদান ও আয় সর্বাধিক হতে পারে। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি যদি আয়ত্তের বাইরে চলে যায় তবে আবার তাতে নিয়োগ, উৎপাদন এবং জাতীয় আয় কমতে পারে। কারণ তখন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি দেখবে, উৎপাদন সরাসরি বিক্রয় করে যে মুনাফা হবে তার চেয়ে সামগ্রী গোপনে মজুত করে বিক্রয় করলে মুনাফা অনেক বেশি হবে। কৃষকরা আরও বেশি লাভের আশায় বিক্রয় কমিয়ে মজুত ধরে রাখবে। উৎপাদনকারীরা দাম আরও বাড়ানোর আশায় উৎপাদন কমিয়ে দুষ্প্রাপ্যতা বাড়াবে, কারণ তাতেই মুনাফা বেশি হবে। মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিক-মালিক বিরোধ বাড়বে এবং তাতেও উৎপাদন কমবে। দামস্তর বৃদ্ধির জন্য অর্থের ক্রয়শক্তি কমছে বলে সঞ্চয়কারীরা সঞ্চয়ের পরিবর্তে ভোগব্যয় বাড়াবে। সুতরাং সমাজে বিনিয়োগ অক্ষুন্ন রাখতে ও বাড়াতে যে সঞ্চয়ের প্রয়োজন তা পাওয়া যাবে না। তাতেও উৎপাদন ক্ষমতা কমবে। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির ফলে শেষ পর্যন্ত মজুত-সম্ভারের পরিমাণ বাড়ে, বিক্রয় কমে, মুনাফা কমে, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ—সবই কমে।

মুদ্রাসংকোচনে উৎপাদন, আয়, নিয়োগ, বিনিয়োগ, সঞ্চয় ও মুনাফা সব কিছুর উপরই অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। এসময়ে দাম কমতে থাকায় মুনাফা কমে, তাতে বিনিয়োগ কমে। ফলে প্রথম থেকেই নিয়োগ, উৎপাদন, আয় এবং সঞ্চয় কমতে থাকে।

২. বণ্টন: কৃষকসহ সকল উৎপাদন ও কারবারীরা (অর্থাৎ সমাজের অ-স্থির আয়বিশিষ্ট শ্রেণীগুলি) আকস্মিক মুনাফা উপার্জন করে বলে তারা মুদ্রা-

স্ফীতিতে উপকৃত হয়। কারণ, উৎপাদন খরচের যত বৃদ্ধিই ঘটুক না কেন উৎপন্ন সামগ্রীর দাম তা থেকে বেশি বাড়ে, অতএব উৎপাদকের মুনাফা বাড়ে।

মুদ্রাসংকোচনের সময়ে উৎপাদক ও কারবারীদের মুনাফা কমে ও লোকসান বাড়ে বলে তাদের সামগ্রিক আয় কমে। ঋণ শোধে অনেকে অক্ষম হয়ে দেউলিয়া হয়ে পড়ে। এজন্য এসময়ে অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্ক কারবার গোটাতে বাধ্য হয়।

খ. শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী (স্থির আয়ভোগী শ্রেণী) মুদ্রাস্ফীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসময়ে তাদের কারও কারও মজুরি ও বেতন বাড়লেও, তা সর্বদাই দামস্তরের বৃদ্ধি অপেক্ষা কম হয়। তা ছাড়া পেন্সনভোগী, সুদজীবী ও খাজনাভোগী যারা, তাদের আর্থিক আয় বিন্দুমাত্র বাড়ে না। সুতরাং একদিকে সামগ্রিকভাবে তাদের আর্থিক আয় মোটামুটি স্থির থাকায় এবং অন্যদিকে দামস্তর ক্রমাগত বাড়ায় তাদের প্রকৃত আয় কমতে থাকে।

মুদ্রাসংকোচনের সময় এর বিপরীত ঘটে। তখন এই সকল শ্রেণীর আর্থিক আয় মোটামুটি স্থির থাকে অথচ দামস্তর কমতে থাকায় তাদের প্রকৃত আয় বাড়ে। কিন্তু যেহেতু মুদ্রাসংকোচনের সময় বিনিয়োগ ও উৎপাদন কমে সেহেতু নিয়োগ কমে ও কর্মহীনতা বাড়ে। ফলে অতি অল্প সংখ্যক শ্রমিক ও বেতনভোগী কর্মচারী এই সুবিধা ভোগ করতে পারে।

গ. ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা মুদ্রাস্ফীতিতে পরস্পর বিপরীত ফল ভোগ করে। ঋণদাতারা এই সময়ে ঋণ পরিশোধস্বরূপ যে অর্থ পায় তার ক্রয়শক্তি কমে গেছে বলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর ঋণগ্রহীতারা ঋণ পরিশোধ বাবদ যে অর্থ দেয় তার ক্রয়ক্ষমতা, (যখন তারা ঐ ঋণ নিয়েছিল সে সময় অপেক্ষা) কম বলে প্রকৃতপক্ষে তারা লাভবান হয়।

মুদ্রাসংকোচনের সময় এর বিপরীত ব্যাপার ঘটে। তখন ঋণদাতারা লাভবান হয় ও ঋণগ্রহীতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের মধ্যে কোন্‌টি বেশি খারাপ ঃ মুদ্রাস্ফীতিতে প্রথম দিকে নিয়োগ ও আয় বা উৎপাদন বাড়লেও শেষ পর্যন্ত তা আর বাড়ে না, এমনকি মুদ্রাস্ফীতি আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে সবই কমতেও পারে। আব মুদ্রাসংকোচনের ফলে আয়, উৎপাদন ও নিয়োগ সবই কমে। সুতরাং এদের উভয়েই খারাপ। এদের মধ্যে বাছাই করবার কিছু নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যদি তাদের মধ্যে কোন একটিকে বেছে নিতে হয়, তবে বলতে হয় যে, মুদ্রাস্ফীতি অপেক্ষা মুদ্রাসংকোচন বেশি খারাপ। কারণ,—(১) যদিও মুদ্রাস্ফীতিতে আয় বণ্টনে বৈষম্য বাড়ে এবং ধনী আরও ধনী এবং গরীব আরও গরীব হয়, তথাপি মুদ্রাসংকোচনে যেমন প্রথমাবধি ক্রমাগত আয়, উৎপাদন এবং নিয়োগ কমতে থাকে, মুদ্রাস্ফীতিতে তা হয় না এবং তা আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারলে সে সময়

আয়, উৎপাদন, নিয়োগ প্রভৃতি সবই বাড়ে। (২) মুদ্রাস্ফীতি অন্যায় হতে পারে (কারণ তা ধনীর পক্ষে ও দরিদ্রের বিপক্ষে যায়) তথাপি সে সময় সব উপকরণ কোন না কোন প্রকারে উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে। কিন্তু মুদ্রা-সংকোচনে উৎপাদনের উপাদানগুলির নিয়োগ কমে যায়, তারা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। (৩) মুদ্রাসংকোচন নিয়ন্ত্রণ করা অপেক্ষা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সহজসাধ্য। কারণ মুদ্রাসংকোচনের পশ্চাতে অধিকাংশ সময়ই পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার অবনতি মূল কারণ হিসাবে কাজ করে। এর প্রতিষেধক নেই।

তবে, দেশের অর্থনীতিক নীতির লক্ষ্যরূপে এদের কোনটিই বাঞ্ছনীয় নয়। যা বাঞ্ছনীয় তা হল পূর্ণনিয়োগের স্তরে দেশের অর্থনীতিক কার্যাবলীর স্থিতিসাধনের নীতি।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ (control of inflation) ঃ অর্থের যোগান, উৎপাদন ও ভোগ—এই তিনের সমন্বয়ের অভাবে বা অভারসাম্য থেকেই মুদ্রাস্ফীতির উৎপত্তি ঘটে। সে জন্য মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে তার বিরুদ্ধে ত্রিমুখী আক্রমণ প্রয়োজন —(১) অর্থের যোগানের দিক থেকে, (২) ভোগের দিক থেকে এবং (৩) উৎপাদনের দিক থেকে। এ কারণে প্রয়োজন দামস্তর নিয়ন্ত্রণের জন্য আর্থিক বিধি-ব্যবস্থার, ভোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য দামস্তর নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং এবং তৎসহ করপ্রস্তাব-সমন্বিত ফিস্‌ক্যাল বিধি-ব্যবস্থার ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন রদবদল-নীতি, যথোপযুক্ত মজুরি-নীতি এবং শিল্পে শান্তিস্থাপনের নীতি।

১. অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণের বিধি-ব্যবস্থা ঃ এক্ষেত্রে তিন প্রকারের আর্থিক নীতি প্রয়োগ করা যায়। যথা, (ক) সুদের হার সংক্রান্ত নীতি, (খ) অর্থের ও অন্যান্য প্রায়-নগদ সম্পত্তির সংকোচনের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা (যেমন প্রচলিত নগদ অর্থের একাংশ তুলে নেওয়া ও নগদ অর্থের একাংশ জব্দ করা অর্থাৎ তার ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা); (গ) সরকারী ঋণপত্র বিক্রয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ব্যাঙ্কগুলির বাধ্যতামূলক জমার অনুপাত বাড়িয়ে দেওয়া এবং অন্যান্য গুণগত ও বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ-নীতিসমূহ প্রয়োগ।

মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী আর্থিক নীতিগুলির মধ্যে সুদের হার সংক্রান্ত নীতি হল সর্বাপেক্ষা পুরাতন এবং সর্বাধিক পরিচিত। মুদ্রাস্ফীতি দমন করতে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার বাড়াতে হয় এবং তার ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি আবার নিজেদের সুদের হার বাড়াতে বাধ্য হয়। ফলে ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগ-কারীরা (সুদ বাবদ খরচ বৃদ্ধির দরুন) অল্প পরিমাণে ঋণ নেবে। কিন্তু সমালোচকদের মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার খুব বেশি না বাড়ালে, এই উদ্দেশ্য ফলবতী হবে না। হ্যানসেন বলেন, কেবলমাত্র এইরূপ মৃদু ব্যবস্থা এককভাবে বিশেষ ফলদায়ক নয়, আবার বেশি কড়া ব্যবস্থা গ্রহণে অর্থনীতির ওলটপালট ঘটতে পরে। এর কারণ, মৃদু ব্যবস্থা অত্যধিক ফট্‌কামূলক মুনাফার লোভে চালিত লেনদেন ও কাজ-কারবার দমন করতে পারে না। তা কেবল বাঞ্ছনীয় বিনিয়োগমূলক

কার্যাবলীই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আবার যদি ব্যাঙ্করেট (কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার) অত্যন্ত বেশি বাড়াবার মত কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, পুঁজির বাজার তাতে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, বিনিয়োগকারীদের আস্থা ধূলিসাৎ হবে এবং বেসরকারী কারবারের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে।

মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী দ্বিতীয় প্রকারের আর্থিক বিধি-ব্যবস্থাগুলি (অর্থাৎ প্রচলিত নগদ অর্থের একাংশ বাজার থেকে তুলে নেওয়া বা নগদ অর্থের একাংশ জব্দ করা) এই সমস্যাটিকে সরাসরি আক্রমণ করে। অর্থাৎ তারা সরাসরিভাবে অর্থের যোগান কমিয়ে মুদ্রাস্ফীতি দমন করতে চেষ্টা করে। **এর প্রধান অসুবিধা** এই যে—(১) এটি কারবারী জগতের আস্থা নষ্ট করবে। (২) যদি কাগজের নোট এবং ব্যাঙ্কের আমানতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় তবে মানুষের মধ্যে নগদ অর্থ পরিত্যাগের ঝোঁক আরও বাড়বে এবং ফট্‌কামূলক লেনদেন প্রবল হবে। (৩) এটি অতীত মুদ্রাস্ফীতির অবশিষ্টাংশ বিনষ্ট করতে পারে কিন্তু বর্তমান আয় ও মজুরির উপর নির্ভরশীল বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি দূর করতে পারবে না। আর এর **প্রধান সুবিধা** এই যে,—এটি এক সরাসরি পন্থা এবং তাতে দেশবাসীর মনে এক জরুরী পরিস্থিতির অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি হয় ও তা মানুষকে ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করে।

তৃতীয় প্রকারের নীতি হল ব্যাঙ্করেট নীতিটি ছাড়া, ঋণনিয়ন্ত্রণের অন্যান্য নীতিগুলির সুবিধামত একক বা সমন্বিত প্রয়োগ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, যে কোন দেশে মুদ্রা-স্ফীতির প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া গুণগত ও বিচারমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ নীতির সাহায্যে কিছুটা সফলভাবে দমন করা যায়।

উপসংহারে বলা যায় মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী আর্থিক নীতিসমূহের মধ্যে পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রের সাথে গুণগত ও বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণের অস্ত্রগুলিরও যথাযথ স্থান রয়েছে।

আর্থিক নীতির সীমাবদ্ধতা : কিন্তু মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী আর্থিক নীতির অসুবিধা হল : আর্থিক অস্ত্রগুলির দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা দমন করা যায়, সবটা দমন করা যায় না। কারণ মুদ্রাস্ফীতি আবার বাণিজ্য বা কারবারী চক্রের পরিবর্তনের সাথেও জড়িত। সুতরাং কারবারীরা যদি আশাবাদী মনোভাব নিয়ে দামস্তরের আরও বৃদ্ধির আশায় বেশি পরিমাণ মজুত-সম্ভার ধারণ করে, বা বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হয় (পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার আধিক্য), তবে আর্থিক নীতিগুলির দ্বারা তার প্রতিকার অসম্ভব। আর্থিক নীতির দ্বারা অর্থনীতির কেবল বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি দমন করা যায় (যেমন, গৃহনির্মাণ শিল্প, জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা-উৎপাদক শিল্প ইত্যাদি) কিন্তু অর্থনীতির বেসরকারী ক্ষেত্রে যেখানে মুনাফাশিকারী ও কালোবাজারীদের ভিড় রয়েছে, সেখানে

মুদ্রাস্ফীতিরোধে আর্থিক নীতি বিশেষ কার্যকর নয়। এজন্য ফিস্‌ক্যাল ও অন্যান্য নীতি গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়।

২. **ভোগ নিয়ন্ত্রণের বিধি-ব্যবস্থা**ঃ দ্রব্যসামগ্রীর ভোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য দাম নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং-এর সাথে ফিস্‌ক্যাল ব্যবস্থাগুলি (কর, সরকারী ব্যয় ও ঋণ) গ্রহণের উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন রয়েছে। অবদমিত মুদ্রাস্ফীতির সময় ফিস্‌ক্যাল নীতি যেরূপ হওয়া দরকার তা হল – (১) তা যেন চল্‌তি মুদ্রাস্ফীতির চাপ দূর করতে পারে এবং (২) দেশবাসীর হাতে অতীতকালের পুঞ্জীভূত সঞ্চয় দ্বারা দেশের অর্থনীতিতে যে প্রচ্ছন্ন বা অন্তর্নিহিত মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি হয়েছে, তা যেন তাও দূর করতে পারে।

সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকারী ফিস্‌ক্যাল নীতিতে যে সব ব্যবস্থা থাকবে তা হল,—(ক) **সরকারী ব্যয় হ্রাস** (এর অর্থ এই যে, মুদ্রাস্ফীতির সময় সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে যেন জনসাধারণের হাতে স্বল্পতম অর্থ পৌছায়। এক কথায় সরকারী ব্যয় কমিয়ে ও রাজস্ব বাড়িয়ে বাজেট-উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে হবে)।

(খ) **কর বৃদ্ধি**ঃ জনসাধারণের হাতে ব্যবহারযোগ্য আয়ের পরিমাণ নির্ভর করে করের উপর (ব্যক্তিগত আয় – কর = ব্যবহারযোগ্য আয়)। অতএব বিক্রয়-যোগ্য দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মাদি নির্দিষ্ট থাকলে, সে সময়ে মুদ্রাস্ফীতির ফাঁক (ব্যবহারযোগ্য আয় – পূর্বের দামে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্য) কতটা হবে তা করের উপরও নির্ভর করে। কর বেশি হলে ব্যবহারযোগ্য আয় এবং বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে ব্যবধান বা মুদ্রাস্ফীতির ফাঁকটি কমবে। এজন্য মুদ্রাস্ফীতির সময়ে কর মকুব, কর রেহাই-কাল ইত্যাদি যথাসম্ভব কম হওয়া প্রয়োজন এবং দরকার হলে নূতন কর ধার্য করা আবশ্যক।

এসময়ে সরকারী ব্যয় হ্রাস ও করবৃদ্ধির সাথে সমাজে আর্থিক সঞ্চয়কেও শুষে নেওয়া প্রয়োজন হয়; এবং এই উদ্দেশ্যে সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় দ্বারা সরকারী ঋণ সংগ্রহ বাড়াবার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হতে পারে। তবে ভোগদমনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত ফিস্‌ক্যাল নীতির সাফল্য চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে— (১) যতদিন পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতির চাপের আশঙ্কা থাকে ততদিন পর্যন্ত, রাজনৈতিক প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে, পরিস্থিতিটি অবশ্যই এরূপ হওয়া দরকার যেন উপযুক্ত পরিমাণ বাজেট-উদ্বৃত্ত সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে। (২) সরকারী ব্যয়ের স্তর এবং কর ভার যেন কিছুতেই এত বেশি না হয় যে করের হার আর খানিক বাড়ান হলেই তা কাজের প্রণোদনা সমূলে বিনষ্ট করবে। (৩) যথাযথ পরিমাণে সবকারী ব্যয় ছাঁটাই যাতে সুনিশ্চিত হতে পারে সেজন্য প্রশাসনিক যন্ত্রটি যথেষ্ট কার্যকর এবং নমনীয় হওয়া প্রয়োজন। (৪) সাধারণ দামস্তর এবং মজুরি-হারের স্তর অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত-ভাবে স্থিতিশীল হওয়া প্রয়োজন।

দামনিয়ন্ত্রণ ও রেশনিংয়ের একটি রাজনৈতিক সুবিধা এই যে, অত্যধিক

ফাবাজী ও কালোবাজারীর সময় তা জনপ্রিয় হয়। অধ্যাপক লার্ণার এবং গ্যালব্রেথ মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী ব্যবস্থারূপে দামনিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং সমর্থন করেন। কিন্তু তাঁদের মতে এর দ্বারা ক্রয়ক্ষমতা ও বাজারে ক্রয়বিক্রয়যোগ্য যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী থাকে তাদের মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য ঘটতে পারে না।

৩. **উৎপাদন বৃদ্ধির বিধি-ব্যবস্থা :** অধ্যাপক এ. সি. এল. ডে. বলেছেন, মুদ্রাস্ফীতির মূল এবং স্থায়ী নিদান হল উৎপাদনবৃদ্ধি। আর্থিক ও ফিস্‌ক্যাল ব্যবস্থাগুলির দ্বারা সাময়িক ও কৃত্রিমভাবে কার্যকর চাহিদাকে শাসন করে তাকে স্বল্প পরিমাণে লভ্য দ্রব্যসামগ্রীর সাথে ভারসাম্যে আনার চেষ্টা করা যেতে পারে এবং তাতে কমবেশি সাময়িক সাফল্যও ঘটতে পারে। কিন্তু যেহেতু মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতিটি হল মূলত উৎপাদনের তুলনায় কার্যকর চাহিদার আধিক্যের পরিস্থিতি, সে কারণে, উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যতীত এর স্থায়ী সমাধান নেই। এই উদ্দেশ্যে মুদ্রাস্ফীতির সময়, যে সকল শিল্প বিশেষ মুদ্রাস্ফীতিকাতর নয় সেখান থেকে, উৎপাদনগুলির বেশি মুদ্রাস্ফীতিকাতর শিল্পগুলিতে স্থানান্তর দ্বারা তাদের উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ান যেতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ বেশি-চাহিদার পণ্যগুলির উৎপাদনে, কাঁচামাল, সাজ-সরঞ্জাম, যানবাহন ও অন্যান্য উপকরণেব যোগানে বিশৃঙ্খলাগুলি অবিলম্বে দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের দ্বারা উৎপাদন-সংগঠনের উন্নতি ও শ্রমের দক্ষতা বাড়াতে হবে। তাছাড়া, উৎপাদনধারা অব্যাহত রাখার জন্য শিল্পে শান্তিপ্রতিষ্ঠা ও সামাজিক নিরাপত্তা ও শ্রমকল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে ও শ্রমিকরা যাতে ন্যায্য মজুরি পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সময়ে শ্রমের দক্ষতাবৃদ্ধির সমানুপাতে মজুরির হার বাড়ান হলেই দামস্তরের স্থিতি ঘটতে পারে এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতির 'দৈত্য' নিধন সম্ভব।

৬. ৮. মূল্যস্তর পরিবর্তনের ফলাফল
Consequences of Price Changes

১. মূল্যস্তরে পরিবর্তন বললে, মূল্যস্তরের বৃদ্ধি অথবা হ্রাস, মূল্যস্তর ঊর্ধ্বগামী বা নিম্নগামী বোঝায়। মূল্যস্তরের পরিবর্তনের মানেই হল বিপরীত দিকে অর্থের মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তন। সুতরাং মূল্যস্তর বা অর্থের মূল্যের পরিবর্তনের ফলে এবং যাবতীয় অর্থনীতিক কাজকর্মে অর্থ ব্যবহার করা হয় বলে, সমস্ত অর্থনীতিক কাজকর্মই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়। মূল্যস্তরে পরিবর্তনের অর্থনীতিক ফলাফলগুলি চার ভাগে ভাগ করা যায়: (১) উৎপাদনের উপর প্রতিক্রিয়া, (২) কর্মসংস্থানের উপর প্রতিক্রিয়া, (৩) আয় বণ্টনের উপর প্রতিক্রিয়া (৪) দেনাদার ও পাওনাদারের উপর প্রতিক্রিয়া।

২. **উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের উপর মূল্যস্তরের পরিবর্তনের ফলাফল :** (ক) **মূল্যস্তর বাড়লে** উৎপাদনকারীদের, কারবারী সংস্থাগুলির উৎপাদনের খরচ

বাড়লেও, সে তুলনায় তৈরী পণ্যের দাম বেশি বাড়ে বলে উৎপাদনকারীদের মুনাফা বাড়ে। তাই তারা উৎপাদনের পরিমাণ যথাসাধ্য বাড়াতে চেষ্টা করে। দেশের মধ্যে তখন অব্যবহৃত জমি, পুঁজি, শ্রম প্রভৃতি উপাদান থাকলে তা সহজেই পাওয়া যায় এবং উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা যায়। ফলে উৎপাদন বাড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে অব্যবহৃত উপকরণ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত পণ্যের উৎপাদন বাড়তে থাকে। যখন সমস্ত উপকরণ উৎপাদনের কাজে সম্পূর্ণ নিযুক্ত হয়ে যায়, তখন দেশে উৎপাদনের পরিমাণ সর্বাধিক হয়। সুতরাং মূল্যস্তরের বৃদ্ধি দেশে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের উৎপাদনের পরিমাণ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সহায়ক বলে গণ্য হয়।

(খ) **মূল্যস্তর কমলে** তার ফলাফল বিপরীত হয়। তখন অনেক শিল্পে মুনাফা কমে যায়, অনেক শিল্পে মুনাফার পরিবর্তে লোকসান হয়। সুতরাং উৎপাদক ও কারবারী সংস্থাগুলি তখন উৎপাদন কমিয়ে দেয়, যাদের লোকসান হয় তাদের অনেকে উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। অতএব মূল্যস্তর কমতে থাকলে দেশে উৎপাদনের পরিমাণ কমে। উৎপাদনের পরিমাণটা কমে যায় বলে দেশে তখন শ্রমিক সহ কর্মে নিযুক্ত অন্যান্য উপাদানের পরিমাণও কমে যায় ও বেকারি বাড়ে। সুতরাং মূল্যস্তর হ্রাসের ফলে দেশে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমে।

৩. **আয় বণ্টনের উপর মূল্যস্তর পরিবর্তনের ফলাফল ঃ** সমাজে আয় হল চার রকমের—খাজনা, সুদ, মজুরি এবং মুনাফা। এই চার রকম আয়ের মধ্যে প্রথম তিন রকম আয়, অর্থাৎ খাজনা, সুদ ও মজুরির হার উৎপাদন শুরু হওয়ার আগেই উদ্যোক্তার সাথে জমি ও পুঁজির মালিক ও শ্রমিকদের চুক্তির দ্বারা স্থির হয়ে যায় এবং চুক্তির মেয়াদ যতদিনের তার মধ্যে আর তা বদলায় না। অতএব এই আয়গুলিকে বলে স্থির আয় (fixed income)। কিন্তু মুনাফা হল খাজনা, সুদ ও মজুরি বাদে বিক্রয়লব্ধ মোট আয়ের অবশিষ্ট অংশ বা উদ্বৃত্ত। তা কখনও আগে থেকে চুক্তির দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। তা পরিবর্তনশীল, বাড়ে অথবা কমে। (ক) **মূল্যস্তর বাড়লে** সমাজের স্থির আয়ভোগী যারা (খাজনাভোগী, সুদভোগী, পেনসনভোগী, বাড়িওয়ালা, শ্রমিক, বেতনভোগী, প্রভৃতি) তাদের আয় বাড়ে না, কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বাড়ে বলে একই আর্থিক আয়ে তারা আগের তুলনায় কম দ্রব্যসামগ্রী কিনতে পায়। সুতরাং টাকার ক্রয় ক্ষমতা কমে যাওয়ায় স্থির আয়ভোগীদের প্রকৃত আয় কমে যায়। কিন্তু মুনাফা বা পরিবর্তনশীল আয় যাদের (অর্থাৎ উদ্যোক্তা বা কারবারীরা) তাদের মুনাফা বা আয় মূল্যবৃদ্ধির দরুন বাড়ে। সুতরাং তখন দেশের মোট জাতীয় আয়ে কারবারীদের (যারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়) ভাগ বাড়ে ও দেশের অধিকাংশ ব্যক্তির (যাদের আয় স্থির) অংশ কমে। আয় বণ্টনে বৈষম্য বাড়ে।

(খ) **মূল্যস্তর কমলে** স্থির আয়ের মানুষদের প্রকৃত আয় বাড়ে, কারণ তাদের আর্থিক আয় একই থাকলেও, টাকার ক্রয় ক্ষমতা তখন বাড়ে। আর পবিবর্তনশীল আয়ের মানুষদের (অর্থাৎ কারবারীদের) মুনাফা কমে বলে আয় কমে যায়। কিন

মূল্যস্তর কমলে উৎপাদনও কমে যায় বলে বেকারের সংখ্যা বাড়ে। সুতরাং প্রকৃত আয়ের বৃদ্ধিটা ভোগ করার মতো শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যাও তখন কমে যায়।

৪. **দেনাদার ও পাওনাদারদের উপর মূল্যস্তরের পরিবর্তনের ফলাফল :** (ক) **মূল্যস্তর বাড়লে** দেনাদারদের লাভ ও পাওনাদারদের ক্ষতি হয়। কারণ মূল্যস্তর বৃদ্ধির আগে যে ঋণদাতা ১০০ টাকা ধার দিয়েছিল সে টাকায় তখন যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী কেনা গেছে, সে তুলনায় মূল্যস্তর বৃদ্ধির পর ঐ ১০০ টাকায় কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী কেনা যায়। সুতরাং মূল্যস্তর বৃদ্ধির পর দেনাদার যদি টাকাটা ফেরত দেয় তাহলে পাওনাদার টাকার অঙ্কে পাওনা পুরোপুরি পেলেও, দ্রব্যসামগ্রীর দিক দিয়ে আগের তুলনায় কম ফিরে পায়।

(খ) **মূল্যস্তর কমলে,** দেনাদারদের ক্ষতি ও পাওনাদারদের লাভ। কারণ মূল্যস্তরের হ্রাসের আগে টাকার ক্রয় ক্ষমতা ছিল কম। তখন দেনাদার মহাজনের কাছ থেকে যে টাকা ঋণ নিয়েছিল তা দিয়ে সে যে পরিমাণ জিনিস কিনতে পেরেছিল, মূল্যস্তর হ্রাসের পর সেই একই পরিমাণ টাকা সে শোধ করলেও তা দিয়ে এখন বেশি পরিমাণ সামগ্রী কেনা যায়। সেটা দেনাদারের ক্ষতি ও পাওনাদারের লাভ।

৫. সুতরাং মূল্যবৃদ্ধি ও মূল্যহ্রাস দুই-ই ক্ষতিকর। তবে যদি দুটির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হয়, তাহলে আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে মূল্যহ্রাসের চেয়ে মূল্যবৃদ্ধিই বরং ভালো। কারণ তখন অন্তত দেশের মোট উৎপাদন ও কর্মে নিযুক্ত লোকসংখ্যা বাড়ে। কিন্তু সে মূল্যবৃদ্ধিটা অবশ্যই সীমার মধ্যে থাকা চাই।

৬.৯. 'ঋণ'-এর তাৎপর্য ও প্রকৃতি
Meaning and Nature of Credit

১. 'ঋণ' শব্দটির দ্বারা টাকা পাওয়ার অধিকার এবং টাকা দেবার কর্তব্য বোঝায়। তুমি যদি খবরের কাগজের হকারের কাছ থেকে মাসিক চুক্তিতে কাগজ নাও এবং মাসের শেষে বা পরের মাসের গোড়ায় তার দাম দেবার প্রতিশ্রুতি দাও তাহলে খবরের কাগজের হকারটি হল তোমার পাওনাদার (creditor) এবং তুমি হলে তার দেনাদার (debtor)। পাওনাদার হিসাবে হকারটির (১ মাসের খবরের কাগজের দাম বাবদ) তোমার কাছ থেকে টাকা পাওয়ার অধিকার জন্মায়, আর তোমার জন্মায় তাকে সে টাকা দেবার কর্তব্য। তুমি যদি কোন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ঋণ নিয়ে কারবারী হিসাবে তোমার দোকানে পণ্যসামগ্রী কিনে মজুদ কর তাহলে পাওনাদার হিসাবে, নির্দিষ্টকাল পরে তোমার কাছে ব্যাঙ্কের সে টাকা ফেরত পাওয়ার অধিকার জন্মায়, আর তোমার জন্মায় সে টাকা পরিশোধ করার কর্তব্য। প্রথম দৃষ্টান্তটিতে, কোন দ্রব্য (খবরের কাগজ) কেনা বেচা হয়েছে, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে টাকা লেনদেন হয়েছে। কিন্তু দু'টিতেই তার ফলে ঋণের সৃষ্টি হয়েছে। তা হলে, ঋণ কাকে বলে ? **ঋণ হল ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি।**

২. **বৈশিষ্ট্য ঃ** ঋণের বৈশিষ্ট্য : (ক) **আস্থা** হল ঋণের ভিত্তি। দেনাদার পরে দেনা শোধ করবে বলে তার উপর আস্থা থাকলেই তবে পাওনাদার তাকে ঋণ দেয় অর্থাৎ ধারে পণ্য বেচে বা টাকা ধার দেয়। আস্থা না থাকলে ঋণের সৃষ্টি হয় না।

(খ) ঋণের কাজই হল **ভবিষ্যৎ** নিয়ে। অর্থাৎ আজ বা বর্তমানে যে পণ্য বাকিতে বিক্রি করা হল তার দাম কিংবা যে টাকা ধার দেওয়া হল তা ভবিষ্যতেই পরিশোধ করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

(গ) ঋণ মানেই **দেনা**। ঋণের দু'টি পক্ষ, একটি হল পাওনাদার, অপরটি হল দেনাদার। টাকা পাওয়া হল একজনের অধিকার, টাকা দেওয়া হল আরেকজনের কর্তব্য।

(ঘ) ঋণ হল আসলে **ভবিষ্যৎ দ্রব্যের সাথে বর্তমান দ্রব্যের বিনিময়**। অর্থাৎ যে ঋণ নিচ্ছে সে তার সাহায্যে এখন দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করছে এবং ভবিষ্যতে তার দাম পরিশোধ করার অর্থ হল, ভবিষ্যতের দ্রব্য দিয়ে তা শোধ করা। কারণ পাওনাদার টাকাটা ভবিষ্যতেই পাবে এবং তখন সে তা দিয়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে পারবে।

৬.১০. ব্যাঙ্ক
Bank

১. ব্যাঙ্ক হল ঋণের কারবারী। ব্যাঙ্ক জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত জমা নেয় ও ঋণ প্রার্থীদের ঋণ দেয়। ব্যাঙ্ক যখন কারও কাছ থেকে আমানত জমা নেয় তখন সেটা হল ফিরিয়ে দেবার শর্তে আমানতকারীর কাছ থেকে ঋণ নেওয়া। সে জন্য ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের সুদ দেয়। এটা হল আমানতকারীদের কাছ থেকে ঋণ কেনা। আর, ব্যাঙ্ক যখন ঋণ দেয় তখন তার উপর সুদ নেয়। এটা হল ঋণ বেচা। সুদ হল ঋণ ব্যবহারের দাম। এজন্য বলে, ব্যাঙ্কের কাজ হল ঋণ নেওয়া ও দেওয়া, অর্থাৎ ঋণ কেনাবেচা করা।

২. ব্যাঙ্কের সাথে অন্যান্য কারবারী সংস্থার মূল পার্থক্যটা হল এই, ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ যেখানে অন্যের টাকা খাটিয়ে মুনাফা উপার্জন করা, অন্যান্য কারবারী সংস্থার কাজ সেখানে নিজের টাকা খাটিয়ে মুনাফা উপার্জন করা।

৩. ভারতের কোম্পানী আইনে (১৯৫৬) বলা হয়েছে, ব্যাঙ্ক হল এমন একটি সংস্থা যে ফেরত চাওয়া মাত্র বা অন্যভাবে পরিশোধের শর্তে এবং ঋণ দেবার অথবা লগ্নি করার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত-জমা হিসাবে টাকা নেয়। সে টাকা চেক বা ড্রাফ্ট্ কেটে বা নির্দেশ দিয়ে কিংবা অন্যভাবে ঐ সংস্থা থেকে তোলা যায়।

৪. **বিভিন্ন প্রকারের ব্যাঙ্ক ঃ** কারবারী জগতে উৎপাদন ও বেচাকেনার কাজগুলি যেমন বিশেষায়ণের ভিত্তিতে আলাদা হয়ে উৎপাদনকারী সংস্থা ও ব্যবসায়ী সংস্থাগুলির মধ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে, তেমনি কারবারী অর্থসংস্থানের

কাজটিও আলাদা হয়ে গিয়ে ব্যাঙ্ক নামক কারবারী সংস্থাগুলির উপর ন্যস্ত হয়েছে। এটিও বিশেষায়ণের ফল। আবার অর্থসংস্থানের কাজটিও তিনটি ভাগে উপবিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সংস্থার উপর ন্যস্ত হয়েছে। এটি হল অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে বিশেষায়ণ নীতির আরও সম্প্রসারণ। তার ফলে আধুনিক জগতে প্রধানত তিন প্রকারের ব্যাঙ্ক দেখা যায়: (ক) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক; (খ) উন্নয়নমূলক ব্যাঙ্ক; (গ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক।

(ক) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (commercial banks): অধ্যাপক **হ্যাম**-এর মতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হল এমন সংস্থা যে নিজস্ব তহবিল থেকে বা ঋণ করা অর্থ থেকে কিংবা অর্থ সৃষ্টি করে ঋণপ্রার্থীদের ঋণ দেয়। অন্যান্য ব্যাঙ্ক ও ঋণদানকারী সংস্থা থেকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের পার্থক্য হল: (ক) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি **অর্থ সৃষ্টি** করতে পারে, অন্যেরা পারে না; (খ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক **স্বল্প মেয়াদে** (অনধিক ৯০ দিন) ঋণ দেয়, অন্যেরা তা দেয় না। এজন্য বলা হয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হল স্বল্পমেয়াদী ঋণের কারবারী। আমরা সচরাচর যে সব ব্যাঙ্ক দেখি তারা হল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাজ (functions of commercial banks): বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হল—(১) **আমানত জমা গ্রহণ** (acceptance of deposit)—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত হিসাবে নগদ টাকা জমা নেয়। এই আমানত জমা তিন রকমের: (ক) **স্থির বা মেয়াদী আমানত জমা** (fixed deposit)। ছয় মাস, ১, ২, ৩ বৎসর বা তারও বেশি কালের মেয়াদে এই আমানত জমা গ্রহণ করা হয়। এর সুদের হার বেশি এবং মেয়াদ যত বেশি, সুদের হারও তত বেশি হয়। মেয়াদ শেষের আগে আমানতী টাকা তোলা যায় না। এ ক্ষেত্রে চেক ব্যবহার হয় না। (গ) **সেভিংস ব্যাঙ্ক বা সঞ্চয়ী আমানত জমা** (savings bank deposit)। ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয়ে উৎসাহ দেওয়া হল এর উদ্দেশ্য। এর কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই। সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের বেশি টাকা আমানতী হিসাব থেকে তোলা যায় না। সুদের হার মেয়াদী আমানত থেকে কম। টাকা তোলার জন্য 'উইথ্‌ড্রয়াল স্লিপ' কিংবা চেক ব্যবহার করা যায়। আমানতী জমা হিসাবে সর্বদা একটি ন্যূনতম পরিমাণ অর্থ রাখতে হয়। (গ) **চলতি আমানত জমা** (current account deposit)। সাধারণত কারবারীরা এই আমানতী হিসাব রাখে। এতে ব্যাঙ্ক কোন সুদ দেয় না। উপরন্তু, আমানতী হিসাবে সর্বদা একটি ন্যূনতম অঙ্কের টাকা রাখতে হয়; টাকার অঙ্ক তার কম হলে ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট হারে টাকা কেটে নেয়। একদিনে যতবার ইচ্ছা চেক কেটে এই হিসাব থেকে টাকা তোলা যায়।

(২) **ঋণ সৃষ্টি** (creation of credit)—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ঋণ সৃষ্টি করা। (এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

(৩) **প্রতিনিধি হিসাবে কাজ** (agency function)—উপরোক্ত কাজগুলি ছাড়া, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক তার গ্রাহকদের প্রতিনিধিরূপে আরও অনেকগুলি অতিরিক্ত

কাজ করে থাকে। এইসব কাজের জন্য অবশ্য গ্রাহকদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক (কমিশন) নেওয়া হয়। এই কাজগুলি হল : গ্রাহকদের নির্দেশমত তাদের টাকা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট মারফত স্থানান্তরিত করা, অন্য ব্যাঙ্কের উপর গ্রাহকরা যে সব চেক পায় তার টাকা আদায় করা, গ্রাহকদের হয়ে তাদের জন্য শেয়ার, ডিবেঞ্চার, সরকারী ঋণপত্র প্রভৃতি কেনা, গ্রাহকদের বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ারের ডিভিডেণ্ড বা লভ্যাংশ আদায় করা, গ্রাহকদের বীমার প্রিমিয়াম দেওয়া, গ্রাহকদের সম্পত্তির ট্রাস্টিরূপে কাজ করা এবং তাদের উইলের নির্দেশ মত সম্পত্তির বিলি বন্দোবস্ত করা, আয়কর সম্পর্কে গ্রাহকদের পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদি।

(৪) **বিদেশী মুদ্রা বেচাকেনা** (sale and purchase of foreign exchange) —বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বিদেশীমুদ্রা বেচাকেনার কাজ করে।

(৫) **অন্যান্য কাজ** (other functions)—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক আরো যে সব কাজ করে তা হল, গ্রাহকদের মূল্যবান সামগ্রী ও দলিলপত্র সুরক্ষার জন্য লকারের ব্যবস্থা করা, ভ্রমণকারীদের জন্য 'ট্র্যাভেলারস চেক' বিক্রয় করা, কারবারী গ্রাহকদের সম্পর্কে কারবারী লেনদেনের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ করা, কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রির দায় গ্রহণ করা, গ্রাহকদের হয়ে তাদের কাটা বাণিজ্যিক হুণ্ডির টাকা পরিশোধের দায় স্বীকার করা, আর্থিক বিষয়ে গ্রাহকদের পরামর্শ দেওয়া এবং দেশের আর্থিক, ব্যাঙ্কিং, ব্যবসায় ও বাণিজ্যিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা ও প্রকাশ করা প্রভৃতি।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, স্টেট ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অব বরোদা ইত্যাদি হল ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির অন্যতম।

(খ) উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (development banks) : ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে বর্তমানে অর্থনীতিক বিকাশের জরুরী প্রয়োজনে কৃষি ও শিল্পের দ্রুত উন্নতির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই কাজে প্রধানত মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী পুঁজির প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটানোর ভার যাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে তাদের বলে উন্নয়ন ব্যাঙ্ক। জনসাধারণের ও সরকারের কাছ থেকে মেয়াদী আমানত ও ঋণ গ্রহণ করে এদের কাছে যে দীর্ঘমেয়াদী পুঁজির তহবিল সৃষ্টি হয় তা থেকে এরা কৃষি ও শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দীর্ঘমেয়াদে (১০–২৫ বৎসর) ঋণ দিয়ে ও অন্যান্য-ভাবে সাহায্য করে দেশের অর্থনীতিক বিকাশে সহায়তা করে। জাতিসঙ্ঘের সদস্য বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিক বিকাশের উদ্দেশ্যে স্থাপিত এরূপ একটি আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক আছে। তা সংক্ষেপে বিশ্বব্যাঙ্ক (World Bank) নামে পরিচিত। ভারতে এরকম কয়েকটি ব্যাঙ্ক আছে। যেমন, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (IDBI), ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া (IFCI), ন্যাশনাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন (NIDC), ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া (ICICI), স্টেট ফিন্যান্সিয়াল করপোরেশনস (SFCs),

এগ্রিকালচারাল রি-ফিন্যান্স অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন (ARDC), এগ্রি-কালচারাল ফিন্যান্স করপোরেশন (AFC) ইত্যাদি।

উন্নয়ন ব্যাঙ্কের কাজ (functions of development banks) **:** (১) শিল্প ও কৃষি সংস্থাকে সরাসরি বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ দেওয়া ; (২) শিল্প সংস্থার শেয়ার, স্টক, বণ্ড ও ডিবেঞ্চার কিনে শেয়ার পুঁজি ও ঋণ পুঁজি সরবরাহ করা ; (৩) শিল্প ও কৃষি সংস্থাকে অন্যান্য সূত্র থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সে ঋণের জামিনদার হওয়া ; (৪) শিল্প ও কৃষি সংস্থাগুলির শেয়ার ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বিক্রি করার দায় গ্রহণ করা ; (৫) অন্যান্য যে সব প্রতিষ্ঠান কৃষি ও শিল্পে যতটা ঋণ দিচ্ছে সে পরিমাণ টাকা তাদের ঋণ হিসাবে দিয়ে তাদের ঋণ দান ক্ষমতা বাড়ানো (ঋণের টাকার পুনঃ সংস্থান) ; (৬) বিভিন্ন অঞ্চলের কারিগরি-অর্থনৈতিক সমীক্ষা করে নতুন বাজার, নতুন পণ্য, নতুন শিল্প-সম্ভাবনা, স্থানীয় উপকরণের সদ্ব্যবহারের সুযোগ-সম্ভাবনা অনুসন্ধান করে তার ফলাফলের ভিত্তিতে উদ্যোক্তাদের উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করা।

(গ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (central bank) **:** বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই একটি করে এমন ব্যাঙ্ক আছে যা অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণকারী ও তত্ত্বাবধায়ক এবং ব্যাঙ্ক জগতের নেতা বা শীর্ষ সংস্থা রূপে কাজ করে। এই শীর্ষস্থানীয় ব্যাঙ্কটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নামে পরিচিত এবং দেশের পক্ষে অপরিহার্য বলে গণ্য হয়। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নাম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া। ব্রিটেনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নাম ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ : কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিটি কাজ দেশের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ। তা হল : (১) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের দ্বারা ভারপ্রাপ্ত হয়ে দেশে কাগজের টাকা প্রচলনের একমাত্র কর্তারূপে কাজ করে। ফলে দেশে সরকারী নগদ টাকার মোট যোগান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করে। দেশের প্রয়োজন মতো কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাগজের টাকার প্রচলন বাড়ায় বা কমায়। (২) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্ক রূপে কাজ করে। সরকারের রাজস্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা পড়ে। সরকারী খরচের টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে নির্বাহ করা হয়। দরকারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারকে ঋণ দেয় এবং সরকার জনসাধারণের কাছ থেকে যে ঋণ নেয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তা সংগ্রহ এবং পরিশোধ করে। (৩) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্ক রূপে কাজ করে। স্বেচ্ছায় কিংবা আইনত বাধ্য হয়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে তাদের মোট আমানত জমার একটি নির্দিষ্ট শতাংশ সর্বদা জমা রাখে। প্রয়োজন মতো বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নেয়। (৪) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণ সংগ্রহের শেষ সূত্র রূপে কাজ করে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির টাকার টান পড়লে এবং অন্যান্য সূত্র থেকে ঋণ সংগ্রহ করা দুর্ঘট হলে, শেষ পর্যন্ত তারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের শরণ নেয় এবং সেরকম ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়

ব্যাঙ্কও তাদের ঋণ দিয়ে রক্ষা করে। (৫) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণ দেবার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। এই কাজটির মাবফত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশে ঋণের মোট যোগান নিয়ন্ত্রণ ক'রে দেশের মধ্যে টাকার দাম তথা মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করে এবং কারবারীরা যাতে প্রয়োজনীয় ঋণ থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখে। (৬) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির পরস্পরের দেনা-পাওনা মিটানোর 'নিকাশ' ঘর রূপে কাজ করে। ফলে প্রতিদিন ব্যাঙ্কগুলির পরস্পরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকাব দেনা-পাওনা নগদ টাকা ব্যবহাব না করে কেবল হিসাবের জমাখরচ করে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়। (৭) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশেব উপার্জিত বিদেশী মুদ্রা ও সোনা রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুব তহবিলটি ধাবণ কবে। (৮) দেশের মুদ্রাব সাথে বিদেশী মুদ্রাব বিনিময় হার বজায় বাখা ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব আরেকটি কাজ। (৯) উপরোক্ত কাজগুলি ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রয়োজনবোধে আবো নানা রকমেব কাজ করে থাকে। স্বল্পোন্নত দেশেব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের অর্থনীতিক বিকাশেব উদ্দেশ্যে নানাভাবে কৃষি ও শিল্পে মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদে ঋণ দেবার ব্যবস্থা কবে। তাছাড়া, নানা অর্থনীতিক বিবরণ ও তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং বিশ্লেষণ কবে সরকার ও দেশবাসীর কাছে উপস্থিত করে, বিভিন্ন অর্থনীতিক বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা কবে ও সরকারকে অর্থনীতিক ও আর্থিক বিষয়ে পরামর্শ দেয়।

৬. ১১. ঋণ সৃষ্টি
Credit Creation

১. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের একটি প্রধান কাজ হল ঋণ দেওয়া। আমানতকারীদের কাছ থেকে তারা আমানত জমা রূপে যে টাকা পায় তা থেকেই তারা ঋণ দেয় বটে, কিন্তু তারা সকলে মিলে মোট যত নগদ টাকা আমানত জমা রূপে পায় তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে তারা ঋণ দিতে পারে। এটাকে বলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কেব দ্বারা **ঋণ সৃষ্টি** (Credit creation)।

২. কিভাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ঋণ সৃষ্টি করে তা বুঝতে হলে এই তিনটি বিষয় মনে রাখতে হবে: (ক) কারবারী সংস্থা হিসাবে ব্যাঙ্কগুলির (অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক) মূল উদ্দেশ্য হল মুনাফা উপার্জন করা। এজন্য তারা আমানতকারীদের কাছ থেকে পাওয়া আমানতী জমা থেকে ঋণপ্রার্থীদের ঋণ দিয়ে সুদ রূপে আয় উপার্জন করে কিংবা যা থেকে সুদ পাওয়া যায় এমন কোন ভালো লগ্নিপত্রে (সরকারী ঋণপত্র বা কোন কোম্পানীর ডিবেঞ্চারে) টাকা লগ্নি করে। কি এজন্য তারা আমানতী জমার সবটা ব্যবহার করতে পারে না। তার একটা নির্দি শতাংশ তারা সব সময় হাতে রাখে আমানতকারীদের চেকের টাকা মিটিয়ে দেবা জন্য। আমানতী জমার এই শতাংশকে বলে **নগদ সংরক্ষিত অনুপাত** (cas reserve ratio)। [যেমন, প্রতি ১০০ টাকা আমানতী জমার মধ্যে যদি ১০ টাব করে এজন্য রাখতে হয়, তাহলে নগদ সংরক্ষিত অনুপাত হবে ১০%। নগদ সংরক্ষিত অনুপাত যদি ১০% হয়, তাহলে ব্যাঙ্কগুলি প্রতি ১০০ টাকা আমানতের

মধ্যে ৯০ টাকা (বা আমানত জমার ৯০%) ঋণ দেবার বা লগ্নি করার জন্য ব্যবহার করতে পারবে]। (খ) ঋণ দিতে গিয়ে কিন্তু ব্যাঙ্ক ঋণপ্রার্থীদের কাছ থেকে ঋণের অন্তত সমান মূল্যের মূল্যবান কোন সম্পত্তি জামিন নিয়ে তবে ঋণ দেয়। তাকে বলে 'কোল্যাটেরাল সিকিউরিটি'। (গ) ব্যাঙ্কগুলি যেমন আমানত জমা গ্রহণ করার সময় আমানতকারীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের নামে আমানতী হিসাব খোলে, তেমনি, যখন ঋণ দেয় তখনও খাতকের নামে মঞ্জুর করা ঋণের টাকা জমা দেখিয়ে আমানতী হিসাব খোলে। প্রথম ধরনের আমানতকে বলে **প্রাথমিক আমানত** (primary deposit), দ্বিতীয় ধরনের আমানতকে বলে **উদ্ভূত আমানত** (derivative deposit)। **উদ্ভূত আমানতী জমার মধ্য দিয়েই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ঋণ সৃষ্টি** করে থাকে। অর্থাৎ 'উদ্ভূত আমানত জমা'ই (derivative bank deposit) হল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা সৃষ্ট ঋণ। একে ব্যাঙ্ক ঋণ বা 'ব্যাঙ্ক-অর্থ' (bank money)-ও বলে।

৩. ব্যাঙ্কগুলি এ ভাবে ঋণ বা 'ব্যাঙ্ক-অর্থ' বা ব্যাঙ্ক-আমানত সৃষ্টি করে : ধরা যাক, সোনালী ব্যাঙ্কে কোন আমানতকারী নগদ ১০০ টাকা জমা দিয়ে একটি চলতি আমানতী হিসাব খুলল। এটি হল 'প্রাথমিক আমানত' জমা (primary deposit)। ফলে সোনালী ব্যাঙ্কে একদিকে সম্পত্তি জন্মাল নগদ ১০০ টাকা এবং আমানতকারীর কাছে তার দায় বা দেনা জন্মাল ১০০ টাকা। দেশের ব্যাঙ্কগুলি তাদের আমানত জমার শতকরা ১০ টাকা নগদ সংরক্ষিত তহবিল হিসাবে হাতে রেখে বাকি টাকা ধার দেয়। সোনালী ব্যাঙ্কও ওই ১০০ টাকা নগদ আমানত জমা থেকে নগদ সংরক্ষিত তহবিল বাবদ ১০ টাকা রেখে বাকি ৯০ টাকা একজন কারবারীকে ঋণ মঞ্জুর করল। তা করতে গিয়ে সোনালী ব্যাঙ্ক ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে ৯০ টাকা মূল্যের কোন সম্পত্তি জামিন হিসাবে নিল এবং তার নামে ৯০ টাকার একটি আমানতী জমার হিসাব খুলল। এটি হল উদ্ভূত আমানতী হিসাব। ফলে সোনালী ব্যাঙ্কের খাতায় এই লেনদেন দুটির মোট ছবি যা দাঁড়াল তা ৬·১ সারণিতে দেখান হল।

সারণি ৬·১

দায়	টাকা	সম্পত্তি	টাকা
প্রাথমিক আমানত	১০০	নগদ তহবিল	১০০
উদ্ভূত আমানত	৯০	জামিন সম্পত্তি	৯০
মোট—	১৯০	মোট—	১৯০

এইভাবে প্রত্যেক ব্যাঙ্কই ঋণ দিতে গিয়ে প্রাথমিক আমানতী জমার অতিরিক্ত উদ্ভূত আমানতী জমা সৃষ্টি করে এবং উদ্ভূত আমানত জমার মারফত ব্যাঙ্ক ঋণ সৃষ্টি করে। কিন্তু ব্যাঙ্ক ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি একটি ব্যাঙ্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এক ব্যাঙ্ক থেকে তা অন্য ব্যাঙ্কে ছড়িয়ে পড়ে।

সোনালী ব্যাঙ্ক যাকে ৯০টাকা ঋণ মঞ্জুর করে সে বাবদ ৯০ টাকা উদ্ভূত জমা সৃষ্টি করেছিল সেই ঋণগ্রহণকারী (কারবারী) ঋণের সবটা যদি চেক কেটে

সোনালী ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে খরচ করে তাহলে, প্রথমত, সোনালী ব্যাঙ্কের উদ্বৃত্ত আমানত জমার ৯০ টাকার হিসাবটি বিলুপ্ত হবে এবং সোনালী ব্যাঙ্কের নগদ তহবিলও ৯০ টাকা কমে গিয়ে হাতে থাকবে কেবল ১০ টাকা। আর থাকবে জামিন সম্পত্তি ৯০ টাকা এবং প্রাথমিক জমা ১০০ টাকা (আমরা ধরে নিচ্ছি, যে লোকটি ঐ প্রাথমিক জমা রেখেছে সে চেক কেটে কোন টাকা তোলেনি)। এর ফলে সোনালী ব্যাঙ্কের হিসাবটি একটু বদলে গিয়ে দাঁড়াবে এই রকম (সারণি ৬·২):

সারণি ৬·২

দায়	টাকা	সম্পত্তি	টাকা
প্রাথমিক আমানত	১০০	নগদ তহবিল	১০
		জামিন সম্পত্তি	৯০
মোট—	১০০	মোট—	১০০

দ্বিতীয়ত, ঋণগ্রহণকারী ঐ ৯০ টাকা সোনালী ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে খরচ করার ফলে অন্য কোন না কোন ব্যাঙ্কে গিয়ে তার একটা অংশ বা সবটা জমা পড়বে। ধরা যাক, ওই ৯০ টাকা যারা পেল তারা রূপালী ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা দিল। ফলে এখন রূপালী ব্যাঙ্কে প্রাথমিক জমা পড়ল ৯০ টাকা এবং তা থেকে ১০ শতাংশ অর্থাৎ ৯ টাকা নগদ সংরক্ষিত তহবিল রূপে হাতে রেখে, রূপালী ব্যাঙ্ক বাকি ৮১ টাকা আরেকজন কারবারীকে ঋণ মঞ্জুর করল এবং সেজন্য ৮১ টাকার পরিমাণ জামিন নিল। ফলে এবার রূপালী ব্যাঙ্কের খাতায় যে হিসাবটি দাঁড়াল তা ৬·৩ সারণিতে দেখান হল।

ঋণগ্রহণকারী কারবারী রূপালী ব্যাঙ্ক থেকে মঞ্জুর করা ঋণের সবটা তুলে নিলে রূপালী ব্যাঙ্কের কাছে থাকবে কেবল প্রাথমিক আমানত ৯০ টাকা, নগদ তহবিল ৯ টাকা এবং জামিন সম্পত্তি ৮১ টাকা। ঋণগ্রহণকারী ঐ ৮১ টাকা খরচ করার ফলে হয়তো সে টাকাটা পূবালী ব্যাঙ্কে গিয়ে অন্য কারো না কারো মারফত প্রাথমিক জমা রূপে দেখা দেবে। ফলে রূপালী ব্যাঙ্কের ও পূবালী ব্যাঙ্কের হিসাব খাতা দুটির ছবি হবে অনেকটা এই রকম (সারণি ৬·৪ ও সারণি ৬·৫):

সারণি ৬·৩

দায়	টাকা	সম্পত্তি	টাকা
প্রাথমিক আমানত	৯০	নগদ তহবিল	৯০
উদ্বৃত্ত আমানত	৮১	জামিন সম্পত্তি	৮১
মোট—	১৭১	মোট—	১৭১

সারণি ৬·৪

দায়	টাকা	সম্পত্তি	টাকা
প্রাথমিক আমানত	৯০	নগদ তহবিল	৯
		জামিন	৮১
মোট—	৯০	মোট—	৯০

সারণি ৬·৫

দায়	টাকা	সম্পত্তি	টাকা
প্রাথমিক আমানত	৮১	নগদ তহবিল	৮১
মোট—	৮১	মোট—	৮১

এইভাবে ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি এক ব্যাঙ্ক থেকে আর এক ব্যাঙ্কে ছড়িয়ে পড়বে াবং তাদের সকলের হাতে মোট নগদ তহবিলের পরিমাণ একই থাকলেও মোট

সারণি ৬·৬

ব্যাঙ্ক		প্রাথমিক আমানত	নগদ সংরক্ষিত তহবিল	উদ্বৃত্ত আমানত
সোনালী	...	১০০ টাকা	১০ টাকা	৯০ টাকা
রূপালী	...	৯০ „	৯ „	৮১ „
পূবালী	...	৮১ „	৮·১০ „	৭২·৯০ „
...	...	... „	... „	... „
...	...	... „	... „	... „
...	...	... „	... „	... „
সকল ব্যাঙ্ক—		**১০০০ টাকা**	**১০০ টাকা**	**৯০০ টাকা**

ামানত সৃষ্টির পরিমাণ হবে তার কয়েক গুণ। এক ব্যাঙ্কের প্রাথমিক আমানতের ভিত্তিতে সেখানে উদ্বৃত্ত আমানতের সৃষ্টি হবে এবং তা থেকে আবার অন্য ব্যাঙ্কে ্রাথমিক আমানতের সৃষ্টি হবে। এই সমগ্র প্রক্রিয়াটির মোট ফলাফল ৬·৬ ারণিতে দেখান হয়েছে।

সুতরাং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির আমানত সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি হল এই—(১) প্রত্যেক ্যাঙ্কের কাছে নগদ টাকার যে আমানত জমা পড়ে তা হল প্রাথমিক আমানত। ২) তা থেকে নগদ সংরক্ষিত তহবিল হিসাবে নির্দিষ্ট একটি শতাংশ রেখে বাকি াকা ঋণ দিতে গিয়ে ঋণের সমপরিমাণে সে নিজের কাছে উদ্বৃত্ত আমানত সৃষ্টি রে। (৩) ঋণগ্রহণকারী ঋণের সব টাকা তুলে নিলে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের কাছে ওই দ্বৃত আমানতটি লুপ্ত হয় কিন্তু সে টাকাটা অন্য কোন না কোন ব্যাঙ্কে আবার ্রাথমিক আমানত রূপে জমা পড়ে। (৪) প্রতিবার প্রাথমিক আমানত রূপে জমা থকে নির্দিষ্ট হারে (আমাদের দৃষ্টান্তে ১০ শতাংশ হারে) নগদ সংরক্ষিত তহবিল হসাবে টাকা হাতে রাখতে গিয়ে প্রত্যেক ব্যাঙ্কই যে পরিমাণ প্রাথমিক আমানত মা পায় তার চেয়ে কম পরিমাণে ঋণ দেয়। ফলে পরবর্তী ব্যাঙ্কগুলিতে প্রাথমিক ামানতের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে। অবশেষে এক সময়ে তা শূন্যে পরিণত, র্থাৎ শেষ হয়।

৪. **ঋণ সৃষ্টির সীমা** (limits to credit creation): ব্যাঙ্কগুলি সকলে লে যে আমানত সৃষ্টি করে তা সীমাহীনভাবে চলতে পারে না। তাদের ঋণসৃষ্টির মতা এই বিষয়গুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ: (১) **হাতে মোট নগদ টাকার পরিমাণ:** ্যাঙ্কগুলি কতটা পরিমাণে ঋণ সৃষ্টি করতে পারবে তা নির্ভর করে তাদের হাতে কি রিমাণ নগদ টাকা বা নগদ তহবিল রয়েছে, তার উপর। নগদ তহবিলের পরিমাণ বশি হলে তাদের ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতাও বেশি হয়।

(২) **নগদ সংরক্ষিত অনুপাত :** ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা ঋণসৃষ্টির পরিমাণ নির্ভর করে তাদের হাতে আদি প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ ও নগদ সংরক্ষিত তহবিলের অনুপাতের উপর ; অর্থাৎ প্রাথমিক আমানতের কত শতাংশ তারা নগদ সংরক্ষিত তহবিল রূপে হাতে রাখছে তার উপর। নগদ সংরক্ষিত তহবিল যদি প্রাথমিক আমানতের ১০ শতাংশ হয়, তাহলে আদি প্রাথমিক আমানতের ১০ গুণ পর্যন্ত তারা ঋণ সৃষ্টি করতে পারবে। যদি নগদ সংরক্ষিত তহবিলটি ২০ শতাংশ হয়, তাহলে আদি প্রাথমিক আমানতের ৫ গুণ পর্যন্ত তারা ঋণ সৃষ্টি করতে পারবে। (আদি প্রাথমিক আমানতটি হল, আমাদের দৃষ্টান্তে সোনালী ব্যাঙ্কের প্রাথমিক জমার পরিমাণটি, অর্থাৎ ১০০ টাকা)। এর সূত্রটি হল এই,—

মোট আমানত সৃষ্টি = আদি প্রাথমিক আমানত (১০০) ÷ নগদ সংরক্ষিত অনুপাত (১০%) [Total Deposit Created = Original Primary Deposit $\times \frac{1}{r}$ or (cash reserve ratio)]

(৩) **নগদ পছন্দ :** ব্যাঙ্কগুলি কতটা পরিমাণে ঋণ সৃষ্টি করতে পারবে বা আমানত সৃষ্টির পরিমাণ বাড়াতে পারবে তা নির্ভর করে জনসাধারণের মধ্যে নগদ টাকা হাতে ধরে রাখার ইচ্ছা বা নগদ পছন্দটা কতটা প্রবল তার উপর। তাদের নগদ পছন্দ বেশি হলে তারা ব্যাঙ্কে আমানত জমা কম রাখবে। ফলে ব্যাঙ্কগুলির নগদ তহবিল কম হবে এবং তাদের আমানত বা ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতাও কম হবে। জনসাধারণের নগদ পছন্দ কম হলে উল্টোটা ঘটবে।

(৪) **দেশের অর্থনীতিক ও কারবারী পরিস্থিতি :** দেশের অর্থনীতিক কাজ কারবারের পরিস্থিতি ভাল হলে, চড়তির বাজারে ঋণের চাহিদা বেশি হয় ও ব্যাঙ্কগুলি সহজেই ঋণ সৃষ্টি করতে পারে। মন্দার বাজারে ঋণের চাহিদা থাকে না। ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকলেও ব্যাঙ্কগুলি তখন ইচ্ছামত ঋণ সৃষ্টি করতে পারে না।

(৫) **উপযুক্ত জামিনের পরিমাণ :** দেশে ঋণের উপযুক্ত জামিনের পরিমাণ যদি কম থাকে, তবে ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের সামর্থ্য সত্ত্বেও বেশি ঋণ সৃষ্টি করতে পারে না।

(৬) **কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি :** ব্যাঙ্কগুলির ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা বিশেষভাবেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির উপর নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা বাড়াতে পারে, কমাতেও পারে।

৬.১২. টাকার বাজার
Money Market

১. **টাকার বাজার :** স্বল্প মেয়াদে ঋণপ্রদানযোগ্য পুঁজির ভাণ্ডারকে চলতি কথায় টাকার বাজার বলে। এর কাজ হল কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয় স্বল্পমেয়াদী ঋণের সংস্থান করা। টাকার বাজার ও পুঁজির বাজারের পার্থক্য হল, প্রথমটিতে স্বল্পমেয়াদী ঋণের আর দ্বিতীয়টি দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সংস্থান করে।

সাধারণত কাঁচামাল সংগ্রহ, মজুরি প্রদান, কাঁচামাল থেকে আরম্ভ করে উৎপন্ন পণ্য ক্রেতার কাছে বিক্রয়ের মধ্যবর্তী বিভিন্ন অবস্থায় ও স্তরে, পণ্য উৎপাদনের বিবিধ প্রক্রিয়া সচল রাখার এবং তৈরী পণ্য বিক্রয়ের জন্য সরকারের সাময়িক অর্থের প্রয়োজন মিটানোর জন্য, স্বল্পমেয়াদী ঋণ সরবরাহ করাই হল টাকার বাজারের কাজ। টাকার বাজার কারবার ও সরকারের প্রয়োজনীয় চলতি অর্থের সংস্থান করে। পুঁজির বাজার হল কারবারের ও সরকারের প্রয়োজনীয় দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থানের ক্ষেত্র। তবে, পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এরা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। কারণ এক বাজারের কাযকলাপের প্রতিক্রিয়া সহজেই অপর বাজারে প্রভাব বিস্তার করে।

২. যে সব হিতকর কাজের দরুন কারবারী জগতে টাকার বাজারের যথেষ্ট উপযোগিতা ও গুরুত্ব রয়েছে তা হল : (১) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান এই বাজারে স্বল্পমেয়াদী ঋণে টাকা লগ্নি করার সুযোগ পায়। (২) লাভজনকভাবে টাকা খাটানোর সুযোগ থাকায়, টাকার বাজার দেশবাসীকে সঞ্চয়ে উৎসাহ দেয় ও সমাজের সঞ্চয়কে উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক খাতে পরিচালিত করে। (৩) সরকারকে সহজ স্বল্পমেয়াদী ঋণ সংগ্রহ করতে সাহায্য করে। (৪) কারবারের চলতি পুঁজি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে উৎপাদন অক্ষুণ্ণ রাখে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসায়ে পণ্যসামগ্রীর সচলতা অব্যাহত রাখে। (৫) পুঁজির বাজারের লেনদেনগুলিকে সাহায্য করে ও তা অব্যাহত রাখে। (৬) সুগঠিত টাকার বাজার সর্বদাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণনিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী ও কার্যকর করে। সুতরাং ব্যবসায়, বাণিজ্য ও শিল্প প্রভৃতি যাবতীয় কারবারী কার্যকলাপের সূচনা, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিতে টাকার বাজার অপরিহার্য।

৩. **টাকার বাজারের সদস্য :** স্বল্পমেয়াদী ঋণের যোগানদার ও চাহিদাকারী, এই দু'পক্ষ নিয়ে হল টাকার বাজার। তবে এরা সকলেই যে আলাদা তা নয়। এর অনেক সদস্যই একই সঙ্গে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহণকারী। টাকার বাজারের এই সদস্যরা হল প্রধানত : (১) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ; (২) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ ; (৩) লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, যথা বীমা কোম্পানী, সেভিংস ব্যাঙ্ক ইত্যাদি ; (৪) মহাজন, পোদ্দার, সাহুকার প্রভৃতি লগ্নিকারীরা।

ঋণদাতা বা লগ্নিকারীদের তুলনায়, এই বাজারের ঋণগ্রহণকারীরা সংখ্যায় অনেক বেশী ও বিভিন্ন প্রকারের হওয়ায় তাদের নির্দিষ্টভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা কঠিন। তবে এদের মধ্যে বিল-দালাল, বিল-বাট্টাকারবারী প্রতিষ্ঠান, হুণ্ডি-স্বীকৃতির কারবারী প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী ও বেসরকারী সিকিউরিটি কারবারীদের ইংল্যাণ্ডের টাকার বাজারে দেখা যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টাকার বাজারে শেয়ারের দালাল, সিকিউরিটি কারবারীরা, কমার্শিয়াল পেপার কারবারীরা ও বিল কারবারীরা হল প্রধান ঋণগ্রহণকারী।

৪. **ভারতের টাকার বাজার :** (১) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, (২) স্টেট ব্যাঙ্ক,

(৩) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি, (৪) বিদেশী (বাণিজ্যিক) ব্যাঙ্কগুলি, (৫) সমবায় ব্যাঙ্কগুলি, (৬) বিল বাজার, (৭) মহাজন, সাহুকার, পোদ্দার ইত্যাদি দেশীয় ব্যাঙ্কাররা, (৮) কারবারী সংস্থাগুলিতে যারা সরাসরি মেয়াদী আমানত জমা রাখে সেই লগ্নিকারীদের নিয়ে ভারতের টাকার বাজারটি গঠিত।

৫. **বিল বাজার ঃ** পশ্চিমী দেশগুলিতে বাণিজ্যিক হুণ্ডি টাকার বাজারের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঋণপত্র রূপে কাজ করে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে বাকিতে লেনদেনের ফলে বিপুল পরিমাণে নির্দিষ্ট মেয়াদের বাণিজ্যিক হুণ্ডির উৎপত্তি হয়। সংশ্লিষ্ট কারবারীরা সে হুণ্ডি মেয়াদ শেষের আগে ব্যাঙ্কের কাছে বাট্টা বা বিক্রি করে কারবারের প্রয়োজনে টাকার যোগাড় করে। লগ্নিপত্র হিসাবে ব্যাঙ্কগুলি প্রভূত পরিমাণে হুণ্ডি কিনে তাদের লগ্নিযোগ্য টাকা খাটায় এবং বাট্টা হিসাবে আয় উপার্জন করে। নিজেদের টাকার দরকার হলে ব্যাঙ্কগুলি সে হুণ্ডি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে পুনর্বাট্টা বা বিক্রি করে দিয়ে টাকার যোগাড় করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সব সময় হুণ্ডি পুনর্বাট্টা করার জন্য তৈরী থাকে বলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কারবারীদের কাছ থেকে হুণ্ডি কিনতে বা বাট্টা করতে দ্বিধা করে না। এইভাবে বাণিজ্যিক হুণ্ডির কারবার টাকার বাজারের মধ্যে একটা আলাদা বাজার হিসাবে সে সব দেশে সৃষ্টি হয়েছে এবং বাণিজ্যিক হুণ্ডি স্বল্পমেয়াদী ঋণের একটা প্রধান মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। ফলে ব্যবসায়ী, বণিক শিল্পপতিরাও এতে উপকৃত হয়েছে।

কিন্তু ভারতে—(১) ব্যবসা-বাণিজ্যে পশ্চিমী ধরনের বাণিজ্যিক হুণ্ডির উৎপত্তি না হওয়ায়; (২) যে দেশী হুণ্ডি এখানে দেশীয় ব্যাঙ্কারদের ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রচলিত আছে তা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়ায়; এবং (৩) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক হুণ্ডি পুনর্বাট্টা করত না বলে,—ব্যাঙ্কগুলিও বাণিজ্যিক হুণ্ডি বাট্টা করে কারবারীদের ঋণ দিত না। তাই এদেশে বিল বাজার বা বাণিজ্যিক হুণ্ডির বাজারও গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে এদেশের টাকার বাজার সুগঠিত হতে পারেনি।

এই ত্রুটি দূর করার জন্য, দেশে একটি বিল বাজার সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল বাজার স্কীম প্রবর্তন করে।

এখন পুনর্বাট্টার উপযোগী বিলের ন্যূনতম টাকার পরিমাণ কমিয়ে ৫ হাজার টাকা করা হয়েছে (আগে ছিল ১০ হাজার টাকা) এবং আরো ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, ব্যাঙ্কগুলি মোট দশ লাখ টাকার পরিমাণ পর্যন্ত বিল নিজেদের কাছে রেখে দিয়ে শুধু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে ওই বিলগুলির একটি তালিকা পেশ করলেই, তার ভিত্তিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই বিলগুলি পুনর্বাট্টা করবে। এই সব সুবিধা দেবার ফলে এখন বিল পুনর্বাট্টার পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। বিল বাজারটির জনপ্রিয়তা বাড়ছে বলা যায়।

বিল বাজার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে,—(ক) ব্যাঙ্কগুলি এখন বাণিজ্যিক হুণ্ডি বাট্টা করায় ঋণগ্রহণকারী, অর্থাৎ কারবারীরা যে সুবিধা পাচ্ছে তা

হল—(১) একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ পাওয়া যায় এবং ক্যাশক্রেডিট ব্যবস্থার মত যখন তখন তা ব্যাঙ্ক ফেরত চাইতে পারে না; (২) বাট্টা বাদে বিলের পুরো টাকাই ঋণ পাওয়া যায় এবং সেজন্য কোল্যাটের‍্যাল বা সমমূল্যের জামিন লাগে না; (৩) বাজারের অবস্থা ও কারবারের দরকার মতো বিল বাট্টার পরিমাণ কমানো বা বাড়ানো যায়; এবং (৪) অন্যান্য ধরনের ব্যাঙ্ক ঋণের চেয়ে এর উপর সুদের হার কম। (খ) **ব্যাঙ্কগুলির সুবিধা হল এই যে,**—(১) মেয়াদ শেষে বিলের টাকা পাওয়া যায় বলে ব্যাঙ্ক টাকা আদায় সম্পর্কে নিশ্চিত থাকে; (২) মাল বন্ধক রেখে ঋণ দেবার ঝামেলা নেই; (৩) নিজেদের দরকারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ওই বিলগুলি পুনর্বাট্টা করে নিজেরা টাকা যোগাড় করতে পারে; (৪) বিল বাট্টা করা তাদের টাকা লাভজনকভাবে লগ্নি করার একটা উপায়; এবং (৫) মেয়াদ অনুযায়ী তারা বিভিন্ন বিলে এমনভাবে টাকা লগ্নি করতে পাবে যাতে তাদের মুনাফা এবং হাতে প্রয়োজনমত নগদ টাকা রাখা, এই দু'দিকই বজায় থাকে।

৬. **ভারতের টাকার বাজারের লগ্নিপত্রঃ** ট্রেজারী বিল, স্বল্পমেয়াদী সরকারী ঋণপত্র, বেসরকারী কোম্পানীর শেয়ার, স্টক ও ডিবেঞ্চার ও মেয়াদী কৃষিবিল, বাণিজ্যিক হুণ্ডি ইত্যাদি লগ্নিপত্রের ভিত্তিতে এদেশের টাকার বাজারে স্বল্পমেয়াদী ঋণের লেনদেন চলে।

৭. **ভারতের টাকার বাজারের বৈশিষ্ট্যঃ** স্বাধীনতা লাভের পর নানা বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সংস্থা স্থাপনের ফলে বর্তমানে টাকার বাজারের উন্নতি ও প্রসার ঘটেছে। যোগাযোগ ও টাকা স্থানান্তরের সুবিধা বৃদ্ধির ফলে টাকার বাজারের ব্যাপ্তি ঘটেছে। এর ফলে সুদের হারের আঞ্চলিক পার্থক্য কমেছে। টাকার বাজারের চাহিদা, যোগান ও লেনদেনের পরিমাণ বেড়েছে। টাকার বাজারের উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। টাকার বাজারের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতা স্থাপিত হয়েছে। বিদেশী সুসংগঠিত টাকার বাজারগুলির মত এখন এখানে 'ইস্যু হাউজ', 'ডিসকাউন্ট হাউজ' ইত্যাদি টাকার বাজারের বিশিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক অংশগুলি স্থাপিত হওয়ায় বাজারটি সুসংগঠিত হয়ে উঠেছে। বিল বাজার সৃষ্টির ফলে টাকার বাজারে লগ্নিপত্রের একটি বড় অভাব দূর হয়েছে।

৬.১৩. কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ
Central Bank & Credit Control

১. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে ঋণ সৃষ্টি করে, তা হল আধুনিক সমাজে টাকার মোট যোগানের সবচেয়ে বড় ও প্রধান অংশ। দেশে টাকার মোট যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি তাই ব্যাঙ্ক ঋণের উপর বিশেষভাবেই নির্ভরশীল। টাকার মোট যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধির মারফত ব্যাঙ্ক ঋণের হ্রাস-বৃদ্ধি তাই দেশের মূল্যস্তর, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, সঞ্চয় বিনিয়োগ ও অর্থনীতিক কাজকর্মকে গভীর ও ব্যাপকভাবে

প্রভাবিত করে। তা যেমন অর্থনীতিক স্থিতিশীলতা ও সম্প্রসারণের সহায়ক হতে পারে, তেমনি আবার অর্থনীতিক সংকট ও বিপর্যয়েরও কারণ হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং অর্থনীতিক পরিস্থিতি ও সরকারের নির্দিষ্ট অর্থনীতিক লক্ষ্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক ঋণের নিয়ন্ত্রণ সব দেশেই গুরুত্ব লাভ করেছে এবং দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ব্যাঙ্কঋণ নিয়ন্ত্রণের ভারটি ন্যস্ত হয়েছে।

২. দু'রকম পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কঋণ নিয়ন্ত্রণ করে: (ক) পরিমাণগত ঋণনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (quantitative methods of credit control); এবং (গ) গুণগত ও বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (qualitative and selective methods of credit control)। প্রথমটির দ্বারা ঋণের মোট পরিমাণটি কমানো বা বাড়ানো হয়। দ্বিতীয়টির দ্বারা ঋণের বাঞ্ছিত ব্যবহার সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়।

৩. পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উপায় বা অস্ত্র হল তিনটি: (ক) ব্যাঙ্ক রেট নীতি; (খ) খোলাবাজারী লেনদেন; ও (গ) পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত জমার অনুপাত-নীতি। গুণগত ও বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উপায় বা অস্ত্র হল: (ক) ব্যাঙ্কগুলিব উপর নৈতিক চাপ ও অনুরোধ; (খ) নির্দেশজারী; (গ) প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ; (ঘ) ভোগী-ঋণ নিযন্ত্রণ; (ঙ) ঋণের মার্জিন পবিবর্তন; এবং (চ) ঋণের রেশনিং ইত্যাদি।

৬.১৪. পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
Methods of Quantitative Credit Control

১. **ব্যাঙ্ক রেট নীতি** (bank rate policy): (ক) ব্যাঙ্ক রেট কাকে বলে: যে হারে বাট্টা কেটে নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হুণ্ডি রেখে টাকা দেয় তাকে বলে 'ব্যাঙ্ক বেট' বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বিল বাট্টার হার। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যত রকমভাবে তার গ্রাহকদের ঋণ দেয় তার মধ্যে একটি হল গ্রাহকদের বাণিজ্যিক বিলগুলি বাট্টা করে অর্থাৎ নির্দিষ্ট বাট্টার হারে কিনে নিয়ে টাকা দেওয়া। পবে নিজেদের টাকার টান পডলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ওই বাট্টা করা বাণিজ্যিক হুণ্ডি বা বিলগুলি আবার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে বাট্টা দিয়ে বিক্রি করে ঋণ (অর্থাৎ টাকা) যোগাড করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাছে ঋণ সংগ্রহের শেষ ও চরম আশ্রয় বলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের হুণ্ডিগুলি নিজেবা বাট্টা করে (অর্থাৎ কিনে নিয়ে) ঋণ দিয়ে থাকে। বাট্টা হল প্রকৃতপক্ষে সুদ। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার হল আসলে বাণিজ্যিক বিল মারফত ঋণ দেবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আদায় করা সুদের হার। যে হারে বাট্টা বা সুদ দিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নেয়, স্বভাবতঃই ঐ টাকা থেকে নিজেদের গ্রাহকদের ঋণ দেবার সময় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিও এমন হারে বাট্টা বা সুদ আদায় করে যাতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে তারা যে হারে বাট্টা বা সুদ দিয়েছে তা তুলে নিয়ে তার উপর নিজেদেরও মুনাফা থাকে। তাই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের বাট্টার হার সাধারণত কেন্দ্রীয়

ব্যাঙ্কের বাট্টার হারের চেয়ে বেশি হয়। এবং ব্যাঙ্কগুলি অন্যান্যভাবে যে ঋণ গ্রাহকদের দেয় তার সুদের হারও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হারের চেয়ে বেশি হয়। এমনিভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হারের সাথে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে হারে সুদ ও বাট্টা নেয় তার সাথে একটি সম্পর্ক থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার বাড়লে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের বাট্টার ও সুদের হাব বাড়ে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার কমলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের বাট্টা ও সুদের হার কমে।

(খ) ব্যাঙ্ক রেট কিভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে: ব্যাঙ্ক রেট বাড়লে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে যথাসম্ভব কম করে ঋণ নেয় এবং তারা নিজেরাও বাণিজ্যিক হুণ্ডির বাট্টার হার ও অন্যান্য ঋণের সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। ফলে কারবারীরাও ব্যাঙ্ক থেকে কম করে ঋণ নেয়। সেই সাথে কম সুদে দেওয়া আগেকার ঋণ ফেরত দেবার জন্য ব্যাঙ্কগুলি কারবারীদের উপর চাপ দিতে থাকে। কারবারীরা ওই ঋণ নিয়ে যে সব দ্রব্যসামগ্রী, ঋণপত্র কিনে মজুদ করে রেখেছিল তা বিক্রি করে ঋণ শোধ করতে তখন বাধ্য হয়। ফলে বাজারে ঋণের বা টাকার মোট যোগান ও চাহিদা দু'টোই কমে এবং জিনিসপত্রের দাম নিম্ন-মুখী হয়। অন্যদিকে ঋণের অভাবে বিনিয়োগ কমে, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কমে, চাহিদা কমে এবং শেষ পর্যন্ত দামস্তর কমে। দামস্তর কমলে দেশের পণ্য সস্তা হওয়ায় রপ্তানি বাড়ে এবং আমদানি কমে। ফলে বৈদেশিক লেনদেনে ঘাটতি দূর হয় ও উদ্বৃত্ত দেখা দেয়। ব্যাঙ্করেট কমানো হলে এর বিপরীতটা ঘটে।

তাই দামস্তর কমাতে, রপ্তানি বাড়াতে এবং বৈদেশিক লেনদেনে ঘাটতি দূর করে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্করেট বাড়ানো হয়। আর বিনিয়োগ বাড়াতে, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়াতে ব্যাঙ্করেট কমানো হয়।

(গ) ব্যাঙ্করেট নীতির সীমাবদ্ধতা: (১) দেশের টাকার বাজার যদি সুসংগঠিত না হয়, তাহলে ব্যাঙ্করেটের সাথে বাজারের চলতি সুদের হারে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে না। সে অবস্থায় ব্যাঙ্করেট কমানো বাড়ানো হলেও তাতে বাজারের চলতি সুদের হার বিশেষ কমে বাড়ে না। (২) ব্যাঙ্কগুলির হাতে যদি বাট্টা করার উপযুক্ত বাণিজ্যিক হুণ্ডি যথেষ্ট পরিমাণে না থাকে তাহলে ব্যাঙ্করেট নীতি প্রয়োগ করার উপযুক্ত ভিত্তি থাকে না। (৩) ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে হুণ্ডি বাট্টা করার প্রথা ও রীতি প্রচলিত না থাকে তাহলে ব্যাঙ্করেট বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সুদের হারকে খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারে না। (৪) ব্যাঙ্কগুলির হাতে যদি যথেষ্ট পরিমাণে নগদ টাকা থাকে তাহলে তারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে বাণিজ্যিক হুণ্ডি বাট্টা করার কোন গরজ অনুভব করে না। (৫) কারবারীদের মনে যদি এই ধারণা থাকে যে, ভবিষ্যতে বাজার আরও চড়বে এবং মুনাফা বেশি হবে, তাহলে ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধির দরুন সুদের হার বাড়লেও তারা চড়া সুদে ঋণ নিতে কুণ্ঠিত হয় না। চড়া সুদ তখন বিনিয়োগ কমাতে পারে না। তাছাড়া, ব্যাঙ্করেট বাড়লে বা কমলে যত সহজে দামস্তর বাড়বে বা কমবে বলে এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছে, বর্তমানে বাস্তবে

নানা কারণে তা ঘটে না। এই সমস্ত কারণে ব্যাঙ্করেট নীতির কার্যকারিতা এখন কমে গেছে।

২. **খোলাবাজারী লেনদেন নীতি** (open market policy) : (ক) খোলাবাজারী লেনদেন কাকে বলে : 'খোলাবাজারী লেনদেন' হল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা সরকারী ঋণপত্র বেচাকেনার ব্যবস্থা।

(খ) খোলাবাজারী লেনদেন কিভাবে ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে : কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পাইকারী হারে সরকারী ঋণপত্র বিক্রি করলে, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির এবং যে সব ব্যক্তির হাতে বিপুল পরিমাণ অলস নগদ তহবিল থাকে তা দিয়ে তারা সুদের লোভে ওই ঋণপত্র কেনে। এর ফলে ব্যাঙ্কগুলি ও জনসাধারণের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে চলে যায় এবং তার পরিবর্তে ঋণপত্রগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের হাতে যায়। ফলে বাজারে নগদ টাকার মোট পরিমাণ কমে যায় এবং ব্যাঙ্কগুলির ঋণ দেবার ক্ষমতা খর্ব হয়। এতে ক্রমে ক্রমে টাকার যোগান, কারবারী কাজকর্ম, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, আয় এবং দামস্তর কমতে থাকে। তাই ঋণের পরিমাণ কমানোর উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী ঋণপত্র বিক্রি করে।

ঋণের যোগান বাড়াতে চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাজার থেকে (আগে বিক্রি-করা) সরকারী ঋণপত্রগুলি কিনে নেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী ঋণপত্র কিনলে, ব্যাঙ্কগুলির ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে সরকারী ঋণপত্রগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে ফিরে আসে, আর নগদ টাকা ব্যাঙ্কগুলির ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের হাতে ফিরে যায়। ফলে দেশের মধ্যে টাকার যোগান বাড়ে এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণ দেবার সামর্থ্য বেড়ে যায়। কারবারীরা তখন বেশি করে ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ বাড়ায়; তাতে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয় ও দামস্তর বাড়ে।

(গ) খোলাবাজারী লেনদেনের সীমাবদ্ধতা : কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে বিক্রি করার মতো ঋণপত্র যথেষ্ট পরিমাণে না থাকলে কিংবা ঋণপত্র কেনার যথেষ্ট ইচ্ছা ব্যাঙ্কগুলির না থাকলে, কিংবা দেশে টাকার বাজারটি সুসংগঠিত না হলে, ঋণপত্র বিক্রি করে দেশে টাকার ও ঋণের যোগান বিশেষ কমানো যায় না, এবং ঋণ নেবার ইচ্ছা কারবারীদের না থাকলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণপত্র নিয়ে দেশে টাকার যোগান বাড়াতে চাইলেও তাতে ঋণের পরিমাণ বাড়ানো যায় না।

(ঘ) ব্যাঙ্করেটের সাথে খোলাবাজারী লেনদেনের তুলনা : (১) ব্যাঙ্করেটের পরিবর্তন করে, ঋণের খরচ বাড়িয়ে কমিয়ে ঋণের পরিমাণ কমানো বাড়ানো হয়। এটি হল ঋণ নিয়ন্ত্রণের পরোক্ষ পদ্ধতি। কিন্তু খোলাবাজারী বেচাকেনার দ্বারা টাকার যোগান কমিয়ে বাড়িয়ে ঋণের ভিত্তিস্বরূপ নগদ টাকার পরিমাণটি কমানো বাড়ানো হলে সেটা হয় ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ পদ্ধতি।

(২) ব্যাঙ্করেটের পরিবর্তনের দ্বারা ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ঋণ কমানো বাড়ানোর উদ্যোগটা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উপর ছেড়ে দেয়। কিন্তু

খোলাবাজারী লেনদেনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের উদ্যোগে সরাসরি টাকার বাজারে হস্তক্ষেপ করে নগদ টাকার পরিমাণ কমায় বাড়ায়।

সুতরাং, ব্যাঙ্করেট নীতির তুলনায় খোলাবাজারী লেনদেন অনেক কম সময়ের মধ্যে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৩. **পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাতের নীতি** (variable reserve ratio policy) : (ক) পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাত কাকে বলে : সবদেশেই আইনত কিংবা রীতিগতভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের চলতি ও মেয়াদী আমানতের নির্দিষ্ট শতাংশ সর্বদা জমা রাখতে বাধ্য হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির চলতি ও মেয়াদী আমানতের ওই জমারাখা নির্দিষ্ট শতাংশটিকে ন্যূনতম সংরক্ষিত অনুপাত বলা হয় (minimum reserve ratio)। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আইনত ঐ ন্যূনতম সংরক্ষিত অনুপাতটি পরিবর্তন করার ক্ষমতা পেলে, ঐ ন্যূনতম সংরক্ষিত অনুপাতটি পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাতে পরিণত হয়।

(খ) পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাতটি কিভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে : সংরক্ষিত অনুপাতটি বাড়ানো হলে, প্রত্যেক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক আগের তুলনায় তার নিজের চলতি ও মেয়াদী জমার বর্ধিত অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে জমা রাখতে বাধ্য হবে। ফলে প্রত্যেকের হাতে ঋণ দেবার মতো টাকার পরিমাণ কমে যাবে। অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণ দেবার সামর্থ্য এবং ঋণের পরিমাণ কমবে। আর সংরক্ষিত অনুপাতটি কমানো হলে, প্রত্যেক ব্যাঙ্ক নিজের চলতি ও মেয়াদী আমানতের আগের তুলনায় কম অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে জমা রাখবে। তাহলে গ্রাহকদের ঋণ দেবার মতো টাকা তাদের হাতে বেশি পরিমাণে থাকেবে। অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণ দেবার সামর্থ্য এবং ঋণের পরিমাণ বাড়বে।

(গ) পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাতের সীমাবদ্ধতা : (১) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে যদি অত্যধিক পরিমাণে নগদ তহবিল থাকে তবে সংরক্ষিত অনুপাতটি বেশি পরিমাণে পরিবর্তন না করে ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। (২) এই পদ্ধতিটির দ্বারা ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্যান্য ঋণদানকারী সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। (৩) যে সব ব্যাঙ্কের হাতে অতিরিক্ত নগদ তহবিল কম থাকে তাদের পক্ষে এই পদ্ধতিটি বেশি অসুবিধা সৃষ্টি করে। (৪) ব্যাঙ্কগুলির হাতে বেশি পরিমাণ সরকারী ঋণপত্র থাকলে, সংরক্ষিত অনুপাতটি বাড়িয়ে তাদের ঋণদান ক্ষমতা কমানো হলেও তারা কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে সরকারী ঋণপত্র বিক্রি করে নগদ টাকা সংগ্রহ করে তাদের ঋণদান ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে।

(ঘ) ব্যাঙ্করেট ও খোলাবাজারী লেনদেনের সাথে পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাতের তুলনা : (১) অন্য দুটি পদ্ধতির তুলনায় পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাত পদ্ধতি অনেক কম সময়ে অনেক বেশি কার্যকর হয়। (২) খোলাবাজারী লেনদেনের

দ্বারা ঋণ নিয়ন্ত্রণে খরচ লাগে। সে খরচটা হল ঋণপত্রের সুদের হার। কিন্তু পরিবর্তনীয় সংরক্ষিত অনুপাতে কোন খরচ নেই। (৩) এই পদ্ধতিটি খোলাবাজারী লেনদেনের চেয়েও অনেক বেশি প্রত্যক্ষ পদ্ধতি।

৪. **উপসংহার:** ঋণের পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতিরই সুবিধা অসুবিধা আছে। এটা এখন সকলেই বুঝতে পেরেছে যে, এই তিনটি পদ্ধতি পরস্পরের বিকল্প নয়, বরং সহায়ক ও পরিপূরক। তাই এখন কম বেশি পরিমাণে তিনটি পদ্ধতিরই একযোগে ব্যবহার হতে দেখা যায়।

৬.১৫. ঋণের গুণগত ও বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
Qualitative & Selective Methods of Credit Control

১. **বিবিধ পদ্ধতি: (ক) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নৈতিক চাপ ও অনুরোধ** (moral suasion): কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চিঠি ও বিজ্ঞপ্তির মারফত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাছে বাঞ্ছনীয়ভাবে ঋণ দেবার জন্য অনুরোধ জানায়।

(খ) ঋণের জামিনের মার্জিন পরিবর্তন (Change of margin requirements): ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত মূল্যবান কোন কিছুর জামিনে ঋণ দিয়ে থাকে এবং জামিনের মূল্যের সমপরিমাণ ঋণ না দিয়ে তার একটি নির্দিষ্ট শতাংশ পর্যন্ত ঋণ দেয়। জামিনের মূল্যের যে শতাংশ হাতে রাখা হয় তাকে বলে 'মার্জিন'। ওই মার্জিন বাড়ালে ঋণের পরিমাণ কমে, মার্জিন কমালে ঋণের পরিমাণ বাড়ে।

(গ) ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশ (fixation of credit ceiling): প্রয়োজন বোধে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক লগ্নিপত্রের জামিনে ঋণদানের সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করে দেয় এবং প্রয়োজনে তা পরিবর্তন করে।

(ঘ) ভোগী-ঋণ নিয়ন্ত্রণ (control of consumer credit): ব্যাঙ্ক-ঋণের সাহায্যে কারবারীরা নানারকম দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যপণ্য (যেমন টি. ভি., রেফ্রিজারেটার, আসবাবপত্র, মোটরগাড়ী ইত্যাদি) কিস্তিবন্দী বা ভাড়াক্রয় শর্তে ভোগীদের কাছে বিক্রি করে। চড়তির বাজারে এই ঋণ কমানোর ও মন্দার বাজারে তা বাড়ানোর দরকার হয়। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ কমানো বা বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কিস্তিবন্দী ও ভাড়াক্রয় শর্তে বিক্রির শর্তাবলী জারি ও পরিবর্তন করে থাকে।

এছাড়াও গুণগত ও বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণের আরও নানা উপায় রয়েছে।

২. **গুণগত ও বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণের সীমাবদ্ধতা:** (ক) যে সব ক্ষেত্রে কারবারী জগতে মোট ঋণের মধ্যে ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ অল্প সে সব ক্ষেত্রে গুণগত ও বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সার্থক হয় না। (খ) এই পদ্ধতির দ্বারা ঋণের অবাঞ্ছিত ব্যবহার বন্ধ করার চেষ্টা করা হলেও তা সুনিশ্চিত করা যায় না। (গ) স্বল্পোন্নত দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সহজে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নির্দেশ বা অনুরোধ মানতে চায় না। মানলেও এমনভাবে তা পালন করে যে তার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে

যায়। (ঘ) এ পদ্ধতির দ্বারা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণের প্রসার রোধ করা গেলেও সর্বক্ষেত্রে তা করা যায় না।

(চ) উপসংহার: গুণগত ও বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সফল করতে হলে তার সাথে পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিও প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়।

৬.১৬. বিকাশমান দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বিশেষ ভূমিকা

Special Role of Central Banks in a Developing Economy

১. উন্নত দেশগুলির পরিণত অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের চিরাচরিত ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সেখানে তার প্রধান কাজ হল, দেশের অর্থনীতির প্রয়োজন অনুসারে ঋণের যোগান দেওয়া, ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা, টাকার মূল্য স্থিতিশীল রাখা ও বিনিময় হার বজায় রাখা।

২. কিন্তু ঐ সব চিরাচরিত কাজকর্ম ছাড়াও বিকাশমান স্বল্পোন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিকে অতিরিক্ত বিশেষ কতগুলি কাজের ভার নিতে হয়। যেমন (ক) তাকে দেশের টাকার বাজার, পুঁজির বাজার এবং আর্থিক অন্তর্কাঠামোটিও গড়ে তুলতে হয়। (খ) অর্থনৈতিক বিকাশে সাহায্য করার জন্য কৃষির উন্নয়ন, শিল্পের বিকাশের উদ্দেশ্যে ঋণের সংস্থান, পুঁজির সংস্থান, কারিগরী পরামর্শদান প্রভৃতি করতে হয়। (গ) অর্থনৈতিক বিকাশের গতিবেগ বৃদ্ধির জন্য টাকার যোগানের প্রয়োজনীয় সংকোচন-সম্প্রসারণ ঘটাতে হয়। (ঘ) স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কার্যসূচী রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে পরিকল্পনার লক্ষ্যের সাথে নিজের কর্মপন্থার সামঞ্জস্য ঘটাতে হয়।

৭ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
INTERNATIONAL TRADE

৭. ১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি
Basis of International Trade

১. একটি দেশ বা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে কোন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি, স্থান, জেলা বা অঞ্চলের, মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময় বা বেচাকেনাকে বলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। আর যে কোন দুটি বা তার বেশি দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর বেচাকেনা বা বিনিময়কে বলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

২. বাণিজ্য হল পণ্য বা সেবা বেচাকেনা বা বিনিময়ের কাজ। বাণিজ্যের উৎপত্তি ঘটে তখনই যখন নিজের চেষ্টায় মানুষ যা উৎপাদন করতে পারে না অথবা যা উৎপাদন করতে গেলে খরচ বেশি পড়ে, তা অন্যের কাছ থেকে সংগ্রহ করার চেষ্টা করে।

৩. সব মানুষের যোগ্যতা, প্রতিভা, কর্মদক্ষতা যেমন এক নয়, তেমনি একটি দেশের সমস্ত অঞ্চলের কিংবা সব দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক উপকরণের প্রকৃতি, পরিমাণ, পুঁজি, কারিগরী জ্ঞান ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও এক নয়। ফলে মানুষ এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমের বিভাগ ও বিশেষীকরণ বা বিশেষায়ণ প্রচলিত হয়েছে। সে কারণে, যেমন প্রত্যেকটি ব্যক্তি, তেমনি এক একটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিভিন্ন দেশও বেছে বেছে শুধু সেই সব দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন করে যেগুলির উৎপাদনে তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সুবিধা সবচেয়ে বেশি। এ সব সুবিধার জন্যই এরা সবচেয়ে কম খরচে সে সব দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে। আর নিজের উৎপন্ন দ্রব্য বা সেবার বিনিময়ে সে অন্যের কাছ থেকে সেই সব সামগ্রী কেনে যা উৎপাদন করা তার পক্ষে সম্ভব নয় কিংবা যা উৎপাদনে তার দক্ষতা, যোগ্যতা, সুবিধা সবচেয়ে কম এবং সে কারণে যা উৎপাদন করতে গেলে উৎপাদন খরচ খরিদ দামের তুলনায় বেশি পড়ে। সুতরাং **শ্রমের বিভাগ বা বিশেষায়ণই হল অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, উভয়েরই ভিত্তি**। এদিক থেকে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে কোন **মুলগত প্রভেদ নেই**।

৪. যে কোন দুটি দেশ (ভারত ও পাকিস্তান) অথবা দুটি মহাদেশ (ইয়োরোপ এবং আফ্রিকা) কিংবা পৃথিবীর দুটি জলবায়ু অঞ্চলের (ক্রান্তীয় এবং নিরক্ষীয় মণ্ডল) প্রত্যেকটির জলবায়ু, প্রাকৃতিক উপকরণ, পুঁজি, শ্রম এবং কারিগরী জ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এর ফলে এদের উৎপাদনের অবস্থার মধ্যেও

বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক দেশেরই দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন সম্ভাবনা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়েছে। এই কারণে, প্রত্যেক দেশে বা দেশের প্রতিটি অঞ্চলে যদি সব রকম দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের চেষ্টা করা হয়, তবে হয় সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে, নয়তো তার খরচ পোষাবে না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কলা শীত-প্রধান ইয়োরোপে তাপনিয়ন্ত্রিত কাঁচের ঘরে যদিও উৎপাদন করা সম্ভব হয়, তাতে যেমন খরচ পড়বে অত্যন্ত বেশি, তেমনি তা হয়তো তেমন স্বাদের হবে না। সুতরাং নিরক্ষীয়, ক্রান্তীয় এবং নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের দেশগুলির পরস্পরের মধ্যে উৎপাদনের সুবিধা ও সম্ভাবনা অনুযায়ী বিশেষায়ণ এবং বাণিজ্য ঘটেই থাকে। তার দরুন একদিকে যেমন পৃথিবীর দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন বাড়ে, তেমনি অন্যদিকে দেশগুলির নিজেদের এবং পরস্পরের উৎপন্ন সামগ্রী ভোগের ক্ষমতা এবং পরিমাণও বাড়ে।

৫. **তুলনামুলক সুবিধা বা তুলনামুলক খরচের নীতি ঃ** বিভিন্ন দেশের উৎপাদনের অবস্থা, দক্ষতা ও সুযোগ সম্ভাবনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বলে তাদের মধ্যে উৎপাদনের সুবিধার বা উৎপাদন খরচের তুলনামূলক পার্থক্য দেখা দেয়। একটি দেশের তুলনায় আরেকটি দেশ হয়তো প্রতিটি দ্রব্যের উৎপাদনে **চূড়ান্ত-ভাবেই** বেশি দক্ষ। এর অর্থ হল, দ্বিতীয় দেশটি প্রথম দেশটির তুলনায় সমস্ত দ্রব্য উৎপাদনেই চূড়ান্তভাবে কম দক্ষ এবং **চূড়ান্তভাবেই** কম সুবিধাসম্পন্ন। কিন্তু, সে-দুটি দেশের মধ্যে বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদনে যদি দক্ষতার **তুলনামূলক পার্থক্য** (বা তুলনামূলক সুবিধা) থাকে, তাহলে চূড়ান্তভাবেই কম দক্ষ বা গরিব দেশটিরও এমন কতকগুলি দ্রব্যের উৎপাদনে **তুলনামুলক সুবিধা** দেখা দেয় যাদের ক্ষেত্রে তার **তুলনামুলক দক্ষতা** সবচেয়ে বেশি। আর যেসব দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তার দক্ষতা কম সেসব ক্ষেত্রে তার **তুলনামুলক অসুবিধা** থাকে। তেমনি, সব বিষয়ে বেশি দক্ষ, ধনী দেশটির কতকগুলি দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে **তুলনামুলক সুবিধা বেশি** এবং অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে **তুলনামূলক সুবিধা কম** বা **তুলনামুলক অসুবিধা বেশী** হয়ে থাকে। ফলে, ধনী এবং গরিব প্রত্যেকটি দেশই কেবল সেই সব দ্রব্য উৎপাদনে বিশিষ্টতা লাভ করে যেসব দ্রব্যের উৎপাদনে তার তুলনামূলক দক্ষতা ও সুবিধা বেশি এবং সে কারণে তুলনামূলক উৎপাদন খরচ কম। সেগুলির বিনিময়ে সে সেই সব দ্রব্য আমদানি করে যাদের উৎপাদনে তার তুলনামূলক দক্ষতা কম এবং তুলনামূলক অসুবিধা বেশি ও সেকারণে তুলনামূলক উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে এবং এর ফলে উভয় দেশেরই লাভ হয়। [মনে রাখতে হবে, 'তুলনামূলক' বা 'আপেক্ষিক' 'শব্দটির দ্বারা এখানে একথাটাই বোঝানো হয়েছে যে, প্রত্যেকটি দেশেরই কিছু কিছু দ্রব্যের উৎপাদনে কতকগুলি নিশ্চিত 'সুবিধা' এবং অন্য কতকগুলি দ্রব্যের উৎপাদনে কতকগুলি নিশ্চিত 'অসুবিধা' থাকে।]

ধরা যাক, দু'টি দেশ আছে। যার মধ্যে একটি ধনী, অন্যটি গরিব। ১ কেজি ধান উৎপাদন করতে ধনী দেশে ১ ঘণ্টার শ্রম লাগে, গরিব দেশে লাগে ৩ ঘণ্টার শ্রম।

১ মিটার কাপড় উৎপাদন করতে ধনী দেশে লাগে ২ ঘণ্টার শ্রম ও গরিব দেশে লাগে ৪ ঘণ্টার শ্রম। তাহলে দেখা যাচ্ছে, গরিব দেশটির তুলনায় ধনী দেশটি ধান ও কাপড় দু'টি দ্রব্যই কম খরচে (শ্রমে) উৎপাদন করতে পারে। অর্থাৎ, ধনী দেশটি গরিব দেশটির তুলনায় চূড়ান্ত-ভাবেই বেশি দক্ষ। (ধান উৎপাদনে ৩ গুণ ও কাপড় উৎপাদনে ২ গুণ বেশি দক্ষ)। কিন্তু তাহলেও, দু'টি দেশের মধ্যে এই দু'টি দ্রব্যের উৎপাদন খরচের তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায়, ধনী দেশটির ধান উৎপাদনে তুলনা-মূলক দক্ষতা ও সুবিধা বেশি এবং কাপড় উৎপাদনে তুলনামূলক দক্ষতা ও সুবিধা কম, এবং গরিব দেশটির কাপড় উৎপাদনে তুলনামূলক দক্ষতা ও সুবিধা বেশি এবং ধান উৎপাদনে তুলনামূলক দক্ষতা ও সুবিধা কম।

সারণি ৭.১

উৎপন্ন দ্রব্য	ধনী দেশ	গরিব দেশ
১ কেজি ধান	১ ঘণ্টা শ্রম	৩ ঘণ্টা শ্রম
১ মিটার কাপড়	২ ঘণ্টা শ্রম	৪ ঘণ্টা শ্রম

কারণ, ১ ঘণ্টার শ্রমে, (অর্থাৎ একই উৎপাদন খরচে) ধনী দেশে ১ কেজি ধান কিংবা ০·৫ মিটার কাপড় উৎপন্ন হয়; সুতবাং ধনী দেশে ১ কেজি ধানের দাম = ০·৫ মিটার কাপড়। যদি গরিব দেশের সাথে ধনী দেশের বাণিজ্য না হয়, তাহলে ধনী দেশে ধান ও কাপড়ের মধ্যে বিনিময় হার হবে, ১ কেজি ধান = ০·৫ মিটার কাপড়। কিন্তু গরিব দেশে ১ ঘণ্টার শ্রমে (অর্থাৎ একই উৎপাদন খরচে) ৩৩৩ গ্রাম ধান কিংবা ০·২৫ মিটার কাপড় উৎপন্ন হয়। সুতবাং এখানে, ১ কেজি ধানের দাম = ০·৭৫ মিটার কাপড়। যদি ধনী দেশের সাথে গরিব দেশের বাণিজ্য না হয়, তাহলে গরিব দেশে ধান ও কাপড়ের বিনিময় হার হবে, ১ কেজি ধান = ০·৭৫ মিটার কাপড়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, গরিব দেশের তুলনায় ধনী দেশে ধান সস্তা, (কারণ, গরিব দেশে ১ কেজি ধান কিনতে গেলে ০·৭৫ মিটার কাপড় লাগে, কিন্তু ধনী দেশে তা ০·৫ মিটার কাপড় দিলেই পাওয়া যায়)। তেমনি দেখা যাচ্ছে, ধনী দেশের তুলনায় গরিব দেশে কাপড় সস্তা (কারণ, ধনী দেশে ১ কেজি ধান দিলে মাত্র ০·৫ মিটার কাপড় পাওয়া যায়, কিন্তু গরিব দেশে ১ কেজি ধানের বিনিময়ে ০·৭৫ মিটার কাপড় পাওয়া যায়)।

অতএব, ধনী দেশ (কাপড় উৎপাদন না ক'রে) যদি শুধু ধান উৎপাদন করে ও গরিব দেশ (ধান উৎপাদন না ক'রে) যদি শুধু কাপড় উৎপাদন করে, এবং ধনী দেশটি যদি ধানের বিনিময়ে গরিব দেশের কাছ থেকে কাপড় কেনে, তাহলে উভয়েরই লাভ হবে। কারণ তাহলে, ধনী দেশ গরিব দেশের কাছ থেকে ১ কেজি ধানের বদলে ০·৫ মিটারের বেশি কাপড় কিনতে পাববে এবং গরিব দেশ ধনী দেশের কাছ থেকে ০·৭৫ মিটারের কম কাপড় দিয়ে ১ কেজি করে ধান কিনতে পারবে।

সুতরাং, পৃথিবীর যে কোন দু'টি দেশের বা দু'টি অঞ্চলের মধ্যে একটি দেশ বা অঞ্চল সব দ্রব্য উৎপাদনে অন্যটির চেয়ে চূড়ান্তভাবেই বেশি দক্ষ হোক বা না হোক, তাদের প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজের তুলনামূলক সুবিধা বা সর্বাধিক তুলনামূলক দক্ষতা অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনে বিশিষ্টতা অর্জন করে তাহলে তা উভয়ের পক্ষেই লাভজনক হবে। এই হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিখ্যাত **তুলনামূলক সুবিধা বা আপেক্ষিক খরচের তত্ত্ব**। প্রখ্যাত অর্থবিজ্ঞানী **ডেভিড রিকারডো** হলেন এর প্রবক্তা। এই নীতিটিই হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের **ভিত্তি**।

৭.২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ
Gains from International Trade

১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে, বাণিজ্যে লিপ্ত দুই দেশের মানুষেরই আয় বাড়ে। (আমাদের আগের দৃষ্টান্তে, ধনী দেশের শ্রমিক ১ দিনের শ্রমের দ্বারা আগে যতটা ধান পেত তা ত কিনতে পারবেই, উপরন্তু, আগে একদিনের শ্রমে সে যতটা কাপড় কিনতে পারতো, এখন তার চেয়ে খানিকটা বেশি পাবে। গরিব দেশের শ্রমিকও ১ দিনের শ্রমে আগে যতটা কাপড় কিনতে পারতো এখন সে পরিমাণ কাপড় ত কিনতে পারবেই, উপরন্তু আগের চেয়ে কিছুটা বেশি ধানও কিনতে পারবে।)

২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে শ্রমিক ও দেশবাসী আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করতে পাবে। কারণ সস্তায় বিদেশী দ্রব্য আমদানি করা যায়।

৩. দুই দেশই বিশেষায়ণ দ্বারা আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে বিশিষ্ট দ্রব্যগুলি উৎপাদন করতে পারে। ফলে পৃথিবীর দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন বাড়ে।

৪. আয় ও ভোগ বৃদ্ধির ফলে দেশবাসীর কল্যাণ বাড়ে, জীবনযাত্রার মান বাড়ে।

৭.৩. বাণিজ্যের হার
Terms of Trade

১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হল আসলে আমদানী পণ্যের সাথে রপ্তানী পণ্যের বিনিময়। আমদানী পণ্যের দাম রপ্তানী পণ্যের দ্বারাই শোধ করতে হয়। এক একক দেশী পণ্যের বিনিময়ে যে ক'টি একক বিদেশী পণ্য পাওয়া যায়, অর্থাৎ, **যে হারে রপ্তানির সাথে আমদানির বিনিময় হয়,** তাকে বলে বাণিজ্যের হার।

২. বাণিজ্যের হার নির্ভর করে দু'টি বিষয়ের উপর ঃ (ক) দু'টি দেশে দু'টি পণ্যের উৎপাদন খরচের অনুপাত ; (খ) দুই দেশের পরস্পরের কাছে পরস্পরের পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা।

(ক) উৎপাদন খরচের অনুপাত ঃ আমাদের আগের দৃষ্টান্তে, ধনী দেশটিতে ১ ঘণ্টার শ্রমে ১ কেজি ধান ও ২ ঘণ্টার শ্রমে ১ মিটার কাপড় উৎপন্ন হয়। সুতরাং তার ধান ও কাপড়ের উৎপাদন খরচের অনুপাত হল $\frac{1}{2}$: ১ (অর্থাৎ

এক কেজি ধানের উৎপাদন খরচ হল এক মিটার কাপড়ের উৎপাদন খরচের তুলনায় অর্ধেক) আর গরিব দেশটিতে ৩ ঘণ্টার শ্রমে ১ কেজি ধান ও ৪ ঘণ্টার শ্রমে ১ মিটার কাপড় উৎপন্ন হয়। সুতরাং তার ধান ও কাপড়ের উৎপাদন খরচের অনুপাত হল $\frac{৩}{৪}$: ১ (অর্থাৎ এক কেজি ধানের উৎপাদন খরচ হল এক মিটার কাপড়ের উৎপাদন খরচের তিন-চতুর্থাংশ)। তাই ধনী দেশটিতে ১ কেজি ধানের বিনিময়ে আধ মিটার কাপড় কিংবা ২ কেজি ধানের বিনিময়ে ১ মিটার কাপড় পাওয়া যায়। এটা হল, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য না হলে, ধনী দেশটিতে ধান ও কাপড়ের মধ্যে বিনিময় হার এবং তা হল ধান ও কাপড়ের উৎপাদন খরচের অনুপাতের বিপরীত। তেমনি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য না হলে, গরিব দেশটিতে ধান এবং কাপড়ের বিনিময় হার হবে ১ কেজি ধান : ০·৭৫ মিটার কাপড় কিংবা ১ কেজি ৩৩৩ গ্রাম ধান : ১ মিটার কাপড়। দু'টি দেশে ধান ও কাপড়ের উৎপাদনের খরচের অনুপাতের পার্থক্য থেকেই ধান ও কাপড়ের বিনিময় হারের এই পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। দুটি দেশের মধ্যে ধান ও কাপড়ের উৎপাদন খরচের এই তুলনামূলক পার্থক্যের ফলেই কিন্তু এদের মধ্যে বাণিজ্যের সুযোগও দেখা দিয়েছে। এ থেকে দেখা যাচ্ছে, ধনী দেশে ধান উৎপাদনের খরচ তুলনামূলকভাবে কম এবং কাপড়ের উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি ; গরিব দেশে ধানের উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি ও কাপড়ের উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভাবে কম। সুতরাং, ধনী দেশটি কেবল ধান উৎপাদন করে বাড়তি ধানের বিনিময়ে গরিব দেশটি থেকে কাপড় কিনলে এবং গরিব দেশটি কেবল কাপড় উৎপাদন করে বাড়তি কাপড়ের বিনিময়ে ধনী দেশটি থেকে ধান কিনলে, উভয়েই লাভবান হবে। কিন্তু তাদের মধ্যে ধান ও কাপড়ের বিনিময়টা কি হারে ঘটবে ? অর্থাৎ বাণিজ্যের হারটা কি হবে ? ধনী দেশে ১ কেজি ধান = ০·৫ মিটার কাপড়/গরিব দেশে ১ কেজি ধান = ০·৭৫ মিটার কাপড়।

(খ) **পরস্পরের পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা :** বিনিময় অর্থাৎ বাণিজ্যের হারটা কোথায় এসে দাঁড়াবে তা নির্ভর করবে ধনী দেশে কাপড়ের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর এবং গরিব দেশে ধানের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। ধনী দেশে কাপড়ের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার তুলনায় গরিব দেশে ধানের চাহিদা যদি কম স্থিতিস্থাপক হয় তাহলে, বাণিজ্যের হারটা ধনী দেশের পক্ষে বেশি সুবিধাজনক হবে এবং গরিব দেশে ১ কেজি ধানের বিনিময়ে যতটা কাপড় পাওয়া যায় (১ কেজি ধান = ০·৭৫ মিটার কাপড়) বাণিজ্যের হারটা তার কাছাকাছি হবে (ধরা যাক, ১ কেজি ধান = ০·৭ মিটার কাপড়)। আর, গরিব দেশের ধানের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার তুলনায় ধনী দেশের কাপড়ের চাহিদা যদি কম স্থিতিস্থাপক হয় তাহলে বাণিজ্যের হারটা গরিব দেশের পক্ষে বেশি সুবিধাজনক হবে এবং ধনী দেশে ১ কেজি ধানের বিনিময়ে যতটা কাপড় পাওয়া যায় বাণিজ্যের হারটা তার কাছাকাছি হবে (ধরা যাক, ১ কেজি ধান = ০·৬ মিটার কাপড়)।

৭. ৪. অবাধ বাণিজ্য বনাম সংরক্ষণ
Free Trade vs. Protection

১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দু'রকমের নীতি দেখা যায়: (ক) অবাধ বাণিজ্য নীতি এবং (খ) সংরক্ষণ বা সরকার নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য নীতি।

২. **অবাধ বাণিজ্য:** অবাধ বাণিজ্য হল, সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত বিধিনিষেধহীন অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীরা এরকম বাণিজ্য নীতির প্রবল ও উৎসাহী সমর্থক।

অবাধ বাণিজ্যের সুফল: (ক) **এতে শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণ বাড়ে**—বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক উপকরণাদি ও সুযোগ সুবিধার বণ্টন সমান নয়। বিভিন্ন দেশ আপন আপন সুযোগ-সুবিধা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদনের দ্বারা নিজেদের উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করতে পারে। পরস্পরের দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময় দ্বারা উপাদান বণ্টনের বৈসম্য দূর করতে পারে। ফলে প্রত্যেকটি পণ্য সর্বনিম্ন খরচে উৎপাদিত হতে পারে।

(খ) **সর্বাধিক উৎপাদন**—অবাধ বাণিজ্য আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণ বৃদ্ধির দ্বারা দ্রব্যসামগ্রীব উৎপাদন সর্বাধিক করতে পারে। ফলে বৃহদায়তনে উৎপাদন সম্ভব হয় ও শিল্পে স্থানীকরণ বাড়ে। সকল দেশে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন ও চাহিদাব বৃদ্ধির দরুন কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ে।

(গ) **দামের সমতা**—উপাদানগুলির দেশগত সচলতার অভাব সত্ত্বেও অবাধ বাণিজ্যের বিস্তারের ফলে পৃথিবীব বিভিন্ন দেশের বাজারগুলির পার্থক্য কমে গিয়ে দামেব পার্থক্য কমে যায়।

(ঘ) **ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের লাভ**—অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক্রেত ও বিক্রেতা দু'জনেই লাভবান হয়। আমদানিকারীরা সর্বনিম্ন দামে কিনতে পারে এবং রপ্তানিকারীরা সর্বাধিকসম্ভব দামে বেচতে পারে।

(ঙ) **ভোগ ও তৃপ্তির সর্বাধিক বৃদ্ধি**—অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা দেশের দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনের সর্বাধিক বৃদ্ধি সম্ভব হয়। এতে সর্বনিম্ন দামে সেগুলি পাওয়া সম্ভব হয় বলে সর্বত্র ভোগের ও তৃপ্তির পরিমাণ সর্বাধিক হয়। দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানেরও ক্রমোন্নতি ঘটে।

(চ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সুবিধাও বিভিন্ন দেশ ভোগ করে। সংস্কৃতির পারস্পরিক আদান-প্রদান বৃদ্ধিতে শান্তি ও ঐক্যের শক্তিগুলি পুষ্ট হয় এবং রাজনৈতিক মনোমালিন্য ও উত্তেজনা কমে।

অবাধ বাণিজ্যের ত্রুটি: (ক) **ভারসাম্যহীন অর্থনীতিক বিকাশ**—অবাধ বাণিজ্যে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণ অনুসারে প্রত্যেক দেশে কেবল সর্বাধিক সুবিধাবিশিষ্ট মুষ্টিমেয় শিল্পের উন্নয়ন ঘটে। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিক বিকাশ ঘটে না। বিশেষ সুবিধা আছে এ যুক্তিতে কোন দেশ কেবল শিল্পে আর

কোন দেশ কেবল কৃষিতে আত্মনিয়োগ কবলে তাদের অর্থনীতির সমস্ত অঙ্গ সমান পুষ্ট হয় না।

(খ) **অত্যধিক পারস্পরিক নির্ভরতা**—অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেব বাজার ও দেশীয় অর্থনীতিগুলি এত বেশি পরস্পর নির্ভবশীল হয়ে পড়ে যে, তাতে এক দেশেব চড়তি, মন্দা এবং সংকট সহজেই অন্য দেশে সংক্রামিত হয়। তা ছাড়া অত্যধিক পরনির্ভরশীলতা যুদ্ধকালে গভীব বিপদ ঘটাতে পাবে।

(গ) **দেশীয় শিল্পের উন্নতিতে বাধা**—অবাধ বাণিজ্যনীতিতে সস্তা বিদেশী পণ্যেব আমদানিব দরুন দেশের পুরাতন শিল্পগুলি যেমন নষ্ট হতে পাবে তেমনি দেশীয় শিল্পেব উন্নতিতেও বাধা ঘটতে পাবে।

তবে, অবাধ বাণিজ্যের অপকাবেব তুলনায় উপকাবই বেশি। এজন্য বিভিন্ন দেশ অবাধ বাণিজ্যনীতি পবিত্যাগ কবলেও, সকলেই দীর্ঘকালীন লক্ষ্য বলে ঐ বাণিজ্য-নীতিকেই মেনে নিয়েছে। পৃথিবীব বর্তমান জটিল পবিস্থিতিতে সম্পূর্ণ অবাধ বাণিজ্য অসম্ভব হলেও, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধগুলি যথা সম্ভব কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৩ **সংরক্ষণ নীতি ঃ** সরকাবী হস্তক্ষেপেব দ্বাবা বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণেব নীতিকে সংরক্ষণ নীতি বলে। (১) **আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করে, (২) আমদানির পরিমাণ সীমাবদ্ধ ক'রে, (৩) মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ক'রে, (৪) দেশীয় মুদ্রা-বিনিময়ের একাধিক হার ধার্য ক'রে, আমদানির উপর অতিরিক্ত কর ধার্য ক'রে** দেশের সরকাব বৈদেশিক বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করে ও আমদানি নিয়ন্ত্রণ করে।

দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রতিযোগী বিদেশী পণ্যেব আমদানি বন্ধ কিংবা হ্রাস করাব উদ্দেশ্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিদেশী পণ্যেব উপর যে শুল্ক ধার্য হয় তাই হল সংরক্ষণ শুল্ক। একে শুল্ক প্রাচীরও বলে। **দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে শুল্কনীতির এইরূপ প্রয়োগকে (শিল্প) সংরক্ষণনীতি বলা হয়।**

(ক) **সংরক্ষণের সমর্থনে গুরুত্বপুর্ণ অর্থনৈতিক যুক্তি ঃ** (১) **স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ**—অর্থনৈতিক বিকাশ লাভ কবতে গিয়ে যে কোন দেশকে অর্থনৈতিক বিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয়। এই সময়ে সংবক্ষণের সুবিধা তার পক্ষে প্রয়োজন হয়। বিকাশেব প্রথম স্তরে দেশটি যখন কৃষিপ্রধান থাকে, তখন তাকে খাদ্যশস্য ও কৃষিজাত দ্রব্যের বিনিময়ে শিল্প-জাত দ্রব্যাদি আমদানি করতে হয়। এই পর্যায়ে সংরক্ষণ তার পক্ষে ক্ষতিকব। অর্থনৈতিক বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন দেশীয় শিল্প সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হতে আরম্ভ করে (শিল্পের শৈশব) তখন অত্যধিক বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে তাদের রক্ষার জন্য সংরক্ষণ নীতি দরকার হয়। অর্থনৈতিক বিকাশের তৃতীয় স্তরে যখন

দেশের অধিকাংশ প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেশীয় শিল্পের দ্বারা উৎপন্ন হতে থাকে তখনও সংরক্ষণ নীতি শিল্পগুলির বিকাশে সহায়ক হতে পারে। তবে দেশীয় শিল্পগুলি শক্তি সঞ্চয় করেছে বলে অতি সতর্কভাবে সংরক্ষণের পরিমাণ কমাতে ও সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। অর্থনীতিক বিকাশের চতুর্থ ও সর্বোচ্চ পর্যায়ে যখন দেশ যন্ত্রশিল্পজাত পণ্য ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করতে আরম্ভ করে এবং বিদেশী প্রতিযোগিতা তার শিল্পগুলির উন্নতিতে বাধা দিতে পারে না, তখন তার সংরক্ষণের প্রয়োজন আর থাকে না। তখন সংরক্ষণনীতি প্রত্যাহার করাই উচিত।

(২) **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি :** দেশে মন্দা দেখা দিলে কর্মসংস্থান ও জাতীয় আয় কমে। আবার দেশে যখন নিয়োগ বাড়ে তখন তার সাথে উৎপাদন এবং আয়ও বাড়ে। সুতরাং দেশে কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির জন্য সংরক্ষণনীতি প্রয়োজন হয়। এর যুক্তি হল, সংরক্ষণের দরুন আমদানি কমলে দেশীয় পণ্যের চাহিদা বাড়বে এবং তাতে দেশে কর্মসংস্থান ও আয় বাড়বে।

তত্ত্বগতভাবে সংরক্ষণ দ্বারা নিয়োগ বৃদ্ধির যুক্তি সঠিক হলেও, বাস্তবে কিন্তু বিপরীত ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ এক দেশ এই পথ গ্রহণ করলে পাল্টা ব্যবস্থারূপে অন্য দেশেরও সংরক্ষণের আশ্রয় গ্রহণ করার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। সব দেশ এই পথ অনুসরণ করলে শেষে প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ স্বনির্ভরতা লাভের চেষ্টা করবে। এর একমাত্র ফল হবে প্রত্যেক দেশেরই বৈদেশিক বাণিজ্য অত্যন্ত কমবে। তার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও অত্যন্ত কমবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণের অবসান ঘটবে। এ রকম হলে প্রত্যেক দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(৩) **বিদেশী রপ্তানিকারীদের দ্বারা জলের দামে দেশে পণ্যবিক্রয় (বা ডাম্পিং) প্রতিরোধ :** বিদেশী রপ্তানিকারীরা অত্যন্ত কম দামে (উৎপাদন-খরচ অপেক্ষাও) তাদের পণ্য কোন দেশে বিক্রি করার চেষ্টা করলে সংরক্ষণনীতির দ্বারা তা প্রতিরোধ করার কিছুটা সার্থকতা আছে। কিন্তু এরও উপযোগিতা সীমাবদ্ধ। এরূপ ক্ষেত্রে সংরক্ষণনীতির উদ্দেশ্য থাকে শুল্ক ধার্য করে ঐ বিদেশী পণ্য ও দেশীয় পণ্যের দামের মধ্যে পার্থক্য দূর করা। এই নীতি ও যুক্তির সার্থকতা নির্ভর করবে ডাম্পিং নীতি কোন ধরনের তার উপর। যদি তার পশ্চাতে এই উদ্দেশ্য থাকে যে, সাময়িকভাবে সস্তায় পণ্য বেচে বিদেশী বাজারে প্রতিযোগীদের উচ্ছেদ করে বিদেশী রপ্তানিকারী একচেটিয়ামূলক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে দাম বাড়িয়ে দেবে, তখন সেটা হবে আগ্রাসী ডাম্পিং। এ ধরনের ডাম্পিং-এর বিরুদ্ধে সংরক্ষণ-ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করবে।

(৪) **সংরক্ষণ নীতির সমর্থনে অন্যান্য যুক্তি :** (১) **জাতীয় প্রতিরক্ষা :** দেশের প্রতিরক্ষা শক্তি বৃদ্ধির জন্য সামরিক দ্রব্য এবং যুদ্ধের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের শিল্পগুলি (জাহাজ শিল্প, খনিজ তৈলশিল্প ইত্যাদি) যে কোন

খরচে দেশে স্থাপন করা ও তাদের উন্নয়নের চেষ্টা করা প্রয়োজন, এই যুক্তিতে এই শিল্পগুলির সংরক্ষণের দাবি করা হয়। কারণ অবাধ বাণিজ্য চললে অপেক্ষাকৃত কম দামে এই সব দ্রব্যের আমদানি সম্ভব হলে, দেশে এই প্রকারের শিল্পগুলি প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না এবং তাতে প্রতিরক্ষা ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়বে।

দেশের প্রতিরক্ষা-শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অর্থবিজ্ঞানীদের দ্বিমত না থাকলেও তাঁদের বক্তব্য হল, প্রতিরক্ষা-শিল্প ও অন্যান্য সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের উন্নয়নের জন্য শুল্ক-প্রাচীর নির্মাণের পরিবর্তে ঐ সকল শিল্পে ভরতুকি দানের ব্যবস্থাটি বেশি সুবিধাজনক। এ বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বিদেশী পণ্যের তুলনায় দেশীয় পণ্যের উৎপাদন খরচ বেশি বলে দেশীয় পণ্য বিদেশী পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে না। এ জন্যই শুল্কপ্রাচীর সৃষ্টি করতে হয়, অর্থাৎ আমদানির উপর শুল্ক ধায করতে হয়। এতে দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়ে বটে, তবে আমদানি করা পণ্য যে দামে ভোগীরা কিনতে পারত, দেশীয় পণ্য তার থেকে বেশি দামে তাদের কিনতে হয়। সংরক্ষিত দেশীয় শিল্পগুলির উৎপাদন খরচ বেশি, তাই তাদের উৎপন্ন পণ্যের দামও বেশি হতে বাধ্য। এতে দেশের সাধারণ দামস্তরে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শুল্ক প্রাচীর নির্মাণ করে শিল্পের সংরক্ষণ করা হলে এ বিপদের সম্ভাবনা থেকেই যায়। পক্ষান্তরে, ভরতুকি দিলে দেশীয় শিল্পের বেশি-খরচে-উৎপন্ন পণ্য কম দামে বিক্রয় করা সম্ভব হয়। এমন কি বিদেশে তা রপ্তানিও করা যেতে পারে। তা ছাড়া, প্রতিরক্ষা ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলির উন্নয়নে রাজকোষ থেকে ভরতুকি বাবদ কত ব্যয় হচ্ছে সেটারও যেমন পরিমাপ করা যায় তেমনি ঐ ধরনের ব্যয় কতটা যুক্তিযুক্ত তাও বিচার করা সম্ভব হয়।

(২) **রাজনীতিক স্বার্থ ঃ** অনুরূপভাবে দেশের 'জাতীয় স্বার্থের' নামে কোন সাময়িক রাজনীতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কোন বিদেশী দ্রব্যের আমদানির উপর শুল্ক ধার্যের দাবি করা হতে পারে। এর ফলে উৎপাদন খরচের আপেক্ষিক সুবিধার বিধিটি অস্বীকার করে যে সকল শিল্পে সংরক্ষণ দেওয়া হবে তাতে উৎপাদন খরচ বেশি হবে এবং তাতে শুধু দেশের উপকরণের সর্বাধিক-বাঞ্ছিত বণ্টনের বিকৃতি ঘটবে তা নয়, সম্পূর্ণ অনাবশ্যকভাবে দেশীয় ভোগীদের উপর বেশি দামের আকারে এক গুরুতর আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে। এতে দেশের অর্থনীতির ক্ষতি হতে পারে। এর কারণ হল, সংরক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পে উৎপাদন ব্যয় বেশি হবে, উৎপাদন ব্যয়ের আপেক্ষিক সুবিধার বিধি হয়ত লঙ্ঘিত হবে, দেশের উপকরণের সর্বাধিক-বাঞ্ছিত বণ্টন সম্ভব হবে না, সংরক্ষিত শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যের দাম বাড়বে, আর, এ বর্ধিত দামের অনাবশ্যক বোঝা ভোগীদের বহন করতে হবে। বরং, যদি এরূপ ক্ষেত্রে জনমত প্রবল হয় তবে সংরক্ষণের পরিবর্তে ভরতুকি দানের ব্যবস্থা দ্বারা সংশ্লিষ্ট

দেশীয় শিল্পকে উন্নয়নের পরীক্ষামূলক সুযোগ দেওয়া যেতে পারে, এবং তাও নির্দিষ্ট কালের বেশি হওয়া অনুচিত।

উপসংহার : (অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ নীতির পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি বিচার করে দেখলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় যে, ওই দু'টি বাণিজ্যনীতির মধ্যে অবাধ বাণিজ্যনীতিই শ্রেষ্ঠ। কারণ, তাতে দক্ষতা বাড়ে, উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণ সর্বাধিক হয় ও সবচেয়ে কম খরচে উৎপাদন ঘটে, সবচেয়ে কম দামে ভোগীরা দ্রব্যসামগ্রী কিনতে ও ভোগ করতে পারে এবং উৎপন্ন সামগ্রীগুলি গুণে সর্বোৎকৃষ্ট হয়।

কিন্তু অবাধ বাণিজ্যের ঐ সব সুবিধা দেখা দেবে তখনি, যখন প্রতিযোগী দেশগুলির অবস্থা সমরূপ এবং তাদের উপাদান ও পণ্যের বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতার সমস্ত অবস্থাই বর্তমান রয়েছে। বাস্তবে তা নেই বলেই অবাধ বাণিজ্যের সুবিধাগুলি কেবল উন্নত দেশগুলিই ভোগ করে, তাদের অর্থনীতিক উন্নতির পথে তারা দ্রুত এগিয়ে যেতে পাবে আর পশ্চাৎপদ দেশগুলি অবাধ বাণিজ্যের সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত হয় ও তাদের অর্থনীতিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়। তাই অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে সাময়িকভাবে কিছুকাল সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকে না। তবে, আধুনিক অর্থনীতিবিদদের অভিমত এই যে, বিদেশী পণ্য আমদানির উপব শুল্ক ধার্য করে সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগের পরিবর্তে, কর ব্যবস্থা ও সরকারের আর্থিক ও ফিসক্যাল ব্যবস্থার দ্বাবা দেশীয় শিল্পগুলিকে সাহায্য করা হলে, আরও ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে।

৭.৫. বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত
Balance of Trade

১. কোন একটি বৎসরে দেশের শুধু দ্রব্যসামগ্রীর (সেবা নয়) মোট আমদানির মূল্য ও মোট রপ্তানির মূল্য পরস্পরের সমান হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। যদি তা পবস্পবের সমান হয়, তবে দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি ও রপ্তানির **ভারসাম্য** ঘটেছে বলা হয়। আর তা যদি না হয়. যদি দ্রব্যসামগ্রীর মোট আমদানির মূল্য মোট রপ্তানির চেয়ে বেশি বা কম হয়, তা হলে বলা হয় **বাণিজ্যের** ভারসাম্যের অভাব বা **উদ্বৃত্ত** ঘটেছে। সুতরাং বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত বললে দেশের দ্রব্যসামগ্রীর **মোট আমদানির মূল্য ও মোট রপ্তানির মূল্যের পার্থক্য** বোঝায়।

২. দ্রব্যসামগ্রীর মোট আমদানির মূল্য যদি দ্রব্যসামগ্রীর মোট রপ্তানির মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে **বাণিজ্যের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি** হয়েছে বোঝায়। এর দরুন অন্যান্য দেশের কাছে দেনা জন্মায়।

আর, দ্রব্যসামগ্রীর মোট রপ্তানির মূল্য যদি দ্রব্যসামগ্রীর মোট আমদানির মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে **বাণিজ্যের অনুকূল উদ্বৃত্ত** হয়েছে বোঝায়। এজন্য অন্যান্য দেশের কাছে পাওনা জন্মায়।

৫. দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি ও রপ্তানিকে বলে **দৃশ্য আমদানি** ও **দৃশ্য রপ্তানি** (কারণ, দ্রব্যসামগ্রী চোখে দেখা যায়)। এজন্য বাণিজ্যের উদ্বৃত্তকে **দৃশ্য উদ্বৃত্ত**-ও বলে।

৭.৬. লেনদেনের উদ্বৃত্ত
Balance of Payments

১. বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অন্যান্য আর্থিক লেনদেন চলে তার ফলে এক দেশের যেমন আর এক দেশের কাছে পাওনা জন্মায়, তেমনি দেনাও জন্মায়। অন্যান্য দেশের কাছে প্রত্যেকটি দেশের মোট পাওনার ও মোট দেনার পার্থক্যটাকে বলে আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্ত। এটাকে আন্তর্জাতিক লেনদেনে একটা দেশের মোট আয় ও ব্যয়ের হিসাব বলে গণ্য করা যেতে পারে।

২. বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের মতই আন্তর্জাতিক লেনদেনে কোন একটি বৎসরে পাওনা (বা আয়) এবং দেনা (বা খরচ) পরস্পরের সমান হতে পারে; এরকম হলে, তাকে **আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য** বলে। আন্তর্জাতিক লেনদেনে পাওনার (বা আয়ের) চেয়ে দেনা (বা খরচ) বেশি হতে পারে; তাকে বলে আন্তর্জাতিক **লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত** বা **ঘাটতি** (−)। আন্তর্জাতিক লেনদেনে পাওনার (বা আয়ের) চেয়ে দেনা (বা খরচ) কম হতে পারে; তাকে বলে আন্তর্জাতিক **লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত** (+)।

৩. দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি-রপ্তানি হল **দৃশ্য** আমদানি-রপ্তানি। এজন্য যেমন প্রতি বৎসর অন্যান্য দেশের কাছে প্রত্যেক দেশের পাওনা (অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত) বা দেনা (প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত) জন্মায়, ঠিক তেমনি, অন্যান্য দেশের কাছ থেকে সেবা কিনলে কিংবা তাদের কাছে সেবা বেচলে, প্রত্যেক দেশের দেনা বা পাওনা জন্মায়। দেশী পুঁজি বিদেশে খাটলে দেশের যেমন সুদ ও লভ্যাংশ পাওনা হয় তেমনি বিদেশী পুঁজি দেশে খাটলে বাইরের দেশগুলিকে সুদ ও লভ্যাংশ দিতে হয়। বিদেশী পর্যটক, বিদেশী শিক্ষার্থী, বিদেশী দূতাবাস ভারতে যে খরচ করে সে খরচ আমাদের আয়; আবার তেমনি বিদেশে ভারতীয় পর্যটক, শিক্ষার্থী ও ভারতীয় দূতাবাস যা ব্যয় করে সেটা ভারতের দেনা। বিদেশী ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, জাহাজের ও বিমানের সাহায্য নিলে যেমন আমাদের খরচ বা দেনা হয়, তেমনি বিদেশীরা আমাদের ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, জাহাজ ও বিমানের সাহায্য নিলে আমাদের আয় বা পাওনা হয়। এগুলি হল সেবা বেচাকেনা বা সেবা আমদানি-রপ্তানির দৃষ্টান্ত। সেবা চোখে দেখা যায় না বলে, এ বাবদ আমদানি-রপ্তানিকে বলে **অদৃশ্য আমদানি-রপ্তানি**। অদৃশ্য আমদানি-রপ্তানির পার্থক্যকে বলে **অদৃশ্য** আমদানি-রপ্তানির **উদ্বৃত্ত**।

৪. কোন বৎসরে দেশের বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত বা **দৃশ্য উদ্বৃত্ত ও অদৃশ্য উদ্বৃত্তের নীট ফলটিকে বলে আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্ত**। একই বৎসরে এদের

দু'টিই অনুকূল হতে পারে, দু'টিই প্রতিকূল হতে পারে, কিংবা এদের একটি অনুকূল ও অন্যটি প্রতিকূল হতে পারে।

৭. ৭. আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য
Equilibrium of Balance of Payments

১. আন্তর্জাতিক লেনদেনের বার্ষিক উদ্বৃত্ত অনুকূল হতে পারে, প্রতিকূলও হতে পারে। কিন্তু, অনুকূল (ক্রেডিট ব্যালান্স) কিংবা প্রতিকূল (ডেবিট ব্যালান্স), যাই হোক না কেন, হিসাবের উল্টো দিকটাতে তার সমপরিমাণ বিপরীত লেনদেন দ্বারা হিসাবের জমা ও খরচ, দুই দিকই সমান হবে। অর্থাৎ, প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হলে, (ক) হয় সেটা বিদেশের কাছে দেনা হিসাবে থাকবে; (খ) নয়তো অন্য কোথাও থেকে ধার নিয়ে তা শোধ করা হবে; (গ) কিংবা বিদেশে নিজেদের পুঁজি লগ্নি করা থাকলে তা বিক্রি করে সে দেনা শোধ করা হবে; অথবা, (ঘ) সোনা বিক্রি করে তা শোধ করা হবে। তেমনি, যদি অনুকূল উদ্বৃত্ত হয়, তা (ক) বিদেশে লগ্নি করা হতে পারে; (খ) নয়তো তা দিয়ে সোনা কেনা হতে পারে।

২. সুতরাং আন্তর্জাতিক লেনদেনে কোন বৎসর কোন দেশের প্রতিকূল বা অনুকূল উদ্বৃত্ত হলেও, তার লেনদেনের হিসাবের দু'দিকের সমতা তাতে বজায় থাকে। সেটাকে লেনদেনের হিসাবের **হিসাবপদ্ধতিগত সমতা** বলা যায়। কিন্তু সেটা বিদেশের কাছে দেশের দেনাপাওনার সমতা বা ভারসাম্য বোঝায় না। কারণ কয়েক বৎসর লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হলে তা বিদেশীদের কাছে ঋণ নিয়ে বা সোনা বিক্রি করে মেটালে সাময়িকভাবে দেনাপাওনার সমতা হলেও, তা বেশি দিন চলে না।

৩. **স্নামেল**-এর মতে, আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য বলতে এমন একটা অবস্থা বোঝায় যে, স্বল্পকালীন সময়ে লেনদেনের অনুকূল ও প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ক্রমশ কমে গিয়ে দীর্ঘকালীন সময়ে দেশের সোনা বা বিদেশী মুদ্রার তহবিলের কোন পরিবর্তন ঘটে না। অর্থাৎ **দীর্ঘকালীন সময়ে, শেষ পর্যন্ত অন্যান্য দেশের সাথে লেনদেনে দেশের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ বা দেনা ও পাওনার পরিমাণ পরস্পরের সমান** হবে এবং দেশের সোনার বা বিদেশী মুদ্রার তহবিল বাড়বেও না বা কমবেও না। **কিণ্ডল বার্গারের** মতে লেনদেনের ভারসাম্য বলতে এমন একটি অবস্থা বোঝায় যখন দেশে কর্মহীনতা না ঘটিয়ে আন্তর্জাতিক লেনদেন অক্ষুণ্ন রাখা যায়। সুতরাং আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য স্বল্পকালীন সময়ে দেখা না দিলেও দীর্ঘকালীন সময়ে দেখা দিতে পারে।

৭ ৮. লেনদেন-উদ্বৃত্তের ভারসাম্যহীনতার সংশোধন
Correction of Disequilibrium

কোন দেশের লেনদেন উদ্বৃত্তের ভারসাম্য দেখা দিতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কোন দেশের লেনদেন-উদ্বৃত্ত পর পর দু'তিন বৎসর বা তার পরেও প্রতিকূল হতে পারে। তাতে আতঙ্কিত হতেই হবে এমন কোন কথা

নেই। তবে অবস্থাটা যদি এমন হয় যে বৎসরের পর বৎসর লেনদেন-উদ্বৃত্ত ক্রমাগত প্রতিকূল হচ্ছে এবং তার ফলে দেশের সোনা ও বিদেশী মুদ্রার তহবিল ক্রমশ নিঃশেষিত হচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে আন্তর্জাতিক লেনদেনে নিশ্চিতভাবেই ভারসাম্যের অভাব ঘটেছে। এমনটা হলে, অবিলম্বে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা দরকার হয়ে পড়ে। অর্থাৎ তখন এমন কতকগুলি ব্যবস্থা নিতে হয় যার ফলে, দেশের আমদানি কমে গিয়ে ও রপ্তানি বেড়ে গিয়ে দেশের প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত দূর হবে, এমনকি অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তও দেখা দেবে। এজন্য যে সব ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করতে পারে তা হল :

১. **দেশের মধ্যে টাকার যোগান কমানো** (মুদ্রাসংকোচন) : টাকার যোগান কমলে দেশের মানুষের আর্থিক আয় কমবে এবং তার ফলে দেশের মধ্যে বিদেশী দ্রব্যের চাহিদা কমবে। তাতে আমদানি কমবে। অন্যদিকে জিনিসপত্রের যোগানের তুলনায় টাকার যোগান কম হলে জিনিসপত্রের দামও কমবে। তখন দেশী জিনিস সস্তা হয় বলে বিদেশে তার চাহিদা ও রপ্তানি বাড়তে পারে।

২. **বিদেশী মুদ্রার সাথে দেশের টাকার সরকারী বিনিময় মূল্য কমানো (মুদ্রার অবমূল্যায়ন)** : এর ফলে দেশের টাকায় বিদেশী মুদ্রার দাম বাড়ে ও বিদেশী মুদ্রায় দেশের টাকার দাম কমে। ফলে, একটি বিদেশী মুদ্রায় আগে যত টাকার দেশী পণ্য কেনা যেত, এখন তার চেয়ে বেশি টাকার দেশী পণ্য কেনা যায়। অর্থাৎ বিদেশীদের কাছে দেশের জিনিস সস্তা হয় ও রপ্তানি বাড়ে। অন্যদিকে, বিদেশী মুদ্রায় দেশের টাকার দাম কমেছে বলে আগে দেশের একটি টাকায় যতটা বিদেশী জিনিস কেনা যেত, এখন তার চেয়ে কম কেনা যায়। সুতরাং বিদেশী জিনিসের দাম বাড়ে ও আমদানি কমে।

৩. **বিদেশী মুদ্রার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ** : দেশের বিদেশী মুদ্রার তহবিলটি সরকারের কাছে জমা থাকে। সরকার বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ জারি করে কেবল নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিদেশী পণ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বিদেশী মুদ্রা দেওয়া বন্ধ করতে পারে। ফলে বিদেশী পণ্যের আমদানি কমে।

৪. **আমদানি নিয়ন্ত্রণ** : সরকার বিদেশী পণ্যের আমদানির কোটা স্থির করতে পারে, লাইসেন্স ছাড়া আমদানি বন্ধ করে দিতে পারে, আমদানী পণ্যের উপর চড়া হারে শুল্ক বসাতে পারে। এসব ব্যবস্থার ফলে আমদানির পরিমাণ কমে।

৫. **রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহ দান** : সরকার রপ্তানী পণ্যের উপর শুল্ক কমিয়ে বা তুলে দিয়ে, রপ্তানী পণ্যের জন্য ভরতুকি দিয়ে, রপ্তানী পণ্যের উৎপাদন খরচ কমিয়ে ও তাদের গুণমান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে বিদেশীদের কাছে রপ্তানী পণ্যগুলি দামের ও গুণের দিক দিয়ে আকর্ষণীয় করতে পারে, বিদেশে রপ্তানী পণ্যগুলির প্রদর্শনী ও প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারে। এসব ব্যবস্থার ফলে রপ্তানি বাড়ে।

ভারত সরকার দেশের আমদানি কমাতে ও রপ্তানি বাড়াতে উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলির সবই গ্রহণ করেছে।

৭ ৯. বিদেশী মুদ্রা
Foreign Exchange

১. **বিনিময় হার** (Rate of exchange) : স্বদেশের মুদ্রার একটি এককের বিনিময়ে অন্য দেশের মুদ্রা যে পরিমাণে কিনতে পাওয়া যায়, তাই হল দু'টি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার। সুতরাং মুদ্রার বিনিময় হার হল এক দেশের মুদ্রায় অন্য দেশের মুদ্রার দাম। আমাদের দেশের এক টাকায় যদি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ১৩ সেণ্ট মুদ্রা কিনতে পাওয়া যায়, তাহলে ভারত ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রার বিনিময় হার হবে, ১ টাকা = ১৩ সেণ্ট।

২. **বিদেশী মুদ্রার বাজার** (Foreign exchange market) : যে বাজারে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বেচাকেনা বা বিনিময় করা হয় তাই বিদেশী মুদ্রার বাজার। পণ্যের বাজারে যেমন পণ্য হল ভোগ্যদ্রব্য, উপাদানের বাজারে যেমন পণ্য হল উপাদান-সেবা, তেমনি বিদেশী মুদ্রার বাজারে পণ্য হল বিভিন্ন দেশের মুদ্রা। অন্যান্য বাজারের মতই বিদেশী মুদ্রার বাজারেও চাহিদা এবং যোগানের দ্বারা দাম (অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার) স্থির হয়ে থাকে। যে দু'টি দেশের মুদ্রার মধ্যে বিনিময় ঘটছে, তার একটির চাহিদার তুলনায় যোগান বাড়লে তার দাম (বা বিনিময় হার) কমে এবং যোগানের তুলনায় চাহিদা বাড়লে তার দাম (বা বিনিময় হার) বাড়ে।

৩. **বিনিময়ের ভারসাম্য হার** (Equilibrium rate of exchange) : পণ্য ও উপাদানের বাজারের মতই বিদেশী মুদ্রার বাজারে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের দৈনন্দিন অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠা-নামা ঘটে। বিনিময়ের ঐ দৈনন্দিন হার তাই মুদ্রা বিনিময়ের স্বাভাবিক বা ভারসাম্য হার নয়।

মুদ্রা বিনিময়ের ভারসাম্য হার বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। নার্কসে (Nurkse)-র মতে, মুদ্রার ভারসাম্য বিনিময় হার হল এমন একটি হার, যা একটি নির্দিষ্টকালের মধ্যে বিদেশী লেনদেনের ভারসাম্য বজায় রাখে। স্নামেলের মতে, মুদ্রার ভারসাম্য বিনিময় হার হল সেই হার, যার দরুন, একটি নির্দিষ্টকালে, দেশে পূর্ণ নিয়োগের এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে বা লেনদেনের উদ্বৃত্ত হস্তান্তরের উপর বিধিনিষেধহীন অবস্থায় দেশের সোনার বা বিদেশী মুদ্রার সংরক্ষিত তহবিলে কোন নীট পরিবর্তন ঘটে না। হ্যামের মতে, ভারসাম্য বিনিময় হার হল এমন একটি হার, যার ফলে দেশে কর্মহীনতা বাড়ে না, দেশে অর্থনীতিক স্থিতি বজায় থাকে, দেশের সংরক্ষিত বিদেশী মুদ্রা ও সোনার তহবিলে ঘাটতি হয় না, এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে দেশের কৃত্রিম সুবিধা বা অসুবিধা ঘটে না।

৪. **মুদ্রা বিনিময়ের ভারসাম্য হার নির্ধারণ** (Determination of the equilibrium rate of exchange) : মুদ্রা বিনিময়ের ভারসাম্য হার কি করে

নির্ধারিত হয় সে বিষয়ে তিনটি তত্ত্ব রয়েছে: (ক) স্বর্ণমান তত্ত্ব; (খ) ক্রয় ক্ষমতার সমতার তত্ত্ব; এবং (গ) লেনদেনের উদ্বৃত্তের তত্ত্ব বা আধুনিক তত্ত্ব।

(ক) **স্বর্ণমান তত্ত্ব** (gold standard theory): পরস্পরের সাথে বাণিজ্যরত দু'টি দেশেই যদি স্বর্ণমান থাকে তাহলে তাদের প্রত্যেকের স্বর্ণমুদ্রায় যে পরিমাণ খাঁটি সোনা থাকে তার মূল্যের অনুপাতের দ্বারা তাদের মুদ্রা দু'টির পারস্পরিক বিনিময় হার স্থির হয়ে থাকে। (যদি ভারতের ১টি সোনার টাকায় ১০ গ্রাম সোনা থাকে ও ইংল্যাণ্ডের একটি পাউণ্ড স্বর্ণমুদ্রায় ৫০ গ্রাম সোনা থাকে তাহলে টাকা ও পাউণ্ডের ভারসাম্য বিনিময় হার হবে, ১ পাউণ্ড=৫ টাকা।) এই হল মুদ্রা বিনিময়ের ভারসাম্য হার নির্ধারণ সম্পর্কে স্বর্ণমান তত্ত্ব। এইভাবে নির্ধারিত বিনিময় হারকে **টাঁকশালের দর বা স্বর্ণসমতা হার (mint par of exchange)** বলে। বিদেশী মুদ্রার বাজারে অবশ্য সর্বদা টাকা ও পাউণ্ডের এই বিনিময় হার যে বজায় থাকবে তা নয়। সেখানে প্রতিদিন টাকা ও পাউণ্ডের চাহিদা ও যোগানের অবস্থা অনুযায়ী বিনিময় হার ওঠানামা করবেই। কিন্তু ঐ ওঠানামার পরিমাণ কখনই খুব বেশি হবে না ও তা স্বর্ণসমতা হারের কাছাকাছিই থাকবে। তার কারণ, স্বর্ণমান থাকলে দুই দেশের মধ্যে সোনার আমদানি-রপ্তানি অবাধে চলে। তাই কখনও যদি কোন দিন বাজারের বিনিময়ের হারটি স্বর্ণসমতা হারের চেয়ে অনেক বেশি বা কম হয়ে পড়ে, লোকসান এড়াতে ব্যবসায়ীরা অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানিকারীরা সরাসরি মুদ্রা বিনিময় না করে সোনা দিয়ে নিজেদের লেনদেনের নিষ্পত্তি করবে। ফলে মুদ্রার অতিরিক্ত চাহিদা সোনার বাজারে চলে গিয়ে মুদ্রা বিনিময়ের বাজারে দু'টি মুদ্রার চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সাথে স্বাভাবিক সাম্যে থাকবে। সুতরাং দৈনন্দিন বিনিময় হারটি স্বর্ণসমতা হারের কাছাকাছিই থেকে যাবে। এই কারণে স্বর্ণমানে দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল হয়ে থাকে।

(খ) **ক্রয়ক্ষমতার সমতার তত্ত্ব** (purchasing power parity theory): দু'টি দেশে স্বর্ণমান না থাকলে, কাগজী মুদ্রামান থাকলে দুই দেশের মুদ্রার ভারসাম্য বিনিময় হার কি করে স্থির হয় তা ব্যাখ্যার জন্য নতুন তত্ত্বের প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই প্রয়োজনে এই তত্ত্বটির উৎপত্তি ঘটেছে। এই তত্ত্বটির বক্তব্য হল, দু'টি দেশের মুদ্রার ভারসাম্য বিনিময় হার বললে এমন একটি হার বোঝায় যা ঐ মুদ্রা দু'টির নিজের নিজের ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতের সমান। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি মুদ্রায় নিজ দেশে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী কিনতে পাওয়া যায়, ঐ মুদ্রার বিনিময়ে পাওয়া বিদেশী মুদ্রা দিয়েও বিদেশে ঠিক ততখানি পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রীই কিনতে পারা উচিত। তা যদি না হয়, তা হলে বুঝতে হবে ঐ দু'টি মুদ্রার বিনিময় হার যা হওয়া উচিত তা থেকে হয় বেশি নয়তো কম হয়েছে। বিদেশী মুদ্রার বাজারটি যদি সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয় ও অবাধ বাণিজ্য চলে, তাহলে, এর ফলে এমন ঘটনাবলী ঘটবে যার দরুন দু'টি মুদ্রার বিনিময় হার শেষ পর্যন্ত তাদের নিজের নিজের ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতের সমান হয়ে পড়বে। যেমন, দু'টি মুদ্রার বিনিময় হার

যদি এমন হয় যে, দেশী মুদ্রার দ্বারা স্বদেশে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী কেনা যায়, দেশী মুদ্রাটি দিয়ে ঐ বিনিময় হারে বিদেশী মুদ্রা কিনে তার চেয়ে বেশি পরিমাণে ঐ দ্রব্যসামগ্রী বিদেশী বাজার থেকে কেনা যাচ্ছে, তাহলে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা বাড়বে এবং বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হার বাড়বে। আবার যদি এমন হয় যে, দেশী মুদ্রায় দেশের বাজারে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী কেনা যায়, ঐ মুদ্রাটির বিনিময়ে বিদেশী মুদ্রা যোগাড় করে তা দিয়ে বিদেশী বাজারে তার থেকে কম পরিমাণে ঐ দ্রব্যসামগ্রী কিনতে পাওয়া যাচ্ছে, তাহলে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা কমবে ও তার বিনিময় হার কমবে। সুতরাং শেষ পযন্ত দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হারটি এমন হবে যে, তা দুই দেশে ঐ দু'টি মুদ্রার অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতের সমান হয়ে পড়বে।

এই তত্ত্বটির দু'টি রূপ (form) দেখা যায়। একটি হল, চূড়ান্ত রূপ (absolute form)। অন্যটি হল আপেক্ষিক রূপ (comparative form)। চূড়ান্ত রূপটির বক্তব্য হল, যে কোন সময়ে, দুটি দেশের মুদ্রার ভারসাম্য বিনিময় হার তাদের অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতের সমান হয়। এই রূপটি হল, দুটি দেশের মুদ্রার

$$\text{ভারসাম্য বিনিময় হার} = \frac{\text{ক দেশের টাকা}}{\text{খ দেশের টাকা}} = \frac{\text{ক দেশের টাকার ক্রয়ক্ষমতা}}{\text{খ দেশের টাকার ক্রয়ক্ষমতা}}$$

$$= \frac{\text{খ দেশের মূল্যস্তর (সূচক সংখ্যা)}}{\text{ক দেশের মূল্যস্তর (সূচক সংখ্যা)}}$$

আপেক্ষিক রূপটির বক্তব্য হল, একটি নির্দিষ্ট সময়ে, দুই দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা যে অনুপাতে পরিবর্তিত হবে, সে সময়ে তাদের মুদ্রা দু'টির বিনিময় হারও সেই অনুপাতে পরিবর্তিত হবে।

সমালোচনা ঃ ক্রয়ক্ষমতার সমতার তত্ত্বের মূল কথা হল, যে কোন দু'টি দেশের মুদ্রার বিনিময় হারটি তাদের নিজের নিজেব অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতের প্রতিফলন ছাড়া আব কিছু নয়। একথা সত্য হলে, ঐ দু'টি দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার সূচক সংখ্যা অতি সহজেই ঐ দুই দেশের মূল্যস্তরের সূচক সংখ্যার সাহায্যে প্রস্তুত করা যায় এবং তার ভিত্তিতে দেশ দু'টির মুদ্রার ভারসাম্য বিনিময় হারটিও নির্ধারণ করা যায়। অথচ বাস্তবে তা নিম্নোক্ত কারণে সম্ভবপর নয়:

(১) দু'টি দেশের মুদ্রাব বিনিময় হার শুধু তাদের চূড়ান্ত মূল্যস্তরের উপরেই নির্ভর করে না; আরও নানা বিষয়ের উপর (যেমন, পরিবহণ খরচ, সরকারী বাণিজ্য নীতি, অর্থনীতিক অবস্থা ইত্যাদি)।

(২) ক্রয়ক্ষমতার অথবা মূল্যস্তরের সূচক সংখ্যা তৈরি করতে হলে একটি 'স্বাভাবিক' ভিত্তি বৎসর খুঁজে বের করতে হবে। বাস্তবে তা খুঁজে পাওয়া কঠিন।

(৩) যে সব দ্রব্যসামগ্রী বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্তর্গত তাদের দামের ভিত্তিতে মূল্যস্তরের সূচক সংখ্যা তৈরি করে তার ভিত্তিতে নির্ধারিত বিনিময় হারটি দু'টি মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতের সমান হবেই। কিন্তু যে সব দ্রব্যসামগ্রী আমদানি রপ্তানি

হয় না, তাদের মূল্যস্তরের ভিত্তিতে তৈরি সূচক সংখ্যার অনুপাত দিয়ে নির্ধারিত বিনিময় হার কখনই সঠিক হবে না।

তবে এই সব ত্রুটি সত্ত্বেও তত্ত্বটি একেবারে মূল্যহীন নয়। কারণ দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হারের সাথে তাদের মূল্যস্তরের যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তা ওই তত্ত্বটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

(গ) **লেনদেনের উদ্বৃত্তের তত্ত্ব বা আধুনিক তত্ত্ব** (the balance of payment theory or the demand and supply theory or the modern theory) **:** দু'টি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার কি করে নির্ধারিত হয় সে বিষয়ে সর্বাধুনিক এই তত্ত্বটির মূল কথা হল, বিদেশী মুদ্রার বাজারটি সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হলে ও অবাধ বাণিজ্য চালু থাকলে, দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হারটি শেষ পর্যন্ত এমন হয় যে, ঐ হারে একদিকে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা ও যোগান অন্যদিকে দেশীয় মুদ্রার যোগান ও চাহিদা পরস্পরের সমান হয়ে পড়ে।

ব্যাখ্যা : দেশের মধ্যে বিদেশী পণ্যের আমদানিকারীরা ও বিদেশী দেনা পরিশোধে ইচ্ছুক ব্যক্তি ও সংস্থারা হল বিদেশী মুদ্রার চাহিদাকারী। তারা দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশী মুদ্রা কিনতে চায়। বিদেশে পণ্য রপ্তানিকারীরা ও অন্যান্য ব্যক্তি ও সংস্থাগুলি যাদের কাছে বিদেশী মুদ্রা আছে, তারা হল বিদেশী মুদ্রার যোগানদার। তারা বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রা কিনতে চায়। অর্থাৎ বিদেশী লেনদেনের জমা ও খরচ, এই দু'টি দিক থেকে বিদেশী মুদ্রার যোগান ও চাহিদার উৎপত্তি হয়। বিদেশী মুদ্রার বাজারে বিদেশী মুদ্রার চাহিদাকারী ও যোগানদার, এই দু'টি পক্ষ বিনিময়ে বিভিন্ন হারে যে পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা কিনতে ও বেচতে চায় তার তালিকা দু'টি বিদেশী মুদ্রার চাহিদা ও যোগান তালিকা (বা চাহিদা ও যোগান রেখায়) পরিণত হয়। ওই রেখা দু'টির পরস্পর ছেদবিন্দুতে দেশীয় মুদ্রার সাথে বিদেশী মুদ্রার ভারসাম্য বিনিময় হার নির্ধারিত হয়।

বিদেশী লেনদেনের হিসাবে জমার চেয়ে খরচ বেশি হলে পাওনার চেয়ে দেনা বেশি বা বিদেশী লেনদেনে ঘাটতি হয় এবং বিদেশী মুদ্রার যোগানের চেয়ে চাহিদা বেশি হয়। ফলে বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হার বাড়ে (ও দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার কমে)। বিদেশী লেনদেনের হিসাবে খরচের চেয়ে জমা বেশি হলে, বিদেশী লেনদেনে দেনার চেয়ে পাওনা বেশি হয় বা বিদেশী লেনদেনে উদ্বৃত্ত হয়। ফলে, বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হার কমে (ও দেশী মুদ্রার বিনিময় হার বাড়ে)। এইভাবে বিদেশী লেনদেনে ঘাটতি ও উদ্বৃত্ত দেশীয় মুদ্রার তুলনায় বিদেশী মুদ্রার চাহিদা ও যোগানকে প্রভাবিত করার মধ্য দিয়ে দু'টি মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করে দেয়।

৭.১০. বিনিময় হারের ওঠানামার কারণ
Causes of Fluctuations of the Rate of Exchange

১. যে কোন দু'টি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারিত হয় মূলত তাদের পরস্পরের কাছে পরস্পরের মুদ্রার তুলনামূলক চাহিদা ও যোগানের দ্বারা। একটি

দেশের কাছে অন্য একটি দেশের মুদ্রার চাহিদা ও যোগান আবার চারটি বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়: (ক) উভয় দেশের পারস্পরিক অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও তার গতি-প্রকৃতি; (গ) উভয় দেশের সরকারী আর্থিক-ফিসক্যাল নীতি; (গ) বিদেশী মুদ্রার বাজারে ফটকাজাতীয় লেনদেন; এবং (ঘ) দুই দেশের মধ্যে পুঁজির চলাচল। উপরোক্ত বিষয়গুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দু'টি দেশের মুদ্রার তুলনামূলক চাহিদা-যোগানের হ্রাসবৃদ্ধির দরুন দু'টি দেশের মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তন বা ওঠা-নামা ঘটে।

(ক) **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও গতি-প্রকৃতি:** দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যের পরিমাণ যদি নগণ্য হয় তাহলে দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হারের উপর তার প্রভাবও নগণ্য হয়ে থাকে। পারস্পরিক বাণিজ্যের পরিমাণ সবিশেষ হলে, যদি উভয় দেশের বাণিজ্যে লেনদেনের বা দেনাপাওনার ভারসাম্য থাকে তাহলে উভয় দেশের মুদ্রারই চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হবে ও তার ফলে বিনিময় হারটি স্থিতিশীল হবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক লেনদেনে এক দেশের যদি অনুকূল ও অন্য দেশের যদি প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হয়, তাহলে অনুকূল উদ্বৃত্তের দেশটির মুদ্রার চাহিদা তার যোগানের তুলনায় বেশি এবং প্রতিকূল উদ্বৃত্তের দেশটির মুদ্রার চাহিদা তার যোগানের তুলনায় কম হবে। ফলে, অনুকূল উদ্বৃত্তের দেশটির মুদ্রার বিনিময় হার বাড়বে ও প্রতিকূল উদ্বৃত্তের দেশটির মুদ্রার বিনিময় হার কমবে।

(খ) **দেশের সরকারী আর্থিক-ফিসক্যাল নীতি:** দেশের সরকারী আর্থিক-ফিসক্যাল নীতি ও মুদ্রার চাহিদা ও যোগানকে প্রভাবিত করে তার বিনিময় হারকে প্রভাবিত করে। সরকার দেশের অর্থনীতিতে তেজী অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য, কিংবা কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর জন্য যদি সম্প্রসারণমূলক আর্থিক-ফিসক্যাল নীতি গ্রহণ করে (যেমন, সুদের হার কমানো, করের হার কমানো, ভরতুকি দান ইত্যাদি) তাহলে দেশে অর্থের যোগান বাড়বে ও কাজ-কারবারের সম্প্রসারণ ঘটবে। এর ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। তার দরুন দামস্তর বাড়তে পারে। দামস্তর বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই রপ্তানি কমার ও আমদানি বাড়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। ফলে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা বাড়বে ও তার যোগান কমবে এবং বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হার বাড়বে ও দেশের মুদ্রার বিনিময় হার কমবে। সরকার যদি সংকোচনমূলক আর্থিক ফিসক্যাল নীতি গ্রহণ করে তাহলে, এর বিপরীত অবস্থা ঘটবে।

(গ) **বিদেশী মুদ্রার বাজারে ফটকা জাতীয় লেনদেন:** বিদেশী মুদ্রার কারবারীরা যখন মনে করে বিদেশী মুদ্রার বাজারে, দেশী মুদ্রার বিনিময় হার ভবিষ্যতে বাড়বে, তখন তারা ভবিষ্যতে চড়া বিনিময় হারে দেশী মুদ্রা বিক্রির আশায় বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে দেশী মুদ্রা কিনতে শুরু করে। তাতে বিদেশী মুদ্রার বাজারে দেশী মুদ্রার চাহিদা ও বিদেশী মুদ্রার যোগান বাড়ে, ঐ অবস্থায় বাজারে দেশী মুদ্রার যোগান ও বিদেশী মুদ্রার চাহিদা যদি না বেড়ে থাকে

তখন দেশী মুদ্রার বিনিময় হার বাড়ে ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হার কমে। আর, বিদেশী মুদ্রার কারবারীরা যদি মনে করে, ভবিষ্যতে বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হার বাড়বে, তাহলে এর বিপরীত ঘটনা ঘটে। এমনি করে, বিদেশী মুদ্রার বাজারে ফটকাজাতীয় বেচাকেনার দরুন বিনিময় হারের ওঠা-নামা ঘটতে থাকে।

(ঘ) **পুঁজির চলাচল :** বেশি সুদের লোভে এবং নিরাপত্তার সন্ধানে প্রায়ই এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী বিদেশী পুঁজির চলাচল ঘটে। এসব কারণে কোন দেশে বিদেশী পুঁজি এলে, তা দেশী মুদ্রার সাথে বিনিময়ের মারফত দেশীয় মুদ্রায় পরিণত হয়। ঠিক এ ধরনের বিনিময়ের প্রয়োজনে দেশী মুদ্রার চাহিদা ও বিদেশী মুদ্রার যোগান বাড়ে। ফলে দেশী মুদ্রার বিনিময় হার বাড়ে ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হার কমে। উপরোক্ত কারণে বিদেশী মুদ্রা দেশ থেকে চলে গেলে বিপরীত ঘটনা ঘটে।

৭.১১. বিদেশী মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ
Exchange Control

১. দেশের অর্থনীতির উপর নানারূপ অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা থাকায় কোন রাষ্ট্রেই অবাধে দেশীয় মুদ্রার সাথে বিদেশী মুদ্রার বিনিময় ঘটতে দেওয়া হয় না। সব দেশেই তাই নানা রূপ সরকারী বিধিনিষেধের দ্বারা বিনিময়ের হার ও বিনিময়ের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এর নাম হল বিদেশী মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

২. **উদ্দেশ্য :** বিদেশী মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হল চারটি : (ক) দেশ থেকে দেশী ও বিদেশী পুঁজির পলায়ন বন্ধ করা ; (খ) বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা , (গ) বৈদেশিক লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি হলে বৈদেশিক লেনদেনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সাপেক্ষ সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ; এবং (ঘ) স্বল্পোন্নত দেশ হলে, শিল্প সংরক্ষণ করা। এ ছাড়াও আরও তিনটি উদ্দেশ্যে বিদেশী মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা হতে পারে , (ঙ) সরকারের রাজনৈতিক ও সামরিক উদ্দেশ্য সাধন করা , (চ) আপৎকালে সহজে বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করা , এবং (ছ) অন্যান্য দেশের গৃহীত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক পন্থা গ্রহণ করা।

৩. **নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপায় :** যে সব উপায়ে বিদেশী মুদ্রার সাথে দেশী মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা হয় তা হল। (ক) বিদেশী মুদ্রার সমস্ত লেনদেনের উপর সরকারী একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপন করা ; (খ) দেশবাসীর হাতে বিদেশী মুদ্রার ও বিদেশী সম্পত্তির উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা , (গ) দেশী মুদ্রার সরকারী বিনিময় হার ঘোষণা করা ও সেটা দৃঢ়ভাবে রক্ষা করা ; (ঘ) আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের উপর পরিপূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করা ; (ঙ) অন্যান্য দেশের সাথে সরকারী স্তরে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি বৈদেশিক লেনদেনের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন করা , (চ) বিদেশী মুদ্রা নিলাম করা ইত্যাদি।

৪. **উপযোগিতা :** বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিক অবস্থার গভীর বৈষম্যের দরুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অসমান প্রতিযোগিতার উৎপত্তি

হয়েছে। সেটা বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিদেশী পুঁজির স্বল্প ও দীর্ঘকালীন চলাচলে জটিলতা বাড়িয়ে দিয়েছে। এর ফলে অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির বৈদেশিক লেনদেনে ক্রমাগত ঘাটতি এবং উন্নত দেশগুলির বৈদেশিক লেনদেনে ক্রমাগত উদ্বৃত্ত ঘটছে। ফলে অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির মুদ্রার বিনিময় হার কমছে ও উন্নত দেশগুলির মুদ্রার বিনিময় হার বাড়ছে। তার ফলে অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির প্রয়োজনীয় বিদেশী পণ্য কেনাব ক্ষমতা কমে যাচ্ছে এবং উন্নত দেশগুলিতে আবার অবিক্রীত পণ্যের মজুত বাডছে। এই কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে। তা ছাডা বিদেশী দেনা পরিশোধে আবাব দেশের বিদেশী মুদ্রার সংরক্ষিত তহবিল এবং সোনার সংরক্ষিত তহবিলও দ্রুত ক্ষয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

এই সংকট দূর করার জন্য বিদেশী মুদ্রার সাথে দেশী মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। বিদেশী মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণের কাজটি দেশের রপ্তানি বাডাতে ও আমদানি কমাতে এবং বিদেশী মুদ্রার বাজাবে ফটকা জাতীয় লেনদেন ও বিদেশী মুদ্রার অবাঞ্ছিত স্বল্পকালীন গতায়াত বন্ধ করতে সাহায্য কবে এবং তার মধ্য দিয়ে মুদ্রা বিনিময়েব হারটিকে স্থিতিশীল করতে সহায়তা করে। এই হল বিদেশী মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থার প্রধান উপযোগিতা। এই কারণে বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশই বিদেশী মুদ্রা বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করতে ও নিজের নিজের মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপন ও সম্প্রসারণ করতে বাধ্য হয়েছে।

৭·১২· মুদ্রার অবমূল্যায়ন
Devaluation

১. **অবমূল্যায়ন ঃ** বর্তমানে সব দেশেব মুদ্রাই হল কাগজের। সব দেশের সরকারই দেশী কাগজীমুদ্রার সরকাবী বিনিময় হার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যে সব দেশ আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডাবেব সদস্য তাদের প্রত্যেককেই আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের নিয়ম অনুযায়ী সদস্য হওয়ার সময় নিজের মুদ্রার স্বর্ণমূল্য ঘোষণা করতে হয়। তবে ঘোষিত সে স্বর্ণমূল্য পরিবর্তনযোগ্য। প্রয়োজন হলে, কোন দেশের সরকার তার মুদ্রার ঘোষিত সরকারী বিনিময় হার বা স্বর্ণমূল্য কমাতে ও বাড়াতে পারে। মুদ্রার ঘোষিত স্বর্ণমুল্য বা বিনিময় হার কমানো হলে, তাকে বলে 'অবমূল্যায়ন', বাড়ানো হলে তাকে বলে 'পুনর্মূল্যায়ন' (revaluation)।

২. **ফল ঃ** যে দেশের মুদ্রার অবমূল্যায়ন করা হয়, তার বিনিময় হার কমে যায় ও তার সাথে অন্যান্য দেশের মুদ্রার বিনিময় হাব বেডে যায়।

৩. **প্রতিক্রিয়া ঃ** (ক) যে দেশের মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটে তার বিনিময় হার কমে যাওয়ায় তা দিয়ে একই পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা কিনতে গেলে আগের তুলনায় বেশি মুদ্রা লাগে। এবং তার সাথে বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হার বেড়ে যাওয়ায়, সে দেশের একই পরিমাণ মুদ্রা কিনতে গেলে আগের তুলনায় কম পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা লাগে।

(খ) সুতরাং, যে দেশের মুদ্রার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে তার পণ্য কিনতে

গেলে আগের তুলনায় কম বিদেশী মুদ্রা লাগে। অর্থাৎ বিদেশীদের কাছে তার পণ্য সস্তা হয়ে ওঠে। আর বিদেশী পণ্য কিনতে গেলে তাকে আগের তুলনায় বেশি পরিমাণ দেশী মুদ্রা দিতে হয়। অর্থাৎ তার কাছে বিদেশী পণ্যের দাম বেড়ে যায়।

(গ) এর ফলে অবমূল্যায়নকারী দেশের একদিকে রপ্তানি বৃদ্ধির এবং অন্যদিকে আমদানি কমার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু বাস্তবে, রপ্তানি কতটা বাড়বে ও আমদানি কতটা কমবে, তা নির্ভর করে দেশে আমদানী পণ্যের চাহিদার এবং বিদেশে রপ্তানী পণ্যের চাহিদার তুলনামূলক স্থিতিস্থাপকতার উপর।

আমদানি ও রপ্তানি উভয়ের চাহিদাই যদি স্থিতিস্থাপক হয়, তাহলে নিশ্চিত-ভাবে মোট রপ্তানি বাড়বে ও মোট আমদানি কমবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত হবে। বিদেশী মুদ্রার উপার্জন বাড়বে ও বৈদেশিক লেনদেনে উদ্বৃত্ত সৃষ্টির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে। আর উভয়ের চাহিদাই যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহলে রপ্তানির পরিমাণ না কমলেও তার দ্বারা উপার্জিত বিদেশী মুদ্রা কমবে এবং আমদানির পরিমাণ যা ছিল তা যদি অপরিবর্তিতও থাকে তবুও তা কিনতে বেশি খরচ হবে। ফলে বৈদেশিক লেনদেনে ঘাটতি দেখা দেবে। যদি রপ্তানী পণ্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় কিন্তু আমদানী পণ্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহলে রপ্তানি বাড়বে ও রপ্তানি-জাত বিদেশী মুদ্রার উপার্জন বাড়বে। কিন্তু অন্যদিকে আমদানির পরিমাণ অব্যাহত থাকার দরুন বিদেশী মুদ্রার খরচও বেশি হবে। মোটের উপর অবস্থাটা কি দাঁড়াবে তা নির্ভর করবে ওই দু'টি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ও অস্থিতিস্থাপকতার তুলনামূলক মাত্রার পার্থক্যের উপর। কিন্তু রপ্তানী পণ্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক ও আমদানী পণ্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়। তাহলে, রপ্তানির পরিমাণ বাড়বে না ও রপ্তানি-জাত বিদেশী মুদ্রার উপার্জন কমবে এবং আমদানির পরিমাণ বিশেষভাবে কমে যাবে ও সে কারণে বিদেশী মুদ্রার খরচও কমবে। নীট ফলাফলটি নির্ভর করবে দু'টির তুলনামূলক মাত্রার উপর।

(ঘ) অবমূল্যায়নের দরুন দেশী মুদ্রার বিনিময় হার কমলে, আমদানী পণ্য ও আমদানী কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি হয়। এর ফলে দেশে যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর উৎ-পাদন খরচ বাড়ে। আবার, অন্যদিকে অবমূল্যায়নের ফলে রপ্তানি বৃদ্ধির দরুন দেশের বাজারে পণ্য ও কাঁচামালের যোগানে টান ধরে। সব মিলিয়ে দেশের সাধারণ দামস্তর বাড়তে আরম্ভ করে। তাতে আবার রপ্তানি বৃদ্ধি খানিকটা স্তিমিত হতে পারে।

(ঙ) দেশের বিদেশী ঋণ ও তার সুদ পরিশোধ এবং বিদেশী পুঁজির লভ্যাংশ দিতে গিয়ে আগের চেয়ে খরচ বাড়ে।

উপরোক্ত বিষয়গুলির নীট ফলাফল কি দাঁড়াবে তা প্রধানত নির্ভর করে অবমূল্যায়নের ফলে আমদানি কতটা কমল ও রপ্তানি কতটা বাড়ল তার উপর এবং সে অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে বৈদেশিক লেনদেনের উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি বাড়বে বা কমবে।

৪. **উদ্দেশ্য :** সাধারণত যে সব উদ্দেশ্যে অবমূল্যায়নের আশ্রয় গ্রহণ করা হয় তা হল : (ক) বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দূর করা, উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা ও তা বজায় রাখা বা বাড়ানো ; (খ) বৈদেশিক লেনদেনে ঘাটতি দূর করা, উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা ও তা বজায় রাখা বা বাডানো ; (গ) রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাসের মারফত দেশের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থান বাডানো।

৫. **সাফল্যের শর্তাবলী :** অবমূল্যায়নের বাঞ্ছিত ফল পেতে হলে : (ক) আমদানী পণ্যের চাহিদা ও রপ্তানী পণ্যের চাহিদা, উভয়ই স্থিতিস্থাপক হওয়া চাই, (খ) আমদানী পণ্যের প্রতিযোগী দেশী পণ্যের যোগান স্থিতিস্থাপক হওয়া চাই, কারণ তা না হলে আমদানী পণ্যের পরিমাণ হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে দেশী পণ্যের যোগান অর্থাৎ উৎপাদন বাডানো যাবে না এবং ফলে দেশে মূল্যস্তরের বৃদ্ধি শুরু হয়ে যাবে, (গ) অবমূল্যায়নের মাত্রাটি অল্প হওয়া চাই, (ঘ) প্রতিযোগী দেশগুলি যেন পাল্টা অবমূল্যায়ন না করে সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া চাই।

৮ বাণিজ্য চক্র
TRADE CYCLE

৮.১. সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
Definition and Nature

১. **সংজ্ঞা ঃ** বাণিজ্য চক্র হল, একটি নির্দিষ্ট কালব্যাপী (কম বেশি ৬ থেকে ১৩ বৎসর) ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ও মন্দার, সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচনের, উন্নতির ও অবনতির চক্রের আকারে নিয়মিত আবির্ভাব ও আবর্তন। এরই সাথে চক্রের মত দেশের মোট উৎপাদন, নিয়োগ, আয়, দামস্তর, মজুরি, সুদের ও মুনাফার হার ওঠা-নামা করে। ধনতান্ত্রিক সমাজ এই বাণিজ্য চক্রের আবর্তনের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হতে থাকে।

২. **প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ঃ** (১) ধনতান্ত্রিক সমাজেই এর আবির্ভাব ঘটে; (২) নির্দিষ্টকাল পর পর না হলেও, এদের আবির্ভাব কিছুকাল পর পর নিয়মিত-ভাবেই ঘটে; (৩) প্রতিটি বাণিজ্য চক্রের চারটি পর্যায় থাকে। কিন্তু তাদের কালগত দৈর্ঘ্য কখনই এক রকম হয় না, তীব্রতাও এক রকম হয় না; (৪) প্রথমে একটি ধনতান্ত্রিক দেশে তা দেখা দিয়ে পরে তা অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সংক্রামিত হয় ও পরিশেষে সমগ্র ধনতান্ত্রিক দুনিয়াকে গ্রাস করে; (৫) ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থার চক্রাকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন উৎপাদন, দামস্তর, কর্মসংস্থান প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে তেমনি নগদ টাকা, ঋণ ও টাকার প্রচলন বেগ প্রভৃতিরও একই রকমের পরিবর্তন ঘটে; (৬) প্রতিটি ধনতন্ত্রী দেশে একটি শিল্পে বাণিজ্য চক্রের প্রভাব দেখা দিলে ক্রমশ তা অন্যান্য শিল্পেও ছড়িয়ে পড়ে; (৭) ভোগ্যপণ্য শিল্পের তুলনায় পুঁজিদ্রব্য শিল্পে বাণিজ্য চক্রগত পরিবর্তন অনেক বেশি হয়; (৮) যন্ত্রশিল্পজাত পণ্যের দামের তুলনায় কৃষিজাত পণ্যের দামে পরিবর্তন বেশি ঘটে; এবং (৯) যাবতীয় আয়ের মধ্যে মুনাফার পরিবর্তন ঘটে সর্বাধিক।

৩. **বাণিজ্য চক্রের পর্যায়সমূহ ঃ** সমস্ত বাণিজ্য চক্রেরই চারটি পর্যায় থাকে ঃ মন্দা, পুনরুন্নতি, সমৃদ্ধি ও অবনতি। যে কোন পর্যায় থেকে এর বর্ণনা শুরু করা যায়।

(ক) **মন্দা** (depression) ঃ মন্দার সময়ে দেখা যায়—দেশের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেছে, ভোগ্যপণ্য ও পুঁজিদ্রব্যের চাহিদা ভীষণ কমে গেছে, দোকানগুলিতে অবিক্রীত পণ্যের বিপুল মজুদ পড়ে আছে, দ্রব্যসামগ্রীর দাম ক্রমাগত কমছে, শিল্পগুলিতে ফরমাশের অভাবে উৎপাদনের পরিমাণ সাংঘাতিক কম এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতার বেশির ভাগই অলস ও অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। কারবারীদের মুনাফা অত্যন্ত কমে গেছে এবং ভবিষ্যতে মুনাফা আরও কমবে এবং লোকসান হবে বলে তারা আশঙ্কা করছে। নতুন বিনিয়োগে তাদের

বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। তারা ব্যাঙ্ক থেকে এজন্য কোন নতুন ঋণ নিতেও চায় না। অনেক কারবার লোকসানের ধাক্কায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আগেকার ধার করা টাকা শিল্পগুলি শোধ করতে না পারার ফলে ব্যাঙ্কগুলিও আর্থিক অসুবিধায় পড়ছে। বিনিয়োগকারী প্রার্থীর অভাবে তাদের হাতে অত্যধিক পরিমাণে নগদ টাকা জমে উঠছে। কারবারী লেনদেন, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয়, দামস্তর সবই অত্যন্ত কমে যাওয়ায় টাকার প্রচলন বেগও খুব কমে গেছে। এইভাবে গোটা দেশের অর্থনীতিক মন্দার অবস্থা গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। অবশেষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প ও ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলি ছাড়া আর সব শিল্পের চাকা স্তব্ধ হয়ে পড়ে। দেশের অর্থনীতিক পরিস্থিতি একসময়ে সর্বনিম্ন স্তরে এসে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

(গ) **পুনরুন্নতি** (recovery or revival) ঃ মন্দার চরম অবস্থায় কিছুকাল পরে দেখা যায়, ধীরে ধীরে শিল্পগুলিতে আবার সাড়া জাগছে। তা ধীরে ধীরে এক শিল্প থেকে আরেক শিল্পে ছড়িয়ে পড়ে। কলকারখানার বন্ধ দরজাগুলি খুলতে আরম্ভ করে। উৎপাদন প্রথমে সামান্য পরিমাণে ও পরে অধিকতর গতিতে বাড়তে শুরু করে। মোট উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট কর্মসংস্থান ও মোট আয় বাড়ে। ফলে মোট চাহিদাও ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করে। বেচাকেনার পরিমাণ বাড়ে। মুনাফা বাড়ে। কারবারীরা ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাবাদী হয়। নতুন বিনিয়োগের ঝুঁকি নিতে সাহস করে। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়া শুরু করে। দামস্তরের নিম্নগতির বদলে সামান্য ঊর্ধ্বগতি দেখা দেয়। এইভাবে ধীরে ধীরে মন্দার মোড় ফেরে। উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয়, চাহিদা, বেচাকেনা, কারবারী লেনদেন, টাকার যোগান, টাকার প্রচলন বেগ বাড়তে থাকে। ব্যবসায় বাণিজ্যের বিপুল সম্প্রসারণ হতে থাকে। সমগ্র অর্থনীতিতে বিরাট কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয়ে যায়, দ্রুতগতিতে অর্থনীতির উন্নতি ঘটতে থাকে। মন্দার অবস্থা কাটিয়ে অর্থনীতি সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হতে থাকে।

(গ) **সমৃদ্ধি** (prosperity) ঃ পুনরুন্নতির পথে অর্থনীতি যতই এগিয়ে যেতে থাকে, উৎপাদনের উপাদানগুলিও ততই বেশি বেশি পরিমাণে উৎপাদনে নিযুক্ত হতে থাকে। শিল্পগুলির উৎপাদন ক্ষমতারও পূর্ণতম ব্যবহার সম্ভব হতে থাকে। এ অবস্থায় কাঁচামাল, দক্ষ শ্রমিক প্রভৃতির অভাব দেখা দিতে থাকে। এদিকে বিনিয়োগের পরিমাণও ক্রমাগত বাড়িয়ে যেতে হয়। বিনিয়োগ যত বাড়তে থাকে সমাজের আয় (অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতা)-ও তত বাড়তে থাকে। এর ফলে চাহিদাও প্রভূত পরিমাণে বেড়ে যায়। একটা স্তরে চাহিদা উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যায়। সব কিছুর দাম বাড়তে থাকে। ফলে উৎপাদন খরচও বাড়তে থাকে। আবার, দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে মুনাফাও বাড়ে। অতিরিক্ত মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে পণ্যসামগ্রী মজুত করার প্রবণতা দেখা দেয়। মুনাফা বাড়ছে বলে কারবারী আরো আশাবাদী

হয়ে ওঠে এবং বিনিয়োগ বাড়াবার বহু রকমের পরিকল্পনা নেয়। বিনিয়োগের প্রয়োজনে ঋণের চাহিদা বাড়ে বলে সুদের হার বাড়তে থাকে। ব্যাঙ্কগুলিও লাভের লোভে দেদার ঋণ দিতে শুরু করে। এমনি করে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয়, চাহিদা, টাকা ও ঋণের যোগান, দামস্তর, মুনাফা, মজুরি সুদের হার ক্রমাগত বাড়তে থাকে ও অর্থনীতি ক্রমে ক্রমে পূর্ণ নিয়োগের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। পূর্ণ নিয়োগের পর্যায়ে অর্থনীতি পৌঁছালে, উৎপাদন সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায়। এর পর যত চেষ্টাই হ'ক না কেন, মোট উৎপাদন ও মোট কর্মসংস্থান বাড়ানো যায় না। কিন্তু চাহিদা, দামস্তর ও খরচস্তরের কোন সর্বোচ্চ সীমা থাকে না। আরও, আরও মুনাফার লোভে কারবারীরা উন্মত্তের মত ক্রমাগত বিনিয়োগ বাড়াতে চেষ্টা করে তাতে কিন্তু মোট উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে না। কারণ, কাঁচামাল ও সাজসরঞ্জাম এবং শ্রমিকের অভাবে শুধু এক শিল্প থেকে আরেক শিল্পে, এক স্থান থেকে আরেক স্থানে এক সংস্থা থেকে আরেক সংস্থায় কাঁচামালের সাজসরঞ্জামের ও শ্রমিকদের স্থানান্তর ঘটে এবং চড়াদাম দিয়ে তা সংগ্রহ করতে হয়। সুতরাং বিনিয়োগ খরচই কেবল বাড়ে। মোট উৎপাদন ও মোট কর্মসংস্থান বাড়ে না। এই অবস্থায় কেবল দামস্তরই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। এটা সম্ভব হয় টাকার ও ঋণের যোগান বৃদ্ধির দরুন। আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কায় বাজারে বেচাকেনায় ভাটা পড়ে দোকানে, গুদামে অবিক্রীত পণ্যের মজুদ জমতে থাকে। কিন্তু বাজারে দামের ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত থাকে। আরও চড়া দামের আশায় কারবারীরা বেশি করে মজুদ ধরে রাখতে থাকে।

(ঘ) **অবনতি** (recession): অবশেষে এক সময়ে কারবারীদের মনে আশঙ্কা জাগে এত চড়া দামে বুঝি তাদের পক্ষে মজুদ পণ্যের সবটা বিক্রি করা সম্ভব হবে না। বাস্তব বিক্রির পরিমাণের দিকে তাদের খেয়াল পড়ে। আর সেই মুহূর্তেই তাদের মনে আশার রঙীন বুদবুদটি ফেটে যায়। তারা তাদের পণ্য বেচার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সেই মুহূর্ত থেকেই শুরু হয় অর্থনীতিক অবস্থার অবনতির পর্যায়। ক্রেতারা যেই দেখতে পায় বেচতে অনিচ্ছুক বিক্রেতারা এখন বেচতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে অমনি তারাও হাত গুটিয়ে নেয়। ফলে শুরু হয় চাহিদার অবনতি। তাতে বিক্রেতারা আরও শঙ্কিত হয়ে দাম কমানো শুরু করে প্রতিযোগিতামূলকভাবে। শুরু হয় দামের নিম্নগতি। ব্যাঙ্কগুলি তখন ভয় পেয়ে কারবারীদের উপর চাপ দেয় ঋণ শোধের জন্য। তার চাপে কারবারীরা আরো দাম কমিয়ে বিক্রি বাড়াতে চেষ্টা করে। ক্রেতারা তখন বোঝে দাম আরও কমবে। তাই কেনার আগ্রহ তারা দমন করে। ফলে চাহিদা আরও কমে। লোকসানের দায়ে কারবারগুলি দেউলিয়া হতে থাকে। কলকারখানার দরজা বন্ধ হতে থাকে। শ্রমিক ছাঁটাই হতে থাকে। এমনি করে মোট উৎপাদন মোট কর্মসংস্থান, মোট আয়, মোট চাহিদা, দামস্তর, টাকার ও ঋণের যোগান, মুনাফা, মজুরি সবই হুড়মুড় করে যেন পাহাড়ের চূড়া থেকে খাদে গড়িয়ে পড়তে

থাকে এবং একে অন্যকে আরও নিচে টানতে থাকে; অবশেষে সমগ্র অর্থনীতি জুড়ে মন্দা নেমে আসে।

বাণিজ্য চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি এবার সংক্ষেপে নিচে দেখান হল :

বৈশিষ্ট্য	মন্দা (১)	পুনরুত্থান (২)	সমৃদ্ধি (৩)	অবনতি (৪)
১. মোট উৎপাদন :	কম	ধীরে ধীরে বৃদ্ধি	বেশি, পরের দিকে বিভিন্ন আনুষঙ্গিক উপাদানের যোগানে টান	হ্রাসমান
২. কর্মসংস্থান :	কম	,,	বেশি	সহসা হ্রাস
৩. দামস্তর :	,,	,,	বেশি, পরের দিকে অত্যন্ত বেশি	দ্রুত পতন
৪. মজুরির হার :	,,	ধীরে ধীরে বৃদ্ধি, কিন্তু দামস্তরের চেয়ে কম	বেশি, কিন্তু দামস্তরের চেয়ে কম	পতনশীল, কিন্তু দামস্তরের চেয়ে কম
৫. মুনাফা :	শেষ দিকে কিছুটা হতে থাকে	বৃদ্ধি	বেশি, কিন্তু নিম্নমুখী	লোকসান
৬. কারবার ফেল পড়া :	অনেক	কম	খুব কম	সহসা বৃদ্ধি
৭. মজুদ সম্ভার :	কম	ধীরে ধীরে বৃদ্ধি	বেশি, পরের দিকে খুব বেশি	হ্রাসমান
৮. ব্যাঙ্ক ঋণ :	কম	বৃদ্ধি	বেশি	সহসা হ্রাস
৯. সুদের হার :	কম	বেশ কম	বৃদ্ধি	বেশি
১০. পুঁজিদ্রব্য উৎপাদন শিল্প :	উৎপাদন বন্ধ	ধীরে ধীরে বৃদ্ধি	উৎপাদনের সবিশেষ বৃদ্ধি, পরের দিকে অত্যন্ত বেশি	সহসা বন্ধ
১১. কারবারী মনোভাব :	নিরাশা, শেষের দিকে আশার সূচনা	আশাবাদী	আশাবাদী	সংশয়, শেষের দিকে নিরাশা

৮·২· বাণিজ্য চক্রের কারণ
Causes of Trade Cycle

১. বাণিজ্য চক্রের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতের বিভিন্ন মত। এক একটি মত এক একটি তত্ত্ব। তাই বাণিজ্য চক্র সম্পর্কে বহু তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে, যাদের পরস্পরের সাথে যেমন মিল তেমনি গরমিলও অনেক। তবে ঐ তত্ত্বগুলিকে তিনটি মূল ভাগে ভাগ করা যায়। কতকগুলি তত্ত্বে **অর্থনীতিক ব্যবস্থার বাইরের** কতকগুলি বিষয়কে বাণিজ্য চক্রের কারণ বলে গণ্য করা হয়েছে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে, 'External or Exogenous Theories'। যেমন, এদের মধ্যে কোনটিতে সৌর কলঙ্কের (sun spot) আবির্ভাবকে, কোনটিতে যুদ্ধকে, কোনটিতে রাষ্ট্রবিপ্লব ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে, কোনটিতে নতুন সোনার খনির আবিষ্কারকে, কোনটিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও এক দেশ থেকে আরেক দেশে জনাগমকে, কোনটিতে নতুন দেশ ও উপকরণের আবিষ্কারকে, কোনটিতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও কারিগরী বিদ্যার বাণিজ্যিক প্রয়োগকে বাণিজ্য চক্রের কারণ বলে গণ্য করা হয়েছে।

২. কিছু তত্ত্বে বলা হয়েছে, অর্থনীতিক ব্যবস্থার মধ্যেই এমন একটা কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে যা থেকে বাণিজ্যিক চক্রের আপনাআপনি উৎপত্তি ঘটে, চলতে থাকে তার খানিকটা নিয়মিত এবং নিরন্তর পুনরাবৃত্তি, প্রতিটি সমৃদ্ধির পর্যায়ের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে পরবর্তী অবনতি ও মন্দার বীজ, আবার প্রতিটি মন্দার মধ্যেই থাকে পরবর্তী পুনরুত্থান ও সমৃদ্ধির বীজ। এদের নাম দেওয়া হয়েছে অভ্যন্তরীণ তত্ত্ব ('Internal or Endogenous Theories')। অর্থনীতিক ব্যবস্থার যে সব অভ্যন্তরীণ কারণের দরুন বাণিজ্য চক্রের উৎপত্তি ঘটে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: (১) কলকারখানার যন্ত্রপাতি অর্থাৎ পুঁজিদ্রব্য পুরনো ও অকেজো হয়ে পড়লে কিছুকাল (যথা, এক দশক) পর পর তাদের রদবদলের প্রয়োজনে নতুন বিনিয়োগের ঘটনা। সে সময় দেশে নতুন বিনিয়োগের দরুন কর্মসংস্থান, আয় এবং ব্যয় বাড়ে। তার ফলে পুনরুন্নতি শুরু হয় ও সমৃদ্ধি আসে। তার দ্বারা যে সব পুঁজিদ্রব্য সৃষ্টি হল সেগুলি ক্ষয় পেয়ে তাদের রদবদলের সময় না আসা পর্যন্ত আর নতুন বিনিয়োগ ঘটে না। সুতরাং নতুন কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টিও হয় না। তার ফলে দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা বাড়ে না। ফলে কাজ-কারবারে ভাঁটা পড়ে ও মন্দা দেখা দেয়। কিন্তু ৮/১০ বৎসরের মধ্যে সহসা এক সময়ে যাবতীয় যন্ত্রপাতি কলকবজা পুরনো ও অকেজো হয়ে পড়লে আবার সেসব রদবদলের হিড়িক পড়ে যায়। শুরু হয় কাজ-কারবারের ঊর্ধ্বগতির। (২) কিছুকাল পর পর কারবারীদের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একবার আশাবাদী ও আরেকবার নিরাশাবাদী মনোভাবের উদয়, যা পর্যায়ক্রমে পুনরুত্থান, সমৃদ্ধি, অবনতি ও মন্দার সূচনা করে ও তাদের তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়। (৩) সরকারী আয়-ব্যয় (ফিসক্যাল) এবং আর্থিক কর্মনীতিগুলি (পলিসি) দেশের মধ্যে ভোগব্যয়, বিনিযোগ ব্যয় ও সরকারী ব্যয় তথা দেশে মোট

ব্যয়ের সমষ্টিকে বাড়াতে কমাতে পারে। তাই সঠিকভাবে সরকারী আয়-ব্যয় ও আর্থিক পলিসি পরিচালিত হলে তা যেমন কারবারী চক্রের ওঠা-নামাকে খানিকটা দমন করে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে আবার তেমনি তা ভুলভাবে পরিচালিত হলে বাণিজ্য চক্রের দরুন অর্থনৈতিক অস্থিরতাকে অনেক বাড়িয়েও দিতে পারে এবং অনেক সময় তা ঘটেও থাকে।

৩. অধিকাংশ আধুনিক অর্থনীতিবিদই কিন্তু মনে করেন, বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ, এই দু'রকম কারণ একত্রে বাণিজ্য চক্রের জন্ম দেয়। বিনিয়োগ ব্যয়ের খামখেয়ালী ও দুর্দমনীয় অস্থিরতার জন্য দায়ী তিনটি প্রধান বাহ্য কারণ হল: (১) নতুন নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবন (technological innovations) ও সেগুলির বাণিজ্যিক প্রয়োগ; (২) জনসংখ্যা ও ভূখণ্ডের অতিপরিবর্তনশীল বৃদ্ধি (dynamic growth of population and territory); এবং (৩) কাজ-কারবারের পরিস্থিতি সম্পর্কে কারবারীদের আস্থার পরিবর্তনশীলতা (fluctuations in business confidence)। এই বাহ্য কারণগুলি অভ্যন্তরীণ কারণগুলির সাথে মিলে বিনিয়োগের স্তরে প্রাথমিক পরিবর্তন ঘটায় যা পরে পুঞ্জীভূত আকারে ও বহুগুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। যতই পুঁজিদ্রব্য শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়তে থাকে ততই কর্মে নবনিযুক্ত ব্যক্তিরা তাদের আয় থেকে ভোগ্য পণ্যের জন্য ব্যয় করতে থাকে। ফলে দেশে ভোগ্যপণ্যের বেচাকেনা বাড়তে থাকে ও কারবারীদের মধ্যে নতুন করে আশাবাদী মনোভাব সঞ্চারিত হতে থাকে। এর ফলে কারবার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে কারবারীরা অর্থ ও ঋণ সংগ্রহের জন্য ব্যাঙ্ক এবং লগ্নিপত্রের বাজারের শরণাপন্ন হতে থাকে। নতুন নতুন উদ্ভাবন ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অবশ্য বাণিজ্য চক্রের সাথে সংশ্রবহীনভাবেই ঘটতে পারে। কিন্তু সেজন্য কতটা পরিমাণে কারবারীরা বিনিয়োগ করবে তা নির্ভর করে কারবারী জগতের পরিস্থিতির উপরে। সুতরাং স্বল্পকালীন সময়ে, (এবং বাণিজ্য চক্র হল স্বল্পকালীন ঘটনা) কারবারীদের বিনিয়োগ, অর্থাৎ বেসরকারী বিনিয়োগ অংশত দেশের আয়স্তরের ওঠা-নামার ফল, আবার অংশত তার কারণও বটে। দীর্ঘকালীন সময়ে অবশ্য দেশের মোট আয় বা জাতীয় আয়ের স্তর যতই উঁচুতে থাকুক না কেন, পুঁজিদ্রব্যের মোট মজুদ সম্ভাব উচ্চতর স্তরে স্থিতিশীল হবে, এবং জাতীয় আয় তখন আর না বাড়লে, কারিগরী উন্নতি অব্যাহত না থাকলে কিংবা সুদের হার ক্রমাগত না কমতে থাকলে, নতুন বিনিয়োগের পরিমাণ শূন্যে পরিণত হবে।

৭. দ্রব্যসামগ্রীর বেচাকেনা ও জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি যে প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগ-চাহিদা বাড়ায় ও বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ায়, তার নাম দেওয়া হয়েছে **ত্বরণ নীতি** (acceleration principle)। আর বিনিয়োগ বৃদ্ধি যে প্রক্রিয়ায় জাতীয় আয়কে ক্রমশ উঁচু থেকে আরও উঁচু স্তরে তোলে তার নাম দেওয়া হয়েছে **গুণক** (multiplier)। ত্বরণ নীতি ও গুণক, এই দু'টিকে বাণিজ্য চক্রের অন্তর্নিহিত শক্তিশালী কারণরূপে গণ্য করা যেতে পারে।

ত্বরণ নীতির কার্যধারা ঃ দেশের জাতীয় আয় বা উৎপাদনের স্তরের উপর তার প্রয়োজনীয় পুঁজিদ্রব্যের পরিমাণটি নির্ভর করে। সে আয়টা যদি বাড়ে, তাহলেই কেবল বাড়তি পুঁজিদ্রব্যের বা নতুন নীট বিনিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেবে।

ধরা যাক, একটি মোটর গাড়ির কারখানায় বৎসরে গড়পড়তা গাড়ি বিক্রির মোট পরিমাণের দ্বিগুণ পুঁজিদ্রব্য (অর্থাৎ মোটর তৈরির যন্ত্রপাতি) হাতে রাখা হয়। সুতরাং তার বাৎসরিক বিক্রির পরিমাণ যদি ৫ কোটি টাকা হয়, তাহলে তার বিনিয়োগের (অর্থাৎ পুঁজিদ্রব্যের মোট মূল্য) পরিমাণ হবে ১০ কোটি টাকা। এক একটি যন্ত্রের দাম যদি ১ কোটি টাকা হয়, তাহলে তার মোট যন্ত্রের পরিমাণ হল ১০টি। বিভিন্ন সময়ে কেনা ঐ যন্ত্রগুলির প্রত্যেকটির আয়ু যদি ১০ বৎসর হয়, এবং প্রতি বৎসর তাকে একটি করে পুরনো যন্ত্র অকেজো হবার দরুন তুলে (depreciation) ফেলে নতুন যন্ত্র কিনতে ও বসাতে হয় (replacement), তাহলে কোম্পানীটির বাৎসরিক মোট বিনিয়োগের হার হল (gross investment) ১ কোটি টাকা এবং তা দিয়ে কেবল পুঁজিদ্রব্যের বার্ষিক ক্ষয়পূরণ হবে; কিন্তু তার বেশি কোন বিনিয়োগ অর্থাৎ নীট বিনিয়োগ বা সঞ্চয় (net investment or saving) কিছু হবে না।

এখন, ধরা যাক, ৫ বৎসর এইভাবে চলার পর ষষ্ঠ বৎসরে সহসা মোটরগাড়ির বিক্রি শতকরা ৫০ ভাগ বেড়ে বার্ষিক ৫ কোটি টাকার স্থলে ৭·৫০ কোটি টাকায় দাঁড়াল। তার দরুন যন্ত্রপাতির পরিমাণও ১০টি যন্ত্র থেকে বেড়ে ১৫টিতে দাঁড়াবে। অর্থাৎ ষষ্ঠ বৎসরে রদবদলের জন্য প্রয়োজনীয় ১টি যন্ত্র ছাড়াও আরও ৫টি যন্ত্র কিনতে হবে। সুতরাং ঐ বৎসর মোট যন্ত্র লাগবে ৬টি এবং তার দরুন বিনিয়োগ খরচ লাগবে ৬ কোটি টাকা। তার মধ্যে বার্ষিক ১টি যন্ত্র কেনার দরুন যন্ত্রপাতি রদবদলের জন্য প্রয়োজনীয় ১ কোটি টাকা বিনিয়োগ ছাড়াও অতিরিক্ত ৫ কোটি টাকাই হবে নতুন বিনিয়োগ। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, বিক্রি বা ভোগ ব্যবহারের (sale or consumption) পরিমাণ ৫০ শতাংশ বৃদ্ধির দরুন ষষ্ঠ বৎসরে মোট বিনিয়োগ বাড়বে ৬০০ শতাংশ এবং অতিরিক্ত বা নীট বিনিয়োগ বাড়বে ৫০০ শতাংশ। প্রতিবৎসর অতিরিক্ত বা নীট বিনিয়োগের পরিমাণ একই হারে (৫ কোটি টাকা) বাড়াতে হলে, অর্থাৎ সপ্তম বৎসরে মোট বিক্রি ২০ কোটি টাকা, অষ্টম বৎসরে মোট বিক্রি ২৫ কোটি টাকা, ইত্যাদি ঐ সময়ে প্রতিবৎসর বিক্রি বা ভোগ ব্যয়ের পরিমাণও ২·৫ কোটি টাকা করে বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। কিন্তু সপ্তম বৎসরে যদি বিক্রির পরিমাণ ঐ ৭·৫ কোটি টাকাই থাকে, তাহলে, সে বৎসর আর নতুন বা অতিরিক্ত কোন বিনিয়োগ ঘটবে না। সে বৎসরও যদি ধরে নেওয়া যায় ১টি যন্ত্রই শুধু রদবদল করতে হবে, তাহলে মোট বিনিয়োগ কমবে ৮৩ শতাংশ এবং নীট বিনিয়োগ কমবে ১০০ শতাংশ। ভোগব্যয় বৃদ্ধির দরুন বিনিয়োগ ব্যয় যে অনুপাতে

বাড়ে তাকে বলে ত্বরণ সহগ (acceleration co-efficient)। এখানে ত্বরণ সহগটি হল ১০।

তাহলে ত্বরণ নীতি আমাদের এই কথাটাই শেখাচ্ছে যে, বিক্রি বা ভোগব্যয়ের পরিমাণে **সামান্য** হ্রাস বৃদ্ধি ঘটলে বিনিয়োগ ব্যয়ের পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে **অনেক বেশি** এবং প্রতিবৎসর নীট বিনিয়োগের বৃদ্ধির পরিমাণ যদি **স্থির** রাখতেও হয় তাহলে প্রতিবৎসর বিক্রি বা ভোগব্যয়ের পরিমাণটা ক্রমাগত **বাড়াতে** হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রির (বা ভোগীদের আয় ও ভোগব্যয়ের) দ্বারা নতুন বিনিয়োগ কিভাবে ত্বরণ প্রক্রিয়ায় প্রণোদিত হয়ে থাকে। এইটিই হল ত্বরণ তত্ত্ব বা ত্বরণ নীতি।

ত্বরণ নীতির দরুন, দেশে আয় ও ভোগব্যয় বাড়লে যেমন নতুন বিনিয়োগের চাহিদা জন্মায় ও বিনিয়োগ উৎসাহ পায়, তেমনি আয়, ভোগব্যয় এবং দ্রব্য-সামগ্রীর বিক্রি কমে গেলে কেবল যে নতুন বিনিয়োগই শূন্যে পরিণত হতে পারে তা নয়, কারবারীরা যন্ত্রপাতির বার্ষিক রদবদল পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে পারে। তখন মোট বিনিয়োগও শূন্যে পরিণত হয়।

সুতরাং ত্বরণ নীতির কার্যধারা থেকে দেখা যাচ্ছে, দেশে দ্রব্যসামগ্রীর মোট বিক্রির পরিমাণ বাড়তে শুরু করলে বিনিয়োগ বাড়ে, কিন্তু মনে রাখতে হবে মোট বিক্রি পরিমাণ বাড়াটাই একমাত্র কথা নয়। মোট বিক্রির পরিমাণ কি হারে বাড়ছে সেটা মূল প্রশ্ন। কেন না, এমন যদি হয় যে মোট বিক্রির পরিমাণ বাড়ছে ঠিকই কিন্তু বাড়ার হার ধীরে ধীরে কমছে তেমন ক্ষেত্রে অর্থনীতিতে অবনতি ও মন্দা দেখা দিতে পারে।

৫. **গুণক (Multiplier)-এর ক্রিয়া :** পুঁজিদ্রব্যের জন্য খরচ বা এক কথায় যাকে বিনিয়োগ বলা হয়, তার কাজ হল দেশে নতুন কর্মসংস্থান ও নতুন আয় সৃষ্টি করা। নতুন পুঁজিদ্রব্যের জন্য যে খরচটা হয় (বিনিয়োগ) তা ঐ পুঁজিদ্রব্য তৈরির কাজে উপাদানগুলির নিয়োগ ঘটায় এবং তাদের কাজের পারিশ্রমিক বাবদ আয়ে (যথা, মজুরি, খাজনা, সুদ, মুনাফা) রূপান্তরিত হয়। সে আয় থেকে উপাদানের মালিকেরা তাদের ভোগের প্রয়োজনে খরচ করে (ভোগব্যয়)। আয়ের কতটা অংশ তারা খরচ করবে সেটা নির্ভর করে তাদের সঞ্চয়ের প্রবণতা (propensity to save) ও ভোগের প্রবণতার (propensity to consume or consumption function) উপর। ১ টাকা আয় বাড়লে তা থেকে যদি তারা ৭৫ পয়সা ভোগের জন্য খরচ করে ও ২৫ পয়সা রেখে দেয়, তাহলে, তাদের ভোগপ্রবণতা হল $\frac{৩}{৪}$ এবং সঞ্চয় প্রবণতা হল $\frac{১}{৪}$। অর্থাৎ কাজে নিযুক্ত উপাদানগুলির মালিকেরা তাদের আয়ের $\frac{১}{৪}$ সঞ্চয় করতে থাকবে ও $\frac{৩}{৪}$ খরচ করতে থাকবে। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এ ধারণাটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরা যাক, সমাজে নীট বিনিয়োগ (বা নতুন অতিরিক্ত বিনিয়োগ) হল ৪ কোটি টাকা। বিনিয়োগকারীরা ঐ ৪ কোটি টাকা ব্যয় করার ফলে ঐ টাকা আয়ের আকারে অনেকের হাতে আসবে। যাদের

হাতে এ টাকা আয় হিসাবে আসবে তাদের ভোগপ্রবণতা $\frac{3}{4}$ ও সঞ্চয় প্রবণতা $\frac{1}{4}$ হলে, তারা সবাই মিলে এ ৪ কোটি টাকা আয়ের থেকে ৩ কোটি টাকা ভোগব্যয় করবে আর ১ কোটি টাকা সঞ্চয় করবে। এখন ৩ কোটি টাকা ভোগব্যয় করার দরুন যাদের হাতে এ ৩ কোটি টাকা আয় হিসাবে পৌঁছবে, তারা আবার তা থেকে ২·২৫ কোটি টাকা খরচ করবে ও ৭৫ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করবে। আবার, ভোগব্যয় ২·২৫ কোটি টাকা হওয়ার দরুন কারো কারো হাতে এ ২·২৫ কোটি টাকা আয় হিসাবে আসবে। যাদের হাতে আয় হিসাবে এ টাকা আসবে তারা এ টাকার $\frac{3}{4}$ ভাগ অর্থাৎ ১ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা খরচ করবে ও বাকিটা ($\frac{1}{4}$ ভাগ) সঞ্চয় করবে। এমনিভাবে ঐ প্রাথমিক বিনিয়োগ ধাপে ধাপে নতুন আয় সৃষ্টি করতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত ঐ আয়ের মোট যোগফল হবে ৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ, দেশবাসীর প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা যদি $\frac{1}{4}$ হয় তাহলে, প্রাথমিক বিনিয়োগের ৪ গুণ পরিমাণ মোট নতুন আয় সৃষ্টি হবে। ঠিক এভাবে হিসাব করে দেখান যায়, প্রান্তিক সঞ্চয়ের প্রবণতা যদি $\frac{1}{3}$ হয়, তবে প্রাথমিক বিনিয়োগের ৩ গুণ নতুন আয় সৃষ্টি হবে, প্রান্তিক সঞ্চয়ের প্রবণতা $\frac{1}{5}$ হলে, প্রাথমিক বিনিয়োগের ৫ গুণ নতুন আয় সৃষ্টি হবে। এইভাবে প্রাথমিক বিনিয়োগের দরুন মোট নতুন আয় সৃষ্টির পরিমাণ প্রাথমিক বিনিয়োগের যতগুণ হবে তাকে বলে 'বিনিয়োগ গুণক' বা শুধু 'গুণক' (investment multiplier or multiplier)। উপরের দৃষ্টান্তে গুণক হল ৪।

৬. **গুণক ও ত্বরণ নীতির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া :** গুণক ও ত্বরণ নীতির পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধারাটি লক্ষ্য করলে, ধনতন্ত্রী অর্থনীতির অন্তর্নিহিত কারণ থেকে কিভাবে বাণিজ্য চক্রের আবর্তন ঘটে তা বোঝা যায়। নতুন বিনিয়োগ বা নীট্ বিনিয়োগের দরুন যে কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টি হয়, তাতে সমাজের ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়। ভোগব্যয় বৃদ্ধির দরুন আবার বিনিয়োগ বাড়ে কয়েক গুণ, নতুন বিনিয়োগ বাড়ার ফলে নতুন কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টি হতে থাকে। এ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সূত্রের আকারে বর্ণনা করা যায় : নতুন বিনিয়োগ→নতুন কর্মসংস্থান→ নতুন আয়→নতুন ভোগব্যয়→নতুন বিনিয়োগ→নতুন কর্মসংস্থান। এ প্রক্রিয়াই অর্থনীতিকে পুনরুত্থান ও সমৃদ্ধির পথে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে যায়। আবার ভোগব্যয় বৃদ্ধির হারটি যদি কখনও কমে বা তার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়, তখন বিনিয়োগ বৃদ্ধির হারটি বেশ কয়েক গুণ কমে যায় বা শূন্যে পরিণত হতে পারে। তখন সূত্রপাত হয় অবনতি ও মন্দার। এইভাবে দেশের অর্থনীতিটা স্বল্পকালীন সময়ে ত্বরণ নীতি ও গুণকের দুষ্ট চক্রের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে এবং অর্থনৈতিক কার্যাবলীর সংকোচন সম্প্রসারণের বা বাণিজ্য চক্রের আবর্তনের শিকার হয়ে থাকে। দীর্ঘকালীন সময়ে কারিগরী অগ্রগতি কিংবা জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রভৃতি বহিরাগত কারণে অর্থ-নৈতিক কার্যাবলীর উন্নতি ও বৃদ্ধি ঘটে। তখন ত্বরণ নীতিটা মুখ্যত কাজ-কারবার বৃদ্ধির সহায়ক উপাদান রূপে কাজ করে।

৮·৩. বাণিজ্য চক্রের নিয়ন্ত্রণ
Control of Trade Cycles

১. ধনতন্ত্রী ও মিশ্র অর্থনীতিতে বাণিজ্য চক্র সম্পূর্ণ দূর করা অসম্ভব। তাই ধনতন্ত্রী অর্থনীতির একমাত্র প্রচেষ্টা হয় কিভাবে বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণ করা যায়। নিয়ন্ত্রণের পন্থা হল চারটি: জনসাধারণের ভোগ ও বেসরকারী বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ; যথোপযুক্ত মজুরি ও দামনীতি গ্রহণ; কার্যকর আর্থিক নীতি গ্রহণ; এবং উপযুক্ত সরকারী আয়-ব্যয় নীতি (অর্থাৎ ফিসক্যাল পলিসি) গ্রহণ। বাণিজ্য চক্র বিরোধী এই সব পন্থার মূল উদ্দেশ্য হল পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে অর্থনীতি ও দামস্তরকে স্থিতিশীল রাখা।

২. **দেশের মোট ভোগব্যয় ও বেসরকারী বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ** (Control of consumption expenditure and private investment) : এর মূল লক্ষ্য হল দেশের মোট ভোগব্যয় এবং মোট বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মারফত দেশের মোট ব্যয় (aggregate expenditure) স্থিতিশীল করে তার মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনীতিক কার্যাবলীতে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা।

ভোগব্যয় নিয়ন্ত্রণ : দেশের মোট ভোগব্যয় নির্ভর করে দু'টি বিষয়ের উপর— (ক) কর বাদে দেশবাসীর হাতে অবশিষ্ট খরচ-যোগ্য আয় (disposable income), (খ) ভোগ প্রবণতা বা ভোগ অপেক্ষক (propensity to consume or consumption function)।

ভোগব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও স্থিতিশীল করার প্রত্যক্ষ পদ্ধতি হল ভোগ প্রবণতাকে প্রভাবিত করা, এবং এর পরোক্ষ পদ্ধতি হল দেশবাসীর খরচ-যোগ্য আয়কে স্থিতিশীল করা।

প্রত্যক্ষ পদ্ধতি : ভোগ প্রবণতাকে প্রভাবিত করা যায় দু'টি ভাবে— (ক) আয়ের পুনর্বণ্টন ঘটানো, এবং (খ) বিভিন্ন হারে ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের উপর কর ধার্য করা। ধনীদের তুলনায় গরিবদের আয়ের বেশির ভাগই ভোগের জন্য খরচ হয়। কিন্তু আয় বণ্টনে বৈষম্যের ফলে গরিবদের মোট আয় কম থাকে; ফলে দেশের মোট ভোগব্যয় কম হয়ে থাকে। তাই দেশের আয় বণ্টনে পরিবর্তন ঘটিয়ে আয় বৈষম্য কমালে দেশের মোট ভোগব্যয় বাড়বে। কিন্তু তা করতে হলে কর-কাঠামোকে এত বেশি প্রগতিশীল করতে হবে যে, বাস্তবে তা সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ বেসরকারী বিনিয়োগ তাতে ক্ষুণ্ণ হতে পারে। আর, বাণিজ্য চক্রের সমৃদ্ধির পর্যায়ে ভোগব্যয়ের উপর কর বসিয়ে ভোগব্যয়কে অত্যধিক হতে না দিয়ে, এবং অবনতি ও মন্দাব পর্যায়ে সঞ্চয়ের উপর কর ধার্য করে জনসাধারণকে ভোগব্যয়ের পরিমাণ বাড়াতে বাধ্য করে, গোটা বাণিজ্য চক্রের সময়টাতে মোট ভোগব্যয় স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করা যায়।

পরোক্ষ পদ্ধতি : ভোগব্যয় স্থিতিশীল করার পরোক্ষ পদ্ধতি তিন রকমের। প্রথম, অর্থনীতি যখন সমৃদ্ধির পর্যায়ে এসে পৌছায়, তখন সমাজের মধ্য থেকে

খরচ-যোগ্য আয়ের একটা অংশ তুলে নেবার ব্যবস্থা করতে হয় যাতে সমাজের মোট ব্যয় কমান যায়। এ জন্য শ্রমিকদের সামাজিক বীমার দেয় চাঁদার হার বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া আয়করের হার খুব বেশি প্রগতিশীল কবা যেতে পাবে। অন্যদিকে, অবনতি ও মন্দার সময় কর্মহীন ব্যক্তিদের বেকারভাতা দিয়ে, আয়করের হার কমিয়ে দিয়ে সমাজের খরচযোগ্য আয়স্তরকে স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা কবা যেতে পারে। দ্বিতীয়, অবনতি ও মন্দার সময় কৃষিজাত পণ্যের দাম অত্যধিক কমে গেলে সমর্থনমূলক ব্যবস্থা দ্বারা (price-support) এবং অন্যভাবে সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া; আবার পুনরুন্নতি ও সমৃদ্ধির সময় ত' তুলে দিয়ে কৃষকদেব খরচ-যোগ্য আয়স্তব স্থিতিশীল বাখার চেষ্টা কবা যেতে পারে। তৃতীয়, আয় উপার্জনের সূত্র থেকেই আয়কব কেটে নেবার ব্যবস্থা করা যেতে পাবে।

বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ঃ ধনতন্ত্রী ও মিশ্র অর্থনীতিতে মোট বিনিয়োগেব বড অংশটি হল বেসবকারী বিনিয়োগ। বেসরকাবী বিনিযোগ তিন জাতীয়—যন্ত্রপাতি সাজসবঞ্জামেব জন্য খবচ, গৃহনির্মাণ খরচ, এবং কাঁচামাল ও তৈবী পণ্যেব মজুদসম্ভাব ধরে বাথার খরচ। সামগ্রিকভাবে, অবনতি ও মন্দাব সময়ে বেশি হাবে অবচয় কাটা অনুমোদন করে, কবেব বোঝা কমিয়ে ও নতুন বিনিয়োগকে কব থেকে বেহাই দিয়ে এবং সমৃদ্ধির পযায়ে ঐ সুবিধাগুলি ধীবে ধীবে প্রত্যাহাব কবে মোট বেসবকাবী বিনিয়োগ-ব্যয় স্থিতিশীল বাথার চেষ্টা কবা যায।

৩. **যথোপযুক্ত মজুরি ও দাম নীতি** (Appropriate wage-price policy) ঃ সাধারণত, বাণিজ্য চক্রেব ওঠা-নামাব সময় মজুবি ও দামস্তবেবও প্রবল ওঠা নামা ঘটে। কিন্তু অর্থনীতিতে একচেটিয়া কারবার ও অলিগোপলিব আধিপত্য থাকলে, চডতিব বাজারে দাম যতটা বাডে, মজুবি ততটা বাডে না, এবং মন্দাব সময় মজুবি যতটা কমে, দাম ততট কমে না। এর ফলে অর্থনীতিতে নানা ধরনেব বিকৃতি ঘটে এবং স্বাভাবিক অবস্থাব পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে। এই কাবণে, সরকাবী হস্তক্ষেপেব দ্বাবা মজুবি ও দামস্তব নিয়ন্ত্রণের প্রযোজন দেখা দেয়। এজন্য অর্থনীতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে বাণিজ্য চক্রবিবোধী যথোপযুক্ত মজুবি ও দাম নীতি গ্রহণ করতে হয়।

৪. **আর্থিক নীতি** (Monetary policy) ঃ বাণিজ্য চক্রের দরুন কারবাবী পরিস্থিতির ওঠানামা কমিয়ে আনার জন্য প্রধান আর্থিক অস্ত্রগুলি হল--কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব বাট্টার হাবের পবিবর্তন, সরকারী ঋণপত্রের খোলাবাজারী বেচাকেনা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব কাছে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিব সংবক্ষিত জমার অনুপাতের পরিবর্তন-এগুলি হল ঋণের প বমাণগত নিয়ন্ত্রণেব পদ্ধতি। এ পদ্ধতির সাথে যুক্ত কবতে হয় ঋণ নিয়ন্ত্রণেব গুণগত ও বিচারমূলক পদ্ধতিগুলি।

চডতির বাজাবকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাট্টার হার বাডিয়ে, সরকারী ঋণপত্র বিক্রি করে এবং ব্যাঙ্কগুলিব সংরক্ষিত জমার অনুপাত বাডিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক-গুলির ঋণ দেবার ক্ষমতা কমানো ও বাজারে ঋণের যোগান কমানো হয়। সেই

সাথে গুণগত ও বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, যথা, ঋণের মার্জিন বাড়িয়ে, ভোগী-ঋণ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির সাহায্যে ঋণের অবাঞ্ছিত ব্যবহার বন্ধ করা হয়।

অবনতি ও মন্দার সময় বাট্টার হার কমিয়ে, সরকারী ঋণপত্র পুনরায় বাজার থেকে কিনে নিয়ে ও সংরক্ষিত জমার অনুপাত কমিয়ে দিয়ে ব্যাঙ্কগুলির ঋণ দেবার ক্ষমতা বাড়ানো এবং বাজারে ঋণের যোগান বাড়ানো হয়। সেই সাথে ঋণের গুণগত ও বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করে ঋণের শর্তাবলী উদার করা হয়।

এইভাবে বাণিজ্য চক্রবিরোধী আর্থিক নীতির সাহায্যে বাণিজ্য চক্রজনিত কারবারী পরিস্থিতির ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

সীমাবদ্ধতা : কিন্তু বাণিজ্য চক্রবিরোধী আর্থিক নীতির মূল অসুবিধা হল, এর সাহায্যে সমৃদ্ধি ও চড়তির সময়ে ঋণের যোগান কমিয়ে দেওয়া সম্ভব হলেও, অবনতি এবং মন্দার সময়ে এর সাহায্যে ঋণের যোগান বৃদ্ধিটা সুনিশ্চিত করা যায় না। কারণ মন্দার বাজারে কারবারীরা ঋণ নিতে চায় না। তা ছাড়া সমৃদ্ধির সময় ঋণের যোগান কমাতে গেলে তা উল্টো বিপদ ডেকে আনতে পারে। কারণ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে ঋণের পরিমাণ যতটুকু কমান উচিত বলে ভাবা হয়, বাস্তবে ঋণের পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে কমে যেতে পারে। তাতে অর্থনীতিতে অবনতি ও মন্দার আবির্ভাব ঘটতে পারে। এই কারণে বাণিজ্য চক্র দমনের জন্য আর্থিক নীতি যথেষ্ট নয়।

৫. **বাণিজ্য চক্রবিরোধী ফিসক্যাল পলিসি :** এই নীতির মূল উদ্দেশ্য হল, বাণিজ্য চক্রজনিত বাজারের অস্থিরতা কমানোর জন্য, সরকারী আয় ব্যয় ও ঋণের মারফত দেশের মোট ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা। এর মূল পদ্ধতি হল, চড়তির বাজারে কর প্রভৃতি বাড়িয়ে একদিকে সরকারী আয় বাড়ান, আর অন্যদিকে সরকারী ব্যয় কমিয়ে বাজেটে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা। মন্দার সময় সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি অনুসরণ করতে হয়। তখন করের হার কমিয়ে সরকারী আয় কমাবার নীতি গ্রহণ করতে হয়; এবই সঙ্গে সরকারী আয় অপেক্ষা সরকারী ব্যয় বাড়িয়ে দিয়ে বাজেট ঘাটতি সৃষ্টি করতে হয়। এর ফলে চড়তির বাজারে দেশের মোট ব্যয় কমে এবং তার ফলে দেশের পণ্যসামগ্রীর যোগানের তুলনায় মোট চাহিদা দ্রুত বাড়তে পারে না। মন্দার সময়ে দেশের মোট ব্যয় বাড়ে এবং তার ফলে, দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা ও বিক্রি বেড়ে যায়।

চড়তি বাজারে এজন্য নানারকম করের হার বাড়িয়ে, নতুন কর বসিয়ে এবং সরকারী ঋণ শোধের সময় উপস্থিত হলে তা নগদে শোধ না করে নতুন ঋণপত্রের দ্বারা পুরানো সরকারী ঋণ শোধ করে এবং সরকারী ব্যয় ছাঁটাই করে সরকারের আয় বাড়ানো ও মোট ব্যয় কমানো হয়।

মন্দার সময় যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা হল, কর কমানো, করের হার কমানো, বেকারভাতা দেওয়া, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দামে ভরতুকি দেওয়া,

নতুন বিনিয়োগে কর-ছাড়ের সুবিধা দেওয়া, এবং তার সাথে সরাসরি সরকারী ব্যয়ের মারফত, যেমন, রাস্তাঘাট সংস্কার ও নির্মাণ, জলাধার ও নদীবাঁধ নির্মাণ, পোতাশ্রয় ও বিমানবন্দর এবং আবাসগৃহ নির্মাণ কর্মসূচীর দ্বারা দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি।

উপসংহার ঃ তবে, বাণিজ্য চক্রবিরোধী উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলির প্রয়োগের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, ওই ব্যবস্থাগুলি কেউ কারো বিকল্প নয় বরং একে অপরের পরিপূরক ও সম্পূরক। তাই বর্তমানে সমস্ত ধনতান্ত্রিক ও মিশ্র অর্থনীতির দেশে উপরোক্ত সমস্ত বাণিজ্য চক্রবিরোধী ব্যবস্থাগুলি অর্থাৎ, আর্থিক নীতি, ফিস্‌ক্যাল নীতি ও অন্যান্য পদ্ধতিগুলি প্রয়োজনমত একযোগে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

রাষ্ট্রের অর্থসংস্থান
PUBLIC FINANCE

৯· ১· সরকারী বনাম ব্যক্তিগত অর্থসংস্থান
Public vs. Private Finance

১. **মিল ঃ** সরকারী ও ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়-ঋণের মধ্যে কতকগুলি মিল দেখা যায় : (ক) উভয়েরই উদ্দেশ্য হল সর্বাধিক কল্যাণ লাভ। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে চেষ্টা করে এর মধ্য দিয়ে তার পরিবারের সর্বাধিক কল্যাণ লাভের ; সরকারের উদ্দেশ্য, সমস্ত দেশবাসীর সর্বাধিক কল্যাণ। (খ) ব্যক্তির আয় যেমন অনেক ক্ষেত্রেই স্থির-নির্দিষ্ট নয়, তেমনি সরকারের আয়ও স্থির-নির্দিষ্ট নয়। (গ) আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে ব্যক্তি ঋণ করে তার সংস্থান করে, সরকারও তা করে থাকে।

২. **অমিল ঃ** সবকারী ও ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়-ঋণের মধ্যে কিন্তু মিলের তুলনায় অমিলই বেশি : (ক) অধিকাংশ মানুষই নিজের আয় বুঝে ব্যয় করার চেষ্টা করে। সবকাব কিন্তু প্রথমে তাব ব্যয়ের হিসাব করে এবং তারপর তার সংস্থান যাতে হয় সেই পরিমাণে আয়ের চেষ্টা করে।

(গ) ব্যক্তিব আয়েব সীমা আছে, কিন্তু সরকারের আয়ের সীমা নেই। দরকার মত সরকার তা বাড়াতে পাবে।

(গ) কোন ব্যক্তির আয়-ব্যয়-ঋণ তার সামর্থ্যের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ এবং তার প্রভাব তার পরিবাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সরকারের আয়-ব্যয়-ঋণের প্রভাব পড়ে সারা দেশে, সমস্ত দেশবাসীর জীবনে ও তাদের কার্যকলাপের উপর।

(ঘ) ব্যক্তির ঋণ করার সুযোগ বডজোর তার স্বদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ; কিন্তু সরকার যেমন দেশের জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ করতে পারে, তেমনি বিদেশ থেকে, বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের কাছ থেকেও ঋণ করতে পারে।

(ঙ) ব্যক্তির মানসিক গঠন এমনই যে সে ভবিষ্যতের অভাব মোচন সম্পর্কে বা অভাবের তীব্রতা সম্পর্কে খুব বেশি চিন্তা করে না বা করতে পারে না ; তার কাছে বর্তমান অভাব দূর করাটাই অতিশয় গুরুত্ব অর্জন করে। কিন্তু জাতির শুধু বর্তমান প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখলেই সরকারের চলে না, জাতির ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথা মনে রেখেও তাকে কাজ করতে হয়।

(চ) ব্যক্তির আয়-ব্যয়-ঋণের ব্যাপারটা হল ঘরোয়া বিষয়, তা অন্যের জানার বিষয় নয়। কিন্তু সরকারের আয়-ব্যয়-ঋণ হল সর্বসাধারণের স্বার্থের সাথে জড়িত। তাই তা যেমন সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় তেমনি তা সর্বসাধারণের আলোচিত বিষয়েও পরিণত হয়।

৯. ২. রাষ্ট্রের ব্যয়
Public Expenditure

১. ১৯৫০-৫১ সাল থেকে বর্তমান কালের মধ্যে ভারত সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ বেড়েছে বহুগুণ। কেবল ভারত সরকারেরই নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশেই নানা কারণে সরকারের ব্যয় এরকম দারুণভাবে বেড়ে চলেছে।

২. **সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির কারণঃ** (ক) সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ছাড়া পৃথিবীর অন্য সব দেশেই **দামস্তর** ক্রমাগত **বেড়ে চলেছে** বলে ব্যক্তিগত ব্যয়ের মত সরকারের ব্যয়ও ক্রমাগত বাড়ছে। (খ) আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রগুলি যেমন ভয়াবহ তেমনি ব্যয়বহুল হওয়ায় সবদেশেরই **প্রতিরক্ষার খরচ বেড়ে চলেছে** (গ) পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই **লোকসংখ্যা বাড়ছে** বলে শান্তিরক্ষা, বিচার ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাজকর্ম প্রভৃতি সরকারের চিরাচরিত কাজগুলির খরচও বাড়ছে। (ঘ) সব দেশেই সমাজের গরিব, অবনত ও পশ্চাৎপদ অংশের মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্য সরকারের **লোককল্যাণমূলক খরচ বাড়ছে**। (ঙ) ভারতের মতো **স্বল্পোন্নত** দেশগুলিতে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভার প্রধানত সরকারকে নিতে হচ্ছে বলে সরকারের **উন্নয়নমূলক ব্যয় বাড়ছে**। (চ) জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ, জাতীয় ক্রীড়া ও আমোদপ্রমোদ, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয় এবং জনসাধারণের পানীয় জলের ব্যবস্থা, পয়ঃপ্রণালীর উন্নতি, বিদ্যুৎ সরবরাহ, সড়ক তৈরি প্রভৃতি ন্যূনতম ও অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন মেটাতে সরকারের খরচের বহর দিনের পর দিন বাড়ছে। (ছ) বেকার সমস্যার সমাধান ও সামাজিক নিরাপত্তা (অবসর ভাতা, বেকার ভাতা, সামাজিক বীমা ইত্যাদি) ব্যবস্থা করার জন্যও সরকারি ব্যয় বাড়ছে।

৩. **সরকারী ব্যয়ের প্রকারভেদঃ** (১) পৃথিবীর **উন্নত দেশগুলি সরকারী ব্যয়কে** পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (ক) প্রশাসনিক ব্যয় বা শাসনকার্য পরিচালনার খরচ; (খ) প্রতিরক্ষা ব্যয়; (গ) পরিবহণ ও সংসরণ ব্যয় (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তা ও লোককল্যাণ ব্যয়, এবং (ঙ) প্রাকৃতিক উপকরণগুলি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যয়।

(২) কিন্তু ভারতের মত **স্বল্পোন্নত দেশগুলির সরকারী ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ** কিছুটা ভিন্ন ধরনের। এই সব দেশের সরকারী ব্যয়কে প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (ক) **উন্নয়নমূলক ব্যয়** যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সমাজকল্যাণমূলক খরচ ও কৃষি, শিল্প, সমবায়, বনসম্পদ ও জলসম্পদ ইত্যাদির উন্নয়নমূলক ব্যয়; এবং (খ) **প্রত্যক্ষভাবে উন্নয়নমূলক নয় এমন ব্যয়,** যেমন প্রশাসনিক ও প্রতিরক্ষা খরচ, সরকারী ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধ প্রভৃতি।

(৩) সরকারী ব্যয়ের দুটি শ্রেণীবিভাগ কিন্তু সবদেশেই প্রচলিত। তা হল (ক) **চলতি খাতে ব্যয়,** (খ) **মূলধনী খাতে ব্যয়।** বিভিন্ন দেশের উপরো

বিভিন্ন শ্রেণী বা দফার সরকারী ব্যয়ের প্রত্যেকটিতেই চলতি খাতে যেমন ব্যয় হয় তেমনি মূলধনী খাতেও ব্যয় হয়। বৎসর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে খরচের ফলাফল শেষ হয়ে যায় তা হল চলতি খাতে খরচ। যেমন, সরকারী কর্মচারীদের বেতন। সুতরাং প্রতি বৎসর বারংবার এই খরচগুলি করতে হয়। আর যে খরচের সুফলটা অনেকদিন ধরে ভোগ করা যায় তা হল মূলধনী খাতে খরচ। যেমন, সরকারী অফিসের একটি নতুন দালান তৈরির খরচ। সুতরাং একটি বিষয়ে একবার মূলধনী খাতে খরচ হলে কিছু দিনের জন্য সে উদ্দেশ্যে আর ব্যয় করার প্রয়োজন হয় না।

৪. **সরকারী ব্যয়ের নীতি** : ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারের কতকগুলি নীতি মেনে চলা উচিত। সব দেশের সরকারই এই সকল নীতি কমবেশি মেনে চলতে চেষ্টা করে এবং তা না করলে সমালোচনার সম্মুখীন হয় : (ক) **সর্বাধিক সামাজিক মঙ্গল**—এমনভাবে প্রতিটি টাকা সরকারের খরচ করা উচিত যাতে সমাজের সামগ্রিক মঙ্গল সর্বাধিক হয়। রাষ্ট্রের টাকা কোন বিশেষ ব্যক্তির স্বার্থে কখনই খরচ করা উচিত নয়। সরকারী ব্যয়ের দ্বারা প্রতিরক্ষা, শান্তিশৃঙ্খলা ও বিচারের সুব্যবস্থা, উৎপাদন ও জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি, জাতীয় আয়ের অধিকতর সমবণ্টন, দ্রব্যমূল্যস্তর কমিয়ে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা এবং শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যতের জন্যও সংস্থান করা হলে —তবেই সর্বাধিক সামাজিক মঙ্গল ঘটবে বলে মনে করা হয়।

(খ) **ব্যয়সংকোচ** : এমনভাবে সরকারের টাকা খরচ করা উচিত যেন তাতে কোন অপব্যয় বা অপচয় না হয় কিংবা তাতে মানুষের সঞ্চয় করার ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ না হয়।

(গ) **উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা ব্যয় মঞ্জুরি** : আইনসভা বা সংসদের বিনা অনুমোদনে সরকারের কোন টাকা খরচ করা কখনই উচিত নয়। তেমনি মঞ্জুর করা খরচের টাকা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত আদেশ ছাড়াও কখনো খরচ করা উচিত নয়।

(ঘ) **নিরপেক্ষতা** : এমনভাবে সরকারের টাকা খরচ করা উচিত যাতে দেশের উৎপাদন ব্যাহত না হয় ও আয়ের বণ্টনে বৈষম্য সৃষ্টি না হয়।

(ঙ) **স্থিতিস্থাপকতা** : সরকারের বা রাষ্ট্রের ব্যয় এমন হওয়া উচিত যেন তা প্রয়োজন মতো বাড়ানো বা কমানো যায়।

৫. **সরকারী ব্যয়ের ফলাফল** : সরকারী ব্যয় দেশের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট উৎপাদন বা জাতীয় আয়, দেশে মানুষের মোট কর্মসংস্থান এবং দেশের জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে আয়ের বণ্টনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সরকারী ব্যয়ের ফলে দেশের নানা শ্রেণীর মানুষের আর্থিক আয় হয়, ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। তাতে জনসাধারণের ভোগ ও সঞ্চয় বাড়ে এবং তার ফলে জনসাধারণের কাজ করার ও সঞ্চয় করার ইচ্ছার ও ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সরকারী ব্যয় দেশের উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়ের বণ্টনে পরিবর্তন ঘটায়।

(ক) **উৎপাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল** ঃ সরকারী ব্যয়ের ফলে দেশের সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতা যেমন বাড়ে, তেমনি মোট উৎপাদনও বাড়ে। এটা সম্ভব হয় সরকার যখন দেশের শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য এবং প্রাকৃতিক উপকরণগুলির সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের জন্য রাজকোষ থেকে টাকা খরচ করে। কল্যাণমূলক ব্যয়ের দ্বারা (বেকার ভাতা, পেনসন, বিনামূল্যে শিক্ষা, গরিবদের ও শ্রমিকদের সস্তায় খাদ্য সরবরাহ ইত্যাদি) দেশের মানুষের ভোগ প্রবণতা ও মোট ভোগব্যয় বাড়ে। তার ফলে দেশে দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা বাড়ে ও উৎপাদন বাড়ানোর সুযোগ ঘটে। সরকারী ব্যয়ের দ্বারা দেশের বেসরকারী শিল্পগুলিতে যেমন দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে বলে তাদের উৎপাদন বাড়তে পারে (রেলকর্তৃপক্ষ ওয়াগন কিনলে ওয়াগন তৈরির কারখানায় ওয়াগনের উৎপাদন বাড়বে), তেমনি সরকারী ব্যয়ে সরকারী কলকারখানা স্থাপিত হলে তার ফলেও দেশের দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়ে। ফলে দেশে মোট উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে। জাতীয় আয় বাড়ে।

(খ) **কর্মসংস্থানের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল** ঃ দেশে কর্মসংস্থানের স্তর, অর্থাৎ কত লোকের কাজের সংস্থান হবে তা নির্ভর করে সমাজে মোট ব্যয়ের পরিমাণের বা প্রবাহের আয়তনের উপর। যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে অব্যবহৃত প্রাকৃতিক উপকরণ ও বেকারত্ব থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির দরুন দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে এবং সে সবের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে ঐ সব প্রাকৃতিক উপাদানের ব্যবহার ও বেকারদের কাজে নিয়োগ ঘটতে থাকে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে কর্মসংস্থানও বাড়ে।

(গ) **আয়ের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল** ঃ সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ফলে দেশের মোট উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ে বলে জাতীয় আয়ও বাড়ে এবং জাতীয় আয়ের বণ্টনে পরিবর্তন ঘটতে পারে। সরকারী ব্যয় যদি এমনভাবে করা হয় যাতে কম আয়ের মানুষেরা বেশি উপকৃত হয় (যেমন বেকার ভাতা, বিনামূল্যে গরিবদের শিক্ষার ব্যবস্থা, গরিবদের জন্য সস্তা দরে খাদ্য বস্ত্র সরবরাহ, কম ভাড়ায় বাসস্থান ইত্যাদি), তাহলে তেমন সরকারী ব্যয়ের ফলে দেশের মধ্যে ধনী ও গরীবের আয় বৈষম্য কমতে পারে।

৯·৩· রাষ্ট্রের আয় ও রাজস্বের উৎস
Sources of Public Revenue

১. সরকারের আয় বা রাজস্বের উৎস হল মূলত দু'টি ঃ (১) কর-রাজস্ব, (২) কর বাদে অন্যান্য উৎস।

(১) **কর রাজস্ব** ঃ সরাসরিভাবে সরকারের কাছ থেকে **কোন সুবিধা লাভের আশা না করে** করদাতার পক্ষ থেকে সরকারকে **বাধ্যতামূলকভাবে** যে অর্থ দিতে হয় তাকেই কর বলে। এজন্য সরকারের কাছ থেকে করদাতার

কোন সুবিধা লাভের অধিকার জন্মায় না। কিন্তু এটা দণ্ড বা জরিমানাও নয়। তবে এর ফলে করদাতাদের আয় ও সম্পত্তির একটি অংশ সরকারের হস্তগত হয় ও তাদের আয় ও সম্পত্তির পরিমাণ কমে যায়। কর দুই রকমের (ক) **প্রত্যক্ষ কর**, যেমন আয়কর, সম্পদ কর, সম্পত্তি কর, দান কর, ইত্যাদি; (খ) **পরোক্ষ কর**, যেমন বিক্রয় কর, অন্তঃশুল্ক, আমদানী শুল্ক, রপ্তানী শুল্ক, চুঙ্গি ইত্যাদি। সরকারী রাজস্বের অনেক উৎসের মধ্যে একমাত্র কর হল বাধ্যতামূলক, অন্য উৎসগুলি নয়।

(২) **কর বাদে অন্যান্য উৎস ঃ** (ক) **রাষ্ট্রের সম্পত্তিলব্ধ আয় ঃ** সরকারের জমিজমা, গৃহসম্পত্তি ইত্যাদি থাকলে তা থেকে খাজনা, ভাড়া ইত্যাদি আয় হতে পারে। ভারতে খাসমহল জমি থেকে সরকারের আয় এর একটি দৃষ্টান্ত।

(খ) **রাষ্ট্রীয় কারবারের আয় ঃ** রাষ্ট্রের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত কারবার থাকলে তা থেকে সরকারের খরচ বাদে যে নীট আয় বা মুনাফা হয় তা সরকারী রাজস্বের একটি উৎস। ভারতে এখন বহু রকমের রাষ্ট্রীয় কারবারী সংস্থা আছে। এদের আয় সরকারের রাজস্বের অন্যতম উৎস।

(গ) **ফী ঃ** কোন বিশেষ সুবিধা লাভের জন্য সরকারকে যে অর্থ দিতে হয় তাকে ফী বলে। ফী বাধ্যতামূলক দেয় নয়। যারা বিশেষ সুবিধাটি চায় না, তাদের ফী দিতে হয় না। কোম্পানী নিবন্ধনের ফী, আমদানি-রপ্তানির লাইসেন্স-এর জন্য আবেদনের ফী ইত্যাদি এর দৃষ্টান্ত।

(ঘ) **জরিমানা বা অর্থদণ্ড ঃ** সরকারী আইন লঙ্ঘনের শাস্তি স্বরূপ অনেক ক্ষেত্রে জরিমানা ও অর্থদণ্ডের বিধান আছে। এটিও সরকারের রাজস্বের একটি উৎস।

(ঙ) **বিশেষ দেয় ঃ** অনেক সময় কোন অতিরিক্ত বা বিশেষ সুবিধা ভোগের জন্য সরকারকে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়। তা বিশেষ দেয় বলে গণ্য হয়। যেমন, সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের ফলে কোন অঞ্চলের উন্নতি হলে সেখানকার অধিবাসীদের কাছ থেকে সরকার বিশেষ দেয় আদায় করতে পারে।

উপরোক্ত নানা উৎস থেকে সরকারের যে রাজস্ব আদায় হয় তা দিয়েই সচরাচর সরকারের ব্যয়ের সংস্থান হয়ে থাকে। কিন্তু আজকাল সরকারের ব্যয় খুব কম ক্ষেত্রেই আদায়-করা রাজস্বের সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কারণ সরকারের উপর ব্যয় বৃদ্ধির চাপ থাকে খুব বেশি। আদায়-করা রাজস্বের তুলনায় সরকারের ব্যয় বেশি হয়ে গেলে দু'টি উৎস থেকে তার সংস্থান হতে পারে। একটি হল **ঋণ**, অন্যটি হল **ঘাটতি ব্যয়**।

৯.৪. করনীতি
Principles or Canons of Taxation

১. কর—সেটা সামান্যই হ'ক বা বেশিই হ'ক—সব সময়েই করদাতার উপর সেটা একটা বোঝা হিসাবেই চাপে। দেশের মানুষই কর দেয়, তাই করের বোঝা

দেশের মানুষকেই বইতে হয়। সুতরাং বোঝা যতটা কম হয়, কর দেওয়ার সময়ও করদাতাদের পক্ষে যতটা সম্ভব সুবিধাজনক হয় তা দেখা প্রয়োজন। একারণে কর ধার্যের নীতিগুলি কি হওয়া উচিত তা নিয়ে অতীতে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছে। করনীতি ঠিক কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ্ নানা মত প্রচার করেছেন বটে তবে **অ্যাডাম স্মিথের** প্রচারিত করনীতিগুলি হল সবচেয়ে প্রখ্যাত। পরবর্তীকালে অন্যান্য অর্থবিজ্ঞানীরাও নতুন কয়েকটি করনীতি যোগ করেছেন।

২. **অ্যাডাম স্মিথের করনীতি : (ক) করভারের সমতা** (equality) অ্যাডাম স্মিথের মতে রাষ্ট্র ও সরকার হল সকলের মঙ্গলের জন্য। সুতরাং ন্যায় বিচারের দিক থেকে সরকারের খরচের বোঝা সব করদাতার সমানভাবে বহন করা উচিত। সকলে যদি নিজের নিজের সামর্থ্যমত (ability) কর দেয় (যার সাধ্য বেশি সে বেশি এবং যার সাধ্য কম সে কম কর দিলে), তাহলেই সকলের উপর করের বোঝা সমান হবে। মানুষের কর দেবার সামর্থ্যটা নির্ভর করে তার আয় কিংবা সম্পদের উপর।

করের বোঝা বহনে সমতার নীতি সকলেই স্বীকার করলেও আয় বা সম্পত্তির উপর কি হারে কর ধার্য করা হলে সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে তা নিয়ে একদা অনেক বিতর্ক হয়ে গেছে। একটি মত ছিল, সম্পত্তি বা আয় নির্বিশেষে সকলের উপর একই হারে কর বসান হলে সমতার নীতিটি পালিত হবে। যেমন, আয়ের উপর ৫ শতাংশ হারে কর ধার্য করা হলে, যার আয় ১০০ টাকা সে ৫ টাকা কর দেবে ; যার আয় ১০০০ টাকা সে ৫০ টাকা কর দেবে। এখানে করের হার একই হলেও, করের পরিমাণটা কম আয়ের উপর অল্প ও বেশি আয়ের উপর বেশি হবে। এরকম করকে বলে **সমানুপাতিক কর** (proportional tax)। কিন্তু অনেকের মতে সমানুপাতিক করের দ্বারা করের বোঝার সমতা ঘটে না। তাদের মতে, কম আয়ের মানুষের কাছে টাকার প্রান্তিক উপযোগ বেশি এবং বেশি আয়ের মানুষের কাছে টাকার প্রান্তিক উপযোগ কম হয়ে থাকে। সুতরাং যার আয় ১০০ টাকা তার আয়ের উপর যদি ৫ শতাংশ হারে কর ধার্য হয়, তবে যার আয় ১০০০ টাকা তার উপর আরও বেশি শতাংশ হারে (ধরা যাক, ১০ শতাংশ হারে) কর ধার্য হওয়া উচিত। এইভাবে আয় যত বেশি হবে তত **বেশি হারে** কর ধার্য হলেই করের বোঝা সকলের উপর সমান হবে। এই ধরনের করের হার ধার্য করা হলে তাকে বলে **প্রগতিশীল কর** (progressive tax)। আধুনিক কালে অধিকাংশ দেশেই আয় ও সম্পত্তির উপর প্রগতিশীল কর ধার্য করা হয়েছে।

(খ) **নিশ্চয়তা** (certainty) : অ্যাডাম স্মিথের মতে, কি কি কর দিতে হবে, করের পরিমাণটি কি হবে, কখন করটা দিতে হবে এবং কার কাছে তা জমা দিতে হবে, এসব আগে থেকেই করদাতাকে জানানো উচিত। তাতে তার হয়রানি যেমন

কমবে এবং আগে থেকেই সে কর দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারবে, তেমনি সরকারেরও রাজস্ব আদায় সুনিশ্চিত হবে এবং আগে থেকেই তার পক্ষে সরকারী ব্যয়ের পরিকল্পনা তৈরি করা সম্ভব হবে। একে বলে নিশ্চয়তার নীতি।

(গ) **সুবিধা (convenience) :** কর দেওয়াটাই কষ্ট ও বেদনাদায়ক। তাই অ্যাডাম স্মিথ বলেছিলেন, করদাতার কষ্ট যাতে কম হয় সেজন্য এমন একটা সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক সময়ে করটা আদায় করা উচিত যখন সে বোঝার চাপটা করদাতার কাছে অপেক্ষাকৃত হাল্কা বলে মনে হবে এবং তার পক্ষে কর দেওয়াটা সবচেয়ে সহজ হয়। প্রমোদ কব এর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। মানুষ যখন সিনেমা দেখতে যায় তখন টিকিটেব দামের সাথে সে যে প্রমোদকর দেয় সেটা সে লক্ষ্যও করে না। এই কারণে বেতনভোগী আয়করদাতাদের কাছ থেকে মাসের বেতন পাওয়ার সময় আয়কর কেটে নিয়ে বাকি টাকাটা দেওয়া হয়। চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা হয় ফসল ওঠার ঠিক পরেই, যখন চাষীরা ফসল বিক্রি কবে টাকা হাতে পায়। এটি হল সুবিধার নীতি।

(ঘ) **ব্যয়সংকোচ** (economy) : যে কর থেকে, ধরা যাক্, ৫ কোটি টাকার বাজস্ব আদায় হবে কিন্তু তা আদায় করতে গিয়ে ধরা যাক্, খরচ হবে ৪ কোটি টাকা, সে কর ধার্য করা কোন কাজের কথা নয়। কেননা, এ ক্ষেত্রে ৪ কোটি টাকা খরচ করে নীট রাজস্ব আসছে মাত্র ১ কোটি টাকা। যে কোন কর আদায়ের খরচ যথাসম্ভব কম হওয়া দরকার। তা না হলে সে কর থেকে সরকারেব রাজস্ব বিশেস বাড়বে না। এই হল ব্যয়সংকোচের নীতি।

৩. **অন্যান্য করনীতি :** অন্যান্য অর্থবিজ্ঞানীদেব প্রচারিত যে সব করনীতি স্বীকৃতি লাভ করেছে তা হল :

(ঙ) **উৎপাদনশীলতা** (productivity) : বেছে বেছে এমন কর ধার্য করা উচিত যা থেকে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ সর্বাধিক হতে পারে। তা না হলে কর ধার্যের উদ্দেশ্যই সফল হবে না। এই হল উৎপাদনশীলতার নীতি।

(চ) **স্থিতিস্থাপকতা** (elasticity) : সবকাবের ব্যয় দিনদিনই বাডছে বলে রাজস্বের প্রয়োজনও বেড়ে চলেছে। তাই কর এমনটি হওয়া দরকার যেন তার সাহায্যে প্রয়োজন মত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বাড়ানো যায়। আয়কর হল এমন করের দৃষ্টান্ত। কারণ জনসংখ্যা ও আয়স্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে আয়কর বাজস্বও বেড়ে চলেছে। এটি হল স্থিতিস্থাপকতার নীতি।

(ছ) **সরলতা** (simplicity) : কর এমন হওয়া উচিত যেন তাতে কোন জটিলতা না থাকে এবং করদাতারা সহজেই তা বুঝতে পারে। কিন্তু আধুনিক কালে করগুলি ও করব্যবস্থা ক্রমশই জটিল হয়ে পড়েছে।

৯.৫. করঘাত ও করপাত
Impact and Incidence of Taxes

১. **করঘাত :** আইনের দ্বারা যার উপর কর ধার্য হয় তাকেই করটি দিতে হয়, তার উপরই করের ভার বা বোঝাটা **(করভার) প্রথম চাপে** বা করের আঘাতটা **প্রথম পড়ে**। এটা হল করঘাত (করের প্রথম আঘাত বিন্দু)। সুতরাং আইনানুসারে যার উপর কর ধার্য হয় ও যার কাছ থেকে সরকার তা আদায় করে তার (অর্থাৎ করদাতার) উপরই করঘাত পড়ে। ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে আয়করদাতার উপর করঘাত পড়ে। অন্তঃশুল্কের ক্ষেত্রে করঘাত পড়ে উৎপাদকের উপর। বিক্রয় করের ক্ষেত্রে করঘাত পড়ে ক্রেতার উপর।

২. **করপাত :** করদাতা (অর্থাৎ যে করঘাত বহন করে) সর্বদা করের বোঝাটা নিজের কাঁধ থেকে অন্যের কাঁধে চাপিয়ে লোকসানটা পূরণ করতে চায়। একাজে সে সক্ষম হলে, করের বোঝাটা তখন করদাতার কাঁধ থেকে অন্যের কাঁধে চলে যায়। একে বলে **কর** (-এর বোঝার বা ভারের) **সঞ্চালন** (shifting of the burden)। যেমন, দিয়াশলাইয়ের উৎপাদনের উপর উৎপাদন **শুল্ক** বা **অন্তঃশুল্ক** (excise duty) সরকার প্রথমে উৎপাদনকারীর কাছ থেকে আদায় করে। সুতরাং উৎপাদনকারীর উপর **সর্বপ্রথম** সে **শুল্ক** বা করের বোঝাটা চাপে (করঘাত)। কিন্তু দিয়াশলাইয়ের বিক্রয়-মূল্যের সাথে ওই **শুল্কটা** যোগ করে যে দামটা দাঁড়ায় উৎপাদনকারী তখন সে দামেই দিয়াশলাই বিক্রি করে। ফলে দিয়াশলাইয়ের উপর অন্তঃশুল্কের বোঝাটা উৎপাদনকারীর কাঁধ থেকে খরিদ্দার ব্যবসায়ীর কাঁধে চালান বা সঞ্চালিত হয়। দোকানদার আবার সাধারণ মানুষের কাছে যে দামে দিয়াশলাই বিক্রি করে তার মধ্যে দিয়াশলাইয়ের ঐ **অন্তঃশুল্কটা** ধরা থাকে। সুতরাং অন্তঃশুল্কের বোঝাটা এবার ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সাধারণ খরিদ্দারের বা ভোগীর কাঁধে চলে আসে বা সঞ্চালিত হয়। কিন্তু সাধারণ ভোগীরা অন্যের কাছে বিক্রি করার জন্য দিয়াশলাই কেনে না, কেনে নিজেরা ব্যবহার করার জন্য। সুতরাং তারা আর কারও কাঁধে দিয়াশলাইয়ের **অন্তঃশুল্ক** বা করটা চাপিয়ে দিতে পারে না। ওটা শেষ পর্যন্ত তাদের কাঁধেই থেকে যায়। এমনিভাবে করের বোঝা একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে সঞ্চালিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত যার কাছে এসে তা থেমে যায়, অর্থাৎ অন্যের কাছে আর সঞ্চালিত হয় না, শেষ পর্যন্ত সে-ই করের বোঝা বহন করে। একে বলে **করপাত। করের বোঝা শেষ পর্যন্ত** যাকে বহন করতে হয়, **যেখানে তা থেকে যায়, তার সেই শেষ অবস্থিতি ক্ষেত্রকে বলে করপাত**। অন্তঃশুল্কের করঘাত পড়ে উৎপাদনকারীর উপর কিন্তু করপাত ঘটে ভোগীদের উপর। করের বোঝার সঞ্চালন ঘটলে এমনি করে করঘাত একজন ও করপাত আর একজন বহন করে। সব করের ক্ষেত্রে অবশ্য তা সম্ভব হয় না। যে করের বোঝার সঞ্চালন ঘটে না, তার করঘাত যার উপর পড়ে, করপাতও তাকেই বহন করতে হয়। আয়কর তার

একটি দৃষ্টান্ত। আয়করের করঘাত ও করপাত সাধারণত একজনকেই (আয়কর-দাতাকেই) বহন করতে হয়।

৩. পণ্য করের ক্ষেত্রে, করঘাত যে বহন করে করপাতও সে বহন করবে কি না, তা নির্ভর করে পণ্যটির চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি স্থিতিস্থাপক হলে করের সবটা বোঝা ক্রেতার কাঁধে চাপানো কঠিন হয়। যোগানের তুলনায় চাহিদা কম স্থিতিস্থাপক হলে বিক্রেতা ক্রেতার উপর করের বেশির ভাগ বোঝা চাপাতে পারে। বিপরীতভাবে পণ্যটির যোগান যদি স্থিতিস্থাপক হয়, তবে উৎপাদকের পক্ষে করের বোঝার বড় অংশ ক্রেতার উপর সঞ্চালন করা সম্ভব ; আর, পণ্যটির যোগান যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে করের বোঝার বেশির ভাগটাই উৎপাদককে (বা বিক্রেতাকে) বহন করতে হয়।

৯.৬. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর
Direct and Indirect Taxes

১. যে করের করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তির উপর (একই বিন্দুতে) পড়ে তাকে বলে প্রত্যক্ষ কর। আয়কর হল প্রত্যক্ষ করের একটি দৃষ্টান্ত। যে করের করঘাত ও করপাত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উপর (ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে) পড়ে, তাকে বলে পরোক্ষ কর। প্রমোদকর, বিক্রয়কর ও অন্তঃশুল্ক এর দৃষ্টান্ত।

২. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের সুবিধা

প্রত্যক্ষ করের সুবিধা (পক্ষে যুক্তি)

১. করদাতাদের সামর্থ্য অনুসারে প্রত্যক্ষ কর নির্ধারিত হয়। তাই করভারের বণ্টনে সমতা ঘটে।

২. প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ, কর দেবার সময় ও স্থান ইত্যাদি সব কিছুই সুনিশ্চিত। তাই এটা করদাতা ও সরকারের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক।

৩. এই কর আদায়ের খরচও অপেক্ষাকৃত কম।

৪. এর স্থিতিস্থাপকতা আছে। দরকার মত সামান্য রদবদলের দ্বারা এর রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ সহজেই বাড়ানো যায়।

৫. প্রত্যক্ষ করটা দিতে হচ্ছে এবং কতটা দিতে হচ্ছে করদাতারা তা

পরোক্ষ করের সুবিধা (পক্ষে যুক্তি)

১. ধনী গরীব সকলের কাছ থেকেই পরোক্ষ কর আদায় হয়। তাই এর রাজস্ব আদায় বেশি হয়।

২. এক এক বারে অল্প অল্প পরিমাণে পরোক্ষ কর আদায় করা হয় (যতবার সিনেমা দেখা হবে ততবার অল্প অল্প করে প্রমোদ কর দিতে হবে)। তাই এই কর দেওয়াটা করদাতাদের পক্ষে সুবিধাজনক।

৩. পরোক্ষ কর ফাঁকি দেওয়া কঠিন।

৪. পরোক্ষ করও স্থিতিস্থাপক হতে পারে।

৫. মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর দ্রব্যসামগ্রীর উপর পরোক্ষ কর বসিয়ে সরকার সে সব দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে তাদের

প্রত্যক্ষ করের সুবিধা
(পক্ষে যুক্তি)

জানতে পারে। তাই তারা সচেতন ভাবে এই কর দেয়। সুতরাং সে টাকা দিয়ে সরকার কি করছে বা না করছে সে সম্পর্কে তারা সচেতন হয়। তাই প্রত্যক্ষ কব নাগবিকদেব সচেতনতা বাড়ায়। তারা তাদেব অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। গণতন্ত্রের সাফল্যের পক্ষে এটা সহায়ক।

পরোক্ষ করের সুবিধা
(পক্ষে যুক্তি)

বিক্রি ও ভোগের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে লোককল্যানের ক্ষতিটা কমাতে পারে।

৩. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের অসুবিধা

প্রত্যক্ষ করের অসুবিধা
(বিপক্ষে যুক্তি)

১. প্রত্যেক করদাতার কাছ থেকে প্রত্যক্ষ কব একসঙ্গে আদায় করা হয় বলে, এব এককালীন দেয় পবিমাণটা বেশি হয়ে থাকে এবং তা কবদাতার পক্ষে অসুবিধাজনক হয়।

২. কর দেবাব সামর্থ্য অনুসারে প্রত্যক্ষ কর ধার্য করা হয় বলে দাবি করা হলেও, বাস্তবে সেটা সঠিকভাবে স্থির কবা যায় না। তাই করের হারটা আন্দাজী এবং খেয়ালখুশির ব্যাপার হয়ে পড়ে।

৩. প্রত্যক্ষ কব ফাঁকি দেওয়া সহজ।

৪. প্রত্যক্ষ কর দিতে গিয়ে, করদাতাদের সরকাবেব কাছে নানারূপ হিসাব-পত্র ও দলিল পেশ করতে হয় ও অনুসন্ধানের জবাব দিতে হয়। এই কারণে প্রত্যক্ষ কর অপ্রিয় হয়ে ওঠে।

৫. প্রত্যক্ষ কবেব পরিমাণ বেশি হলে তা সাধারণ করদাতাদের কঠিন পরিশ্রমের উৎসাহ এবং কারবারীদের বিনিয়োগ করার উৎসাহ কমিয়ে দেয়।

পরোক্ষ করের অসুবিধা
(বিপক্ষে যুক্তি)

১. এর রাজস্ব আদায়ের খরচটা অপেক্ষাকৃত বেশি হয়।

২. পরোক্ষ কর করদাতাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নির্ধারিত হয় না। ধনীব চেয়ে গরিবের উপরই এই করেব বোঝা বেশি পড়ে। সুতরাং এই কব ন্যায়বিচার বিরোধী।

৩. পরোক্ষ কর আদায়ের স্থান, কাল, পরিমাণ, পাত্র, সবই অনিশ্চিত।

৪ পবোক্ষ কর দ্রব্যের দামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় সুতরাং করদাতারা তা টের পায় না। সুতরাং পরোক্ষ কব মানুষের নাগরিক-চেতনা বাড়ায় না।

৫. পরোক্ষ করের পরিমাণ বেশি হলে তা দ্রব্যসামগ্রীর দামগুর বাড়িয়ে দেয়।

প্রত্যক্ষ করের অসুবিধা (বিপক্ষে যুক্তি)	পরোক্ষ করের অসুবিধা (বিপক্ষে যুক্তি)
৬. আয়কর, সম্পদকর ইত্যাদি যাবতীয় প্রত্যক্ষ কর মানুষের একটি ন্যূনতম পরিমাণ আয় বা সম্পদ না হলে ধার্য করা হয় না। সুতরাং প্রত্যক্ষ কর-দাতাদের সংখ্যা বেশি হয় না। ভারতে আয়কর দাতাদের মোট সংখ্যা হল দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশ।	

মন্তব্য ঃ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিকল্প নয়। এরা হল পরস্পরের পরিপূরক। আধুনিক সরকারগুলির ব্যয়ের পরিমাণ এত বেড়েছে যে, শুধু প্রত্যক্ষ বা শুধু পরোক্ষ করের দ্বারা প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহ করা অসম্ভব। তাই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বাদে আর সর্বত্রই এই দু'রকম কর ব্যবস্থাই প্রচলিত হয়েছে।

৯. ৭. সরকারী ঋণ
Public Debt

১. আয় থেকে ব্যয় বেশি হলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মত সরকারও ঋণের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে ব্যয়ের সংস্থান করতে পারে। সুতরাং ঋণ হল সরকারের অর্থসংস্থানের আরেকটি উপায়। সরকার ঋণ করলে সে ঋণের সুদ ও আসল শোধ করার একটা দায় সরকারের উপর বর্তায়। হয় কর রাজস্ব অথবা করের বাইরে অন্য কোন আয় থেকে সরকারকে সে ঋণ শোধ করতে হয়। **করের সাথে সরকারী ঋণের পার্থক্য** হল ঃ (ক) করের দরুন সরকারের কোন দায় জন্মে না, কিন্তু ঋণের দরুন সরকারের দায় সৃষ্টি হয়, (খ) কর হল বাধ্যতামূলক, কিন্তু ঋণ সাধারণত বাধ্যতামূলক হয় না।

২. **সরকারী ও ব্যক্তিগত ঋণের তুলনা ঃ** (ক) **মিল ঃ** ঋণদাতা কাউকে ঋণ না দিলে টাকাটা (সে ঋণদাতা) যে উদ্দেশ্যে খরচ করত, ঋণ গ্রহণকারী ঋণ নিলে সে টাকাটা অন্য উদ্দেশ্যে খরচ করে। ফলে দেশের উপকরণগুলি যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হত, সেগুলি সে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয়ে অন্যভাবে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ ঋণের দরুন দেশের উপকরণগুলি এক রকম ব্যবহারের ক্ষেত্র থেকে অন্য রকম ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হয়। এটা সরকারী ও ব্যক্তিগত ঋণ, উভয়ের ক্ষেত্রেই ঘটে।

(খ) **অমিল ঃ** কিন্তু সরকারী ও ব্যক্তিগত ঋণের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি ঃ (১) ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধের বোঝা ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ছাড়া

আর কেউ বহন করে না। কিন্তু সরকারী ঋণ পরিশোধের বোঝা দেশের সব নাগরিকরা বহন করে। কারণ তারা সরকারকে যে কর দেয় তা থেকেই সরকার সাধারণত সরকারী ঋণ পরিশোধ করে। (২) সাধারণত ঋণগ্রহীতারা তাদের আয় থেকে কিংবা তাদের কোন সম্পত্তি বিক্রি করে তা থেকে ব্যক্তিগত ঋণ শোধ করে। কিন্তু সরকারী ঋণ সাধারণত হয় কর-রাজস্ব থেকে নয়তো সে ঋণ উৎপাদনশীল ভাবে ব্যবহার করে যে সরকারী আয় সৃষ্টি হয় তা থেকে শোধ দেওয়া হয়। (৩) ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে, ঋণগ্রহীতা ঋণের টাকাটা খরচ করলে তা থেকে ঋণদাতা উপকৃত হয় না। কিন্তু দেশবাসীর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে সরকার যে খরচ করে তা থেকে ঋণদাতা সহ দেশের সকলেই উপকৃত হয়। (৪) ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে, সুদের সবটাই ঋণদাতার লাভ। কিন্তু সরকারী ঋণের ক্ষেত্রে ঋণদাতারা যে সুদ পায় তার সবটাই তাদের লাভ বলে ধরা যায় না। কারণ তার একটা অংশ কর বাবদ সরকারকে তারা আগেই দিয়েছে। যেটুকু তারা কর বাবদ দিয়েছে সেটুকু তাদের ক্ষতি। (৫) সাধারণত, ব্যক্তিগত ঋণ দেশের ভিতর থেকেই সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু সরকারী ঋণ যেমন দেশ থেকে সংগ্রহ করা যায়, তেমনি বিদেশ থেকেও সংগ্রহ করা হতে পারে। (৬) ব্যক্তিগত ঋণ সবসময়েই পরিশোধ্য। কিন্তু কোন কোন সরকারী ঋণ পরিশোধ করা নাও হতে পারে। তাকে বলে অপরিশোধ্য (irredeemable) সরকারী ঋণ।

৩. **সরকারী ঋণের উৎস ঃ** সরকারী ঋণের বিভিন্ন উৎস হল—(ক) দেশের জনসাধারণ; (খ) দেশের ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য অর্থলগ্নিকারী সংস্থা; (গ) দেশের কারবারী সংস্থা; (ঘ) বিদেশের জনসাধারণ, অর্থলগ্নিকারী ও সরকার; এবং (ঙ) বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা।

৪. **সরকারী ঋণের ও ঋণ বৃদ্ধির কারণ ঃ** যে সব কারণে সরকারকে ঋণ নিতে হয় এবং সরকারী ঋণের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে তা হল—(ক) সরকারের বার্ষিক ব্যয়ের তুলনায় বার্ষিক রাজস্বের ঘাটতি (বাজেট ঘাটতি); (খ) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন; (গ) প্রতিরক্ষা বা যুদ্ধ; (ঘ) মন্দার সময়ে বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যয়, এবং (ঙ) প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের দরুন সরকারের রাজস্বের ক্ষতি।

৫. **সরকারী ঋণের বোঝা ঃ** (ক) ঋণের বোঝা বা ভার বলতে তার আসল ও সুদ পরিশোধের আর্থিক দায় বোঝায়। এটা হল ঋণের **প্রত্যক্ষ আর্থিক বোঝা**। ব্যক্তিগত ঋণের মত সরকারী ঋণেরও এই প্রত্যক্ষ আর্থিক বোঝা রয়েছে কিন্তু সরকারী ঋণের প্রত্যক্ষ আর্থিক বোঝা ছাড়াও তার একটা **প্রকৃত বোঝা** আছে। এই প্রকৃত বোঝা দু'রকমের। সুদ ও আসল মিলিয়ে সরকারী ঋণ পরিশোধ করার মধ্য দিয়ে দেশে উৎপাদন ক্ষুন্ন হতে পারে, আয়ের বণ্টনে বিকৃতি ঘটতে পারে ও লোককল্যাণের ক্ষতি হতে পারে। এটা হল সরকারী ঋণের **প্রত্যক্ষ প্রকৃত বোঝা**। তা ছাড়া, সরকারী ঋণের দরুন দেশবাসীর সঞ্চয় প্রবণতা ও

কর্মোদ্যম ক্ষুন্ন হতে পারে। এটা হল সরকারী ঋণের **পরোক্ষ প্রকৃত বোঝা**।

(খ) সরকারী ঋণের উৎস মূলত দু'টি—স্বদেশ ও বিদেশ। দেশের মধ্য থেকে 'সরকারী ঋণ সংগ্রহ করা হলে তাকে বলে **অভ্যন্তরীণ ঋণ**। বিদেশ থেকে সরকারী :ঋণ সংগ্রহ করা হলে তাকে বলে **বিদেশী ঋণ**।

(১) **অভ্যন্তরীণ সরকারী ঋণের কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক বোঝা নেই**। ·কারণ, দেশবাসীরা সরকারকে ঋণ দিয়ে আসলে নিজেদেরকেই ঋণ দিয়েছে। সুতরাং এটা হল তাদেব নিজেদেরই কাছে নিজেদের পাওনা। ঋণদাতাদের অর্থাৎ সমাজের একটি অংশেব কাছ থেকে সরকার ঋণ নিয়ে যে খরচটা করে তার খানিকটা তাদের কাছেই ফিরে যায়, বাকিটা সমাজেব অন্যান্য অংশের কাছে যায়। দেশবাসীর কাছ থেকে (যাদের মধ্যে ঋণদাতারাও আছে) করের মাধ্যমে টাকা তুলে ঋণের সুদ ও আসল শোধ 'দওয়া হয়। ফলে, ঋণদাতারা যে কর দিয়েছিল তার একটা অংশ সুদ হিসাবে ফেরত পায়, আর বাকিটা আসে যারা ঋণ দেয়নি এমন কবদাতাদের কাছ থেকে। এমনি করে সরকারী ঋণের দরুন দেশবাসীর এক অংশ থেকে আরেক অংশেব কাছে সম্পদেব হস্তান্তর ঘটে।

কিন্তু অভ্যন্তরীণ ঋণের আর্থিক বোঝা না থাকলেও, **প্রকৃত বোঝা আছে।** সবকারেব ঋণদাতারা প্রায় সকলেই ধনী। তারাই সরকারী ঋণপত্র কিনে সবকারকে ঋণ যোগায়। সে ঋণ শোধ করার জন্য সরকার যখন কব আদায় করে, তখন এরা সংখ্যায় কম বলে এদেব দেওয়া করের অংশ অল্পই হয়। এরা যেমন ঋণ দেয়, কর দেয়, তেমনি সুদসহ ঋণটা ফিরেও পায়। করের অধিকাংশই আসে গরিবদের কাছ থেকে, যারা ঋণদাতা নয়। এরা শুধুই দেয়, পায় না কিছুই। সুতরাং সরকারী ঋণের দরুন গবিবদের কাছ থেকে ধনীদের কাছে আয় ও সম্পদ হস্তান্তরিত হয়। ফলে, দেশে ধন বৈষম্য ও আয় বৈষম্য বাডে। দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ক্ষুন্ন হয়। তাছাডা সরকারী ঋণ বেশি হলে তা পরিশোধের প্রয়োজনে কর বাডাতে হতে পারে। তার চাপে গরিব সাধারণ মানুষের কাজের উদ্যম ও উৎসাহ কমে যেতে পারে। সে ঋণ শোধ কবতে গিয়ে সরকারী তহবিল কমে গিয়ে কল্যাণ-মূলক কাজে সরকারের অর্থাভাব হতে পারে। ফলে লোককল্যাণ ক্ষুন্ন হতে পারে। এসবই হল অভ্যন্তরীণ সরকারী ঋণের প্রকৃত বোঝা।

(২) অভ্যন্তরীণ সরকারী ঋণের কোন আর্থিক বোঝা না থাকলেও প্রকৃত বোঝা আছে। **কিন্তু বিদেশী সরকারী ঋণের আর্থিক এবং প্রকৃত, দু'রকম** বোঝাই আছে। বিদেশী সরকারী ঋণ সুদে আসলে শোধ দিতে গিয়ে যে পরিমাণ অর্থ লাগে তা দেশের বাইরে চলে যায়। তা হল তার **আর্থিক বোঝা**।

বিদেশী ঋণ সুদে আসলে শোধ করতে গিয়েও কর ধার্য করতে হয় এবং তারও বেশির ভাগ আসে গরিবদের কাছ থেকে। তাতে দেশের লোককল্যাণ ক্ষুন্ন হয়। তেমনি আবার বিদেশী ঋণ শোধ করতে হলে বিদেশী মুদ্রায় তা শোধ করতে হয়

এবং সে বিদেশী মুদ্রা যোগাড় করতে হয় আমদানি কমিয়ে ও রপ্তানি বাড়িয়ে। তা করতে গেলে দেশের ধনী গরিব সকলেরই ভোগ কমাতে হয়। এসব হল বিদেশী ঋণের **প্রকৃত বোঝা**।

(৩) তবে, যুদ্ধের খরচ চালাতে যে বিদেশী ঋণ নেওয়া হয় সেটা যখন খরচ হয়ে যায়, তা সুদে আসলে ঋণ শোধের দায় ছাড়া আর কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। সে খরচের ফলে এমন কোন সম্পদ সৃষ্টি হয় না যা থেকে পুরোপুরি বা আংশিক-ভাবে সে ঋণ শোধ করা যায়। এজন্য যুদ্ধ-ঋণের বোঝাটা জগদ্দল পাথরের মত একটা ভয়াবহ বোঝা হয়ে পড়ে। তাই যুদ্ধ-ঋণকে **মৃত-ভার ঋণ** বলে। কিন্তু বিদেশী ঋণের দ্বারা যদি উন্নয়নমূলক কাজ করা হয় তাহলে সে ঋণের সাহায্যে রাস্তাঘাট, শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পত্তি বা পুঁজি সৃষ্টি হয়। এসবের সাহায্যে উৎপাদন বাড়ে এবং তা থেকে রপ্তানি বাড়িয়ে বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করে ঐ ঋণ সুদে আসলে শোধ করা যায়। সুতবাং উন্নয়নের কাজে বিদেশী ঋণ ব্যবহার করা হলে তার বোঝাটা মৃত-ভার বা নীরেট বোঝা হয়ে ওঠে না।

৬. **সরকারী ঋণের ফলাফল** : (ক) সরকারী ঋণ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা হলে উৎপাদন ও আয় বাড়ে। যুদ্ধ প্রভৃতি অনুন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা হলে উৎপাদন ও আয় বাড়ে না।

(খ) সরকারী ঋণের দরুন দেশের মধ্যে আয় ও সম্পদের বণ্টনে বৈষম্য বাড়ে। ধনীরা আরও ধনী এবং গরিবরা আরও গরিব হয়।

(গ) বিদেশী সরকারী ঋণের দ্বারা বিদেশ থেকে পুঁজি দ্রব্য ও ভোগ্য দ্রব্য সংগ্রহ করা হয়। তাতে দেশের টাকার যোগান বাড়ে না। তেমনি তা শোধও দিতে হয় দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করে। তাই বিদেশী ঋণ পরিশোধের ফলে দেশে টাকার যোগান কমেও না। কিন্তু কোন কোন অভ্যন্তরীণ ঋণের ফলে (যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নিলে) দেশে টাকার যোগান বাড়ে। তাছাড়া ঋণপত্র বিক্রি করে দেশবাসীর কাছ থেকে সরকারী ঋণ সংগ্রহ করা হলে, ঋণদাতারা পরে ব্যাঙ্কের কাছে ওই ঋণপত্র জামিন রেখে ঋণ নিতে পারে। তাতে দেশে ঋণ-স্ফীতি হয়। ঋণটাও টাকার সামিল। সুতরাং এটাতে টাকার যোগান বাড়ে বলা যায়।

(ঘ) বিদেশী ঋণের দ্বারা পুঁজিদ্রব্য ও ভোগ্যদ্রব্য আমদানী হয়ে থাকে আমদানি করা পুঁজিদ্রব্যের সুষ্ঠু ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়াতে পারলে দেশে দামস্তর কমবে। বিদেশ থেকে ভোগ্যদ্রব্য এলে দেশের মধ্যে তার যোগান বেড়ে বর্তমান দামস্তর কমবে। তেমনি সুদে আসলে বিদেশী ঋণ শোধ করতে গিয়ে রপ্তানি বাড়াতে হয়। তার ফলে চাহিদার তুলনায় দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান কমে গিয়ে দামস্তর বাড়তে পারে। অভ্যন্তরীণ সরকারী ঋণের দরুন তখনকার মত দেশে টাকার যোগান বাড়লে দামস্তর বাড়তে পারে। কিন্তু সে ঋণ যদি উন্নয়নমূলক কাজে খরচ হয় তাহলে ভবিষ্যতে উৎপাদন বাড়লে দামস্তর কমবে। আর যদি

যুদ্ধ প্রভৃতির মতো অনুৎপাদনমূলক কাজে অভ্যন্তরীণ সরকারী ঋণ খরচ হয় তাহলে বেসামরিক প্রয়োজনে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান কমে গিয়ে দামস্তর ক্রমশই বাড়তে থাকবে।

(ঙ) সরকারী, বিশেষত অভ্যন্তরীণ সরকারী, ঋণের দরুন দেশের মধ্যে সুদের হার বাড়ে। কারণ, বেসরকারী ঋণগ্রহণকারীদের সাথে প্রতিযোগিতা করে সরকারকে দেশবাসীর কাছ থেকে ঋণ করতে হয় বলে, বেশি হারে সুদ দিয়ে তা যোগাড় করতে হয়। এ কারণে অভ্যন্তরীণ সরকারী ঋণ দেশে সুদের হার বাড়িয়ে দিতে পারে।

৯.৮. ঘাটতি ব্যয়
Deficit Financing

১. **কাকে বলে :** রাজস্বের বিভিন্ন উৎস—যেমন, কর, সরকারী কারবারী সংস্থাগুলির উদ্বৃত্ত, জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত ঋণ, বিভিন্ন আমানত ও তহবিল, বিদেশী ঋণ ও সাহায্য এবং অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া মোট সরকারী আয়ের তুলনায় সরকারী ব্যয় যদি বেশি হয় এবং ঐ ব্যয় আয়ের ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে যদি সরকার (ক) অতিরিক্ত কাগজের টাকা ছাপাবার পদ্ধতি, বা (খ) দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের পদ্ধতির (এরকম ক্ষেত্রে সরকারের ঋণের প্রয়োজন মিটাতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাড়তি কাগজের নোট ছাপিয়ে সরকারকে ঋণ দেয়) আশ্রয় নেয়, তাহলে বাজেটের ঘাটতি মিটাবার এ পদ্ধতিকে **ঘাটতি ব্যয় বলা হয়।**

২. **ফল :** (ক) ঘাটতি ব্যয়ের ফলে দেশের দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগানের তুলনায় টাকার যোগান দ্রুত বাড়ে। (খ) দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগানের তুলনায় টাকার যোগান বেশি হয় বলে দামস্তর বাড়তে থাকে। (গ) দামস্তর যত তাড়াতাড়ি বাড়ে মানুষের আয় তত তাড়াতাড়ি বাড়ে না বলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। (ঘ) ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ায় মানুষের অনেক অভাব পূর্ণ হয় না, অনেক ভোগ বাদ যায়। এটাকে বলে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়। যে দ্রব্যসামগ্রীগুলি তারা কিনতে পারল না, তা সরকার কিনে নিয়ে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে (সাধারণত উন্নয়নমূলক কাজে) ব্যবহার (বিনিয়োগ) করে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এবং যুদ্ধের খরচ মিটাবার জন্য দেশের সরকার ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় নেয়। ভারতে পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য সরকার ক্রমাগত ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় নিয়ে এসেছে।

৩. **সুবিধা :** (ক) (ভারতের মত) স্বল্পোন্নত দেশে উন্নয়নের কাজে ঘাটতি ব্যয় হলে মুদ্রাস্ফীতি ও দামস্তর সাময়িকভাবে বাড়ে। পরে উৎপাদন বাড়লে ও আয় বাড়লে মানুষের সঞ্চয়ও বাড়ে এবং ধীরে ধীরে মুদ্রাস্ফীতির চাপও দূর হয় ও দামস্তর কমে যায়। (খ) ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা উন্নয়নমূলক কাজের ফলে মানুষের কর্মসংস্থান বাড়ে, বেকার সংখ্যা কমে। (গ) ঘাটতি ব্যয়ের দরুন দামস্তর

বাড়লে কারবারীদের আয়, মুনাফা ও সঞ্চয় বাড়ে তারা কারবারে আরও পুঁজি বিনিয়োগ করে উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহিত হয় তাতে কৃষি ও শিল্পের আরও বিকাশ ঘটে।

৪. **অসুবিধা ঃ** (ক) দেশে ঘাটতি ব্যয়ের দরুন দামস্তর বাড়লে, কারবারীদেব আয় দ্রুতগতিতে বাড়ে। কিন্তু মজুরিভোগী, বেতনভোগী, খাজনা ও সুদভোগী মানুষের আয় বাড়ে না বলে তাদের প্রকৃত আয় কমে যায়। সুতরাং তাতে ধনী আরও ধনী এবং গরিব আরও গরিব হয়। দেশে আয় ও ধনবণ্টনে বৈষম্য বেড়ে যায়। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফলটা বেশি ভোগ করে মুষ্টিমেয় বিত্তশালী। আর তার কষ্ট বা বোঝাটা বেশি বইতে হয় অসংখ্য গরিব ও সাধারণ মানুষকে।

(খ) দামস্তর বৃদ্ধির ফলে টাকার দাম ক্রমশ কমতে থাকে। তার ফলে টাকাব উপর, মুদ্রা ব্যবস্থার উপর, আর্থিক কর্তৃপক্ষেব উপর, এমন কি সরকাবেব উপব মানুষের আস্থা নষ্ট হয়।

(গ) ঘাটতি ব্যয়ের দরুন মুদ্রাস্ফীতির যে দানব মাথা চাড়া দেয় তাকে শায়েস্তা করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু তাকে শায়েস্তা করতে না পারলে গোটা উন্নয়নমূলক কাজ কর্মই বিফল হতে পারে। কারণ, ঘাটতি ব্যয়ের মারফত মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা দামস্তব বাড়লে মজুরি ও উৎপাদন খরচও বাড়ে। তাতে পুনরায় দাম বাড়ে এবং উন্নয়ন পবিকল্পনাব খরচ বাড়ে। ফলে বারবার ঘাটতি ব্যয়ের দরকার হয় ও মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করা কঠিন হয়।

(ঘ) ঘাটতি ব্যয় ও মুদ্রাস্ফীতির দরুন দেশের দামস্তর অত্যধিক বেড়ে গেলে, বিদেশী পণ্যের আমদানি বাড়ে (কারণ দেশেব জিনিসের দামের তুলনায় সেগুলি তখন অপেক্ষাকৃত সস্তা হয়) এবং রপ্তানি কমে (কারণ বিদেশী পণ্যের তুলনায় দেশী পণ্যের দাম তখন বেশি হয়) । ফলে বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত এবং লেনদেনেব উদ্বৃত্ত পর্যন্ত তখন প্রতিকূল হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ তখন বৈদেশিক বাণিজ্যে এবং লেনদেনে পযন্ত ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

মন্তব্য ঃ কিন্তু এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও সব স্বল্পোন্নত দেশই অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে কমবেশি পরিমাণে ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় নিয়েছে। তবে ঘাটতি ব্যয়নীতি গ্রহণ করা হলে একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে কঠোরভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করতে হয় অন্যদিকে তেমনি সরকারের পক্ষ থেকে আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং ব্যবস্থার মারফত সারা দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর ন্যায্য বণ্টনের বন্দোবস্ত করা অবশ্য কর্তব্যে পরিণত হয় তা না হলে মুদ্রাস্ফীতি ও দামস্তরের বৃদ্ধি দমন কিংবা অন্তত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা ও ঘাটতি ব্যয়ের সুবিধাগুলি সম্পূর্ণভাবে ভোগ করা সম্ভব হয় না।

১০ তুলনামূলক অর্থনীতিক ব্যবস্থা
COMPARATIVE ECONOMIC SYSTEM

১০. ১. অর্থনীতিক ব্যবস্থা
Economic System

১. 'অর্থনীতিক ব্যবস্থা' হল সমাজের অর্থনীতিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সরকারী আইন, বিধি, নিয়মাবলী ও মানুষে-মানুষে উৎপাদন-সম্পর্ক প্রভৃতির সম্মিলনে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠানিক কাঠাম (institutional framework)। সংগঠিত সমাজে অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত অর্থনীতিক কার্যাবলীকে (যেমন উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় ও আয়বণ্টন প্রভৃতিকে) কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে এই প্রতিষ্ঠানগত কাঠাম গড়ে ওঠে। এই কাঠাম নিজস্ব প্রয়োজনে অর্থনীতিক কাজকর্মের চারিদিকে আইন, বিধিবিধান দিয়ে ঘেরা এক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে নেয়। আবাব এগুলির সাহায্যে অর্থনীতিক কার্যাবলীকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। সুতরাং অর্থনীতিক কার্যাবলীব প্রধান অংশরূপে কারবারী কার্যাবলী কোন শূন্যতার মধ্যে পরিচালিত হয় না। জীবন্ত প্রাণিদেহের মতই যে কোন অর্থনীতিক ব্যবস্থারও জন্ম, বৃদ্ধি, বিকাশ, ক্ষয় এবং মৃত্যু বা অবসান ঘটে। পৃথিবীতে কোন অর্থনীতিক ব্যবস্থাই চিরজীবী নয়।

২. বর্তমান সমাজে দুটি পৃথক ধরনের অর্থনীতিক-সামাজিক ব্যবস্থা পাশাপাশি রয়েছে: (ক) ধনতন্ত্র ও (খ) সমাজতন্ত্র। কখনও কখনও আর একটি তৃতীয় অর্থনীতিক-সামাজিক ব্যবস্থাও বর্তমানে ঐ দু'টি ব্যবস্থার পাশাপাশি রয়েছে বলে দাবি করা হয়। তা হল, মিশ্র অর্থনীতি বা মিশ্র অর্থনীতিক ব্যবস্থা। তবে, বাস্তবিক পক্ষে, মিশ্র অর্থনীতি একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের অর্থনীতিক ব্যবস্থা নয়। আসলে এটি হল খাঁটি ধনতন্ত্রেরই একটি সংস্কৃত বা পরিমার্জিত রূপ। পৃথিবীর কোথাও এখন খাঁটি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেই। বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই বরং মিশ্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা মিশ্র অর্থনীতি বলে গণ্য করা যেতে পারে। পৃথিবীতে ধনতন্ত্রের জন্মের আগে ছিল সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিক ব্যবস্থা বা সামন্ততন্ত্র। ধনতন্ত্রের উত্তরসূরী হল সমাজতন্ত্র।

১০. ২. ধনতন্ত্র
Capitalism

১. ১৭৬০-১৮২০ সালের মধ্যে শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্রিটেনে যে অর্থনীতিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং কালক্রমে যা বিভিন্ন দেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, তাকেই 'ধনতন্ত্র' বলা হয়। ফরাসী বিপ্লব এর মতাদর্শগত ভিত্তি ও ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লব এর বৈষয়িক ভিত্তি রচনা করেছিল। সংক্ষেপে, ধনতন্ত্র হল, উৎপাদনের উপাদান বা উপায়গুলির উপর ব্যক্তিগত বা বেসরকারী মালিকানার ব্যবস্থা।

২. **বৈশিষ্ট্য ঃ** ধনতন্ত্রের অর্থনীতিক বৈশিষ্ট্য চারটি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি উদ্যোগের স্বাধীনতা, ভোগীর সার্বভৌমত্ব ও নিয়ন্ত্রণবিহীন মূল্য ব্যবস্থা।

(ক) **ব্যক্তিগত সম্পত্তি ঃ** ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে জমি, খনি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উৎপাদনের উপায় (বা উপাদান) এবং তৎসহ বাড়ীঘর ইত্যাদি যাবতীয় দ্রব্য অর্থাৎ সম্পদ প্রভৃতির আইনস্বীকৃত ব্যক্তিগত মালিকানা বোঝায়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবাধ ভোগদখল, হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারেব অধিকার আইনের দ্বারা স্বীকৃত হয়।

ধনতন্ত্রের অর্থনীতিক দর্শন অনুসারে ধনসম্পদ করায়ত্ত করার ও আয় বাড়াবার অভিপ্রায়ই মানুষকে সর্বদা কঠোর পরিশ্রমে প্রবৃত্ত করাচ্ছে। এটা যে স্বার্থ সাধনেরই উদ্দেশ্যে পরিচালিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হয়েই প্রত্যেকে সর্বাধিক সম্ভব দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম, অর্থাৎ সম্পদ উৎপাদনের চেষ্টা করছে। ফলে সমাজে সর্বাধিক উৎপাদন ঘটছে। সুতরাং মানুষের এই স্বার্থপর উদ্দেশ্য যেমন তার ব্যক্তিগত উপকাব কবছে তেমনি সমগ্র সমাজেরও উপকার করছে। অতএব ব্যক্তিগত সম্পত্তি কবায়ত্ত করা ও বৃদ্ধি করার ইচ্ছাই হল যাবতীয় অর্থনীতিক কাজে মানুষেব উদ্যমেব পিছনে মূল চালিকা শক্তি। এই ধারণাটি ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিক ব্যবস্থাব মূল ভিত্তি। এই ধারণা অনুযায়ী মুনাফা উপার্জন করা ও তা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য দ্বারাই সমস্ত উৎপাদনকারীরা পরিচালিত হচ্ছে।

(খ) **উদ্যোগের স্বাধীনতা ঃ** ধনতন্ত্রের আর একটি অপরিহার্য উপাদান বা ভিত্তি হল 'উদ্যোগেব স্বাধীনতা' নামক ধারণা। 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ' নামক দার্শনিক মতবাদের উপর ভিত্তি করে অ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীরা এই ধারণা প্রচার করেন যে, অর্থনীতিক কার্যাবলীতে মানুষের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ক্ষুণ্ণ করতে পারে, এমন কোন ব্যবস্থাই রাষ্ট্র বা সরকারেব অবলম্বন কবা উচিত নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই অবাধে তার আপন স্বার্থ অনুসরণ করতে দেওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক উৎপাদকই আপন আপন মুনাফা বৃদ্ধির জন্য অন্য উৎপাদকের সাথে কঠোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। এজন্য প্রত্যেকেই অপরের তুলনায় কম খরচে উৎকৃষ্টতর দ্রব্যসামগ্রী বেশি পরিমাণে উৎপাদনের চেষ্টা করছে। ফলে উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়ছে, সর্বাপেক্ষা কম খরচে সমাজে সর্বাধিক দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের উৎপাদন ঘটছে। যে উৎপাদকরা তুলনায় কম দক্ষ তারা পরাজিত হয়ে অধিক দক্ষ উৎপাদকদের পথ ছেড়ে দিচ্ছে। সুতরাং উৎপাদনে প্রবৃত্ত হওয়ার, অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করার 'অবাধ স্বাধীনতা উৎপাদকদের অবশ্যই দিতে হবে। তা ক্ষুণ্ণ করা চলবে না। ব্যক্তির অর্থনীতিক কার্যকলাপে রাষ্ট্র বা সরকারের হস্তক্ষেপ না করার এই তত্ত্বই 'অবাধ স্বাধীনতার' তত্ত্ব নামে পরিচিত। এই কারণে অনেক সময় ধনতন্ত্রকে 'ব্যক্তিগত উদ্যোগের অর্থনীতি' বা 'স্বাধীন উদ্যোগের অর্থনীতি' বলা হয়।

(গ) **ভোগীর সার্বভৌমত্ব ঃ** উৎপাদনকারীর স্বাধীনতায় যেমন কোন হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, তেমনি ভোগীর স্বাধীনতায়ও কোন রাষ্ট্রীয় বা সরকারী হস্তক্ষেপ অনুচিত। পছন্দমত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম কেনার স্বাধীনতা যদি ভোগীদের অক্ষুণ্ন থাকে, তা হলে তারা যেসব সামগ্রী চাইবে, উৎপাদকরা শুধু তাই উৎপাদন করে নিজেদের মুনাফা সর্বাধিক করার চেষ্টা করবে। সমাজে তা ছাড়া অন্য সামগ্রী উৎপন্ন হবে না। এইভাবে কোন্‌টা উৎপন্ন হবে না, কোন্‌টা হবে, কখন তা উৎপন্ন হবে ও কতটা পরিমাণে উৎপন্ন হবে, তা ভোগীদের নির্দেশমত স্থির হবে। এজন্যই ভোগীদের দ্রব্যসামগ্রী পছন্দ করার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। এই হল ভোগীর সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব। ধনতন্ত্রে তা বজায় থাকে বলে দাবি করা হয়।

(ঘ) **নিয়ন্ত্রণবিহীন মূল্যব্যবস্থা ঃ** নিয়ন্ত্রণবিহীন মূল্যব্যবস্থা ধনতন্ত্রের আর একটি অপরিহার্য উপাদান। আপন আপন স্বার্থ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ভোগীরা দ্রব্যসামগ্রী পছন্দের অক্ষুণ্ন স্বাধীনতা নিয়ে যা কিনতে চায়, আপন আপন মুনাফা বৃদ্ধির তাগিদে উৎপাদনকারীরাও উদ্যোগ ও প্রতিযোগিতার অবাধ স্বাধীনতা নিয়ে তা উৎপাদন করার চেষ্টা করছে। ক্রেতা বা ভোগীরা যা বেশি চায়, যার জন্য বেশি দাম দিতে প্রস্তুত, উৎপাদনকারীরা তাই বেশি পরিমাণে উৎপাদন করছে এবং সেসব সামগ্রীর উৎপাদনেই সমাজের উপকরণগুলির বিলিবণ্টন ও ব্যবহার ঘটছে। এইরূপে ভোগীদের চাহিদা ও উৎপাদকের যোগান দ্বারা আপনা-আপনি বাজারে দ্রব্যসামগ্রীর দাম নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে এবং দামের তারতম্য অনুসারে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনের পরিমাণেও তারতম্য ঘটছে। আবার দামের তারতম্যের জন্যই উপকরণগুলির বিলিবণ্টনেও তারতম্য ঘটছে। দাম নির্ধারণের এই ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়। চাহিদা ও যোগানের শক্তি ছাড়া অন্য কারও দ্বারা তা চালিত নয়। এই-রূপ এক স্বয়ংক্রিয়, নিয়ন্ত্রণবিহীন মূল্যব্যবস্থার দৌলতে ধনতন্ত্রে সর্বোত্তমভাবে, কি উৎপন্ন হবে, কিভাবে উৎপন্ন হবে, কার জন্য উৎপন্ন হবে ইত্যাদি, বিনা পরিকল্পনায় আপনা-আপনি স্থির হয়ে যায় বলে দাবি করা হয়।

উপরোক্ত চারটি উপাদানে যে খাঁটি ধনতন্ত্র গঠিত, বাস্তবে তা কোথাও নেই। সমস্ত ধনতন্ত্রী দেশেই কম বেশি পরিমাণে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, উদ্যোগের স্বাধীনতা, ক্রেতার স্বাধীনতা এবং মূল্যব্যবস্থা রাষ্ট্রের নানা বিধিনিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। আর বাস্তব বাজারে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে কম বা বেশি পরিমাণে একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদের প্রচারযন্ত্রের প্রভাবে ক্রেতার তথাকথিত স্বাধীনতার অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে। সুতরাং কার্যত ধনতন্ত্র এরূপ একটি ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে যেখানে মুনাফার প্রেরণায় এবং সক্রিয় ও তীব্র প্রতিযোগিতার দ্বারা অর্থনীতিক কার্যাবলীর এবং বিশেষত নতুন পুঁজি বিনিয়োগের বেশির ভাগই বেসরকারীভাবে ঘটে থাকে।

৩. **ধনতন্ত্রের সমর্থনে যুক্তি ঃ** ধনতন্ত্রের অর্থনীতিক সুফল বলে যা দাবি

করা হয় তাদের মধ্যে চারটি প্রধান : (ক) **এক একটি স্বয়ংক্রিয় মূল্যব্যবস্থার দ্বারা চালিত হয়।** কারণ মূল্যব্যবস্থার দ্বারাই উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ প্রভৃতি অর্থনৈতিক কার্যাবলী পরিচালিত হচ্ছে। এজন্য কোন আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না।

(খ) **ভোগীদের পছন্দমত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন হয়,** দ্রব্যসামগ্রী পছন্দে তাদেব **স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে।** এ কারণে, এ ব্যবস্থায় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের ভোগ দ্বারা তাদের সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ ঘটে।

(গ) উৎপাদনকারীদের **উদ্যোগের স্বাধীনতা ও অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে** তারা সর্বদাই সর্বাপেক্ষা কম খরচে সর্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা করে। ফলে এই ব্যবস্থায় শুধু সর্বাধিক দক্ষ উৎপাদনকারীরাই টিকে থাকে এবং তার দরুন উৎপাদনেব খবচ ন্যূনতম হয় ও উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী সর্বাধিক উৎকর্ষ লাভ কবে। ফলে **সর্বাপেক্ষা কম দামে সর্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য সর্বাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।**

(ঘ) প্রতিযোগিতায় জয়লাভের জন্য প্রতিযোগী উৎপাদকরা সর্বদাই উৎপাদন খরচ কমানোব উদ্দেশ্যের উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াব উন্নতির জন্য দ্রব্যটিব উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য, নতুনতর দ্রব্য উৎপাদনের জন্য গবেষণার কাজে ব্যয় করে। ফলে, বিজ্ঞানেব ও গবেষণাব সাহায্যে **প্রতিযোগিতার তাগিদে অবিরত নতুন নতুন উৎপাদন পদ্ধতি, প্রক্রিয়া** ও **নতুন দ্রব্যসামগ্রী উদ্ভাবিত হচ্ছে।** সমাজ ও সভ্যতাব অগ্রগতি ঘটছে।

৪. **ধনতন্ত্রের ব্যর্থতা :** ধনতন্ত্রেব সমালোচকদের মতে এর প্রধান ব্যর্থতা ও কুফলগুলি হল : (ক) ধনতন্ত্রে **প্রকৃতপক্ষে ভোগীর স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব বলে কিছু নেই।** বিরাট একচেটিয়া কাববারগুলির শক্তিশালী প্রচাব-যন্ত্রেব প্রভাবে তাবা আপন পছন্দমত জিনিস বেছে নেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়। তা ছাড়া ধনতন্ত্রে আয়বৈষম্যেব জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র দেশবাসীর প্রয়োজনমত দ্রব্যসামগ্রীব উৎপাদন ঘটে না। সংখ্যালঘু ধনী ক্রেতাদের খেয়াল মেটানোর উপযোগী বিলাস দ্রব্যই বেশি উৎপন্ন হয়। সুতবাং এতে **ভোগীর সর্বাধিক তৃপ্তি লাভও ঘটে না।**

(খ) **প্রতিযোগিতার ফলে ক্রমান্বয়ে** প্রতিযোগীদেব সংখ্যা কমে গিয়ে, ধনতন্ত্রে **একচেটিয়া কারবারের উৎপত্তি ঘটে।** ফলে প্রতিযোগিতার সুফলগুলি দূর হয়ে অনিখুঁত প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবাবের কুফলগুলি দেখা দেয়। তখন বাজাবের অর্থাৎ ভোগীদের উপব নিরঙ্কুশ আধিপত্যের বলে তারা দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাস কবা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পরিবর্তে মুনাফা বৃদ্ধির জন্য উৎপাদনেব পরিমাণ হ্রাসের ও মূল্যবৃদ্ধির উপর গুরুত্ব বেশি দেয়। **সুতরাং কার্যত, সর্বাপেক্ষা কম খরচে, সর্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য সর্বাধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় না।**

(গ) অবাধ **প্রতিযোগিতার ফলে,** যে কোন শিল্পে প্রয়োজনের তুলনায়

বেশি সংখ্যক উৎপাদক দেখা দিতে পারে। তাতে **অনাবশ্যক অতিরিক্ত উৎপাদন-ক্ষমতার সৃষ্টি হয় অথচ তার সদ্ব্যবহার ঘটে না। এটা অপচয়** ছাড়া কিছু নয়।

(ঘ) **মূল্যব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় এবং সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণবিহীনভাবে কাজ করে, একথাও সত্য নয়।** কারণ কার্যত, শিল্পক্ষেত্রে বিশাল আয়তন বিশিষ্ট অল্পসংখ্যক কারবারের উদ্ভব হলে, **ঐ সব বিরাট একচেটিয়া কারবারীরা একক বা গোষ্ঠীগতভাবে মূল্যব্যবস্থাটিকে নিয়ন্ত্রণ করে।** ফলে, কি উৎপন্ন হবে, কতটা উৎপন্ন হবে তা সর্বোত্তমভাবে স্থির হতে পারে না। কি উৎপন্ন হবে এবং কতটা উৎপন্ন হবে, তা এই মুষ্টিমেয় বৃহৎ কারবারীরাই স্থির করে দেয় এবং **তার ফলে উপকরণের বিলিবন্টনও সর্বোত্তমভাবে ঘটতে পারে না।**

(ঙ) ব্যক্তিগত সম্পত্তি-ব্যবস্থার দরুন (অর্থাৎ, প্রধানত, উৎপাদনের উপাদান যথা জমি, পুঁজি, কলকারখানা ইত্যাদির ব্যক্তিগত মালিকানা) ধনতন্ত্রে **আয়ের বণ্টনে বৈষম্য ঘটে ও তা ক্রমাগত বাড়তে** থাকে। তাতে সমগ্র সমাজ সংখ্যালঘু ধনী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র এই দুই পরস্পর বিরোধী অর্থনীতিক শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায় এবং **সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্রের উপর সংখ্যালঘু ধনীর শোষণ প্রতিষ্ঠিত হয়।** এটা সামাজিক অন্যায় ও অবিচার।

(চ) **চক্রাকার গতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের চড়তি ও মন্দার** (অর্থাৎ বাণিজ্য চক্রের) **আবির্ভাব এবং কর্মহীনতার অস্তিত্ব,** এই দু'টি প্রধান অর্থনীতিক সমস্যা **ধনতন্ত্রের নিত্যসঙ্গী।** এর দরুন যে বিপুল অর্থনীতিক অপচয় ঘটে ও সামাজিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় তা দূর করা ধনতন্ত্রের সাধ্যাতীত। **ধনতন্ত্র এই দু'টি সমস্যার সৃষ্টি করে কিন্তু তাদের সমাধান করতে পারে না।**

১০. ৩. সমাজতন্ত্র
Socialism

১. **সমাজতন্ত্র হল এরূপ একটি অর্থনীতিক ব্যবস্থা** যেখানে সমাজ বা দেশের যাবতীয় উৎপাদনের উপাদান বা উপায়গুলির উপর (অর্থাৎ জমি, পুঁজি, খনি, অরণ্য ও জলসম্পদ ইত্যাদি) সমাজ বা রাষ্ট্রের মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. **বৈশিষ্ট্য : সমাজতন্ত্রের প্রধান অর্থনীতিক বৈশিষ্ট্য তিনটি :** সামাজিক সম্পত্তি, অর্থনীতিক পরিকল্পনা ও জাতীয় আয়ের সমবণ্টন।

(ক) **সামাজিক সম্পত্তি :** সমাজতন্ত্রে ভোগ্যদ্রব্য (অর্থাৎ অর্থবিদ্যায় যাদের 'সম্পদ' বলা হয়) ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানায় রাখার অনুমতি দেওয়া হলেও, উৎপাদনের উপায়গুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার বদলে সামাজিক (অর্থাৎ সমষ্টিগতভাবে সকল দেশবাসীর) বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

(খ) **অর্থনীতিক পরিকল্পনা :** তথাকথিত স্বয়ংক্রিয় মূল্যব্যবস্থার পরিবর্তে কি উৎপন্ন হবে, কতটা উৎপন্ন হবে, কার জন্য উৎপন্ন হবে, ইত্যাদি অর্থনীতিক মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ও তা কাজে পরিণত করার জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিক পরিকল্পনা কমিশন নিযুক্ত হয় ও তা একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য একটি অর্থনীতিক পরিকল্পনা রচনা করে। ঐ পরিকল্পনা অনুসারে নির্দিষ্টকাল ধরে বিবিধ দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও তদনুযায়ী বিবিধ উৎপাদন কাজে উপকরণগুলির বিলিবণ্টন ঘটে। সমাজতন্ত্রে ভোগ্যপণ্য বণ্টনে মূল্যব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া হলেও তা চাহিদা-যোগানের নিরপেক্ষ প্রতিফলক নয়। প্রয়োজন অনুসারে পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শমত রাষ্ট্র তা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার দ্বারা সমাজতন্ত্রের অর্থনীতিক কার্যাবলী পরিচালিত হয় বলে একে পরিকল্পিত অর্থনীতিও বলে।

(গ) **জাতীয় আয়ের সমবণ্টন :** জাতীয় আয়ের সমবণ্টন দ্বারা সমাজে শ্রেণীভেদ বিলোপ করাই সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য লাভের জন্য সমাজতন্ত্রে কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক প্রদানের প্রথা প্রবর্তিত হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি (অর্থাৎ জমি, পুঁজি, কলকারখানার ব্যক্তিগত মালিকানা) থাকে না বলে, সমাজতন্ত্রে কাজ না করলে কোন আয় উপার্জনের উপায় থাকে না। প্রত্যেকে নিজ ক্ষমতামত পবিশ্রম করবে এবং প্রত্যেকে তাব পরিশ্রম অনুসারে পারিশ্রমিক পাবে—এই হল সমাজতন্ত্রে আয় বণ্টনের নীতি।

৩. **সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ :** সমালোচকদের মতে, সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি হল : (ক) রাষ্ট্র পরিকল্পনা কমিশন মারফত কি উৎপন্ন হবে, কতটা পবিমাণে উৎপন্ন হবে, কি দামে তা বিক্রয় হবে ইত্যাদি স্থির করে দেয়। তাই **সমাজতন্ত্রে ভোগীদের কোন স্বাধীনতা থাকে না।** এই সমালোচনা অবশ্য তত্ত্বগত, কাবণ, বাস্তবের ধনতন্ত্রেও ভোগীদের স্বাধীনতা সামান্যই।

(খ) ধনতন্ত্রের মত শুধুমাত্র মুনাফা উপার্জনের উদ্দেশ্যে **ব্যক্তিগত স্বাধীন উদ্যোগের দ্বারা উৎপাদন পরিচালিত হয় না বলে,** এবং উপার্জিত সম্পদ বংশপরম্পরায়, ব্যক্তিগত নিরঙ্কুশ ভোগদখলের অধিকার থাকে না বলে, **সমাজতন্ত্রে উৎপাদন বাড়বে না,** একসময়ে একথা বলা হত। কিন্তু এই আশঙ্কা অবাস্তব বলে প্রমাণিত হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করে ও নতুন সমাজচেতনার সৃষ্টি করে, অবহেলিত সাধারণ মানুষকে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে, প্রাপ্য প্রশংসা ও উপযুক্ত পুরস্কার দিয়ে শ্রমিক-কর্মী ও উৎপাদনে নিযুক্ত সকলকে যে উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা যায়, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তা দেখা যাচ্ছে।

(গ) সমাজতন্ত্রে যাবতীয় উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। ধনতন্ত্রে শিল্পের উদ্যোক্তারা যে ঝুঁকি বহন করে, সমাজতন্ত্রে সরকারী কর্মচারীদের সে রকম ঝুঁকি বহনের কোন প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং

ব্যক্তিগত মালিকানার অর্থনীতিতে উদ্যোক্তারা সর্বদা উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে যতটা আগ্রহান্বিত, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে তা আশা করা যায় না। তা ছাড়া, **শিল্প পরিচালনা ব্যবস্থা এক জটিল সরকারী আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।** তবে, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে চেতনা ও দায়িত্ববোধের উন্মেষ ঘটাতে পারলে, কাজের গুরুত্ববোধ তাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারলে, এই অসুবিধা অনেকখানিই দূর করা সম্ভব। ধনতন্ত্রেও ডাক ও তার বিভাগ, পরিবহণ ও নানারূপ গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সরকারী মালিকানা ও কর্তৃত্বে সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা সুদক্ষভাবে পরিচালিত হতে দেখা যায়। সুম্পিটারের মতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও পরিচালনায় অনেক বেশি দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব।

(ঘ) **ধনতন্ত্রে স্বাধীন মূল্যব্যবস্থার দ্বারা পণ্যোৎপাদনের জন্য উপকরণ-সমূহের যেরূপ বাঞ্ছনীয় বিলিবণ্টন ঘটানো সম্ভব, মূল্যব্যবস্থার অভাবে সমাজতন্ত্রে তা সম্ভব নয়।** সমাজতন্ত্রে পরিকল্পনা কমিশন তথা রাষ্ট্র খেয়ালখুশীমত উপকরণসমূহের বিলিবণ্টন করে। কিন্তু এই অভিমত খণ্ডন করে অর্থবিজ্ঞানীদ্বয় ল্যাঙ্গে ও টেলর দেখিয়েছেন যে, ধনতন্ত্রে মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়ে মূল্য-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে উপকরণগুলির যেরূপ বিলিবণ্টন ঘটে, তার চেয়ে অনেক ভালভাবে সেগুলির ব্যবহার অনুযায়ী বিলিবণ্টন সমাজতন্ত্রে ঘটতে পারে।

৪. **সমাজতন্ত্রের সমর্থনে যুক্তি** : সমাজতন্ত্রের পক্ষে প্রধান প্রধান যুক্তিগুলি হল : (ক) উৎপাদনের উপায়গুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থাই হল ধনতান্ত্রিক সমাজে আয় ও সম্পদের বণ্টনে বৈষম্যের মূল কারণ। এই ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপ করে তার জায়গায় সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার দ্বারা এবং প্রত্যেকের কাজ অনুসারে পারিশ্রমিকের প্রবর্তন করে **সমাজতন্ত্র দেশে আয় ও সম্পদের বণ্টনে সমতা আনে।** তাতে সমাজে শ্রেণীভেদ লোপ পায়। এটি সমাজ কল্যাণ বৃদ্ধির সহায়ক।

(খ) **সকলের জন্য কাজের সংস্থান ও আয় উপার্জনের ব্যবস্থা** করে সমাজতন্ত্র কর্মহীনতার অভিশাপ নির্মূল করে।

(গ) বাণিজ্য চক্রজনিত **অবিরাম চড়তি ও মন্দার বাজারের চক্রবৎ আবর্তন দূর করে সমাজতন্ত্র দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখে।**

(ঘ) ধনতন্ত্রে বাস্তবে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব ঘটে। একচেটিয়া কারবারীরা উৎপাদন কমিয়ে দিয়ে চড়া দামে জিনিস বিক্রি করে ভোগীদের শোষণ করে। কম দামে উৎপাদকের কাছ থেকে কাঁচামাল ও শ্রমিকদের কাছ থেকে শ্রম কিনে তাদের শোষণ করে। **সমাজতন্ত্র** ব্যক্তিগত বা **বেসরকারী এক-চেটিয়া কারবারী ও কারবারের বিলোপ করে ভোগী ও কাঁচামালের যোগানদার এবং শ্রমিকদের শোষণ থেকে রক্ষা করে।**

(ঙ) ধনতন্ত্রে কার্যত, মুনাফা শিকারের লালসায় ধনী ক্রেতাদের বিলাসব্যসন

চরিতার্থ করায় উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিবর্তে উৎপাদনকারীরা অনেক ক্ষতিকারক দ্রব্যের উৎপাদন করে থাকে। **সমাজতন্ত্র** তার অবসান ঘটিয়ে, সমাজের পক্ষে **হিতকর ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের যথেষ্ট উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম।**

বর্তমান কালে ধনতন্ত্রের বিকল্প হিসাবে সমাজতন্ত্র ক্রমশ বিপুল জনসমষ্টির মনে ব্যাপকতম আগ্রহ সৃষ্টি করে চলেছে। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা একে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মতাদর্শগত সংঘর্ষ বর্তমান যুগেব সর্বপ্রধান দ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছে। এব ফলাফলের উপব মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ বিশেষভাবেই নির্ভরশীল।

১০. ৪. মিশ্র অর্থনীতি
Mixed Economy

১ মিশ্র অর্থনীতি বা মিশ্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলতে এমন একটি অর্থনীতিক ব্যবস্থা বোঝায় যেখানে, উৎপাদন ও ভোগ সংগঠিত কবার ক্ষেত্রে বাজাব (অর্থাৎ চাহিদা যোগানের শক্তিব দ্বাবা মূল্য নির্ধারণ) ব্যবস্থার সাথে সবকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই ব্যবস্থায় কতকগুলি অর্থনীতিক কায সম্পাদনেব ভাব বাজাব বা মূল্য ব্যবস্থাব উপর ছেড়ে দেওয়া হয়, আব কতকগুলি অর্থনীতিক কার্য সবকাবী নীতিব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত এবং প্রয়োজন মত সবকারেব দ্বাবা সম্পাদিতও হয়ে থাকে। এজন্য সবকাবী আইন পাস কবে উৎপাদন, ভোগ, লগ্নি, বিনিয়োগ ইত্যাদি নানা প্রকার কার্যাবলী যেমন নিয়ন্ত্রণ কবা হয় তেমনি প্রয়োজনবোধে সরকাবী বিনিয়োগ দ্বারা রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠাও ঘটতে পারে। সম্প্রতিকালে বিকাশমান সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতে দ্রুত অর্থনীতিক উন্নয়নের ভাব সরকাবের উপবই ন্যস্ত হওয়ায এসব দেশগুলির রাষ্ট্রীয় শিল্পের ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রেব উৎপত্তি ও বৃদ্ধি ঘটছে। এরকম কোন কোন দেশ অর্থনীতিক পরিকল্পনার সাহায্যও গ্রহণ করছে।

২. **বৈশিষ্ট্য ঃ** মিশ্র অর্থনীতিব মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ

(ক) **সম্পত্তির ব্যক্তিগত বা বেসরকারী মালিকানার অধিকার** এতে থাকে।

(খ) **ব্যক্তিগত উদ্যোগের অধিকার** এতে থাকে। তবে তা সবকারী বিধিনিষেধের দ্বারা আংশিক সীমায়িত।

(গ) **মুল্যব্যবস্থাও** এতে থাকে, তবে, তা **আংশিক** ভাবে **নিয়ন্ত্রিত**।

(ঘ) **ব্যক্তিগত উদ্যোগ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং মুল্যব্যবস্থার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ** মেনে নেওয়া হয়।

(ঙ) **প্রয়োজন বোধে উৎপাদন ক্ষেত্রে সরকারের প্রবেশ এবং অংশ-গ্রহণও** ঘটে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই অংশগ্রহণ ঘটলে অর্থনীতিক কার্যকলাপেব ক্ষেত্রকে তদনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) উৎপাদনের যেসব ক্ষেত্রে শুধু সরকারী উদ্যোগ রয়েছে তা নিয়ে **সরকারী বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্র** গঠিত।

(২) উৎপাদনের **কতকগুলি ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী, দু'রকম উদ্যোগ** থাকতে পারে। তাদের নিয়ে মিশ্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্র গঠিত।

(৩) উৎপাদনের বাকি ক্ষেত্রে শুধুই বেসরকারী উদ্যোগ থাকে। তাদের নিয়ে **বেসরকারী বা ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্র** গঠিত।

(চ) কোন পূর্বনির্দিষ্ট **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা** অনুসারে বেসরকারী কর্মোদ্যোগ নিয়ন্ত্রিত এবং রাষ্ট্রীয় কর্মোদ্যোগ পরিচালিত হতে পারে।

(ছ) মিশ্র-ধনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল বেসরকারী উদ্যোগের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর **সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা।** প্রয়োজনবোধে এতে কোন বেসরকারী উদ্যোগের জাতীয়করণ করে রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা ও প্রসারিত করা চলে। তেমনি, প্রয়োজনীয় স্থলে, জাতীয়করণ না করে, তার পরিবর্তে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্বার্থে বেসরকারী উদ্যোগগুলিকে বাঞ্ছিত অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণে সরকার বাধ্য করতে পারে। ঐ উদ্দেশ্যে তাদের নির্দিষ্ট কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

১০. ৫. ভারতের মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
The Mixed Economic System in India

বৈশিষ্ট্য ঃ (ক) সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের সহাবস্থান ঃ ভারতের শিল্পক্ষেত্র সরকারী বা রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারী এই দুই অংশে বিভক্ত। ১৯৫১ সালের শিল্প (নিয়ন্ত্রণ) আইন, এবং ১৯৭০ সালের লাইসেন্সিং পলিসী দ্বারা ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি সংক্রান্ত ঘোষণাটি সংশোধিত হয়েছে এবং তাদের অন্তর্গত শিল্পসমূহের নিম্নরূপ পুনর্বিন্যাস ঘটেছে।

(১) ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি অনুসারে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ প্রভৃতি ১৭টি শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে নতুন সব প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র কর্তৃক স্থাপিত হবে। তবে বর্তমানে যে সকল ব্যক্তিগত মালিকানার কারবার রয়েছে, রাষ্ট্র তাদের সম্প্রসারণের অনুমতি দিতে পারে।

(২) অ্যালুমিনিয়াম, লৌহ মিশ্রিত ধাতু, পরিবহণ প্রভৃতি ১২টি শিল্পে নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনে রাষ্ট্র এবং বেসরকারী উদ্যোগ, উভয়েরই অধিকার থাকবে। রাষ্ট্র ক্রমেই অধিক পরিমাণে এই সকল শিল্পে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেও বেসরকারী সংস্থাসমূহকেও এক্ষেত্রে নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উৎসাহ দেওয়া হবে। অতি সম্প্রতি এ বিষয়ে কিছু পরিবর্তন করে বেসরকারী ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন লৌহ ও ইস্পাত শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

(৩) এই দুই শ্রেণী ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় শিল্পের স্থাপনা ও সম্প্রসারণের সকল ভার বেসরকারী উদ্যোগের উপরই ন্যস্ত থাকবে। এই সকল বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্র পরিবহণ, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য শক্তি উৎপাদন ও সরবরাহ

করবে, উপযুক্ত পরিমাণে আর্থিক সাহায্য দেবে এবং সংরক্ষণ নীতির আবশ্যকীয় পরিবর্তন করবে ও অন্যান্যভাবে সহায়তা করবে এবং শিল্পক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দূর করতে চেষ্টা করবে।

উপরোক্ত যে তিনটি শ্রেণীতে শিল্পগুলিকে বিভক্ত করা হয়েছে তা অপরিবর্তনীয় নয়। অর্থনীতিক পরিকল্পনার স্বার্থে বা অন্যান্য গুরুতর কারণে প্রয়োজন মনে করলে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত শিল্পসমূহের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র কর্তৃক নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতে পারে।

(খ) **বেসরকারী ক্ষেত্রের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণঃ** বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের সুনিয়ন্ত্রিত ও উপযুক্ত সম্প্রসারণের জন্য ভারত সরকার ১৯৫১ সালে একটি শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন পাস করে। ১৯৫২ সাল থেকে তা চালু হয় ও ১৯৫৩ সালে তা সংশোধিত হয় ও ৪৫টি শিল্পে তা প্রয়োগ করা হয়। এর দ্বারা বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মের তদন্ত এবং প্রয়োজনবোধে তাদের পরিচালনাভার গ্রহণের ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া একটি নির্দিষ্ট সীমার বেশি পুঁজি নিয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারের নিকট থেকে লাইসেন্স নিতে বাধ্য করা হয়েছে। শিল্পগুলির সাধারণ ও বিশেষ সমস্যা ও লাইসেন্স গ্রহণ সমস্যা ইত্যাদি বিবেচনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতা পরিষদ, লাইসেন্স মঞ্জুরীর জন্য একটি লাইসেন্সিং কমিটি ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলির জন্য একটি করে উন্নয়ন পরিষদ স্থাপনের ভার সরকারকে দেওয়া হয়েছে ও এইগুলি সরকারের দ্বারা স্থাপিত হয়েছে।

এর পর ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত সরকার যে নতুন লাইসেন্সিং পলিসি গ্রহণ করেছেন তাতে—(১) লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে কোর সেক্টর, মিড্‌ল সেক্টর, হেভী ইনভেস্টমেণ্ট সেক্টর ও রিজার্ভ সেক্টর, এই চার ভাগে শিল্পগুলিকে ভাগ করা হয়েছে।

(২) কোর সেক্টরে আছে বুনিয়াদী, গুরুত্বপূর্ণ (স্ট্র্যাটেজিক) ও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ (ক্রিটিক্যাল) শিল্পগুলি। এদের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতার সাথে লাইসেন্স মঞ্জুরীর বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে এবং নতুন স্থাপিত কোন প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দিতে হলে তা সরকারী ও বেসরকারী যুক্ত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ জয়েণ্ট সেক্টর ইউনিট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৩) মিড্‌ল সেক্টরে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত পুঁজি নিয়ে গঠিত শিল্প সংস্থাগুলির কোন লাইসেন্স লাগবে না। যে সব নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠান ১ কোটি থেকে ৫ কোটি টাকা পুঁজি নিয়ে গঠিত হবে তাদের লাইসেন্স নিতে হবে। কিন্তু এই শ্রেণীর পুরাতন সংস্থাগুলিকে কতকগুলি শর্ত সাপেক্ষে লাইসেন্স নেবার প্রয়োজন হবে না (যেমন এরা যদি দত্ত কমিটি কর্তৃক ঘোষিত ২০টি বড় শিল্পগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না হয়, এদের যদি ১০ লক্ষ টাকা অথবা মোট পুঁজির ১০ শতাংশের বেশি মূল্যের দ্রব্য

আমদানির জন্য বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন না হয়, এবং এরা যদি মনোপলি অ্যাক্ট দ্বারা নির্দিষ্ট প্রধান্য বিস্তারকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান না হয়)।

(৪) ৫ কোটি টাকার বেশি পুঁজি নিয়ে গঠিত সকল প্রস্তাবিত নতুন সংস্থা হেভী ইনভেস্টমেণ্ট সেক্টরের অন্তর্গত বলে গণ্য হবে। এদের জন্য কঠোরভাবে লাইসেন্স ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় স্থলে এদের বেলায়ও সরকারী ও বেসরকারী যুক্ত উদ্যোগের সংস্থা স্থাপনের উৎসাহ দিতে হবে।

(৫) বিশেষ বিশেষ কতকগুলি দ্রব্যের উৎপাদন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলির জন্য সংরক্ষণ করা হবে। এটা হল রিজার্ভ সেকটর।

(গ) **সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে পরিকল্পিত বিনিয়োগের অনুপাত ঃ** বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যক্রম ও গৃহীত ব্যবস্থার দ্বারা সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত ও পরিবর্তিত হচ্ছে। এটা সম্পর্কে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, বেসরকারী ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের জন্য নানাবিধ উৎসাহ প্রদান করা হলেও, বর্তমান সরকারী নীতি হল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের অধিকতর বিস্তৃতি। এইজন্য প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অনুপাত ছিল ৫০ : ৫০, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তা ৫৬ : ৪৪-এ পরিণত হয়, আবার তৃতীয় পরিকল্পনায় এ সম্পর্কে বরাদ্দের অনুপাত মোটামুটি ৫৯ : ৪১।

(ঘ) **প্রগতিশীল কর-ব্যবস্থা ঃ** দেশের মধ্যে আয়ের বণ্টনে বৈষম্য দূর করার জন্য কর-ব্যবস্থাকে অধিকতর প্রগতিশীল করার কথা বলা হয়েছে। এজন্য কিছু কিছু নতুন কর প্রবর্তিত হয়েছে।

(ঙ) **সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা ঃ** রাষ্ট্রীয় বীমা মারফত অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, নারী শ্রমিকদের মাতৃত্ব ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় সবেতন ছুটি, অর্থ সাহায্য, চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ইত্যাদি ব্যবস্থার দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর জীবনে নিরাপত্তা আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

(চ) **একচেটিয়া কারবার ও কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ঃ** একচেটিয়া কারবার ও প্রতিযোগিতা-সঙ্কোচনমূলক কারবারী কার্যকলাপ আইন অনুসারে ২০ কোটি টাকার বেশি সম্পত্তি বিশিষ্ট ও আধিপত্যকারী কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলির ভারত সরকারের কাছে রেজিস্ট্রি করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।